অরিন্দম চট্টোপাধ্যায়
শতরঞ্জ

আবেদন

নুক্, কিন্ডেল, কবো বা ট্যাব ছাড়া ই-বই পড়ার অদম্য আগ্রহ থেকেই এই ইপাব তৈরি যা খুব সহজেই হাতের স্মার্টফোনে যে কোন অবসরেই পড়ে ফেলা যায়। আলাদা করে ই-বুক রিডার কেনার কোন প্রয়োজন নেই বা পিডিএফের মত জুম করে ডান-বা দিকে সরিয়ে পড়ারও দরকার নেই।

কিন্তু অন্তর্জালে পছন্দের বাংলা বইয়ের পিডিএফ যাও বা পাওয়া যায়, ইপাব অপ্রতুল। ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ও প্রচারের জন্য তাই নিজের সোশ্যাল মিডিয়ায় (ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, টুইটার, লিঙ্কডইন ইত্যাদিতে) এই ইপাব ছড়িয়ে দিতে হবে।

প্রচ্ছদ, প্রকাশনা, উৎসর্গ ও ভূমিকা (যদি কিছু থাকে) ইত্যাদি প্রথমদিকের পাতাগুলো দেখতে না পেলে ঠিক বই বই ভাবতে অসুবিধা হয়, তাই তথাকথিত এই অপ্রাসঙ্গিক পাতাগুলিও রাখা হয়েছে।

অন্তর্জাল থেকে পছন্দের বইয়ের পিডিএফ নামিয়ে টেক্সটে রূপান্তরিত করা- এ কাজে ভি-ফ্ল্যাটের এখনো কোন জুড়ি নেই। এবার একে ওয়ার্ড বা অন্য কিছুতে এডিট করে ক্যালিবার এর সাহায্যে ইপাব। এটাই সহজ পদ্ধতি।।

ভি-ফ্ল্যাটের সাহায্যে পিডিএফ থেকে তৈরি, ভুল থাকলে জানান। বইটির বিষয়বস্তু ইন্টারনেটের বিভিন্ন ওয়েবসাইটে প্রকাশ্যেই উপলব্ধ। সমালোচনা, মন্তব্য, প্রতিবেদন, শিক্ষাদান, বৃত্তি এবং গবেষণার মতো অলাভজনক শিক্ষামূলক বা ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য, বাণিজ্যিকভাবে বিতরণের জন্য কখনোই নয়।

২৫ জুলাই, ২০১৮, গভীর রাত

কোনা এক্সপ্রেসওয়ে দিয়ে প্রচণ্ড বেগে কলকাতার দিকে আসছিল স্করপিও গাড়িটা। ড্রাইভিং সিটে সিএম-এর বিশ্বস্ত ড্রাইভার তড়িৎ। সামনের প্যাসেঞ্জার সিটে একজন সশস্ত্র দেহরক্ষী। পেছনের সিটে নেশায় বুঁদ হয়ে থাকা একজন প্রায় অচৈতন্য যুবক।

অভিজাত রায়!! অখিলেশ রায়, সিএম অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল-এর একমাত্র সন্তান।

কিছু দূর গিয়ে সাঁতরাগাছি স্টেশন লাগোয়া রাস্তা পেরিয়ে যেতেই হঠাৎ সশস্ত্র দেহরক্ষীটির হাতে উঠে আসে অটোমেটিক পিস্তল। ঠান্ডা নলটা ড্রাইভারের কপালে ঠেকিয়ে সে বলে ওঠে, 'একটু প্লিজ বাঁ-দিকটা নেবেন।'

অরিন্দম চট্টোপাধ্যায়

Shatranj
Arindam Chattapadhayay
Novel

প্রথম প্রকাশ আগস্ট ২০২১
দ্বিতীয় প্রকাশ মে ২০২২ (পরিমার্জিত সংস্করণ)
গ্রন্থস্বত্ব অরিন্দম চট্টোপাধ্যায়
প্রচ্ছদ স্বর্ণাভ বেরা
অলংকরণ কৃষ্ণেন্দু মণ্ডল
পত্রবিন্যাস ইন্দ্রাণী নাগ
বর্ণশুদ্ধি অমৃতা রায়
মুদ্রক জয়শ্রী প্রেস, কলকাতা-০৯
মূল্য ৫০০ টাকা / $25
ISBN 978-81-953017-7-5
প্রকাশক অভিষেক আইচ ও অরিজিৎ ভদ্র
দ্য কাফে টেবল
সাহেববাগান, ব্যান্ডেল, হুগলি – ৭১21২৩
যোগাযোগ – ৯৮742634১৩, ৯৭48081৫৪২

আমার সব জয়ের স্থপতি শ্রীমতী পূরবী চট্টোপাধ্যায় (মা) ও সব পরাজয়ের অংশীদার (স্বর্গীয়) শ্রী অশোক চট্টোপাধ্যায় (বাবান)-কে...

তোমাদের পাশাপাশি বেশি ছবি নেই। এটা থাক...

বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ

প্রিয় পাঠক,

খবরদার, বোকামি করবেন না! আর এগোবেন না... পিছিয়ে আসার রাস্তা নেই কিন্তু!

এই যে ক্ষুদ্রায়তন ভণিতা, এর অপর প্রান্তে আপনার জন্য অপেক্ষা করে রয়েছে এক সুদীর্ঘ চারশো পাতার কাহিনি! শতরঞ্জের একটি বাজির মতোই তা জটিল, বহু শাখা-প্রশাখা, সম্ভাবনা ও তত্ত্বে বিস্তৃত!

এ গল্পে কোনো ফিল-গুড ফ্যাক্টর নেই। সর্ব-মুশকিল আসান ও সর্ব-সূত্র ব্যাখ্যাকারী কোনো প্রখর ডিটেকটিভ বা যুগাবতার নেই এ গল্পে। কোনো পক্ষবিপক্ষ, জয়-পরাজয়, উচিত-অনুচিত নেই। শেষমেশ ধর্মের জয় ও অধর্মের বিনাশও দেখায় না এ গল্প। এমনকী এই গল্পে কোনো নায়ক-খলনায়ক অবধি নেই। আজকের দ্রুতগতির দুনিয়ায়, বাম ও দক্ষিণের পরস্পরবিরোধী দুই মেরুতে বিভক্ত এই অতিসরলীকৃত দুনিয়ায় এত বড় একটি প্যাঁচালো উপন্যাসের পিছনে সময় এবং গাঁটের কড়ি ব্যয় করার আগে তাহলে জেনে নিতে হবে না, এ গল্পে আছেটা কী?

পাঠক হিসেবে আপনি কী প্রত্যাশা রাখতে পারেন 'শতরঞ্জ'-এর কাছে? কীই বা পাওয়া যাবে না তার ঝুলিতে? কেনই বা পড়বেন এই গল্প?

খুব স্পষ্ট এবং দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বললে, 'শতরঞ্জ' একটি রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রমূলক থ্রিলারধর্মী কাহিনি। সুদূর ইতিহাসে নয়, এই কাহিনির শিকড় আমাদের ঘোর বর্তমানে প্রোথিত। এই কাহিনির সত্য হওয়ার কোনো দায় নেই। আবার জোর গলায় এর সমস্ত ঘটনা এবং উপ-ঘটনাকে 'মিথ্যে' বলাটাও মিথ্যে বলা হবে।

বলতে পারেন, 'ঘটনা' এবং 'অসম্ভব কল্পনা'-র মাঝামাঝি, 'হলেও হতে পারে'-র ধূসর জায়গা জুড়েই 'শতরঞ্জ'-এর ছক পাতা।

এ গল্পে রাষ্ট্রের ক্ষমতাশালী প্রভুরা আছেন। তাঁদের আদিগন্ত বিস্তৃত ক্ষমতালিপ্স জিহ্বার স্পর্শ আছে। জটিল-কুটিল মন্ত্রণাদাতারা আছেন। তাঁদের নিজেদের স্বার্থগন্ধী লড়াই আছে। বোড়ে ও ঘোড়ার রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম আছে। সাদাকালো গুলিয়ে দেওয়া, পক্ষ-বিপক্ষের হিসেবে গরমিল করে দেওয়া এই গল্পের শেষে পৃথিবী তাই ঠিক তেমনটিই থেকে যায়, যেমনটি তা গল্পের শুরুতে ছিল।

শুধু খেলার ছকের পাশে কিছু ছুটকো-ছাটকা মৃতদেহ, কিছু অকিঞ্চিৎকর শহীদ বেদি ও বাসি স্মৃতির টুকরো পড়ে থাকে। শতরঞ্জ-এ আছে তাদের কথাও!! সভ্যতা নামের যে মাস্ক-আঁটা গোলকধাঁধার ভিতরে আমাদের বাস, এই গল্প তাকেই ডিকোড করার চেষ্টা করে মাত্র।

আজ, যেদিন এই ভূমিকা লিখছি, তার ঠিক দু' বছর আট মাস আঠেরো দিন আগে লেখা শুরু করেছিলাম 'শতরঞ্জ'! আমার প্রথম বই 'একটি মিথ্যে ঘটনা অবলম্বনে'-র ঠিক পর থেকেই এই গল্পের সময়কাল শুরু। চেষ্টা ছিল, আমার প্রথম উপন্যাসের দুর্বলতাগুলোকে মেরামত করে নেওয়ার। সেই কাজে কতটা সফল হওয়া গেল, তারই পরীক্ষা এবার।

এই নাতিদীর্ঘ ভূমিকার ওপর গুরুভার অর্পিত হয়েছে, আপনাকে এই নবাগত লেখকের লেখা বেশ দোহারা চেহারার এই বইটি কিনতে রাজি করানোর। লঘু কলেবরের ক্ষীণ স্কন্ধের ওপর গুরুতর দায়িত্ব, সন্দেহ কী তায়!

যদি এই বাগাড়ম্বর অসফল হয়... যদি অধৈর্য পাঠক এখনই বইটি তাকে তুলে রাখতে চান, তাহলে আপনার কাছে আর মাত্র দু' মিনিট সময় চেয়ে নেব। এই দু' মিনিটে আমি চাই, আপনি অন্তত আমার এই ষড়যন্ত্রের অংশগ্রহণকারীদের নামও জেনে নিন। একা আমাকে দোষ দেবেন না, প্লিজ!

সর্বাগ্রে আমার প্রিয় বন্ধু ও 'শতরঞ্জ'-এর প্রথম পাঠক মণিদীপ লাহিড়ীর নাম আসবে!

প্রতিটি এপিসোড, প্রতিটি অধ্যায় লেখার সঙ্গে সঙ্গে তিনি পড়েছেন।

তাঁর ক্ষুরধার নজরে ধরা পড়েছে প্রচুর টেকনিক্যাল ভুল-ত্রুটি। পাঠক হিসেবে মণিদীপ আমার শ্রদ্ধেয়, সুহৃদ হিসেবে ভালোবাসার মানুষ। তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা দুই-ই রইল।

অশেষ ভালোবাসা নাম প্রকাশ না করতে চাওয়া সীমান্তের ওপারের আমার দুই পাকিস্তানি বন্ধুর জন্য! বলাই বাহুল্য, তাঁরা বাংলা পড়তে পারেন না। তবে আশা করি, আমার ভালোবাসা তাঁরা হৃদয়ে অনুভব করবেন! তথাকথিত 'শত্রু দেশ'-এর নাগরিকের সঙ্গে পরিচয়ের পর যেভাবে তাঁরা আমাকে, এক সামান্য আঞ্চলিক ভাষার কলমনবিশকে, সাহায্য করেছেন করাচি ও লাহোরের ঘনিষ্ঠ ছবি আঁকতে, সেখানকার ক্ষমতার অলিন্দের গোপন গুজবের গল্প তুলে আনতে, তার জন্য কোনো ধন্যবাদই যথেষ্ট নয়।

সকৃতজ্ঞ প্রণাম রইল আরেক নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বর্ষীয়ান গোয়েন্দার প্রতি, যিনি না থাকলে রাকেশ সাখাওয়াতের চরিত্র তৈরি হয় না। যিনি না থাকলে অনেক কিছুই জানা হত না আমার।

প্রবাসী বন্ধু ও বন্ধুপতি অন্তরা মুখার্জী ও রাজীব সরকার এবং অবশ্যই শান্তনুদা, শান্তনু চক্রবর্তী, কলকাতা মেট্রো রেলের উচ্চপদস্থ চাকুরে— এঁদের কথাও ভোলা যাবে না। এই লেখার একটি গুরুত্বপূর্ণ, সম্ভবত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ আটকে গিয়েছিল কিছু তথ্যের অভাবে। শান্তনুদা সেই অভাব পূরণ করেছেন। আর শান্তনুদার সঙ্গে আমার যোগাযোগ করিয়ে 'শতরঞ্জ' বাস্তবায়িত করতে সাহায্য করেছেন অন্তরা ও রাজীবদা! ধন্যবাদ তাঁদেরকেও!

এই দীর্ঘ দু' বছরে আমার যতটুকু যা উন্নতি, লেখক হিসেবে যতটুকু বেড়ে ওঠা, তার পিছনে সাহিত্যজগতের অনেকের অবাধ প্রশ্রয় ও ভালোবাসা রয়েছে। আমি নিজেই সন্দিহান, তাঁদের এতটা প্রশ্রয়ের যোগ্যতা আমি অর্জন করেছি কিনা। আমার দুই প্রশ্রয়ের ছায়া, দুই অভিভাবক, দুই মুখোপাধ্যায়—সাহিত্যিক শ্রী সৌরভ মুখোপাধ্যায় ও শ্রী সৈকত মুখোপাধ্যায়কে আমার আভূমি প্রণাম। আশা করব, তাঁরা অভিভাবকের মতোই আমার পাশে থাকবেন। ভুল শুধরে দেবেন ভবিষ্যতেও!

প্রকাশক দ্য কাফে টেবল তো বটেই, সেইসঙ্গে বন্ধু শ্রী অভিষেক আইচ-এর কথাও বলব। বিগত এক-দেড় বছর ধরে খালি একটাই কথা বলে গেছে সে নিরন্তর, 'তুমি আর কিচ্ছু ভেবো না, হাত খুলে লিখে যাও!' নবাগত লেখকের মনে নিরন্তর এই সাহস ও ভরসা যুগিয়ে যাওয়াটাই অভিষেক, অরিজিৎ ও তাঁদের টিম দ্য কাফে টেবল-কে অনন্য করে তুলেছে।

স্বর্ণাভ (প্রচ্ছদ), অমৃতা (বর্ণশুদ্ধি), কৃষ্ণেন্দু (অলংকরণ) ও ইন্দ্রাণী (অক্ষরবিন্যাস) অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন আমার গল্পের খামতি তাঁদের টেকনিক্যাল ব্রিলিয়ান্স দিয়ে ঢেকে দিতে। আমার কাজে আপনারা ত্রুটি পাবেনই! কিন্তু তাঁদের কাজে ফাঁক খুঁজে পাওয়া শক্ত। ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতা তাঁদেরকেও!

আমার পুত্র, শ্রীমান সবশেষে যাদের কথা না বললেই নয়... আমার বন্ধু, অর্হিত চট্টোপাধ্যায় এবং আমার সমগ্র পরিবার। তার এবং তাদের প্রাপ্য সময় থেকে চুরি-ডাকাতি করে আমি লিখে থাকি। তারা বিনা প্রতিবাদে সেসব মেনে নেয়। এর কোনো প্রতিদান দেওয়া আমার সাধ্যের বাইরে।

প্রিয় পাঠক, অনেক হাসি-মজা করলাম। আপনিও হালকা চালে পড়তে পড়তে এত দূর হয়তো এসেই গেছেন।

তাই, আশায় বুক বেঁধে আপনাকে জানাই— 'শতরঞ্জ' আমার অত্যন্ত সাধের সন্তান। বাংলা ভাষায় সিরিয়াস থ্রিলারের চর্চার খামতি নিয়ে পাঠক হিসেবে আমার আফশোস বহুদিনের। লেখক হিসেবে যদি সেই শূন্যস্থানের ভগ্নাংশও পূরণ করতে পারি, আমার প্রচেষ্টা সার্থক মনে করব। আমার লেখা হাড়-মাংস, মেদ-মজ্জা, দোষ-গুণ, খামতি-বাড়তি—

সবসমেত আপনার হাতে তুলে দিলাম।

আমার চাল রইল... ডি ফোর!
এবার আপনার পালা।
দেখা যাক, খেলা জমে কিনা।

বিনীত অরিন্দম চট্টোপাধ্যায়
১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২১
জনাই, হুগলি

আজ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস! আজ রাজ্য সরকারের উদ্যোগে বহু ব্যয়ে নির্মিত "মাতৃভাষা সদন" -এর উদ্বোধন হতে চলেছে এই মহানগরীর বুকে। এই মহার্ঘ সময়ে কিছু অপ্রিয় সত্যের দিকে মন এবং চোখ দুই-ই ফেরানো যাক।

এই উপমহাদেশে যে কোনো সামাজিক আন্দোলনকেই দলীয় রাজনীতির ঘোলা জলে মিশিয়ে ফেলার এবং কল্যাণকারী মূল স্রোতকে পঙ্কিল করে ফেলার একটি পুরোনো সযত্নলালিত অভ্যাস আমাদের রয়েছে।

ভাষা আন্দোলনও ঠিক তেমনি।

মাতৃভাষায় কথা বলার ও জীবনচর্যা নির্বাহ করার যে মূলগত অধিকারটুকু যে কোনো দেশের স্বাধীন মানুষ দাবি করতে পারে, এই উপমহাদেশে তার জন্য তরুণ-তরুণীরা ক্ষমতার বুলেটের আঘাতে প্রাণত্যাগ করেছে। সে ইতিহাস একইসঙ্গে গর্বের ও লজ্জার। সে ইতিহাস আমাদের সমাজ সচেতনতার ইতিহাস। আমাদের ভাষাগত ঐক্যের ইতিহাস।

আবার একইসঙ্গে তার বর্তমান ঘোর রাজনীতির জটিল নকশার জালে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে।

কলকাতার বুকে কয়েকশো কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত 'মাতৃভাষা সদন' এই নির্লজ্জ, শিরোনামলোভী নেতাবৃন্দের লোভের এবং দেখনদারিত্বের নতুনতম উদাহরণ।

প্রায় সমমূল্যে নির্মিত বিশ্ব বাংলা গেটের মাথায় তৈরি করা হয়েছে এক অদ্ভুত স্থাপত্য। স্থাপত্যটি নয়নমনোহর তাতে কোনো সন্দেহ নেই। স্থাপত্যটি বিশ্বের অনুপম স্থাপত্যকীর্তিগুলির মধ্যে একটি হয়ে উঠবে এবং টুরিজম ইত্যাদি বিবিধ উপায়ে বহু লোকের জীবিকানির্বাহের বন্দোবস্ত হবে, এইরূপ একটি কথা হাওয়ায় সন্তর্পণে, সুকৌশলে ভাসিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে বই কী।

স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন তিনি নিজে আসবেন এই সৌধের পরিদর্শনে। মুখ্যমন্ত্রী এক ধাপ এগিয়ে বলেছেন— এই সৌধ ভারত-বাংলাদেশের বাংলাভাষী মানুষদের ঐক্যের ও মৈত্রীর বন্ধনকে আরও সুদৃঢ় করবে।

এরূপ সদুদ্দেশ্যের মধ্যে আমাদের পাপী মন কেমন যেন ব্যালটের গন্ধ শুঁকতে পায়।

প্রধানমন্ত্রীর দলের জনপ্রিয়তার যে জোয়ার সারা ভারতে দেখা যায়, তা এখনও এই রাজ্যে অতটা ঢেউ তোলেনি। বাঙালির মন জয় করতে হলে ধর্ম নয়, ভাষাই উপযুক্ততর হাতিয়ার— এমন বিচক্ষণ হিসাব তিনি করে থাকতেই পারেন।

অন্যদিকে এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীও সংখ্যালঘু-রথে চড়ে সিংহাসনে আরোহণ করেছেন। প্রতিবেশী বন্ধুরাষ্ট্রের মন জয় করার ছুতোয় তিনি এই রাজ্যের সংখ্যালঘুদের মন জয় করার বালখিল্য অঙ্ক কষেছেন কিনা, স্বয়ং তিনিই জানেন। বাংলা তথা বাঙালির প্রতি ভালোবাসা দেখানোতেও তিনি মোটেও পিছিয়ে থাকার বান্দা নন।

সৌধ ঘিরে রাজনীতির পাশাখেলা এ দেশে ইন্দ্রপ্রস্থের সময় থেকে চালু। সন্দিগ্ধমনা ক্ষুদ্রমতি নাগরিকের মনে প্রশ্ন কিন্তু রয়েই গেল। এই সৌধ কী উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হবে? মাতৃভাষার সম্মান রক্ষার্থে নাকি ক্ষমতাবানের গদি রক্ষার্থে?

উত্তর, বরাবরের মতো লুকিয়ে আছে ভবিষ্যতের গর্ভে!

প্রথম অধ্যায়
।।দ্য ম্যাচ কন্টেক্সট।।

।। ১.১ ।।
।। দ্য গ্র্যান্ডমাস্টার্স ।।

১০ মে, ২০১৮ / ইসলামাবাদ, পাকিস্তান

'প্রিয় প্রধানমন্ত্রী, মান্যবরেষু

ইতিহাস খুব গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষী। নির্মম তো বটেই! তার প্রবল প্রবাহের মুখে আমরা ফেনার বুদ্বুদ মাত্র। ক্ষণকালের স্ফীতি আমাদের।

আপনি আমার বয়োজ্যেষ্ঠ এবং প্রাজ্ঞ! সুতরাং, এ কথা আপনাকে নতুন করে বোঝানোর ধৃষ্টতা বা প্রয়োজন কোনোটাই আমার নেই। আমি শুধু এই ব্যক্তিগত চিঠিতে আপনার কাছে একটি ব্যক্তিগত অনুরোধ রাখতে চাই।

আমি শুনেছি কলকাতা শহরে নির্মিত হয়েছে এক অনুপম সৌধ। সারা পৃথিবীর সমস্ত মানুষের মাতৃভাষায় কথা বলার অধিকার রক্ষা করতে লড়েছিলেন যে নির্ভীক বাঙালিরা, তাঁদের প্রতি, পৃথিবীর সমস্ত মাতৃভাষার প্রতি, বাংলা ও বাঙালির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের এক অনুপম মাধ্যম এই মাতৃভাষা সদন। আমি এও শুনেছি, এটি ভারত-বাংলাদেশের মৈত্রীর এক অভূতপূর্ব নিদর্শন হয়ে থাকবে বলে আপনাদের বিশ্বাস।

আমিও এই বিষয়ে সহমত পোষণ করি। আমাদের পূর্বপুরুষ ইতিহাসের এই অধ্যায়টির পাতা রক্তে কলঙ্কিত করে রেখেছেন। সে দাগ মোছার ক্ষমতা আমার নেই। তবু, আমি এই সৌধের সামনে একটি বার নতমস্তকে দাঁড়াতে চাই। আমাদের পূর্বসূরীদের কৃতকর্মের জন্য নিজের অনুতাপ ব্যক্ত করতে চাই। আমি চাই, পাকিস্তানকে ভারত ও বাংলাদেশের লোক নতুন করে চিনুক। অন্তত এই বার, পাকিস্তান নিঃশর্তে দীর্ঘমেয়াদি বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিতে চায় প্রতিবেশি দুই দেশের দিকে।

আমার অফিস থেকে জানানো হয়েছে, এই 'মাতৃভাষা সদন'-এ ইতিমধ্যেই আমাদের বন্ধুরাষ্ট্র বাংলাদেশের প্রধান নেত্রী এসে ঘুরে গেছেন। পাকিস্তানের তরফ থেকে শুভেচ্ছা ও সৌহার্দ্যের প্রতীকস্বরূপ, আমি অনুরোধ করব, আগস্ট মাসে আমার যে পূর্বপরিকল্পিত ভারত-সফর, সেখানে আমাকে ওই সৌধের সামনে দাঁড়িয়ে আমাদের এই মহান দেশের এই উপযুক্ত উপলব্ধির কথা সর্বসমক্ষে ঘোষণা করার সুযোগ দেওয়া হোক।

আমি চাই বাংলাদেশ তথা সারা বিশ্ব পাকিস্তানকে নতুনভাবে চিনুক। আর সেই চেনানোয় পাকিস্তানের হাত ধরুক আপনার মহান দেশ ভারতবর্ষ...

সাদা পাঠান স্যুট পরা মানুষটি অসম্ভব সুদর্শন। গলাটি অভিজাত গমগমে। মধ্য পঞ্চাশেও তাকে দেখলে যে কোনো তরুণীর হাঁটু কেঁপে উঠতে বাধ্য। সেই মানুষটির সামনে বসে টাইপ করতে করতে এমনিতেই ভুল হয়ে যেতে পারে রেজিনার।

আর এই লেখা লিখতে গিয়ে যে আরও বেশি করে গুলিয়ে যাবে, সেটাই তো স্বাভাবিক।

এ তো সাবমিশন! নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ! পাকিস্তানের উজির-এ-আজম এই টোনে,

এই কৃতাঞ্জলি ভঙ্গিতে কথা বলবেন ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে... এ তো বেহেশতের বাহাত্তর হুরির মতোই কষ্টকল্পনা!

তার ওপর এই ভদ্রলোক আজীবন যেমন দর্পিত পারফর্মার, যে প্রচণ্ড তীব্র

তাঁর আত্মসম্মান, তার সঙ্গে তো এই টোন, এই স্বর মিলিয়ে নেওয়া যায় না!!

রেজিনা লিখতে লিখতে থেমে এক বার কিন্তু কিন্তু করে, জিজ্ঞেস করেই ফেলে, 'জনাব! আমি কি সেক্রেটারি-সাহেবকে এক বার ডেকে পাঠাব?' একনাগাড়ে বলার ফ্লো-তে বাধা পড়তে হঠাৎ থেমে গিয়ে তিনি, ফিরোজ আহমেদ খান ভ্রূ কুঁচকে তাকালেন মেয়েটির দিকে, 'কেন বলো তো?'

'না... মানে...' অস্বস্তিতে মেয়েটি মাথা নামিয়ে নেয়! কী বলবে ভেবে পায় না।

কিছুক্ষণ একইভাবে তার দিকে তাকিয়ে থেকে ফিরোজ অকস্মাৎ হো-হো করে হেসে ওঠেন। রেজিনা একটু চমকে গেলেও কিছু বলে না। ফিরোজ হাসি থামিয়ে বলেন, 'ওহ! ডিয়ার! তুমি আমার চিঠির বয়ানে অসন্তুষ্ট, তাই না? মনে হচ্ছে বড্ড বেশি হাতজোড় করা হয়ে যাচ্ছে, হিন্দুস্তানের পিএম-এর সামনে?'

রেজিনা মুখে কিছু বলে না। তবে তার চোখের চাউনি নীরব সম্মতিই জানায়। ফিরোজ জানলা দিয়ে বাইরের সুবিস্তৃত সবুজ লনের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে একটু উদাস স্বরে বলেন, 'যুদ্ধ অনেক গভীর জিনিস মাই ডিয়ার! এর জেতা-হারা, রক্তক্ষরণ, সব কিছুই মুখোশের আড়ালে লুকিয়ে রাখা থাকে, সমসময়ে। সময়ের পলেস্তারা যত খসে পড়ে, বোঝা যায় আসলে কার পরাজয় হয়েছে, আসলে কার শরীর থেকে ঝরেছে বেশি রক্ত...'

তারপর হঠাৎ ঘোর ভেঙে বলেন, 'শতরঞ্জ খেলো নাকি?'

'নাহ স্যর!' একটু লজ্জা পেয়ে রেজিনা বলে।

'তাহলে তো তুমি বুঝতে পারবে না রেজিনা। তুমি বরং লিখতে থাকো। কে বলতে পারে, ইতিহাস হয়তো তোমাকে এই শতাব্দীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চিঠিটির লিপিকার হিসেবে মনে রাখবে...

১৫ মে, ২০১৮, ভোর বেলা / নিউ দিল্লী, ভারত

পোশাকে-আশাকে তিনি বরাবরই ফিটফাট। দিনের যে কোনো সময়, তাঁর বাসস্থানের যে কোনো জায়গাতেই তাঁকে পাওয়া যাক— অপ্রস্তুত অবস্থায় পাওয়া যাবে না, এটুকু নিশ্চিত।

এখন সকাল সাড়ে ছ'টা। শতকরা নব্বই ভাগ দিল্লি, সারারাতের চিটচিটে গরমের পর এই ভোরের অপেক্ষাকৃত ঠান্ডা সময়ে একটু ঘুমিয়ে নেয়। কিন্তু এই শহর, তথা এই দেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মানুষটির ইতিমধ্যেই প্রাতঃভ্রমণ, যোগাসন এবং স্নান সারা হয়ে গেছে।

ঘোরতর নিরামিষাশী এবং মিতাহারী। এত সকালে শুধু দুটি ডাইজেস্টিভ বিস্কুট আর এক কাপ চা। ধোঁয়া ওঠা কাপটি রাখা আছে পাশের নীচু টিপয়ে। জানলার ধারে বসে ভোরের সূর্যের কমলা আলোয় তিনি একটি রিপোর্ট পড়ছেন। মুখের ভঙ্গিমায় বোঝা যাচ্ছে, লেখাটি তাঁর প্রীতি উৎপাদন করছে না।

অনতিদূরে দাঁড়িয়ে যে কৃষ্ণকায় ছিপছিপে মানুষটি— এই সকালে তিনিও একেবারে ধোপদুরস্ত ফিটফাট! তাঁর চোখ-মুখ দেখে মনে হচ্ছে না, তিনি অপর জনের অপ্রসন্নতা নিয়ে খুব চিন্তিত।

তাঁর কাজ ওই বসে থাকা মানুষটিকে নিরাপদে রাখা। তাঁকে খুশি রাখা নয়।

প্রায় দশ মিনিট একাগ্রচিত্তে পড়ার পর মানুষটি চোখ তুলে তাকালেন, 'কে এই অরুণ সচদেভ?'

'অ্যানালিস্ট স্যর, জাস্ট অ্যান অ্যানালিস্ট!'

'অ্যান্ড জাস্ট হোয়াট দ্য ফাক ডাজ হি ওয়ান্ট মি টু ডু?' ফর্সা গালে রক্তের ছাপ জমছে ধীরে ধীরে।

‘ইফ আই মে, উই আর আস্কিং দ্য রং কোয়েশ্চেন, স্যর। এই রিপোর্টের রেকমেন্ডেশনের সঙ্গে আমি একমত নই, কিন্তু অবজার্ভেশনের এবং অ্যানালিসিসের সঙ্গে আমি একমত। সেদিক দিয়ে বিচার করে দেখলে, সঠিক প্রশ্ন হচ্ছে, হোয়াট ডু উই ওয়ান্ট টু ডু উইথ হিম?’

কৌতূহলী মানুষটি চায়ের কাপ হাতে তুলতে ভুলে গেলেন। নির্নিমেষে তাকিয়ে রইলেন। প্রশ্নটা উচ্চারণ করার প্রয়োজন হল না। অপর জন সামান্য এগিয়ে এসে নীচু গলায় বললেন, ‘আই হ্যাভ এ প্ল্যান স্যর...’

সময় বেশি নেই। কম সময়েই বোঝাতে হবে। ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রীর ফাঁকা সময়ের পরিমাণ খুবই অল্প!

।। ১.২ ।।
।। দ্য ইনিশিয়াল এক্সচেঞ্জ ।।

১১ মার্চ, ২০১৮/ ইসলামাবাদ, পাকিস্তান

‘মেজবান’ কোন ফাইভ স্টার রেস্তরাঁর নাম নয়। দেওয়ালে সস্তা সবুজ পেন্ট তারও বয়স হয়ে গেল প্রায় এক কুড়ি। তার ওপর ক্যাটকেটে গোলাপি রং দিয়ে ফুল, পাতা, চাঁদ, তারা, আঁকা-বাঁকা কলকার নকশা। অপরিসর ঘরে ভাজা মাংস, মশলা আর তেলের গন্ধ পাক খেয়ে খেয়ে বেরোনোর পথ পায়নি; পরতে পরতে জমা হয়েছে দেওয়ালের গায়ে, টেবিলের সানমাইকার ওপর, এমনকী মানুষগুলোর তেলতেলে বাদামি চামড়াতেও।

নবাগত কেউ যদি হঠাৎ এই দোকানটির সামনে এসে পড়েন, বিশেষত তিনি যদি অভিজাত ও সম্ভ্রান্ত হন, তাহলে নিজের অজান্তেই তাঁর নাক-মুখ কুঁচকে উঠবে। তিনি পাশ কাটিয়ে দ্রুত নিজের গন্তব্যের দিকে এগিয়ে যেতে চাইবেন।

এবং, তিনি ভুল করবেন!

ঘিঞ্জি-অপরিচ্ছন্ন এই রেস্তরাঁটিই কিন্তু আবপারার শান!

কলকাতার যেমন বড়বাজার, তেমনি ইসলামাবাদের হল আবপারা। আধুনিক মল, ঝাঁ-চকচকে কেতাদুরস্ত বিপণি, আকাশছোঁয়া দামের বিদেশি ব্র্যান্ড আর বাতানুকূল পরিবেশের বৈচিত্র্যহীন উপস্থিতি নয়। আবপারা সরব, রঙিন। হাঁক-ডাক, দর-দামের লড়াই, রোদ্দুর, ঘাম, রকমারি ফাস্ট-ফুডের দোকান, পুরোনো মানুষ, মাঝারি মানুষ এবং আশেপাশে দেখতে পাওয়া রোজের আটপৌরে মানুষদের ভিড়ে সরগরম।

এই অঞ্চলে পাওয়া যায় না এমন জিনিস মেলা ভার। ইলেকট্রনিক্স, কাপড়জামা, খাবার-দাবার, মশলাপাতি, মুদির দোকানের জিনিসপত্তর— সব কিছুই অন্যান্য বাজারের চেয়ে সস্তা। ইসলামাবাদের সংখ্যাগুরু লোক জিন্নাহ্ সুপার মার্কেটে কেনাকাটা করার সামর্থ্য রাখে না। তাদের একটা বড় ভরসার জায়গা হল এই আবপারা।

তখনও বাংলাদেশের জন্ম হয়নি। এই জায়গার নাম ছিল বাঘবাট্টা! পূর্ব পাকিস্তানের সরকারি কর্মচারী, যারা কাজের টানে বাড়িঘর ছেড়ে পশ্চিমে এসে থাকতে বাধ্য হত, তাদের আস্তানা ছিল এই অঞ্চলে।

লোকমুখে শোনা যায়, ১৯৬০ সালে ইসলামাবাদের দক্ষিণ-পশ্চিমে এই অঞ্চলে এক বাঙালি মায়ের একটি মেয়ে জন্মায়, যার নাম রাখা হয় আবপারা। অর্থাৎ জল যে শান্তি আনে, সেই শান্তি। মানুষের বসবাসের পত্তন হওয়ার পর, সেই মেয়েটি নাকি এই অঞ্চলে জন্মানো প্রথম শিশু। তার নামেই এই জায়গার নাম চলে আসছে। এই কথাকে পুরো গল্প বলে উড়িয়ে দেওয়াও যায় না, যেহেতু সে সময়কার বহু মানুষ আজও জীবিত এবং তারা এই ঘটনার প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য দেন।

যদিও সেদিনের সঙ্গে আজকের অনেক তফাত। সেদিনের সুয়োরানি আজ দুয়োরানিতে পরিণত। সরকার এসেছে, সরকার গেছে। প্রতিশ্রুতির বন্যা বয়েছে। কিন্তু ইসলামাবাদের বাকি এলাকা যখন উন্নয়নের অশ্বমেধের ঘোড়া ছুটিয়েছে, আবপারার এগিয়ে চলার ধরনটি সেই সময়েও ছইয়ের নীচে টিমটিমে লণ্ঠন জ্বেলে এগিয়ে যাওয়া গরুর গাড়ির মতোই অলস, মন্থর, নিরুদ্বিগ্ন!

চারপাশ থেকে ঘিরে ধরা রাজধানীর দ্রুত ছুটে চলা সময় লাগাম কষে থমকে দাঁড়িয়েছে এই বাজারে। তাই যেন মনে হয় আবপারা পিছিয়ে গেছে কয়েক দশক। আধুনিক স্যানিটেশন, ঠিকঠাক রাস্তাঘাট ইত্যাদি সব কিছুরই অভাব।

কিন্তু ঘিঞ্জি, নিম্নবিত্ত এই জায়গা থেকে কেউ এর গন্ধ-রস-বর্ণ কেড়ে নিতে পারেনি। তা জীবনের মতোই স্বতঃস্ফূর্ত, সদা প্রবহমান। কোনো শাসক বা বিরোধীপক্ষের ধার ধারে না।

যেমন এই গলিটা। ইসলামাবাদ মেডিক্যাল অ্যান্ড সার্জিক্যাল হসপিটাল — গালভরা চওড়া নামের এই সরকারি হাসপাতালের বাঁ-দিকের তস্য গলি। একদিকে আল-ফাতিমা ক্লিনিক আর অন্যদিকে সাইফ ফার্মেসি। ঠিক তাদের মাঝখানে হংস মধ্যে বকো যথা হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে এই খাবারের দোকান। হাসপাতালের কোলে, একদিকে ক্লিনিক আর অন্যদিকে ওষুধের দোকানের মাঝখানে এরকম একটা খাবারের দোকান গুঁজে দেবার এমন উৎকৃষ্ট বুদ্ধি যে কার মাথায় গজিয়েছিল তা আর কারও মনে পড়ে না!

সাধারণত সরকারি হসপিটাল সংলগ্ন এলাকায় একটা ওষুধ ওষুধ গন্ধ লেগে থাকে। কিন্তু এই গলিতে 'মেহজবান'-এর উপস্থিতি এই পুরো অঞ্চলটাকেই খুশবুদার করে তুলেছে। ছাঁকা সরষের তেলে ভাজা মাছ আর চিকেনের গন্ধে ম-ম করে এখানকার বাতাস। সকাল ন'টায় দোকান খোলে। সারাদিনের ভিড় সামলে যখন রাত এগারোটায় ঝাঁপ বন্ধ হয়, তারও দু-তিন ঘণ্টা পর অবধি বাতাসে এই গন্ধের রেশ থেকে যায়।

প্রতিনিয়ত ভিড় লেগেই রয়েছে দোকানে। দাঁড়িয়ে থাকা অধৈর্য খদ্দের তাড়া দিচ্ছে। অর্ডার নেওয়া ছোকরা জেরবার হয়ে চোখ রাঙিয়ে যাচ্ছে রসুয়েকে। রসুয়ে আর তার জোগাড়েরা প্রচণ্ড গরমে আগুনের তাতে ঝলসে যেতে যেতেও নিখুঁত নৈপুণ্যে অর্ডার-মতো রেঁধে যাচ্ছে। তিন দল রাঁধুনে আছে। একনাগাড়ে এক থেকে দেড় ঘণ্টার বেশি কাজ করা যায় না এই আগুন-তাতে। তাই এই তিন দল পালা করে ডিউটি দেয়।

এইমাত্র যে দলটা ছুটি পেল, তাদের বেশিরভাগই গামছা বা তোয়ালেতে গা মুছতে মুছতে বেরিয়ে গেল বাইরের দিকে। ফাঁকা হাওয়ায় দাঁড়িয়ে একটু পান খাবে। হয়তো একটা কোল্ড ড্রিঙ্ক, সঙ্গে একটা সিগারেট। মোবাইলে একটু ভিডিয়ো দেখবে, আড়াল দেখে। চাই কী, কোনো পলিথিনে ছাওয়া, না-খোলা দোকানের বেঞ্চিতে একটু গড়িয়েও নিতে পারে। সামনের এক-দেড় ঘণ্টা এদের কাজ নেই। তাই ছুটি পেয়ে বেরোনোর সময় এরা কোনোদিকে খেয়াল করে না, কে কোথায় গেল। না হলে দেখতে পেত, ওদের যে ছেলেটি কাবাবের মাংসের উপর মশলা মাখায়, সে বাইরে না বেরিয়ে খাবার জায়গাটাতেই ঢুকেছে, কোমরে রাখা তোয়ালেতে হাত মুছতে মুছতে।

ছোট্ট, ঘুপচি খাবার জায়গায় হাত ধোয়ার বেসিনের গা ঘেঁষেও একটা টেবিল। ঠিকঠাক বসলে দুজনই কোনোক্রমে বসতে পারে। তাও বেসিনে কেউ হাত ধুতে এলে, গায়ে হাত ধোয়া জলের ছিটে লাগবে। সেই একটেরে টেবিলে একটা লোক বসে একমনে মুরগির ঠ্যাং চিবোচ্ছিল পরিপাটি। পরনে পাঠান স্যুট। রোদে বাদামি হয়ে যাওয়া গালে দু-চার দিনের না-কামানো কাঁচা-পাকা দাড়ি-গোঁফ। চোখে একটা সস্তার সানগ্লাস। এই আবপারা বাজার থেকেই কেনা, খুব সম্ভবত।

ছেলেটি এসে চেয়ারে একটু ঠেলেঠুলে বসে পড়ল। তারপর বলল, 'কী ব্যাপার? আজকে এসেছ? এই তো ক'দিন আগে এসেছিলে। এত তাড়াতাড়ি তো তোমার আসার কথা না।'

'ছেলে পছন্দ হয়ে গেল যে।'

রাঁধুনি ছেলেটি একমুহূর্ত চুপ করে তাকিয়ে থেকে বলল, 'তোমার পছন্দ হলেই তো হল না। বাড়ির লোকেরও তো পছন্দ হতে হবে। ছবি এনেছ?'

চিকেনের তেল-ঝাল মাখা হাতের আঙুল পাঠান স্যুটের প্যান্টেই মুছে নিয়ে পকেট থেকে একটা মাঝারি মোটা খাম বার করল লোকটা। টেবিলের ওপর রাখামাত্রই রাঁধুনিটি সেটিকে ধীরে-সুস্থে তুলে নিল। তারপর খাকি হাফ প্যান্টের পকেটে চালান করে দেওয়ার সময়ও এক বারও এদিক-ওদিক তাকাল না।

এমন কোনো কাজও ক'রো না, যেটা সাধারণ অবস্থায় একজন মানুষ করবে না। তাহলেই দৃষ্টি আকর্ষণ করবে।

রাঁধুনি লোকটি জানে, এই অঞ্চলে একজন ইন্ডিয়ার এজেন্ট আছে। সে কে, সেটা এখনও লোকেট করা যায়নি। তাই সাবধান থাকাই ভালো। নিতান্ত অলস ভঙ্গিতেই সে উঠে

দাঁড়াল টেবিল থেকে। খদ্দের লোকটির কাজ শেষ। তার কাজ শুরু।

প্লেট থেকে বিনা বাক্যব্যয়ে মুরগির একটা ডানা-ভাজা তুলে নিয়ে মুখে পুরে চিবোতে চিবোতে সে এগিয়ে যায় সামনের দিকে— যেদিকে খদ্দেরের প্রচণ্ড ভিড়। কে ঢুকছে, কে বেরোচ্ছে— এ দোকানে অত খেয়াল রাখার সময় কারও নেই।

১৫ মার্চ, ২০১৮ / দুবাই, সংযুক্ত আরব আমিরশাহী টাপ!

খুব মৃদু একটা আওয়াজে কিছু একটা পড়ল সামনের নীচু সেন্টার টেবিলের কাচের ওপর। একটা রঙিন পোস্টকার্ড সাইজের ছবি। অল্পবয়েসি একটি ইউনিফর্ম পরা ছেলের ছবি।

চেয়ারে হেলান দেওয়া অবস্থা থেকে সোজা হয়ে যিনি প্রথম ছবিটি তুলে নিলেন তিনি ইয়াসির আলি শাহ। ফরেন অ্যাফেয়ার্স মিনিস্টার। ছবিটা দেখতে দেখতে বললেন, 'ছেলেটি কে?'

'আমাদেরই একজন।' যিনি উত্তর দিলেন, তাঁর নাম সাদিক ইসমাইল হলেও দেশি ও বিদেশি গুপ্তচর মহল তাঁকে 'শায়র' বা 'দ্য পোয়েট' নামেই বেশি চেনে।

ছবিটা হাতে হাতে ঘোরে আরও তিন জনের।

এই ঘরে যাঁরা জড়ো হয়েছেন, পদমর্যাদাতে তাঁরা যথেষ্ট কেওকেটা। চুস্ত পাজামা আর পাঞ্জাবি— তার ওপর গলাবন্ধ কোট— ওই যে শৌখিন প্রায় বৃদ্ধ মানুষটি— ওঁর নাম আল আহসান আমিন! উনি কাশ্মীর, গিলগিট ও বালুচিস্তান বিষয়ক মন্ত্রী। টেনিস শর্টস আর গোলগলা টি-শার্টে মধ্য চল্লিশের স্মার্ট প্রায় তরুণটি আজিজ খান। পাকিস্তান পার্লামেন্টে শাসক দলের চিফ হুইপ। প্রধানমন্ত্রী কোনো বিল পাশ করাতে গেলে লোয়ার হাউস, যাকে 'কৌমি অ্যাসেম্বলি' বলে, সেখানে ইনিই সম্বল। আর একটু কোণের দিকে যে লম্বা-শুকনো চেহারার মানুষটি বসে আছেন তিনি রহমত চৌধরি! আইএসআই-এর জেসিআইবি অর্থাৎ জয়েন্ট কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোর চিফ। এই ডিপার্টমেন্টের একমাত্র মাথাব্যথা ইন্ডিয়া বা আরও স্পেসিফিক্যালি বলতে গেলে র-এর কার্যকলাপ নিয়ে।

যদিও এই পদমর্যাদা দিয়েও মানুষগুলির পাকিস্তানে কতটা গুরুত্ব, তা কোনোভাবেই বোঝা যাবে না। এই দেশের গড়ে ওঠা, টিকে থাকা এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে নিজের গুরুত্ব বজায় রাখার পেছনে এই মানুষগুলির যা অবদান— তা এঁদের পদমর্যাদার গণ্ডি ছাড়িয়ে বহুদূর বিস্তৃত!

পাকিস্তানের প্রায় জন্মমুহূর্ত থেকে নির্বাচিত সরকার, সৈন্যবাহিনী, আইএসআই— এদের সবার অলক্ষ্যে একটি সংস্থা ধীরে ধীরে শিকড় চারিয়েছে এই সংঘর্ষ আকীর্ণ দেশের প্রতিটি সংবেদনশীল ক্ষমতাকেন্দ্রে।

মূলত পকিস্তানের গার্জিয়ান অ্যাঞ্জেল আমেরিকা বা আরও স্পষ্ট করে বললে সিআইএ-র মস্তিষ্কপ্রসূত এই প্রোগ্রাম শুরু হয়েছিল ১৯৫৫ সালে।

সেই বছর বাগদাদ চুক্তি স্বাক্ষরের বছর। ঠান্ডা যুদ্ধের সেই গরম সময়ে আমেরিকার মধ্যপ্রাচ্যে নিজেদের সামরিক গাঁটছড়া মজবুত করার দরকার ছিল। কিছুটা কূটনৈতিক চাপ, কিছুটা আর্থিক অনুদানের লোভনীয় টোপ— তারা সক্ষম হয়েছিল ইরান, ইরাক, পাকিস্তান, তুরস্ক এবং ব্রিটিশদের এক টেবিলে বসিয়ে এই চুক্তিতে সই করাতে। যদিও তারা নিজেরা শুরু থেকে এই চুক্তিতে অংশগ্রহণকারী দেশ হিসেবে থাকতে পারেনি, ইউএস কংগ্রেস সেই সময় বিগড়ে বসায়।

তিন বছর বাদে মার্কিন গভর্নমেন্ট যতদিনে এই চুক্তিতে যোগদান করে, ততদিনে লোকের চোখের আড়ালে সিআইএ বিছিয়ে ফেলেছে তাদের জাল। সেই জালের নাম "জিব্রাঈল'!!

বাগদাদ চুক্তির সময় মধ্যপ্রাচ্যে ক্ষমতার কেন্দ্রে ছিল ইরাক এবং অবশ্যই তুরস্ক। কিন্তু সিআইএ বুঝেছিল, রাশিয়ার ওপর চাপ বজায় রাখতে গেলে আফগানিস্তানে অবাধ বিচরণ করার সুযোগ থাকা দরকার। আর তার জন্য পাকিস্তানকে বিকল্প ক্ষমতার কেন্দ্র

হিসেবে ধরে রাখতে হবে। সরকারি স্তরে তার সবরকম জোগাড়যন্ত্র চলছিলই। তবে সমস্ত প্ল্যানের একটা ব্যাক-আপ প্ল্যান থাকে। জিব্রাঈল ছিল সেই ব্যাক-আপ প্ল্যান।

কিছু অত্যন্ত প্রভাবশালী, উচ্চশিক্ষিত, পশ্চিমি সভ্যতার প্রতি আকৃষ্ট মানুষকে খুঁজে বার করা হয়েছিল। এমন মানুষ, যারা উচ্চাকাঙ্ক্ষী কিন্তু পাদপ্রদীপের আড়ালেই থাকতে চায়। এদের কাজ? যদি কোনোদিন পাকিস্তানি গভর্নমেন্ট, আইএসআই বা মিলিটারি আমেরিকার হয়ে পুতুল নাচতে অরাজি হয়, তখন নিজেদের অর্থ, রাজনৈতিক প্রতিপত্তি ও কূটনৈতিক ক্ষমতা কাজে লাগিয়ে আমেরিকাকে সুবিধেজনক জায়গায় রেখে দেওয়া। অন্তত জিব্রাঈলের শুরুটা সেরকমই ছিল।

দুনিয়ার সমস্ত ফ্রাঙ্কেনস্টাইন আর তাদের তৈরি করা সমস্ত দৈত্যের যা ভবিষ্যৎ, জিব্রাঈলের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। ধীরে ধীরে ক্ষমতা ও প্রভাব বাড়াতে বাড়াতে জিব্রাঈল এমন জায়গায় পৌঁছেছে— গোটা দুনিয়ার ওয়াকিবহাল মহল যতই জানুক যে পাকিস্তানকে কন্ট্রোল করে আইএসআই, মিলিটারি আর সিআইএ— সেই ছবিটি ধীরে ধীরে আমূল পরিবর্তিত হয়ে গেছে।

ত্রিভুজের এই তিনটি শীর্ষবিন্দুর মধ্যে দুটিকেই পর্দার বহু পেছন থেকে এক অদৃশ্য সুতোর টানে নিয়ন্ত্রণ করে চলে জিব্রাঈল। আর তাদের স্বার্থ ও পছন্দ সবসময় সিআইএ-র সঙ্গে আর মেলে না।

এই পার্থক্যের শুরু লাদেনের আত্মগোপন করা নিয়ে। ভারতে ২৬/১১-র আক্রমণের পর আজমল কসভের পাকিস্তানি নাগরিকত্ব প্রমাণিত হয়ে যেতেই তাদের দেশে সন্ত্রাসবাদী পুষে না রাখার জন্য পাকিস্তান সরকারের ওপর আন্তর্জাতিক চাপ বাড়তে থাকে। এতদিন তাদের আড়াল দিয়ে আসা আমেরিকাও চাপ বাড়াতে শুরু করে। ইতিমধ্যেই বারাক ওবামা আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হওয়ার পরেই যুদ্ধবিরোধী একটা মনোভাব আমেরিকান সমস্ত পলিসিতে দানা বাঁধছিল।

জিব্রাঈলের সদস্যরা রাজনীতির দাবাখেলায় পোড়-খাওয়া গ্র্যান্ডমাস্টার। তারা ঠিকই আঁচ করেছিলেন যে আমেরিকা যদি আফগানিস্তান থেকে সেনা প্রত্যাহার করে, তাহলে পাকিস্তানের গুরুত্ব তাদের কাছে কমতে বাধ্য। তাই ধীরে ধীরে পাকিস্তানকে সমর্থন করা বা রক্ষা করার দায়ও তাদের কমবে। তাই এ সময় পাকিস্তানও নিজেদের আমেরিকা নির্ভরতা ধীরে ধীরে কমানোর দিকে ঝোঁকে। এতটাই, যে লাদেনকে নিজেদের দেশে সেফ শেলটার দিতেও তারা পিছপা হয়নি। জিব্রাঈলের ফান্ডিং-এর সোর্স ধীরে ধীরে কম্পাসের মুখ সরিয়ে নিল ইজরায়েলের দিকে। সেখানকার অস্ত্র ব্যবসায়ীরা রপ্তানিতে প্রথম পাঁচে উঠে আসার চেষ্টা করে চলেছে অনেকদিন। একটা এমন জায়গা তাদেরও প্রয়োজন ছিল যেখানে তাদের সাপ্লাই নিরবচ্ছিন্ন এবং নজরদারির আওতার বাইরে হবে।

জিব্রাঈলের পক্ষে এটা কোনো সমস্যাই ছিল না। বালুচিস্তান, তালিবান ট্রাইব্স, কাশ্মীরি মুজাহিদিন, লস্কর-এ-তৈবা — অজস্র চ্যানেল ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। পাকিস্তানি আর্মি তো আছেই। এক প্রয়োজন ধীরে ধীরে খুঁজে নিল অন্য প্রয়োজনকে।

সিআইএ-র মনুমেন্টাল ফেলিওর ছিল জিব্রাঈলের এই চেঞ্জ অব গার্ড বুঝতে না পারা। যতদিনে তারা বুঝতে পারল, ততদিনে দেরি হয়ে গেছে। অ্যাবটাবাদে লাদেনের মৃতদেহ নিয়ে ভিকট্রি ল্যাপ দিতে গিয়ে সিআইএ প্রথম অনুভব করল - এই ল্যাপের শেষে কোনো উইনার্স ট্রফি তাদের জন্য অপেক্ষা করে নেই! জিব্রাঈল এখন শুধু নিজের স্বার্থ দেখছে।

তারপর থেকে সিআইএ-ও শুধরে গেল। জিব্রাঈলের কার্যকলাপের ওপর আরও গভীরে নজরদারি শুরু হল। মাটির বহু মাইল ওপরে, মেঘের আড়ালে কোনো নজরদারি স্যাটেলাইট অদৃশ্য চোখ মেলে দিল আরও গহীন মনোনিবেশে। কতকটা বাধ্য হয়েই নিজেদের পর্দার আরও অন্তরালে, আরও গভীরে নিয়ে যেতে হল জিব্রাঈলের সদস্যদের।

হিমশৈলের মতোই তাদের চূড়ার অল্প অংশই এখন বহির্জগতের কাছে দৃশ্যমান।

অবশ্য বহির্জগৎ বলতে গোপন তথ্য সংগ্রহের গুপ্তচরবৃত্তির দুনিয়ার কথাই ধরতে হবে। প্রাইম টাইমের খবর করা কোনো নিউজ চ্যানেল তাদের নামের অস্তিত্বটুকুও জানে না এখনও।

'দ্য পোয়েট' অর্থাৎ সাদিক ইসমাইল হলেন সেই চূড়াটুকু। বাকিদের কথা কেউই জানে না। সেই অজানা জগতের বাজিকরদের একজন, এবং বোধহয় সবচেয়ে ধুরন্ধর মানুষ হলেন আল আহসান আমিন। তিনি এবার গলাখাঁকারি দিয়ে বলে উঠলেন, 'জনাবের জার্নি-ডেট কি ফিক্সড?'

'হ্যাঁ। এখন ইটিনিরারি ফাইনালাইজ করার কাজ চলছে।' উত্তর দিলেন সাদিকই।

'আমরা কি ভালো করে ভেবে নিয়েছি, এ ছাড়া আমাদের কাছে কোনো রাস্তা নেই? ইমিডিয়েট প্রেশার কিন্তু বাড়বে! কিছুদিন পুরোপুরি হাত গুটিয়ে থাকতে হবে!' সাবধানী গলার মালিকটি হলেন রহমত চৌধরি!

আজিজ খান এঁদের মধ্যে সবচেয়ে তরুণ এবং সবচেয়ে বেশি নিষ্ঠুর ও শীতল! জন্ম থেকেই পশ্চিমি সভ্যতায় বেড়ে ওঠার ফলে পারিবারিক সম্পর্কের উষ্ণতার যে আভাস উপমহাদেশের মানুষের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়, তা এঁর মধ্যে অনুপস্থিত। তিনি স্বভাবসিদ্ধ শীতল গলাতেই বলে উঠলেন, 'এটা নিয়ে এত ভাবার কোনো কারণ নেই। ইলেকশনের আগে থেকেই আমরা জানতাম যে জনাব যদি কাশ্মীরে শান্তি ফিরিয়ে, বালুচিস্তানে শান্তি ফিরিয়ে নিজেকে ইতিহাসে স্মরণীয় করে রাখতে চান, দেন— আমরা ওঁকে ইতিহাসের পাতায় উঠতে সাহায্য করব, শান্তি ফিরিয়ে আনতে নয়।'

নিজের রসিকতায় নিজেই মুচকি হেসে তারপর যোগ করলেন, 'আমার মনে হয় দ্য ম্যাক্রো প্ল্যান ইজ গুড এনাফ! কিন্তু উই নিড টু নো দ্য ডিটেলস, সাদিক!'

'সরি স্যর! উইদ অল ডিউ রেসপেক্ট— এই প্ল্যানের সমস্ত ডিটেলস শুধু দুজন জানব, টু অ্যাভয়েড পসিবল লিকেজ!'

'কে, কে?'

'আমি আর শাহজাদা!'

'সুনিয়ে শায়ের সাহাব! প্ল্যানিং-এর সময় যত খুশি সিক্রেসি মেন্টেন করুন - ফাইনালি জিব্রাঈলের কাছে পুরো ছবি পরিষ্কার হওয়া চাই। আমার মনে হয় না এই গ্রুপ থেকে লিকেজের ভয় কিছু আছে।' ধীরে ধীরে কেটে কেটে বরফ ঠান্ডা গলায় বললেন আল আহসান আমিন, 'পুরো প্ল্যানের আপডেট আমাদের টাইম টু টাইম চাই-ই! এই গ্রুপের কোনো মিশনের সাকসেসের দায় যেমন কারও একার নয়, ফেলিওরের ক্রেডিটও কারও একার হবে না।'

সাদিক নিঃশব্দে চোখ বোলাল বাকিদের দিকে। তাদের চোখে-মুখেও সম্মতির লক্ষণ। সাদিক জানত এরকমই হবে। আর সে তৈরিও ছিল। তার কোনো ইচ্ছে নেই বাকিদের থেকে প্ল্যানটা গোপন করার। কিন্তু প্ল্যান করার ও সেটা চেঞ্জ করার নিঃসংশয় কর্তৃত্ব সে নিশ্চিত করতে চেয়েছিল। আমিন সাহেব কার্যত সেটাই প্রতিষ্ঠা করে দিলেন। একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়ল তার।

বাইরে সেটা প্রকাশ না পেতে দিয়ে, একটু ক্ষুণ্ণ স্বরে সে বলে ওঠে, 'বেশ! তাই হবে! আমরা কি তাহলে প্রতি মাসে এক বার করে দেখা করব?'

'দেখা যে করতেই হবে, তার কোনো মানে নেই! আমরা ভিডিয়ো কনফারেন্সও করতে পারি।'

আজিজ খান তরুণ, উৎসাহী এবং টেক-স্যাভি! কিন্তু তার উৎসাহে জল ঢেলে রহমত চৌধরি বললেন, 'নোপ! আই ডোন্ট বিলিভ ইন এনিথিং দ্যাট দোজ গড-ফরসেকন আমেরিকানস হ্যাভ ডিসকভার্ড!

'ডোন্ট ইউ ফরগেট চৌধরি সাহাব, আমরাও ওই আমেরিকানদেরই তৈরি করা! ডোন্ট ইউ বিলিভ ইভন আস?' আজিজ পালটা প্রশ্ন করেন।

‘এস্পেশালি নট আস!’ মৃদু হেসে রহমত চৌধরি বললেন, ‘বাই দ্য ওয়ে, আই লাইক দ্যাট নেম... শাহজাদা!’

‘হোয়াট ইজ আওয়ার টাইমলাইন?’ আল আমিন প্রশ্ন রাখলেন।

‘আর মাস পাঁচেক। নেক্সট ক্যান্ডিডেট ঠিক করা আছে কি?’ প্রশ্ন এবার

এল সাদিকের তরফ থেকে। সে জিজ্ঞাসু চোখে চাইল আজিজ খানের দিকে। ‘উই স্টার্টেড অন দ্যাট! উইল বি ডান!’ সিগারেট ধরাতে ধরাতে নিশ্চিন্ত করলেন আজিজ।

সোফা ছেড়ে আড়মোড়া ভেঙে উঠে দাঁড়ালেন এতক্ষণ চুপ করে বসে থাকা মানুষটি। ফরেন অ্যাফেয়ার্স মিনিস্টার ইয়াসির আলি শাহ। জানলা দিয়ে বুর্জ খলিফার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বললেন, ‘লেটস কনক্লুড ইট হিয়ার জেন্টলমেন! লেটস কিল দ্য প্রাইম মিনিস্টার!’

পূর্বকথা / মেরিল্যান্ড, আমেরিকা

'তাহলে আপনি কী ভাবলেন?'

সামনে বসে থাকা লোকটি ভারতীয়। মাঝারি উচ্চতা। গোলগাল চেহারা একটু ভারীর দিকেই। পরনের ঢোলা স্যুট সেটাকে পুরোপুরি লুকোতে পারেনি। মাথা-ভরতি টাক। চশমার আড়ালে চোখ জোড়া নিষ্প্রভ, মরা মাছের মতো। দেখলে মনে হবে সামান্য প্রাণের, সামান্য মেধার দীপ্তিও যেন কোনো কোণে লুকোনো নেই।

মনে হবে এবং ছেলেটি জানে... ভুল মনে হবে। প্রথম দিনই তার সঙ্গে ইউনিভার্সিটির ক্যাম্পাসে লোকটির যখন দেখা হয়েছিল সেদিনই ও তার পরিচয় পেয়েছে।

সে পড়তে এসেছিল বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন। নিতান্তই নিজের শখে

সে একটি অতি স্বল্প-চর্চিত স্পনসর্ড কোর্স নিজের নাম লিখিয়েছিল। প্রয়োজনীয় গ্রেড পয়েন্ট একটু কম হচ্ছিল। কিন্তু শখ বড় বালাই। কলোনিয়াল পলিটিক্স অ্যান্ড পার্টিশান অফ ইন্ডিয়া— এমন একটা বিষয় যা তাকে বরাবর কৌতূহলী করেছে।

একদিন সেই ক্লাসেরই পরে বাইরে বেরিয়ে সে যখন করিডোর ধরে হাঁটছে, তখনই লোকটি পেছন থেকে তার নাম ধরে ডেকেছিল। তারপর তাকে প্রস্তাব দিয়েছিল ইউনিভার্সিটির ক্যাফেটেরিয়াতে গিয়ে বসার। নিজের পরিচয় দিয়েছিল সুনীত কৃষ্ণণ। কাছেই অবস্থিত একটি ভারতীয় স্টোরের মালিক। আর তারপর শুরু করেছিল এক অপূর্ব ইতিবৃত্ত!

নতুন সহস্রাব্দের শুরুতেই ঘটে যাওয়া একটি ঘটনা সভ্য পৃথিবীর সময়কালকে স্পষ্ট দুই ভাগে ভাগ করে দিয়েছিল। নাইন ইলেভেন পূর্ববর্তী এবং নাইন ইলেভেন পরবর্তী দুই পৃথিবীর মধ্যে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক দূরত্ব সুমেরু আর কুমেরুর দূরত্বের থেকেও বেশি।

এই আলোড়নকারী পরিবর্তন, এই মন্থনের যে কালকূট গরল— তার বেশিরভাগটাই গলাধঃকরণ করেছিল সামরিকভাবে দুর্বল মধ্যপ্রাচ্যের ইসলামিক দেশগুলি। একপ্রকার বাধ্য হয়ে এক এক করে তারা আত্মসমর্পণ করছিল আহত আমেরিকার আগ্রাসী দাদাগিরি মার্কা বিদেশনীতি ও ইসলামিক সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ঘোষণা করা যুদ্ধের হুমকির সামনে।

এ জিনিস নিয়ে দুনিয়া জুড়ে বিবিসি, সিএনএন, আল জাজিরার মতো চ্যানেল প্রচুর প্রাইম টাইম প্রোগ্রাম করেছে।

কিন্তু ঠিক এই প্রচারিত প্রলেপটির নীচে নিঃশব্দে, আড়ালে তীব্র রক্তক্ষরণ হয়ে চলেছিল খোদ আমেরিকার বুকেই। প্রথমে সন্দেহ, তারপর ভয়, তীব্র ঘৃণা এবং শেষে উন্মত্ত হিংসা!

ইসলামোফোবিয়ায় আক্রান্ত আমেরিকানরা সামাজিকভাবে কোণঠাসা করে দিচ্ছিল দেশ-জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সমস্ত বাদামি চামড়ার মানুষকে। মানসিক তো বটেই, শারীরিক নিগ্রহের ঘটনাও ঘটে চলেছিল রোজই। মুসলিম সন্দেহে দাড়িওয়ালা বা পাজামা-পাঞ্জাবি পরা লোকদের ওপর আক্রমণ হচ্ছিল। জোর করে বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছিল দোকানপাট। চাকরির জায়গায় বিনা কারণে বা তুচ্ছ কারণে ধরিয়ে দেওয়া হচ্ছিল গোলাপি কাগজের টুকরো। স্কুলে বাচ্চাদের ওপরও রু হয়েছিল মানসিক অত্যাচার। কেউ তাদের সঙ্গে খেলতে চায় না। টিচাররা

ক্লাসে তাদের প্রতি মনোযোগ দেন না। কোনো বন্ধু বা সিনিয়রের হাতে নিগৃহীত হলেও তাদের বাঁচানোর কেউ থাকে না— উলটে স্কুল-কর্তৃপক্ষ অনেকসময় তারই দোষ দেখতে পায়।

সরকার ভোট চেনে। তাই প্রশাসন সামান্য ধমক-চমক ছাড়া উদাসীন দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিল

অন্যত্র।

এই সব অত্যাচারিত পরিবারগুলি অনেকেই এক দশক বা তার বেশি সময় ধরে আমেরিকাবাসী। তারা হঠাৎ আবিষ্কার করল, এত বছর পরেও এ দেশ তাদের হয়নি। আর তাদের নিজেদের দেশ— ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ বা শ্রীলঙ্কা — সেই গরিবগুরবো দেশ তো তারা নিজেরাই ছেড়ে এসেছে কবে। -

এতদিন তারা নিজেদের বিদেশি চাকরি, ডলারে রোজগার ও ঝাঁ-চকচকে উন্নত জীবনযাত্রার দৌলতে নিজেদের মহীরুহ ভেবে আলাদা আলাদা থাকত। প্রবল ঝড়ে লুটিয়ে যখন ঘাসের মতো ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ হয়ে দাঁড়াল— তখন তারা উপলব্ধি করল, জোট বাঁধতে হবে। টিকে থাকতে গেলে নিজেদের যূথবদ্ধ হয়ে থাকাটা অত্যন্ত জরুরি।

সেই বেঁধে বেঁধে থাকার প্রয়োজন থেকে গড়ে উঠেছে BOUND, Brothers Of United National Diaspora!

বিগত কয়েক বছরে BOUND আড়ে-বহরে বেড়েছে অনেকটাই। আমেরিকার প্রায় সাতাশটা রাজ্যে তাদের শাখা। সদস্য সংখ্যা দেড় লক্ষ ছুঁই ছুঁই। সদস্য সংখ্যা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সরকারি মহলে কিছুটা হলেও বেড়েছে তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি।

সেইসঙ্গে তারা খুঁজে বেড়াচ্ছে নতুন নতুন সদস্য যারা শুধু এই দেশেই নয়, এই অভিবাসীদের মূল দেশেও রাজনৈতিক মহলে সংস্থার প্রতিপত্তি বাড়াতে সাহায্য করবে। যাতে আন্তর্জাতিক সুসম্পর্ক বজায় রাখার জন্য এই সব দেশ আমেরিকার ওপর চাপ দিতে সচেষ্ট হয়; যেন নিজেদের মাটিতে জন্ম নেওয়া সন্তানদের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে তারাও আমেরিকাকে বাধ্য করে।

সেই খুঁজে বেড়ানোরই একটা উপায় হল বিভিন্ন প্রথম সারির বিশ্ববিদ্যালয়ে এই ধরনের স্পনসর্ড প্রোগ্রাম চালানো। সংস্থার পয়সার অভাব নেই। সেই পয়সার কিয়দংশ খরচ করে যদি ব্রাইট, স্কলার এবং এই কারণটির প্রতি সহানুভূতিশীল ছেলে-মেয়েদের নিজেদের দলে টানা যায়, BOUND সেটাকে ভালো লগ্নি বলেই বিশ্বাস করে।

সুনীতের একটানা কথা বলার মধ্যে সে এক বারও বাধা দেয়নি। তার সে স্বভাব নয়। পুরোটা শুনতে শুনতে সে যে কিছুটা চিন্তার স্রোতে হারিয়ে গেছিল, সে কথাও অস্বীকার করা যাবে না। ঘোর কাটিয়ে সে বলে, 'ফ্যাসিনেটিং! অ্যামেজিং! এই ব্যাপারে আমি কীভাবে কাজে লাগতে পারি মিঃ কৃষ্ণণ?'

একগাল হেসে সুনীত কৃষ্ণণ বলেছিলেন, 'আপাতত কিছুদিন আমাদের মিটিংগুলোয় আসুন। লোকজনের কথাবার্তা শুনুন। আপনার ভাবনাচিন্তাও শেয়ার করুন। দেখা যাক না, আমাদের কতটা মনের এবং মতের মিল হয়। তার পরের কথা তার পরে হবে না হয়।'

সেই থেকে এই দু' বছরে সে ধীরে ধীরে BOUND-এর এক জন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হয়ে উঠেছে। আধুনিক বিশ্ব-গ্রামের ছেলে হওয়ায় এই সীমানাহীন, ভৌগোলিক বাধাহীন মেলামেশা তার খুবই ভালো লেগেছে। বন্ধুত্ব হয়েছে প্রচুর ভারতীয়, শ্রীলঙ্কান, আফগান এবং বাংলাদেশি মানুষের সঙ্গেই। আর সে আশ্চর্য হয়ে খেয়াল করেছে আদতে তাদের মধ্যে বিশেষ প্রভেদ নেই। খাওয়ার রুচি, বিনোদনের রুচি, আতিথেয়তা, জীবনের ছোটখাটো চাওয়া-পাওয়া— সবেতেই তারা যেন বড্ড কাছাকাছি।

যত দিন গেছে, ততই সুনীতের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা বেড়েছে। তার কোর্স শেষের মুখে। কিছুদিনের মধ্যে সে দেশে ফিরবে। এখনও অবধি সে BOUNDএর মিটিং অ্যাটেন্ড করা, কিছু ফান্ডিং-এর বন্দোবস্ত করা আর সংস্থার ওয়েবম্যাগাজিনে কিছু লেখালেখি ছাড়া আর কিছুই করেনি। কিছু করতে বলাও হয়নি। আজ বলা হচ্ছে।

এই অ্যাপার্টমেন্ট কমপ্লেক্সের ঠিকানাটা ভারি অদ্ভুত নামের এক জায়গায়। লস্ট নাইফ সার্কল!

কে, কবে এখানে ছুরি হারিয়ে ফেলেছিল, সেই ইতিহাস জানতে ছেলেটির খুব ইচ্ছে করে। ইতিহাসে তার বরাবরই খুব আগ্রহ! স্কুলপাঠ্য বইতে যে ইতিহাস পড়া যায়, শুধু সেই

ইতিহাস নয়। সেসব তো রাজারাজড়ার ইতিহাস। যুদ্ধের ইতিহাস।

ছেলেটির খুব আগ্রহ সাধারণ মানুষের ইতিহাস জানার। তার বিশ্বাস, ছোট ছোট, অকিঞ্চিৎকর মানুষের ইতিহাসের মধ্যেই বড় ইতিহাসের দিক পরিবর্তনের ইশারা লুকিয়ে থাকে। ছোট থেকেই সে তার বাবাকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলত নিজেদের পরিবারের ইতিহাস জানার জন্য। কবে, কী করে তারা লাহোর পৌঁছোল। কীভাবে শুরু হল তাদের পারিবারিক ব্যবসা! সবচেয়ে বড় কথা, কেন তাদের চলে আসতে হল তাদের আদি বাসভূমি ছেড়ে।

বাবা নিপাট ব্যবসায়ী মানুষ। ব্যবসার বাইরে এই সব ব্যাপারে কোনোদিন মাথা ঘামাননি। প্রশ্ন করলেও হয় ভাসা ভাসা উত্তর দিতেন, নাহলে ব্যস্ততার অজুহাতে এড়িয়েই যেতেন।

নিজের ইতিহাস জানার তার সেই অত্যুগ্র পিপাসা এতদিন পর আবার জাগিয়ে তুলেছে লোকটা।

'সুনীত, আপনি ঠিক জানেন?'

'না, ঠিক জানলে আর আপনাকে বলব কেন এই বিষয়ে খোঁজ করতে?' 'কিন্তু এমনিতেও আমি এইরকম ম্যানিপুলেশনের কথা শুনিনি বা রিয়েলাইজও করিনি।'

সুনীত নিঃশব্দে হাসেন।

'আপনার কী মনে হয়? কাশ্মীর থেকে আসা রিফিউজি পরিবারের সদস্যরা পাকিস্তানের ক্ষমতার কেন্দ্রে ঘটে চলা সব কিছু জানতে পারবে? তাদের জানতে দেওয়া হবে?'

'হুম। তাহলে আমি সরকারি মহলে ঢুকবই-বা কী করে? আর এতে BOUND-এর কী লাভ?'

'BOUND একসূত্রে গাঁথার সংস্থা! এটুকু নিশ্চয়ই আপনি দেখেছেন এখানে ওই কাঁটাতারের বেড়া কোনোদিনই আমাদের মেলামেশায় বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি। কিন্তু আজ যদি ভারতের বা পাকিস্তানের তরফ থেকে রাষ্ট্রের মদতে অন্য রাষ্ট্রের মাটিতে সন্ত্রাস ছড়ানো হয় বা তাতে মদত দেওয়া হয়, তাহলে BOUND-এর সদস্যদের মধ্যেও তার প্রভাব পড়তে বাধ্য। তখন কি আর এই সংস্থাকে এরকম টিকিয়ে রাখা যাবে ভেবেছেন?'

'তা ঠিক। কিন্তু সরকারের মদতে সন্ত্রাস— সে তো অনেক উঁচু দরের ব্যাপার। আমাদের সংস্থা সেসব খবর পেলেও কি তা আটকাতে পারবে বা নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে?'

'পারবে না এবং আমরা তা করতেও চাই না। আমরা শুধু নিজেদের প্রিকশনারি মেজার নিতে চাই। যেন সংস্থার ভেতরে ফাটল না ধরে তার জন্য আগাম সাবধানতা নিতে পারব।'

'কিছু মনে করবেন না সুনীত— আপনি শুধু আমাকে বলছেন কেন? ভারতের দিক থেকেও যে এরকম কনস্পিরেসি হতে পারে সেটা কি আপনি অস্বীকার করছেন? বালুচিস্তানে কী হয় না হয়, সেটা আপনি আর আমি দুজনেই ভালো করে জানি!'

সামান্য হলেও দেশের নিন্দে শোনার ক্ষোভ চলকে বেরোয় তার গলা থেকে। সুনীত কিছুক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে, চোখ থেকে চশমা খুলে কাচ মুছতে থাকেন। তারপর গভীর গলায় বলেন, 'আমি ভেবেছিলাম আপনি আমাকে ভুল বুঝবেন না।'

সুনীতের গলায় এমন কিছু একটা ছিল, যা তাকে সঙ্গে সঙ্গে অপ্রতিভ করে তোলে। সে চট করে বলে, 'না না, আমি সেটা মিন করিনি। আমার বলার উদ্দেশ্য— আমাদের সংস্থার প্রতিনিধি ইন্ডিয়াতেও একজন থাকা উচিত, তাই না?'

'আছেন। আপনি তাকে দেখেছেনও বার দুয়েক। অল্প কয়েক দিনের জন্য আসেন মাঝে-মধ্যে!'

'কে বলুন তো?'

'অরুণ!'

"ওহ! রিয়েলি! দেন তো, ভেরি গুড!'

কিছুক্ষণের একটা অস্বস্তিকর নীরবতা। তারপর সেটা ভেঙে সে নিজেই বলে ওঠে, 'বেশ, আমি সরকারি চাকরিই নেব। কতটা ভেতরে ঢুকতে পারব, কতটা কী কাজে লাগতে পারব সংস্থার, তা জানি না। তবে চেষ্টা করব।'

'আপনাকে কিন্তু সতর্ক থাকতে হবে। সরকারি যে কোনো খবরই তো গোপনীয়। আমরা চাই না আপনি কোনো বিপদে পড়ুন। খবর পাঠানোর প্রায় সব চ্যানেলই এখন বিপজ্জনক!!'

'তাহলে?'

'আপনি শর্ট-ওয়েভ রেডিয়ো অপারেট করতে পারেন?'

'দেন লেট আস ইউজ দিস কামিং উইকস টু লার্ন ইট, শ্যাল উই?'

দ্বিতীয় অধ্যায়
।।দ্য চেকার্ড বোর্ড।।

।।২.১।।
।।দ্য রুকি রুক।।

২৫ জুলাই, ২০১৮, গভীর রাত / কলকাতা, ভারত

‘এ গণপত, চল দারু লা, এ গণপত, চল দারু লা। আইস চালা সোডা কম, থোড়া পানি মিলা...

‘অ্যাই মানু, মানু, তোর ফোন বাজছে, ওঠ! ওফ... কত বার বলেছি এই হাড়-জ্বালানো গানটা বদলাতে... কোনো কথা যদি এই ধিঙ্গি মেয়ের কানে

সদ্য ঘুম ভাঙার বিরক্তি জড়ানো মায়ের গলার আওয়াজ আর কাঁধে হালকা ধাক্কায় ঘুম ভাঙে মানু অর্থাৎ মোনালিসা দাসের। লা মার্টিনিয়ারের মোনালিসারা বাড়িতে ‘মোনা’ হয়। মাখলা দেবীশ্বরী শিক্ষায়তনের মোনালিসারা সাধারণত মানুই হয়। তো, সেই মোনালিসা ঘুমের মধ্যে, চোখ বন্ধ করেই আন্দাজে হাত বাড়ায়। মা হাতে মোবাইলটা গুঁজে দেয়।

চোখ না খুলে মোবাইলটা কানে নিতে নিতেই মোনালিসা টের পায় মা দাঁড়িয়ে আছে পাশেই। ফোনটা কানে নিয়ে, ঘুমজড়ানো গলায় সে বলে, ‘হ্যালো!’

‘রাত্রে বিছানায় শুয়ে আরামে ঘুমোবে বলে ক্রাইম বিট চেয়েছিলে? নাকি ফেসবুকে ‘ফিলিং এক্সাইটেড’ পোস্ট দেবে বলে?’

এক ঝটকায় ঘুম ভেঙে বিছানায় সিধে হয়ে বসল সে! বিজনদা!!

দৈনিক সত্যবার্তার সম্পাদক, প্রধান সাংবাদিক, লিথোগ্রাফি এক্সপার্ট, পিওন, এবং সময় ও ক্ষেত্র বিশেষে কাগজের হকারও। আজ থেকে প্রায় সত্তর বছর আগে বিজনদার ঠাকুরদা এই কাগজ শুরু করেছিলেন একার চেষ্টায়। সত্তর বছর পরে নাতি বিজনদাও সেই প্রায় একায় এসে দাঁড়িয়েছেন।

মাঝে দৈনিক সত্যবার্তা অনেক ওঠা দেখেছে। সার্কুলেশন বাড়তে বাড়তে নব্বইয়ের দশকের মাঝামাঝি ছাড়িয়েছিল দু’ লাখের গণ্ডি। তারপর আস্তে আস্তে বাড়তে শুরু করল কম্পিউটার আর ইন্টারনেটের প্রভাব। আবির্ভূত হল স্যাটেলাইট চ্যানেল আর চব্বিশ ঘণ্টার খবরের চ্যানেল। খবরের ইংরেজি ধীরে ধীরে নিউজ থেকে পালটে হয়ে গেল স্টোরি!

বিজনদার বাবা সেই পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মেলাতে চাইলেন না। সত্যবার্তা তখনও পশ্চিম বাংলার অন্যতম প্রধান দৈনিক। কিন্তু গণেশের দুধ খাওয়া প্রচার করার চেয়েও সে সময় ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশনে ভারতের যোগদানই বাণীব্রত মুখোপাধ্যায়ের কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ খবর বলে মনে হত।

ফল যা হবার তা-ই হয়। চটুল-রঙিন গসিপ নির্ভর খবরের দিকে ঝুঁকতে থাকা পাঠকের দল ক্রমশ নিজেদের পছন্দসই খবর বা খাবারের খোঁজ পেতে রওনা দেয় অন্য কাগজের দিকে। দৈনিক সত্যবার্তা দেখতে শুরু করে এক ক্রমপতন।

নামতে নামতে সার্কুলেশন এসে দাঁড়ায় কয়েক শো-তে। শুনতে অবিশ্বাস্য লাগলেও সত্যি, যে মাত্র পাঁচ-ছ’ বছরের মধ্যে একটা দুর্দান্ত জনপ্রিয় খবরের কাগজ আস্তে আস্তে প্রায় পুরোই মুছে গেল মানুষের মন থেকে। বাজারে অজস্র দেনা, প্রায় বন্ধ প্রেস আর মাইনে না পেয়েও থেকে যাওয়া বুড়ো পিওন হিমাদ্রিদাকে রেখে মাত্র আধ ঘণ্টার নোটিসে মারা যান বাণীব্রতবাবু।

সালটা ২০০২।

বিজন মুখার্জী তিন পুরুষের কাগজওয়ালা। ব্যাঙ্গালোরে মাস কমিউনিকেশন ও জার্নালিজম নিয়ে মাস্টার্স করতে করতেই বাবা মারা যাবার খবর পেয়ে পড়াশোনায় ইতি টেনে চলে আসেন কলকাতায়। মা আগেই চলে গেছিলেন। ফাঁকা বাড়িতে ঘুরে বেড়ানো অতৃপ্ত সম্পাদকের আত্মা যেন তার মধ্যে জেদ ঢুকিয়ে দিল।

আনন্দবাজার, আজকাল-এর মতো বাংলা কাগজ ছাড়াও টাইমস গ্রুপের সর্বভারতীয়

স্তরে লোভনীয় অফার ছেড়ে বিজন মুখার্জী নিজের সর্বশক্তি নিয়োগ করলেন দৈনিক সত্যবার্তাকে তার পুরোনো জায়গায় ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য। দিন-রাত এক করে ফেললেন খবর সংগ্রহ করতে। বিজ্ঞাপন জোগাড় করতে কারও পায়ে ধরতে বাকি রাখলেন না। নাওয়া-খাওয়া ভুলে মেতে রইলেন কাগজ বের করার নেশায়। যৎসামান্য ব্যাঙ্কের পুঁজি ভেঙে সাধ্যাতিরিক্ত মাইনেতে বহাল করলেন শাক্য ভট্টাচার্যকে, স্পোর্টস এডিটর হিসেবে। নিয়ে এলেন কয়েক জন আনকোরা কিন্তু উদ্যমী, কাজ শিখতে আগ্রহী ছেলেদের। সবাইকে বললেন একটাই কথা, 'পয়সা দিতে পারব না। কিন্তু সাংবাদিকের সম্মান দেব। আমার কাগজের রিপোর্টার হলে ভাঁড়ামো করতে হবে না।'

উলটো স্রোতে সাঁতার কাটা সহজ না। হারিয়ে যাওয়া জমি উদ্ধার করার কাজটাও সহজ ছিল না। দীর্ঘ পনেরো-ষোলো বছর ধরে অমানুষিক পরিশ্রমে বিজনদা আজ দৈনিক সত্যবার্তাকে আবার তুলে এনেছেন প্রায় দেড় লক্ষ সার্কুলেশনের একটি খবরের কাগজে। আজকের মাপে এটা কোনো সংখ্যাই নয়। কিন্তু সত্যবার্তার এই চড়াই-ভাঙা হাঁটা যারা কাছ থেকে দেখেছে তারা জানে এর গুরুত্ব কী এবং কতটা।

এখনও সত্যবার্তা কোটি কোটি টাকার ব্যবসা করে না ঠিকই। কিন্তু খরচের টাকা উঠে আসে। ধার-দেনা প্রায় সবটাই শোধ। খুব ছোট অথচ এফিশিয়েন্ট সাংবাদিকদের একটা টিম বানাতে সমর্থ হয়েছেন বিজনদা। তারা মাইনে বেশি পায় না, কিন্তু ভালো সাংবাদিক হবার শিক্ষাটা পায়।

বিজন মুখার্জী বিয়ে-থা করেননি। বলা ভুল হল। আসলে তাঁর একটিই বিয়ে। দৈনিক সত্যবার্তা। নিজের বাড়িটিকে অফিস বানিয়েছিলেন শুরুর দিকে। এখন অফিস উঠে এসেছে মিন্টো পার্ক এলাকায়। আর সেটাই হয়ে গিয়েছে তাঁর বাড়ি।

এহেন বিজন মুখার্জী রাতবিরেতে তিনটের সময় যখন একজন শিক্ষানবিশ রিপোর্টারকে ফোন করেন, তখন তার চোখের ঘুম উড়ে যাওয়াটাই স্বাভাবিক। সে মাখলার ঘুমকাতুরে মানু হলেও।

তড়াক করে উঠে বসে, পুরোপুরি জেগে যাওয়া গলায় মোনালিসা জানতে চাইল, 'কেন? কী হয়েছে বিজনদা?

'সিএম-এর অ্যাক্সিডেন্ট! রাত্তির দেড়টা নাগাদ হয়েছে!!'

'সে কী? কোথায়? মারা গেছেন নাকি বেঁচে আছেন?'

'এখন আর কোনো কথা নয়। চটপট রেডি হয়ে বেরিয়ে পড়ো। এস. এস. কে. এম. চেনো তো?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই!'

'সায়ন ওখানেই পৌঁছে গেছে। তুমি রাস্তায় দেবদীপ্তকে তুলে নেবে। ও বাইক চালাতে পারে না।'

চ্যাটাং চ্যাটাং কথা বলে হাড়পিত্তি জ্বালাতে তো বেশ পারে! আধবুড়ো এমসিপি, বাইক চালাতে শিখতে পারেনি এখনও? এ কথাগুলো অবিশ্যি মনে মনেই বলে মোনালিসা।

বিরক্তিতে ভুরু কুঁচকে গেলেও গলার স্বরে তার কোনো প্রভাব পড়তে দেয় না মোনালিসা। সহজ গলায় বলে, 'দেবদীপ্তদা কোথায় দাঁড়াবে?

'সুলেখা মোড়ে ও অপেক্ষা করবে পনেরো মিনিটের মধ্যে। মেক শিওর ইউ আর অন টাইম!! কল মি হোয়েন ইউ আর দেয়ার!'

'ওক্কে!'

ফোনটা ডিসকানেক্ট করে মোনালিসা সময়টা দেখল। তিনটে চব্বিশ! 'মা, বেরোব! এক কাপ কফি প্লিজ!' কথা ক'টা ছুড়ে দিয়েই মোনালিসা বাথরুমের ভেতর। এখন মায়ের জেরার মুখে পড়লে সাড়ে সব্বোনাশ।

পাঁচ মিনিটের মধ্যে ফ্রেশ হয়ে বেরিয়ে জিন্স আর টি-শার্ট পরতে পরতেই মা কফি নিয়ে ঘরে ঢুকল।

'রাতবিরেতে কোথায় ধিঙ্গি নাচন নাচতে চললি শুনি?'

'কাজ। বিজনদা ডেকেছে।' যত সংক্ষেপে সারা যায়, তত ভালো।

'তা তোমার বিজনদা জানে রাত্তির ক'টা বাজে? আর এই রাতবিরেতে মেয়েছেলের রাস্তায় বেরোনো ঠিক নয়!'

'আঃ মা! মেয়েছেলে না, মেয়ে বা মহিলা। আর সাংবাদিকদের কোনো জেন্ডার হয় না। সবচে' বড় কথা হল, খবর তো আর সময় বুঝে আসবে না।'

কথা বলতে বলতেই চুলটা ঘুরিয়ে খট্টাঙ্গ-পুরাণ করে বেঁধে নিয়ে, কফির কাপে আর একটা চুমুক দিয়েই স্কুটির চাবি নিয়ে দৌড় লাগায় মোনালিসা।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে শুনতে পায়, তার এখনও শহুরে না হতে পারা মা বলছে, 'মেয়েটাকে রক্ষা ক'রো, বাবা লোকনাথ! দুগ্গা দুগ্গা দুগ্গা!!'

মুচকি হেসে ফেলল মোনালিসা। মুখে জটাইবুড়িদের মতো কথা বলে বটে বুড়ি। কিন্তু সে জানে, তার মা মনে মনে কতটা আধুনিকা। ওর চেনা-জানা অনেক শহুরে বান্ধবীদের তথাকথিত আলোকপ্রাপ্তা মায়েরা এত রাত্তিরে মেয়েকে একলা বেরোতে দিতেন কিনা, ওর ঘোরতর সন্দেহ আছে।

।। দ্য ডেভেলপমেন্ট স্টার্টস ।।

২৫ জুলাই, ২০১৮, গভীর রাত / কলকাতা, ভারত

মোটামুটি আধ ঘণ্টার রাস্তা নাকতলা থেকে এস. এস. কে. এম.। ভোররাতের শুনশান রাস্তায় দশ-পনেরো মিনিটে পৌঁছোনো যায়। স্কুটির স্পিডোমিটারের কাঁটা ষাটের দিকে যেতে থাকে। মোনালিসার মাথার মধ্যে শুরু হয় হিজিবিজি চিন্তার বুনোট।

বিজনদা তার মতো একটা নভিসকে ডেকে এত রাত্তিরে তুলল কেন? তার মানে কি বিজনদা তাকে গুরুত্ব দিচ্ছে? নাহ! মনে হয় ওই ভাম দেবদীপ্তকে নিয়ে যাবার জন্যে একটা কুলি দরকার ছিল। এক নম্বরের ম্যাদামারা লোক। কী করে বিজনদার মতো ডায়নামিক একজন মানুষ দেবদীপ্ততে মজে থাকতে পারে, মোনালিসা বুঝতে পারে না। ইনডাকশনের সময় থেকেই শুনেছিল ক্রাইম বিটে দেবদীপ্ত নাকি ইন্ডিয়ার ওয়ান অফ দ্য বেস্ট! কে জানে বাবা! দেখে তো মনে হয় মাংসের দোকানের লাইনে দাঁড়ালেও প্যান্টে পেচ্ছাপ করে ফেলবে মুরগির নলি কাটা দেখলে। তার ওপর চিবিয়ে চিবিয়ে কীরকম গা-জ্বালানো কথাবার্তা বলে।

মোনালিসা যখন নিজের চাহিদামতো ক্রাইমবিট পেল— বিজনদা ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ামাত্র, মিটিং-এ বাকি সবার সামনেই হেসে হেসে হাত বাড়িয়ে লোকটা বলল, ‘কনগ্র্যাচুলেশন্স! ইউ আর দ্য ফার্স্ট টু ম্যানেজ টু গেট এ পেড লিভ অ্যাজ অ্যাপ্রেন্টিস!! পেডিকিওর, ম্যানিকিওরের মতো পরিশ্রমসাধ্য কাজ করার পরে তোমরা আবার সামান্য চোর, ডাকাত, খুনি ধরতে বেরোবে! দ্যাট উড বি টু আনফেয়ার টু দ্য ফেয়ারার জেন্ডার!’

মিটিং রুমের সবাই যখন দাঁত কেলিয়ে খ্যাক খ্যাক করে হাসছিল, তখন মোনালিসার কান ঝাঁ-ঝাঁ করছিল রাগে। সায়ন বলে ছেলেটাই একমাত্র সেটা বুঝতে পেরেছিল মনে হয়। রুম থেকে এক এক করে বেরোনোর সময় মোনালিসার কানে আস্তে আস্তে বলেছিল, ‘ইগনোর হিজ জাইব! কাজ করতে গেলে কিন্তু শিখতে পারবে অনেক কিছু!!’

সেই হোঁদল কুঁতকুঁতকে এখন স্কুটির পেছনে চাপিয়ে নিয়ে যেতে হবে ভাবতেই গা রি-রি করছে। কিন্তু কিছু করার নেই। সামনে, একটু দূরেই দেখা যাচ্ছে রাস্তার ধারে একটি বেঁটে অবয়ব। আর একটু কাছে আসতেই স্পষ্ট হল লাল কলারের হলুদ গেঞ্জি আর পায়ের কাছে ইলাস্টিকওয়ালা হাল ফ্যাশনের জিন্স পরা লোকটাই দেবদীপ্ত। কে একে বোঝাবে, পাঁচ ফুট চার ইঞ্চি হাইট আর আটতিরিশ ইঞ্চি কোমরে লুঙ্গি আর ময়ূরপুচ্ছ ধুতি ছাড়া কোনো পোশাকই ভালো লাগে না। এ কী, মাথায় আবার হেলমেট পরে দাঁড়িয়ে আছে কেন? হাসির আর স্কুটির ব্রেকে প্রায় একসঙ্গেই চাপ দেয় মোনালিসা!

‘দেবদা কি হেলমেট পরেই শুয়ে থাকেন, নাকি?”

পিঠে বাচ্চাদের স্কুলব্যাগের মতো একটা ব্যাকপ্যাক। সেটা সামলে স্কুটিতে উঠতে উঠতে দেবদীপ্ত বলে, ‘উপায় কী বলো মামণি! কেউ পুশ-আপ ব্রা পরে শোয়, কেউ হেলমেট! যার যে অর্গানটা বেশি কাজে লাগে, সেটাকে প্রিজার্ভ করা, আর কী।’

‘বোকাচো...’মোনালিসার দাঁতে দাঁত চেপে দেওয়া খিস্তিটা ডুবে যায় স্কুটির আওয়াজে। স্কুটির আওয়াজ ছাপিয়ে একটু গলা তুলে, মুখে সে বলে, ‘কী ব্যাপার একটু বলবেন দেবদা? বিজনদা তো কিছুই তেমন বললেন না।'

‘সিএম বাথরুমে পড়ে গিয়ে মাথার পেছনে চোট পেয়েছেন।'

মোনালিসা প্রথমে ভাবল সে ভুল শুনছে। তারপর মনে হল হারামিটা আবার ইয়ার্কি মারছে। কিন্তু গলা শুনে তো সেরকম লাগছে না। নিজের শকটা চেপে রাখতে না পেরে সে বলেই ফেলল, ‘মানে? বাথরুমে পড়ে গিয়ে মাথায় চোট পেয়েছেন বলে, রাতবিরেতে এরকম জরুরি তলব?’

‘নট সো সিম্পল মোনালিসা! সিএম এর পেছনে চক্রান্ত দেখছেন।'

'সে তো সব নেতা, সবেতেই দেখে থাকেন।'

'সেখানেই শেষ না। ক্রাইম ব্রাঞ্চের পরীক্ষিৎ দাশগুপ্তকে ইনভেস্টিগেট করতে দেওয়া হয়েছে বলে শুনছি।'

সায়ন বলেছিল সঙ্গে থাকলে কাজ শিখতে পারবে!

ঘটনাটা ঘটেছে খুব বেশি হলে ঘণ্টা দুয়েক আগে। লোকটা জায়গায় না পৌঁছেই গুরুত্বপূর্ণ বেসিক খবরগুলো জোগাড় করে ফেলেছে এরই মধ্যে। সোর্স আর পারসিস্টেন্স! সাংবাদিকের অবশ্য প্রয়োজনীয় দুটি অস্ত্র!

'পরীক্ষিৎ মানে রহিম আলি কেস?'

'ইয়েস! দ্যাটস হিম...' একটু কি প্রশংসা শোনা গেল গলায়?

ভাবতে ভাবতেই হুড়মুড় করে তারা এসে পড়ল এস. এস. কে. এম.এর গেটে। অন্য দিন এই গেট দিয়ে গটগট করে ডাইনোসর ঢুকলেও কেউ আটকায় না। আজকে মাছি গলার মতো অবস্থাও নেই। অনেক রোগীর পরিবারের লোককেও আটকে দিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। স্কুটি দাঁড় করানোমাত্র দেবদীপ্ত হাঁচোড়-পাঁচোড় করে কোনোমতে নেমে লদগদ করে হেঁটে গেল কর্তব্যরত পুলিশ অফিসারটির দিকে।

সত্যবার্তা তো আর প্রথম সারির দৈনিক নয়। তাই খবরের একদম অন্দরমহলে যাবার ছাড়পত্র পেতে সমস্যা হয়েই থাকে, মাঝে মাঝে। অনেকটাই নির্ভর করে সাংবাদিকের ব্যক্তিগত চেনা-জানা ও ক্যারিশমার ওপর। অবাঙালি অফিসারটিকে বোঝাতেই বেগ পেতে হল! প্রায় পাঁচ মিনিট পরে দেবদীপ্ত ফিরে এসে জানাল, 'ইমার্জেন্সি বিল্ডিং-এই আছেন। এখন স্টেবল। পরীক্ষিৎ এসেছেন মিনিট পঁয়তাল্লিশ আগে। আমি ডাইরেক্ট ইমার্জেন্সিতে যাচ্ছি। তুমি স্কুটি পার্ক করে চলে এসো। প্রেস আইকার্ড হাতে পেয়েছ?'

'না, এখনও পাইনি!' যদিও এতে মোনালিসার কিছুই করার নেই, তবু অপরাধীর মতো মুখ নীচু করে ফেলে।

'তাহলে, কোথাও আটকালে— ফিগার আউট ইওর ওন ওয়ে সুইটি!'

একটা রাগী চাউনি দেবার জন্যে মুখ তুলে তাকাতেই মোনালিসা দেখতে পেল দেবদীপ্ত ঢুকে যাচ্ছে মেন গেট দিয়ে। স্কুটির চাবি ঘুরিয়ে স্টার্ট দিয়ে মেন এন্ট্রান্স দিয়ে ঢুকে ডান দিকে বাঁক নিল মোনালিসা। ইমার্জেন্সি বিল্ডিং পেরিয়ে আরও বেশ কিছুটা গিয়ে, রোনাল্ড রস বিল্ডিং-এর পেছন দিকে টু হুইলার পার্কিং। এ. জে. সি. বোস রোডের গা ঘেঁষে।

কোনোমতে স্কুটিটা পার্ক করে প্রায় ছুট লাগাল মোনালিসা। জীবনের প্রথম সিরিয়াস কেসে পেড লিভ সে কাটাবে না। রিউম্যাটোলজির আউটডোর বিল্ডিংএর সামনে দু-তিন জন পুলিশ কনস্টেবল দাঁড়িয়ে। তারা খেয়াল করার আগেই, দ্রুত নিজের স্কার্ফটাকে গলায় এক পাক ঘুরিয়ে, কানে ফোন তুলে একটু গলা উঁচিয়ে ফোনের ওপারের অদৃশ্য লোকের সঙ্গে কথা বলতে শুরু করে মোনালিসা, 'বেবির পজিশন এখনও ঠিক আছে। কিন্তু আপনাদের ফ্যামিলির কেউ না এলে সি সেকশন শুরু করা যাবে না, মিঃ লাহিড়ী!

'না! অ্যাজ হার ডক্টর আই ওন্ট অ্যালাও দ্যাট!' কথা বলতে বলতে কনস্টেবলদের পেরিয়ে ইমার্জেন্সি বিল্ডিং-এ ঢুকে পড়ে ফোনটাকে পকেটে পুরে ফেলল সে।

বিল্ডিং-এর ভেতরে থিকথিকে সিকিউরিটি। একদম সামনের দিকেই একটা আধো আলো কোণে দেবদীপ্ত দাঁড়িয়ে কথা বলছে কোনো একটি পুলিশ অফিসারের সঙ্গে। অফিসারটির মুখ দেখা যাচ্ছে না ঠিক করে। একটু অন্ধকারের দিকে ফেরানো। দেবদীপ্তকে সাংবাদিক সার্কিটের অনেকেই স্বাভাবিকভাবেই চেনে। কোনো একজন পুলিশের সঙ্গে তাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেই জনা কয়েক এগিয়ে গেল সেদিকে। মোনালিসাও!

সঙ্গে সঙ্গে অফিসার ভদ্রলোক প্রায় ছিটকে সরে গেলেন নিরাপত্তা বেষ্টনীর ভেতরে। ভিড় করে আসা বাকিদের অগ্রাহ্য করেই মোনালিসা দেবদীপ্তকে জিজ্ঞেস করে, 'কী ব্যাপার দেবদা?'

'ধুস! পাতি অ্যাক্সিডেন্ট! ফালতু সময় নষ্ট! চলো, যাওয়া যাক। যা খবর, সেসব কাল মন থেকে বানিয়েই লিখে দেওয়া যাবে। সবই রুটিন।

খুব হতাশ হয়ে দমে গেল মোনালিসা। মনে মনে যে উত্তেজনাটা ফুটছিল সেটা মিইয়ে গেল। সুড়সুড় করে ফেরার পথ ধরল সে। দেবদীপ্তও সতীর্থ সাংবাদিক বন্ধুগুলোকে হাই-হ্যালো করতে করতে হাঁটা লাগাল মোনালিসার পিছু পিছুই।

পার্কিং লটের কাছাকাছি পৌঁছোতেই দেবদীপ্ত চাপা গলায় বলল, 'সার্জারি ওপিডি-র পাশ দিয়ে ছোট গেটটা চেনো?'

'হ্যাঁ! চিনি। বাবাকে নিয়ে অনেক বার এসেছি এখানে।'

'ওখান দিয়ে বেরোব।'

শিকারি বেড়ালের মতো জ্বলজ্বল করছে দেবদীপ্তর চোখ। দু' মিনিট আগের নিরুৎসুক চোখ-মুখের সঙ্গে এখনকার এক্সপ্রেশন কিছুতেই মেলানো যায় না। 'যাব কোথায়?' মোনালিসা জানতে চায়।

ততক্ষণে স্কুটিতে স্টার্ট দিয়ে ফেলেছে সে। পেছনে বসতে বসতে দেবদীপ্ত বলল, 'লেক ল্যান্ড কান্ট্রি ক্লাবে। পুলিশ সন্দেহ করছে সিএম-এর ছেলে জড়িয়ে এই কাণ্ডে।'

'হোয়াট!!!'

স্কুটির সামনের চাকার ব্রেকে খ্যাঁচ করে চাপ দিয়ে ফেলল মোনালিসা, প্রতিবর্ত ক্রিয়ায়!

'হুম! বাথরুমের মেঝেতে শ্যাম্পু ছড়ানো ছিল প্রচুর। পারপাসফুলি!!' 'ক্র্যাপ! বাট ছেলেকে সন্দেহ করার কারণ?

'দুটো। প্রথমত, সিএম আর তার ছেলে ছাড়া ওই বাথরুম আর কেউ ব্যবহার করে না। দ্বিতীয়ত, শ্যাম্পুও ছেলেই ব্যবহার করে একমাত্র।'

মোনালিসার মনে সিএম-এর মাথাভরা টাকের ছবিটা ভেসে উঠল। সে বলল, 'আর সেই ছেলে এখন লেক কান্ট্রি ক্লাবে ফুর্তি করছে?'

'সেরকমই তো শুনছি।

'ব্যাপারটা কীরকম গোলমেলে লাগছে না, দেবদা? একটু ভেবে দেখো! বাবা মুখ্যমন্ত্রী! ছেলে তাকে মারার চেষ্টা করল। তাও আবার কী কিম্ভূত উপায়ে! বাথরুমের মেঝেতে শ্যাম্পু ছড়িয়ে!'

'পদ্ধতি হিসেবে তেমন এফেক্টিভ না হলেও রিস্ক ফ্রি, সেটা মানতেই হবে।'

'কোথায় আর রিস্ক ফ্রি? দুটো লোক বাথরুম ব্যবহার করে। এক জন টেকো, এক জন চুলওয়ালা! মেঝেতে শ্যাম্পু পড়ে থাকলে তো একশো বারের মধ্যে একশো বারই সন্দেহ যাবে চুলওয়ালা লোকটার দিকে!'

'চুক চুক চুক চুক... অ্যামেচার!' একটা ব্যঙ্গ মেশানো আফশোসের শব্দ করেই দেবদীপ্ত বলল, 'শ্যাম্পু কে ছড়িয়েছে প্রমাণ হয়ে গেলেও, ইনটেনশন কি কোনোভাবে প্রমাণ করা যাবে, মামণি? হাজার হোক, বাথরুমে শ্যাম্পু পড়ে থাকা তো মৌসিনরামে বৃষ্টি পড়ার মতোই ঘটনা, তাই না?'

কথাটা মেনে নিতে হয় মোনালিসাকে। সে বুঝতে পারে দেবদীপ্ত রিস্ক ফ্রি কেন বলেছে। এই উপায়ে কেউ খুন করতে চেয়েছে এটা প্রমাণ করার কোনো সহজ রাস্তা নেই। সে চট করে পালটা প্রশ্ন করে, 'তাই কি ছেলে নিশ্চিন্ত হয়ে ক্লাবে বসে মদ গিলছে?'

'হতেও পারে। তবে আমি অত দূর ভাবছি না এখনই। পরীক্ষিৎ দাশগুপ্ত প্রেস কনফারেন্সে প্রাইম সাসপেক্টের নাম বলার আগেই আমার সাসপেক্টের একটা বাইট চাই। চাই-ই!

নিজের অজান্তেই সে খামচে ধরে মোনালিসার কাঁধ! একটা বাম্পার সামলাতে সামলাতে মোনালিসা বলে, 'আর সায়ন?'

'সায়ন ছবি নিয়ে ওর মতো বেরিয়ে যাবে। উই কান্ট মিস দিস লিড...' প্রায় দশ

কিলোমিটার রাস্তা। অ্যাক্সিলারেটর ঘোরাতে শুরু করল মোনালিসা।

।।২.৩।।
।। অ্যান ইনসিগনিফিক্যান্ট রিপল।।

২৫ জুলাই, ২০১৮, গভীর রাত / ধাড়সা, ভারত

কোনা এক্সপ্রেসওয়ে দিয়ে প্রচণ্ড বেগে কলকাতার দিকে আসছিল স্করপিও গাড়িটা। ড্রাইভিং সিটে সিএম-এর বিশ্বস্ত ড্রাইভার তড়িৎ। সামনের প্যাসেঞ্জার সিটে একটি সশস্ত্র দেহরক্ষী। পেছনের সিটে নেশায় বুঁদ হয়ে থাকা একটি প্রায় অচৈতন্য যুবক।

অভিজাত রায়!! অখিলেশ রায়, সিএম অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল-এর একমাত্র সন্তান।

কিছু দূর গিয়ে সাঁতরাগাছি স্টেশন লাগোয়া রাস্তা পেরিয়ে যেতেই হঠাৎ সশস্ত্র দেহরক্ষীটির হাতে উঠে আসে অটোমেটিক পিস্তল। ঠান্ডা নলটা ড্রাইভারের কপালে ঠেকিয়ে সে বলে ওঠে, 'একটু প্লিজ বাঁ-দিকটা নেবেন!'

তৃতীয় অধ্যায়
।। পন স্যাক্রিফাইস।।

।। ৩.১ ।।
।। দ্য ক্যাজুয়াল ক্যাজুয়ালটি।।

১৭ জুলাই, ২০১৮, সকাল বেলা / চানেসার গোঠ, করাচী, পাকিস্তান চানেসার একটা পুঁচকে হল্ট স্টেশন। বেঁটেখাটো একটি আপ আর একটি ডাউন প্ল্যাটফর্ম। দুটিতেই আগাছা আর সরীসৃপের রাজত্ব। জং ধরে যাওয়া লোহার খাঁচা থেকে টিনের শেড নামক লজ্জাবস্ত্রটি প্রায় পুরোটাই খসে পড়েছে। লাইনের দু' পাশে যতদূর চোখ যায়— প্লাস্টিকের প্যাকেট, স্যানিটারি ন্যাপকিন, মরা জন্তুর দেহাবশেষ। এই নোংরার পাহাড়ের, এই পূতিগন্ধময় পরিবেশের গা লাগিয়েই উঠেছে বস্তির ঝুপড়ি, পায়রার খোপের মতো ফ্ল্যাট, কম্পিউটার শেখার ট্রেনিং সেন্টার, বিউটি পার্লার, টেলারিং শপ, বাচ্চাদের সস্তার ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল আর ফাস্ট ফুডের দোকান।

আগুন জ্বালিয়ে মানুষের জীবনের অন্ধকার দূর করবে বলে যে বিজ্ঞানের যাত্রা শুরু — আলোয় ফুটে ওঠা সভ্যতার এই দগদগে রূপ দেখে সে যেন এখানে এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে... নির্বাক। বিগতযৌবনা!!

কারসাজ আর করাচি ক্যান্টনমেন্টের মাঝে এই হল্ট স্টেশনে করাচি সার্কুলার রেলওয়েজের ট্রেন যাতায়াত করে। ভুল বলা হল। যাতায়াত করত ১৯৯৯ সাল অবধি। ধুঁকতে থাকা করাচি সার্কুলার রেলওয়েজ ১৯৬৯ থেকে ১৯৯৯ অবধি চলার পর অবশেষে দেহ রাখে। তারপর থেকে বহু বার এই শাখাটিকে আবার বাঁচিয়ে তোলার একটা চেষ্টা বেশ কিছু মহলে দেখা গেছে। মাঝে তো এমন কথাও হয়েছিল যে উত্তরে গাদাপ, দক্ষিণে কিয়ামারি, পূর্বে ধাবেজি ও পশ্চিমে হাব পর্যন্ত বাড়িয়ে দেওয়া হবে এর এলাকা। কিন্তু প্রতি বারই হয় আর্থিক বা রাজনৈতিক কারণে তা পেছিয়ে যায়। অবশেষে গত ২০১৭ সালের মে মাসে পাকিস্তান ফেডারেল গভর্নমেন্ট প্রায় দু' হাজার আটশো কোটি টাকা বাজেট বরাদ্দ করেছে এই বাবদ।

তারপর থেকেই চানেসারে বেড়েছে কর্মচাঞ্চল্য। মাপজোখ করার লোক, একটি-দুটি ভারী ক্রেন, একটি ছোট সাইট অফিস— আস্তে আস্তে গজিয়ে উঠছে গত দু' মাস যাবৎ। সাইট অফিসে যদিও ইঞ্জিনিয়ার এসে পৌঁছোয়নি এখনও। জমি সমান করার কাজে লাগা ঠিকে মজুররা এখন ওই ঘরটাকে টিফিন খাওয়ার, আর কাজের ফাঁকে একটু জিরিয়ে নেওয়ার জন্য ব্যবহার করে।

আজও তারা ঢুকেছিল জোহরের নামাজ পড়া সাঙ্গ করেই। ঘড়িতে তখন বারোটা পঞ্চাশ মিনিট! সাইট অফিসের ঘরটার শুধু খাঁচাটুকুই উঠেছে এখনও। চারটে দেওয়াল, দুটো খুপরি জানলা, একটা দরজা ও একটা টিনের ছাদ। দরজাজানলায় পাল্লা বসেনি যদিও এখনও। তাই বাইরে থেকে ঘরের অনেকটাই দেখা যায়।

তাও পা দুটো বাইরে থেকে দেখা যাচ্ছিল না। দরজার ঠিক বাঁ-পাশে দেওয়াল ঘেঁষে ভেতর দিকে ছিল বলেই বোধহয়। প্রথম চোখ পড়ল মনজুরের। বেশিরভাগ দিনই ওজু করার সময় মনজুরের কানে জল ঢুকে যায়। বের করতে পাসিনা ছোটে তার। আজও সেই এক ব্যাপার। ডান কানে জল ঢুকে যাওয়ায় মাথার ভেতরটা কেমন গং গং করে যাচ্ছিল। ডান দিকে মাথা হেলিয়ে জলটা বার করার চেষ্টা করতে করতে মনজুর যখন ঘরটাতে ঢুকছিল, তখন বিলাল, রওশন বা হাফিজরা কেউ আসেনি। জলটা না বের হওয়ায় অস্বস্তিতে মাথাটা একটু বেশিই ঝাঁকিয়ে ফেলে মনজুর।

তার জন্যেই, নাকি মাথা ঝাঁকাতে গিয়ে যা চোখে পড়ল তার জন্যে—সেটা ঠিক বোঝা গেল না— কিন্তু মাথাটা বোঁ করে টলে উঠল। দেওয়ালের ধার ঘেঁষে গুঁজরে পড়ে আছে একটা লাশ! এমনিতে সেই পড়ে থাকার ভঙ্গি থেকে লাশ বলে বোঝা যায় না। যে

কোনো গড়পড়তা পেঁচো-মাতাল টাইপের মজুর নেশা করে এরকমই আদাড়ে-পাদাড়ে পড়ে থাকে। পরনে তালি দেওয়া জিন্স। সুখতলা প্রায় ক্ষয়ে শেষ হয়ে যাওয়া সস্তা চপ্পল। এক হাতে কোনো দরগার লাল-সাদা সুতো বাঁধা, অনেকগুলো। অন্য হাতে একটা ঘড়ি। কড়া রোদে পুড়ে ঝামা হয়ে যাওয়া চামড়া।

কিন্তু তার পরেই চোখ যাবে তার মাথার দিকে। আর ঠিক তখনই নিঃসংশয়ে বোঝা যাবে, ওখানে কোনো মাতাল শুয়ে নেই। পড়ে আছে একটি লাশ। কেউ একটা ভারী কোনো জিনিস দিয়ে মাথাটা থেঁতলে দিয়েছে একেবারে। ঘিলু ছিটকে লেগে আছে দেওয়ালের গায়ে। মুখটা কিছুই বোঝা যায় না। যেখানে একটা সময় কারও মুখ ছিল, সেই জায়গাটা জুড়ে এখন আছে শুধু একটা বিকৃত, কদাকার হাড় ও মাংসের স্তূপ।

দেখেই মনজুরের পেটের ভেতরটা কেমন গুলিয়ে উঠল। নিজেকে সামলাতে না পেরে, হড়হড় করে সে খানিকটা টকজল বমি করে তুলে দিল ঘরের অমসৃণ মেঝেয়।

বমির শব্দ শুনতে পেয়ে শেষ কয়েক পা দৌড়েই ঘরে ঢুকল বিলাল।

'কী হয়েছে বে তোর?' বলতে বলতেই মনজুরের চোখ অনুসরণ করে সে কারণটা খুঁজে পায়। বিলাল যদিও অতটা ঘাবড়ায় না। একটু থতোমতো খেয়ে যায় বটে। কিন্তু ব্যস, ওইটুকুই।

পেছন পেছন ঢুকতে থাকা বাকিদের ওই একপাশে সরিয়ে নিয়ে গেল। মনজুরকে তুলে ধরে ধরে একপাশে বসাল। চোখে-মুখে জল দিল। তারপর সবাইকেই বলল, 'আমরা কেউ কোনো জিনিসে হাত দেব না। লাফড়া হয়ে যাবে। পুলিশ এসে যা করার করবে।'

'পুলিশ এসে বাল ছিঁড়বে। এ নিশ্চই ফারুক লালার গ্যাং-এর কাজ। আজ পর্যন্ত চানেসার গোঠের কোন গুন্ডাটাকে পুলিশ ধরতে পেরেছে?'

হাফিজ আক্রাম। ছেলেটা মুখ খারাপ করে ঠিকই। তবে কথাটা সে মিথ্যে বলেনি।

শারিয়া ফায়জাল শহরের একদম কেন্দ্রে, চানেসার হল্ট স্টেশন থেকে মাত্র কয়েক গজ দূরে এই চানেসার গোঠ। দু' পাশে সাদা, ময়লা বিবর্ণ পাথুরে বা কংক্রিট দেওয়ালের সারি সারি বৈশিষ্ট্যহীন বাড়ি। আর তাদের মাঝখান দিয়ে আঁকাবাঁকা সরু খুঁজি রাস্তা। ইটের... এবড়ো-খেবড়ো।

২০০৭-০৮ থেকে বার বার পুলিশের রেড হয়েছে। গ্যাং-এর এক-দু' জন লোক ধরা পড়েছে। বাকিরা ঘরদোর খালি করে গা-ঢাকা দিয়েছে। দু' দিন সব ঠিকঠাক। তারপর আবার যে-কে-সেই। সেই ড্রাগের অবৈধ লেনদেন, রাস্তায় রাস্তায় খুনখারাপি, মেয়েমানুষ কেনাবেচা আর গ্যাংস্টার ও অসৎ ঘুষখোর পুলিশের দৌরাত্ম্য। চানেসার গোঠের গলিতে ঢুকলে বোঝা যায় শহুরে সভ্যতার মধ্যে কী অনায়াসে অপরাধমূলক কাজকর্মের চারা শিকড় ছড়ায় দ্রুত। অশিক্ষা, অপুষ্টি আর দারিদ্র্যের উর্বর জমিতে অপরাধের বিষবৃক্ষ দ্রুত ডালপালা ও শিকড় ছড়িয়ে মহীরুহে পরিণত হয়।

'কাস মারানি কা— চুপ হো যা! এসব দেখা আমাদের কাজ নয়। একটা মুর্দা দেখে, একটা কতল, একটা গুনাহ-এ-আজিম দেখে আমরা যদি চুপ করে যাই, আল্লাহ মাফ করবে না।' বিলাল একটু গলা চড়িয়ে ফেলে।

'কিন্তু বিলালভাই! আমরা মজদুর লোক। পুলিশকে ডাকতে গেলে ইবলিশের বাচ্চারা আমাদের ধরেই হাজতে পুরবে। তার চে' সুপারসাহাবকে ডাকি। তিনি যা ভালো বুঝবেন...'

'এ কথাটা রওশনভাই ঠিকই বলেছে।' এবার, এতক্ষণে গলা মেলায় মনজুরও। সে একটু সামলে উঠেছে।

'বেশ। তাই ডাকা হোক তাহলে...' বিলাল নিমরাজি হয়। পুলিশের হাতে হয়রান হবার কথাটা ফেলে দেওয়া যায় না।

১৭ জুলাই, ২০১৮, সকাল বেলা / চানেসার গোঠ, করাচী, পাকিস্তান কথিত আছে পণ্ডিত মোতিরাম নামের এক পেয়াদা, সম্রাট আকবরের আমলে নিজের সারাজীবন দিয়ে রক্ষা করে গেছিল এই ফটক। সেই পণ্ডিতের নামেই নাকি এর নাম।

এই গল্পের মধ্যে যদিও সত্যের চেয়ে রোমান্স বেশি। যে যাই বলুক, ইতিহাস সাধারণকে মনে রাখে না।

বেশিরভাগ ইতিহাসবিদের ধারণা মোর্চি শব্দটি থেকে এসেছে এই নাম। মোর্চি অর্থে পরিখার মধ্যে থেকে যুদ্ধ করে যেসব সৈনিক। মোচি গেট বা মোচি দরওয়াজা সুবিখ্যাত ও সুপ্রাচীন দেওয়াল ঘেরা পুরোনো লাহোর শহরের পুরোনো গেট। আধুনিক সময়ে যে ছয়খানি ঝলমলে গেট লাহোর শহরের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই অংশটিকে আগলে রাখে, বয়েসে, জরায় জীর্ণ, ন্যুব্জ মোচি গেট তাদের মধ্যে পড়ে না।

তবে জীর্ণ হলেও এর ঐতিহ্য-আকর্ষণ, কিছুই কমেনি। না পর্যটক, না সাধারণ মানুষ, কারও কাছেই। এই গেট পেরিয়েই মোচি বাগ! পাকিস্তানের ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ড। তর্কাতীতভাবে পাকিস্তানের সবচেয়ে বিখ্যাত রাজনৈতিক সমাবেশের জায়গা। আর আছে বাজার। খোয়াবাজার! খেজুর, আখরোট, মেওয়া, ঘুড়ি, আতশবাজি—এই সব বিকিকিনির বিশাল বাজার । ত্রিপলের ছাউনি দিয়ে তাঁবু খাটিয়ে রাস্তার ধারে ধারেই স্তূপাকৃতি পসরা নিয়ে বসে আছে স্থানীয় ব্যবসায়ীরা।

বাজার ছাড়িয়ে সর্পিল গলিপথ ধরে এগোতে থাকলে নাকে আসবে মন ভালো করে দেওয়া খুশবু! গলির ভেতর, নোনাধরা ইটের দেওয়ালের পড়ো পড়ো দোকানঘরে, গনগনে আঁচের সামনে বসে চাচা আসাদুদ্দিন বানাচ্ছেন মোচি গেটের মশহুর নাস্তা, দাস-কুলচা অউর লোনচারা! পাশে বসে বাবার কাজ দেখে শিখে নিচ্ছে তরুণ নওরোজ! ঠিক যেমনটি চল্লিশ বছর আগে আসাদুদ্দিন চাচা বসে থাকতেন তাঁর ওয়ালিদ সাহেবের পাশে!

যেমন অর্ধ শতাব্দী আগে হত, ঠিক তেমনি শিয়া মহল্লায় এখনও মুহাররমের দিন মাতমের জন্য জমা হয় শিয়া সম্প্রদায়ীরা!

আর এই সবের মধ্যে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে আফজল সুইটস! ঠিক যেমনটি আজ থেকে প্রায় একশো বছর আগেও দাঁড়িয়ে থাকত।

একটু ভুল হয়ে গেল। একশো বছর আগে কোথায় ছিল এই সুবিশাল দোকানঘর?

১৯৩০ সালে এক শরতের সকালে, কাশ্মীর থেকে হামিদ আফজল বেগ এসে পৌঁছোন লাহোরের মোচি গেট এলাকায়। সঙ্গে তিন সঙ্গী যারা আমৃত্যু রয়ে যাবে তাঁরই সঙ্গে। তাঁর পরমাসুন্দরী বেগম রেজিনা, বছর দশেকের শিশুপুত্র ইয়াসির আর একটি রংচটা তোরঙ্গ!

হ্যাঁ, আর একটা জিনিস নিয়ে এসেছিলেন তিনি সঙ্গে করে। সেটি বাইরে থেকে দেখা যায় না। তা হল একটি আইডিয়া! একটি রান্নার রেসিপি। যদিও ঠিকঠাক বললে এ জিনিস তাঁর বেগমের কাছ থেকেই শেখা! পেঠে কা হালুয়া!

এইটুকু সম্বল নিয়ে মুল্লাহ মাজিদ মসজিদের সিঁড়িতে রাত কাটাতে শুরু করেছিলেন হামিদ। আর মোচি গেটের এককোণে খুলেছিলেন বাঁশের ঠেকনা আর কাপড়ের ছাউনি দেওয়া মিঠাইয়ের দুকান। ওই জায়গার ভাড়া ছিল সপ্তাহে তিরিশ টাকা। তখনকার দিনে এত টাকা দেবার কথা একা কোনো ছোট দোকানদার ভাবতেও পারত না। আরও দুজন ছোট দোকানদারের সঙ্গে মিলে জায়গাটা ভাড়া নেন হামিদ। সপ্তাহে মাত্র দু' দিন খুলত আফজল সুইটস। হামিদের আব্বুর নামে রাখা নাম।

মাত্র কয়েক সপ্তাহের মধ্যে অবস্থা এমন দাঁড়াল যে তামাম মোচি গেট এলাকার বাসিন্দারা ওই দু' দিনের অপেক্ষায় থাকতেন! কখন আফজল সুইটসের ঝাঁপ খুলবে আর

পাওয়া যাবে গরমাগরম পেঠে কা হালুয়া!

সেই যে শুরু, তারপর থেকে আফজল সুইটসকে আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। আজ প্রায় এক শতাব্দী বাদে, সারা পাকিস্তানে আফজল সুইটসের প্রায় দেড়শো ব্রাঞ্চ। শুরু হয়েছে বাইরের দেশে প্যাকড মিঠাই এক্সপোর্ট করার ভাবনাচিন্তা। হামিদ যা শুরু করেছিলেন, তার ছেলে ইয়াসির এবং নাতি আজহার বেগ মিলে নিয়ে এসেছেন এত দূর। আজহার বেগই এখনও ব্যবসা সামলান। ইয়াসিরের ইন্তেকাল হয়েছে বছর চারেক আগে। কিন্তু এই সাতান্ন বছর বয়েসেও আজহার এখনও অসম্ভব রূপবান। লোকে বলে তিনি তাঁর দাদির রূপ আর দাদাজানের গুণ একসঙ্গে পেয়েছেন। ব্যবসার দায়িত্ব হাতে নেবার পর মাত্র দুই দশকে তিনি আফজল সুইটসের ভোল পালটে দিয়েছেন পুরো। তাঁর বাবা অবধি একটি রমরমা দোকানেই খুশ ছিলেন। মোচি গেটের কাছে তাঁদের আদি দোকানে। কিন্তু আজহার অল্পেতে খুশি হবার মানুষ নন। এই ক'বছরে লাহোরের ব্যবসায়ী মহলে তিনি সাড়া ফেলে দিয়েছেন নিজের ব্যবসার উল্কার মতো বৃদ্ধি ঘটিয়ে। বাড়িতে রূপসী বেগম, এক ছেলে আর এক মেয়ে নিয়ে, আজহারের সংসার সুখের এবং ঈর্ষণীয়!

অন্তত বাইরের লোকজনদের তো এমনটাই মনে হয়।

কিন্তু আজহার নিজে জানেন, এই মনে হওয়াটা কত বড় ভুল। তাঁর মনে এতটুকু শান্তি নেই। আর তার একমাত্র কারণ তাঁর বড় ছেলে ইফতিকার। উর্দুতে ইফতিকারের মানে সম্মান, যশ! ভেবেছিলেন, ছেলে বড় হয়ে বংশের ঐতিহ্য মেনে পারিবারিক ব্যবসা সামলাবে। এখন তো আর লোকে হালওয়াইয়ের ছেলে বলে ব্যঙ্গ করতে পারবে না। এখন সে হবে দেশের অন্যতম বড়ো ফুড চেনের মালিক। তাই ছেলেকে অনেক যত্নে লেখাপড়া শিখিয়েছেন। ব্যবসার আধুনিক দিক আমেরিকানরা ছাড়া কেউ অত ভালো বোঝে না। তাই লাহোর ইউনিভার্সিটি থেকে পড়াশোনা শেষ হতে-না-হতেই ছেলেকে ভরতি করেন ইউনিভার্সিটি অফ ভার্জিনিয়া, শার্লটসভিলেতে। বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন শেখার অন্যতম সেরা প্রতিষ্ঠান।

ইফতিকারও তুখোড় মেধাবী ছেলে। বাবার পয়সা সে খরচ করায়নি। স্কলারশিপ আদায় করেছিল পরীক্ষায় দুর্দান্ত রেজাল্ট করে। কিন্তু ওই তিন বছর আমেরিকায় থাকতে থাকতে ছেলেটা কেমন বদলে গেল। যে ইফতিকার ফিরে এল, তার সঙ্গে যে গেছিল— তার কোনো মিলই নেই। মানে খোলস একই। ভেতরের রুহ যেন পালটে গেছে। ওর আম্মিও টের পায় না। কিন্তু আজহার জানেন। যে ছেলে ছোট্টবেলা থেকে নিজেদের দোকানের আশেপাশে ঘুরঘুর করত, থেকে থেকে জানতে চাইত আফজল সুইটসের গড়ে ওঠার ইতিহাস— সে ফিরে এসে ব্যবসার কথা মুখেই আনল না। উলটে চাকরির পরীক্ষা দিতে শুরু করল। সরকারি চাকরির।

যখন ইফতিকার করাচি পুলিশের চাকরি পেল, তখনও আজহারের বিশ্বাস হয়নি, যে ছেলে তাদের তিল তিল করে গড়ে তোলা ব্যবসা সামলাবে না। মনের কোনায় কোথাও একটু ধিকধিকে আশা ছিল যে ছেলের মন ফিরবে। সে পারিবারিক ব্যবসা ছেড়ে পরের নোকরি করতে যাবে না।

ছেলে কিন্তু সেদিন মুখের ওপর পরিষ্কার জানিয়ে দিল যে ব্যবসায় তার আগ্রহ নেই, সে চাকরি করতে চায়। সেদিনই আজহার প্রথম জানতে পারেন, ছেলেকে বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন পড়তে পাঠালেও সে সেখানে ফরেন রিলেশন আর ইতিহাসের ওপর করেছে স্নাতকোত্তর। আর সে দেশের হয়ে, সরকারের হয়ে কাজ করতে চায়।

ইফতিকার বিদেশ মন্ত্রকের চাকরিরই চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সেখানে সুযোগ পাওয়া খুব সহজ নয়। তাই তার প্রস্তুতি নিতে নিতেই সে চেয়েছিল স্বাবলম্বী হয়ে বাবার ছত্রছায়া থেকে বেরিয়ে আসতে। সে বুঝতে পেরেছিল মোচি গেটে থাকতে থাকতে সে বাবার বিরোধিতা করে বেশিদিন চালাতে পারবে না। তাই করাচি পুলিশ থেকে যেদিন সে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার পেয়েছিল সেদিনই সে বাড়ি ছেড়েছিল। আব্বুর খুব কষ্ট হয়েছিল।

আম্মি আর রোশান তো কেঁদে কেঁদে চোখ ফুলিয়ে ফেলেছিল। কিন্তু ইফতিকার জানত সে যা করছে, তার মর্ম এরা এখন বুঝবে না। কোনোদিনই কেউই বুঝবে না। ইতিহাস বদলানো যে শুরু করে, বদলে যাওয়া ইতিহাসে তার নামও কোথাও লেখা থাকে না। ভুলে যাওয়া, মুছে যাওয়া ইতিহাসের সঙ্গে তার নামটিও মুছে যায়।

সেই দেড় বছর আগে যে ইফতিকার ঘর ছেড়েছিল চোখে ইতিহাস বদলে দেওয়ার স্বপ্ন নিয়ে, তার সঙ্গে এই মাহমুদাবাদ পুলিশ স্টেশনের ইনচার্জ, সাব-ইনস্পেকটর ইফতিকার আজহার বেগের ঢের তফাত। পাকিস্তানের পুলিশ ডিপার্টমেন্ট আর তার হাল-হকিকত বাইরে থাকতে সে বুঝতে পারেনি। বুঝতে চায়ওনি। ইফতিকারের প্ল্যান ছিল নমো নমো করে এই চাকরিটা করতে করতে সেন্ট্রাল সুপিরিয়র সার্ভিসে যোগ দেবার জন্য প্রস্তুতি নেবে। প্ল্যানে যে মস্ত ভুলটা ছিল, সেটা হল, সে খেয়াল করেনি পুলিশের চাকরি ঠিক বিপিও-র চাকরির মতো নির্দিষ্ট সময় ও নির্দিষ্ট দায়িত্বের চাকরি নয়। আর পাকিস্তানি পুলিশ ডিপার্টমেন্টের ভেতরটা তো ব্যস্ত মৌচাকের মতো। অসংখ্য গোষ্ঠী কোন্দল, অসংখ্য আকচা-আকচি। এই গোয়ালে ঢুকে পড়লে পড়াশোনার পরিবেশ বা সময় কিছুই পাওয়া যায় না। তার ওপর ওর সঙ্গে যারা ট্রেনিং নিয়েছিল তারা কী সুন্দর সুন্দর শান্তিপূর্ণ পশ এলাকায় পোস্টিং পেল। বেশিরভাগই এসেছিল কোনো-না-কোনো মন্ত্রী বা সেনানায়কের সুপারিশ নিয়ে। আর সুপারিশ ছাড়া আসা ইফতিকারের ভাগ্যে জুটল এই মাহমুদাবাদ পুলিশ স্টেশন।

চানেসার গোঠের গ্যাং-ওয়ার, দিনরাত রাজনৈতিক আর সমাজবিরোধী দাদাদের চাপ, আর লিয়াকত-আশফাক কলোনিতে একটা এঁদো কোয়ার্টার— দেড় বছরেই এই বৃত্তে ঘুরতে ঘুরতে সিভিল সার্ভিস পাওয়ার স্বপ্নের রং অনেকটাই ফিকে হয়ে এসেছে।

দিনগত পাপক্ষয়ের মতোই জীবন কাটে এখানে। তারই মধ্যে দিলদারভাইয়ের বাড়ি যেদিন যাওয়া থাকে, সেদিনটা একটু অন্যরকম। কালও দিলদারভাইয়ের বাড়িতে দাওয়াত ছিল। ভাবি জোর করে গোস্ত বিরিয়ানি খাইয়ে দিল। বলল, ওর নাকি পছন্দ হবেই। গোস্ত বিরিয়ানি একদম ভালো লাগে না ইফতিকারের। কেমন বোঁটকা গন্ধ লাগে ছোট থেকেই। আম্মিজান ঈদের দিনে ওর জন্যে আলাদা করে খাসির মাংসের বিরিয়ানি বানাত! আব্বু হেব্বি খাফা হত। কিন্তু আম্মিজানের মুখের ওপর কিছু বলতে পারত না।

সকাল থেকেই অস্বস্তিতে ছিল শরীরটা। ডিউটি জয়েন করেই কিছুক্ষণের মধ্যে আগের রাতের না হজম হওয়া খাবার বমি করে তুলল ইফতিকার। এত হঠাৎ করেই বমিটা পেয়ে গেল যে দৌড়ে বাথরুমে যাবারও সময় পায়নি। তার আগেই... সেই চক্করে ইউনিফর্মেও বমি লেগেছে বেশ খানিকটা। থানার প্রচণ্ড নোংরা বাথরুমের হলদে হয়ে যাওয়া বেসিনের ট্যাপের জল খুলে সে ইউনিফর্মের জামাটা একমনে ধুচ্ছিল। গা থেকে খুলে নিয়েই। ঠিক সেই সময়ে মতিহার, কনস্টেবল মতিহার দরজায় এসে দাঁড়াল।

ইফতিকার মুখ তুলে তাকাতেই, মতিহার একটু ইতস্তত করে বলল, 'জনাব! চানেসার রেল ইয়ার্ডের কাছে একটা কতল হয়েছে। মার্ডার। ফোন এসেছে।'

চতুর্থ অধ্যায়
।। ক্যাসলিং।।

১৩ জুলাই, ২০১৮, সকাল বেলা / বারুইপুর, পঃবঙ্গ, ভারত

'চটি জোড়া কীরকম দামে দিচ্ছিস রে?'

'ফিতেসমেত নেবেন, নাকি ফিতে ছাড়া?'

'মানে? ফিতে ছাড়া চটি কী কাজে লাগবে?'

'না, মানে এস্ট্রা ফিতে নেবেন কি?'

'কত পড়বে?'

'চব্বিশ টাকা চটি আর এস্ট্রা ফিতে আট টাকা।'

'দে তাহলে!'

'এই বুলুটা দিই?'

জবাব দেবার আগেই কী একটা যেন হয়ে গেল। সবে প্যান্টের পকেট হাতড়ে খুচরো বের করার জন্যে সাইকেলের হ্যান্ডেলে রাখা ডান হাতটা পকেটে ঢোকাতে যাচ্ছিল, শামসুদ্দিন। হঠাৎ করে কোথা থেকে একটা মুশকো চেহারার লোক, বলা নেই, কওয়া নেই ঘাড়ের ওপর হুড়মুড় করে এসে পড়ল। প্রথমটায় শামসুদ্দিন ভেবেছিল কেউ পড়ে গেছে। কিন্তু মাটিতে পড়ামাত্রই লোকটা যেভাবে ওকে রাস্তার সঙ্গে চেপে ধরে হাতটা পিছমোড়া করে ধরল, তাতে বেশ চমকে গেল সে।

বারুইপুর বাজার রোববারের সকালে যথেষ্ট সরগরম এবং ভিড়ে ভিড়াক্কার। এখানে এত লোকের মাঝে যে কেউ ছিনতাই করতে পারে সেটা বিশ্বাস করতেও কষ্ট হচ্ছিল তার। ভুল ভাঙল আবার, যখন বুঝতে পারল পিছমোড়া করা হাতে খুট করে আওয়াজে চেপে বসল হাতকড়া। মাটিতে চেপে ধরে থাকা মুখটা কোনোমতে ঘষটে একপাশে ফিরিয়ে দেখতে পেল যে ছেলেটার কাছ থেকে ও চটি কিনতে যাচ্ছিল, তারও অবস্থা অনুরূপ।

ভালো করে কিছু বুঝে ওঠার আগেই একটা কালো স্করপিও এসে ঘ্যাঁচ করে ব্রেক কষল একদম সামনে। ষণ্ডাগণ্ডা জনা ছয়েক লোক ততক্ষণে ঘিরে দাঁড়িয়ে পড়েছে। ঠেলেঠুলে ওদেরকে তুলে নেওয়া হল গাড়িতে। শামসুদ্দিন এক বার মুখ খুলে বলতে গেছিল, 'এসব হচ্ছেটা কী?'

কথাটা শেষ হবার আগেই ওকে ঘাড় ধরে জোর করে নীচু করিয়ে ঠেলে তুলে দিল একটা লোক। একজন পান চিবোনো লোক বলল, 'চোপ বে কাটুয়া! এহি পে গাড় দেঙ্গে মাদারচো...'

স্করপিওর সিটে ভালো করে পেছন ঠেকানোর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই হ্যাঁচকা টানে গাড়িটা দৌড় শুরু করল।

খাসমল্লিক কাজিপাড়া অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়, বারুইপুর এলাকার অন্যতম প্রাচীন প্রাইমারি স্কুল। যদিও বছর পনেরো-কুড়ি আগে যারা এই স্কুলটা দেখেছে, ২০০৭ আর ২০১০-এ দু' দফায় সরকারি অর্থানুকুল্যে স্কুলবাড়ির কলেবর ও আয়তন দুই-ই চড়চড় করে বেড়েছে।

বারুইপুর আমতলা রোড থেকে যে রাস্তাটা উত্তর দিকে চলে গেছে কাজিপাড়া মসজিদের দিকে, সেই রাস্তাতেই মসজিদ আর ইঁদ ময়দানের ঠিক মাঝামাঝি করে এই প্রাইমারি স্কুলটি।

হালকা হলুদ রঙের বাড়ি, আর তার গাঢ় সবুজ রঙের জানলা-দরজা। যদিও এই দশ বছরে রং বেশ কিছুটা ফিকে হয়েছে। জীর্ণ হয়েছে। কালচে শ্যাওলার হালকা আস্তরণ পড়েছে বাইরের দেওয়ালে জায়গায় জায়গায়। তবু, যে দেশের বাজেটে বরাদ্দ মোট অর্থের মাত্র ০.০৩ শতাংশ ব্যয় হয় শিক্ষাখাতে, সেখানে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার একটি ছোট

শহরের উপকণ্ঠে অখ্যাত একটি প্রাইমারি স্কুল হিসেবে এই স্কুলের অবস্থা বেশ ভালোই। শামসুদ্দিন এই স্কুলেই বাংলা পড়ায়। ২০১২-তে চাকরিটা পেয়েছে। দস্তুরমতো পরীক্ষা দিয়েই।

তার আসল বাড়ি চাখুন্দি, বর্ধমানে। বাড়ি বলতে অবশ্য আধখানা গোয়ালঘর, জোড়াতালি দিয়ে খাড়া করা একটা পুঁইমাচা আর একটা টালির দোচালা ঘর। জমি ছিল। দু' ফসলি, বিঘেটাক! তা সেটা গেছে চাকরির পরীক্ষায় পাশ করার জন্য ঘুষ দিতে গিয়ে। চাকরি পাওয়ার খবর পেয়ে আম্মা খুব খুশি হয়েছিল। কিন্তু খুশি বোধহয় আম্মার নসিবে বেশিদিন সয় না। পোস্টিং-এর খবর পাওয়ার দু' দিনের মাথায় রাতের বেলা আগুন লেগে সব ছাই হয়ে গেল। ঘর, গোয়াল, পুঁইমাচা, গরুটা... আর সেইসঙ্গে আম্মাও! কী করে আগুন লাগল কেউ জানে না। তবে কানাঘুষোয় শোনা যাচ্ছিল বিরোধী দলের সমর্থক হওয়াতেই এই বিপত্তি। শামসুদ্দিনের বাবার আমল থেকেই তারা পারিবারিকভাবে একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের সমর্থক ছিল। যতদিন তারা ক্ষমতায় ছিল, ততদিন বাবার সততা তাদের পরিবারকে দারিদ্র্য ছাড়া কিছুই এনে দিতে পারেনি। ক্ষমতার পালাবদলের আগেই বাবার মৃত্যু হয়। আর পালাবদলের আগে থেকেই যখন বৃষ্টির আঁচ পাওয়া পিঁপড়েদের মতো বাসাবদল করছিল প্রায় সমস্ত পশ্চিমবঙ্গের লোক, তখন বাবার থেকে পাওয়া ওই জেদই শামসুদ্দিন আর ওর মাকে তা করতে দেয়নি। গ্রামের মাথারা, যারা কখনো এদিক, কখনো ওদিকে হেলে, ঠিক করে দেয় গ্রামের মানুষ কখন কাকে ভোট দেবে, তারা এই অবাধ্যতায় গেল রেগে। শামসুদ্দিনদের একঘরে করে দিল নিজেদের আজন্ম বাসভূমিতেই। শুরু হল সামাজিকভাবে প্রতিশোধ নেবার পালা। প্রতিশোধের সেই পদ্ধতিরই চূড়ান্ত রূপ ছিল বাড়িতে আগুন লাগানো। শামসুদ্দিন কারও কাছে কোনো অভিযোগ জানায়নি। জানিয়েই-বা লাভ কী হত? কে শুনবে? প্রমাণ ছাড়া তার কথার কীইবা মূল্য?

বাড়ি পুড়ে যাবার সপ্তাহ খানেকের মধ্যেই পড়েছিল তার জয়েনিং ডেট। বারুইপুরে খাসমল্লিক কাজিপাড়া অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। আম্মাকে গোর দিয়ে, চাখুন্দির বাস কার্যত তুলে দিয়েই শামসুদ্দিন এসে পৌঁছেছিল বারুইপুরে। প্রথমে দিন কয়েক শিয়ালদা স্টেশনের কাছে একটা সস্তার হোটেলে থেকে, ট্রেনে করে যাতায়াত করত শামসুদ্দিন। নতুন লোকের পক্ষে গঞ্জ এলাকায় বাড়ি ভাড়া পাওয়া খুব একটা সহজ কাজ নয়। তার ওপর যদি সে মুসলমান, অল্পবয়েসি ও ব্যাচেলার হয়। কিন্তু সপ্তাহ দু-একের মধ্যে সাইদুল তাকে একটা বাড়ি ভাড়া জোগাড় করে দেয়। সাইদুলের একটা চায়ের দোকান আছে ইএম বাইপাসের ধারেই। চায়ের দোকানটা ভেক মাত্র। সাইদুলের আসল রোজগার দালালি, জমিবাড়ির। বেশ করিৎকর্মা লোক। দিন দশেক সময় লেগেছিল তার, মাস্টারপাড়ায় শামসুদ্দিনের এখনকার বাসাবাড়িটা খুঁজে দিতে।

বাড়িটা স্বনামধন্য জয়দেব নস্করের। জয়দেব নস্কর নিজে বামপন্থী রাজনীতি করলেও নিজের ব্যক্তিত্ব, শিক্ষা আর রাজনৈতিক প্রজ্ঞার কারণে দলমত নির্বিশেষে সবার শ্রদ্ধেয়। পাঁচ টার্মের এমপি। পাকাপাকিভাবে দিল্লিতেই বসবাস। বাড়িতে মা থাকতেন এতদিন। নস্করবাবু বা তাঁর স্ত্রী নিয়ম করে প্রতি মাসে দু' বার আসা-যাওয়া করতেন। দু' মাস আগে মা গত হবার পর থেকে বাড়িটা খালিই পড়েছিল। বাড়িতে ভাড়াটে বসাতে নস্করবাবু একদমই রাজি ছিলেন না। ভাড়াটেদের মোটেও বিশ্বাস করেন না তিনি। তার ওপর পাঁচ বারের এমপি-র পয়সার দরকারও বিশেষ থাকে না। সাইদুল যে কী কায়দায় সে বাড়ি জোগাড় করেছিল আল্লাহই জানেন। তবে নস্করবাবু লিখিত এগ্রিমেন্ট করেছিলেন এগারো মাসের। সেই এগ্রিমেন্টও ছ' বার রিনিউ হয়ে গেল। এই ছ' বছরে আস্তে আস্তে গুছিয়ে নিয়েছে শামসুদ্দিন। প্রাইমারি স্কুলের রোজগার মন্দ নয়। এ ছাড়াও শামসুদ্দিনের বাংলা পড়ানোর সুনাম আছে এলাকায়। বাংলা-ইংরেজি, দুই মাধ্যমেরই প্রচুর ছেলে-মেয়ে তার কাছে প্রাইভেট পড়ে।

বছর দুয়েক হল একটি বিয়েও করেছে। ফাতিমা সরকারি হাসপাতালের নার্স। ওদের

পরিবার প্রায় তিন পুরুষ বারুইপুরেরই বাসিন্দা। সেই সাইদুলের মাধ্যমেই যোগাযোগ। হ্যাঁ— জমি-বাড়ির দালালির সঙ্গে সঙ্গে সাইদুল ঘটকালিও করে মাঝেসাঝে।

আজকে সকালেও বাকি রোববারগুলোর মতোই, সকাল ছ'টা থেকে পর পর দু' ব্যাচ পড়ানো শেষ করেছে শামসুদ্দিন। বেশ কয়েক সপ্তাহ পর আজকে ফাতিমারও অফ ডে। তাই প্ল্যান হচ্ছিল বারুইপুর শো-হাউসে বিকেলের শো-তে 'হামি' দেখতে যাওয়ার। টানা দু' ব্যাচ পড়িয়ে বাজারে এসেছিল শামসুদ্দিন। বাজার করতে করতেই মনে পড়ল বাথরুমে পরার চটি জোড়া ছিঁড়ে গেছে। তাই চিকেন কেনার পরে কাছারি বাজারের কোণ ঘেঁষে এই গলিটাতে ঢুকেছিল। মূল বাজারের গায়েই এই ছোট্ট গলিটাতে কিছু টেলারিং শপ, কিছু দলিল টাইপ বা জেরক্সের দোকান, একটা-দুটো মনিহারি দোকান আর একটি চায়ের দোকান। কিন্তু এই গলির আসল পণ্য হল চটি। হাওয়াই চটি। প্রতি রবিবার সকাল সাতটা থেকে দুপুর একটা পর্যন্ত এই গলি থেকে অন্তত পক্ষে হাজার দুয়েক জোড়া হাওয়াই চটি বিক্রি হয়। দামেও সস্তা। টেকসই। স্থানীয় মজুরদের ঘরে বানানো চটি অনেক কম লাভেই বিক্রি করে যায় তারা।

তো, সেখান থেকে এক জোড়া চটি কিনতে গিয়েই এই বিপত্তি।

গাড়ি ভালো করে স্পিড নেওয়ার আগেই থানা এসে পড়ল। সাধারণত কাছারি বাজার এলাকা থেকে থানাটা হাঁটা দূরত্বে পড়ে। কিন্তু ইনস্পেকটর প্রদীপ ভৌমিক কোনো রিস্ক নিতে নারাজ। বহুদিন ধরে পুরো গ্যাংটাকে ট্র্যাক করা হচ্ছে। বেআইনি অস্ত্রব্যবসার একটা বেশ বড়সড় শাখা এরা। আজ যে সময়ে কাছারি বাজারের অপারেশন চলল, প্রায় সেই একই সময়ে ডোমজুড়ে রেড হওয়ার কথা একটা প্রায় পরিত্যক্ত স্ক্র্যাপ আয়রন কারখানায়। সন্দেহ করা হচ্ছে ওটাই আর্মস বানানোর ফ্যাক্টরি হিসেবে ব্যবহার করা হত।

কাছারি বাজার সংলগ্ন ওই এলাকা থেকে আজ প্রায় বাইশ জনকে তোলা হয়েছে। বাইশ জন কনভিক্টকে রোববারের ভিড় বাজারের মধ্যে দিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে আসার বোকামি করতে প্রদীপবাবু মোটেই রাজি ছিলেন না।

গাড়ি কম্পাউন্ডে এসে থামামাত্র প্রদীপবাবু টুক করে নেমে হাঁটা লাগালেন নিজের কামরার দিকে। বাকিরা মিলে গ্রেপ্তারের পরের প্রাথমিক কাজকর্মগুলো সেরে নিতে পারবে। কিন্তু ইন্টারোগেশন শুরুর আগে, আর প্রাথমিক রিপোর্ট তৈরি করে জমা দেওয়ার আগে প্রদীপবাবুকে একটু মাথাটা ফাঁকা করতে হবে।

নিজের অফিসঘরে ঢুকে চেয়ারে বসে তিনি সামনে টেবিলে রাখা প্লাস্টিকের বোতলটা টেনে নিলেন। ছিপি খুলে প্রায় আধ বোতল জল ঢক ঢক করে এক নিঃশ্বাসে শেষ করে ফেললেন। তারপর ঘণ্টি বাজাতেই নিঃশব্দে দরজার সামনে এসে দাঁড়াল শমিত।

'রাজেশকে পাঠিয়ে দাও।'

'ওকে স্যর!'

দু' মিনিটের মধ্যে রাজেশ এসে ঘরে ঢুকল।

'রাজেশ, ইনিশিয়াল পেপারওয়ার্ক যত তাড়াতাড়ি পারো শেষ করো। ফিঙ্গারপ্রিন্ট নেওয়া, ছবি তোলা— দ্য হোল নাইন ইয়ার্ডস!' 'শিওর স্যর!'

'আমি এখানেই অপেক্ষা করছি।'

'ওকে স্যর!'

বলার পরেও রাজেশ দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। ইতস্তত করতে থাকল। প্রদীপ চোখ নামিয়েছিলেন সামনে রাখা ফাইলের দিকে। রাজেশকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে মুখ তুলে আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'কিছু বলবে?'

'বলছি স্যর— অ্যারেস্ট দেখানোর আগে এদের কয়েক জনকে আলাদা করে...'

রাজেশের ইঙ্গিত বুঝতে পেরে মাঝপথেই থামিয়ে দেন প্রদীপ, 'না না রাজেশ। একদমই না। এদের মধ্যে কয়েক জন যে নিশ্চিতভাবেই পেটি ক্রিমিনাল— তা আমি জানি।

কয়েক ঘা দিলেই হয়তো পেট থেকে কিছু কথা বেরিয়েও পড়বে। কিন্তু মাথায় রেখো, আমাদের নাকের ডগায় যারা এতদিন ধরে এই চক্রটা চালিয়েছে তাদের ক্ষমতা, প্রস্তুতি আর নেটওয়ার্ক মোটেও অবহেলা

করার মতো নয়। ওপরমহল থেকে খুব শিগিরই কিছু চাপ আসবে, এমনটাই আমার সন্দেহ। এই অবস্থায় আমি নিয়মের বাইরে একটাও স্টেপ নিতে চাই না। আমাদের জবাবদিহি করার মতো কোনো পরিস্থিতি তৈরি হলে, তখন যেন সমস্যায় না পড়ি। সুতরাং — গো অ্যাজ পার ল' -

'ঠিক আছে স্যর!'

একটু হতাশ হয়েই বেরিয়ে যায় রাজেশ। প্রদীপ সেদিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে ওঠেন নিজের মনেই।

অল্পবয়েসি ছেলে। সদ্য প্রোমোশন পেয়ে সাব-ইনস্পেকটর হয়েছে। অভিজ্ঞতার খামতিটা উৎসাহ দিয়ে পুষিয়ে দিতে চায়। প্রদীপও এমনই ছিলেন সার্ভিস লাইফের শুরুর দিকে। এখনও মনে আছে, জীবনের প্রথম রেড করতে গেছিলেন এক বেআইনি দেশি মদের ভাটিতে। রেড করতে গিয়ে উৎসাহের চোটে নিজেদের ইনফর্মারকেই তুলে এনে উত্তম-মধ্যম দিতে শুরু করেছিলেন লকআপের মধ্যে।

সেই ইনফর্মার বেচারার তো অবস্থা যাকে বলে 'এগুলে আঁটকুড়ো, পেছুলে নিব্বংশ"। মার সহ্য করার অভ্যেস চলে গেছে বেশ কিছুকাল আগে। আর নিজের দলের বাকি লোকদের সামনে নিজের আসল পরিচয়ও ফাঁস করতে পারে না। পাশে দাঁড়িয়ে থাকা আধবুড়ো কনস্টেবলটি বোধহয় কিছু একটা বলি বলি করেও চুপ করে গেছিল। সদ্য যোগ দেওয়া অফিসারবাবুকে মুরগি হতে দেখার লোভ ছিল হয়তো। কে জানে!

শেষমেশ বড়বাবু এসে প্রদীপকে ডেকে নিয়ে গিয়ে থামান।

একদিকে ইনস্পেকটর প্রদীপ ভৌমিক যখন নিজের স্মৃতিতে ডুব দিচ্ছিলেন, অন্যদিকে তখন যেন দমবন্ধ অবস্থায় আঁকুপাঁকু করছিল শামসুদ্দিন। বারুইপুর থানার পেল্লায় বড় ঘরটা যে কোনো পুরোনো আমলের সরকারি দপ্তরের মতোই দেখতে। উঁচু সিলিং। লোহার বিম থেকে লম্বা আংটা বেয়ে ঝুলে আছে ঘটাং ঘটাং শব্দ করে ঘুরতে থাকা ফ্যান। সেই সিলিং ফ্যানের আওয়াজ মোটামুটি মালগাড়ি সাইডিং-এ যাওয়ার মতো হলেও তার হাওয়া জন্মদিনের কেকের পাশে থাকা মোমবাতিও নেভাতে পারবে না।

কোনো নির্দিষ্ট প্যাটার্ন ছাড়াই এদিক-ওদিক মিলিয়ে খান ছ-সাত চেয়ারটেবিল। এককোণে প্লাইয়ের পাতলা পার্টিশন দিয়ে ঘেরা একটা জায়গা। ডিউটি অফিসারের। তার একদিকের দেওয়ালের উলটো দিকে একটা লম্বা কাঠের বেঞ্চি। সেখানেই বসে আছে শামসুদ্দিন আর তার পাশেই বসে আছে সেই চটি বিক্রেতা ছেলেটা।

চটি কেনার সময় ছেলেটার দিকে ভালো করে তাকায়নি শামসুদ্দিন। থানাতেও এতক্ষণ বসে বসে একমনে কাগজ পড়ছিল। সকালে বাড়িতে কাগজ আসে। ছুটির দিনে বাজার করে বাড়ি ফিরে, চা খেতে খেতে পড়া অভ্যেস। আজ সেটা হয়নি বলাই বাহুল্য। কাগজ পড়তে পড়তে হঠাৎই মুখ তুলে ছেলেটার দিকে তাকাল। বেশ কালো গায়ের রং। মাথায় ঘন, ঠাস বুনোট ঝাঁকড়া চুল - যাতে শেষ বার তেল বা শ্যাম্পু পড়েছিল যখন, তখনও হয়তো লোক পিসিও থেকে রাত্তির বেলা সস্তায় এসটিডি করত। উঁচু হনু, ভাঙা গাল, চোখের সাদা অংশটার বেশিরভাগেই লাল নয়তো হলুদ রঙের ছড়াছড়ি। অপরিমিত নেশা ও অপুষ্টির ছাপ। দাঁতে পান-খয়েরের ছোপ লেগে প্রায় পুরোটাই কালো। একটা জিনিস চোখে পড়তে শিউরে উঠল শামসুদ্দিন। ছেলেটার ডান দিকে বসেছিল সে। ছেলেটা এক বার চুলে হাত বোলাতেই ঝাঁকড়া চুলের বোঝা ক্ষণিকের জন্য ডান কানের ওপর থেকে সরে গেল। শামসুদ্দিন দেখতে পেল ছেলেটার ডান কানের ওপরের প্রায় ইঞ্চি খানেক অংশ নেই। সমানভাবে কাটা নয়। মনে হচ্ছে প্রচণ্ড শক্তিশালী কেউ যেন হাতে করে ছিঁড়ে নিয়েছে।

ছেঁড়া কাগজের কিনারার মতোই অমসৃণ, কর্কশ।

ক্ষতবিক্ষত ওই কানটা দেখতে দেখতে শামসুদ্দিনের বুকের ভেতর চাপ চাপ ভাবটা যেন বেড়ে উঠল। প্রায় আড়াই ঘণ্টা হতে চলেছে। ওরা দুজন আর ওদেরই গাড়িতে থাকা আরও দুজন সেই বেঞ্চিতেই বসে আছে। সামনের টেবিলে এক জন কনস্টেবল বসে। সে মাঝে মাঝে নিজের ঝিমুনির ফাঁকে এক বার করে চোখ পাকিয়ে ওদেরকে দেখছে। পাহারা বলতে এইটুকুই। শুরুতেই এক জন অফিসার এসে নাম-ধাম, পেশা লিখে নিয়ে ওদেরকে বলে গেছিল চুপ করে বসে থাকতে। বলেছিল ডাক পড়বে ঠিক সময়ে। তো, সেই ঠিক সময় এখনও এল না। বুকের ভেতর অস্বস্তিটা যে হারে বাড়ছে তাতে... এদিকে ফোনটাও কেড়ে রেখে দিয়েছে। ফাতিমাকে একটা খবরও দেওয়া হয়নি। খুব চিন্তা করবে।

শামসুদ্দিন অনেকটা মরিয়া হয়েই উঠে দাঁড়াল নিজের সিট থেকে। এগিয়ে গেল কনস্টেবলটার দিকে। ঝিমোতে থাকা পুলিশেরও মনে হয় একটা ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় কাজ করে। কী করে যেন চোখ বুজে ঝিমোতে থাকা আধবুড়ো কনস্টেবলটিও ঝট করে সজাগ হয়ে উঠল। তারপর চোখ পাকিয়ে তড়িঘড়ি নিজের চেয়ার ছেড়ে উঠে হুংকার দিল, 'অ্যাই, অ্যাই— কী হচ্ছে? এদিকে এগিয়ে আসছিস কেন হারামজাদা!' ভয়, উদ্বেগ আর রাগ মিলিয়ে গলায় রামধনুর মতো সাতরকমের আওয়াজ একসঙ্গে মিশে একটা অদ্ভুত কোঁকানো আওয়াজ বেরোয়।

চেয়ারের পাশে হেলান দিয়ে রাখা লাঠিটা তুলে নিয়ে বেশ আওয়াজ করে মেঝেতে ঠুকে উঠে দাঁড়ায় সে। শামসুদ্দিন থমকে যায়। তবু মরিয়া হয়ে গলায় কষ্ট করে স্বর ফুটিয়ে বলে ওঠে, 'আর কতক্ষণ লাগবে স্যর?'

শামসুদ্দিনের বেচারামার্কা চেহারা আর স্যর সম্বোধনে কনস্টেবলের টেনশন একটু কমে। যাক, মালটা তাহলে লুকোনো মেশিন নিয়ে গুলি চালাতে আসছিল না। একটু সাহস ফিরে আসায়, গলাটাও একটু স্বাভাবিক হয়। দ্রুত নিজের গম্ভীর মেজাজটা ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে লোকটা একটু বাড়াবাড়ি রকমের হেঁড়ে গলায় বলে ওঠে, 'বিয়েবাড়ির নেমন্তন্ন খেতে এসেছিস বলে মনে হচ্ছে নাকি? চুপ মেরে বোস ওখানে।'

'কিন্তু আমি করেছিটা কী স্যর? কিছুই তো বলছেন না।

'যখন সময় হবে, ঠিক বলা হবে।'

'দেখুন, আমি এখানকার প্রাইমারি স্কুলের মাস্টার। বাজারে এসেছিলাম। চটি কেনার দরদাম করছিলাম, আর আপনারা অন্যায়ভাবে তুলে নিয়ে চলে এলেন। তখন থেকে বসিয়ে রেখেছেন। বাড়িতে একটা ফোনও করতে দেননি। আমি কিন্তু ছেড়ে কথা...'

ঠাস করে চড়টা গালে পড়তেই শামসুদ্দিন ঘুরে গিয়ে পড়ল টেবিলের উলটো দিকে রাখা টুলটার ওপর। আধ পাক গড়িয়ে তারপর মেঝেতে উপুড় হয়ে পড়ল শরীরটা। টুলটাও ততক্ষণে ছিটকে গিয়েছে বেশ কিছু দূর। বেশ জোর আওয়াজে ইতস্তত কাজ এবং অকাজে ব্যস্ত থাকা সবাই চমকে উঠেছে। ডিউটি অফিসারের খোপ থেকে বেরিয়ে এসে দাঁড়াল রাজেশ।

মাটিতে পড়ে থাকা শামসুদ্দিনের দিকে তাকিয়েই ভুরু কুঁচকে গেল তার। ততক্ষণে শামসুদ্দিন আস্তে আস্তে উঠে বসেছে। তার ভুরুর ওপরে বেশ কিছুটা কেটে গিয়ে ঝরঝর করে রক্ত পড়ছে। রাজেশ ফিরে তাকাল কনস্টেবলের দিকে। সে বেচারি নিজেও বুঝতে পারেনি তার চড়ে এত জোর আছে। লোকটাকে ছিটকে পড়তে দেখে আর ফিনকি দিয়ে বেরোনো রক্ত দেখে তার এমনিতেই আক্কেল গুড়ুম হয়ে গেছিল। তার ওপর সাহেবের চাউনি দেখে তো আরোই নার্ভাস লাগছে। কোনোমতে তুতলে সে বলে উঠল, 'আমি... আমি... স্যার, মানে, পকেট থেকে... মানে ভাবলাম পিস্তল... লোকটা ভীষণ আজেবাজে কথা বলছিল স্যার, মানে পুলিশকে গালাগালি...'

'চুপ! পরে শুনছি। লোকটাকে তুলে আমার ঘরে নিয়ে আসুন আগে।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ স্যার! এই, এক্ষুনি যাচ্ছি।'

শামসুদ্দিনকে ধরে ধরে তুলে নিয়ে ডিউটি অফিসারের ঘরে নিয়ে যায় কনস্টেবলটি। রাজেশ ছাড়াও তার টেবিলের উলটো দিকে আরও একটি লোক ব'সে। আধময়লা গায়ের রং। মাথায় পূর্ণিমার চাঁদের আকারে টাক। মাথার পেছন দিকে বেড়ার মতো কিছুটা চুল রয়ে গেছে এখনও। গোলগাল মুখে একটি সরু গোঁফ নাকের তলায় এলিয়ে আছে। লালবাজার ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের নিশাকর ব্যানার্জি। শামসুদ্দিনকে ধরে ধরে তার পাশেই নিয়ে গিয়ে বসানো হল খালি চেয়ারটিতে। রাজেশ কনস্টেবলটিকে বলল, 'যান, ফার্স্ট এড কিট নিয়ে আসুন।'

কনস্টেবলটি একটু ইতস্তত করে। রাজেশ এবার ধমকে ওঠে, 'কী হল? যান!!'

দৌড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে এক মিনিটের মধ্যে ফার্স্ট এডের বাক্স নিয়ে ফিরে আসে কনস্টেবলটি। রাজেশ উঠে টেবিলের পাশ ঘুরে এসে দাঁড়ায় ঠিক শামসুদ্দিনের পাশে। টেবিলে থাকা জলের গ্লাস থেকে হাতের আঁজলা করে জল নিয়ে যত্ন করে ধুইয়ে দিতে থাকে কপালের রক্ত। তারপর ফার্স্ট এড বক্স থেকে তুলো নিয়ে সেটা ডেটলে ভিজিয়ে ক্ষতস্থানে চেপে ধরে। শামসুদ্দিনের মুখটা অল্প বেঁকে গেল জ্বালায়। রাজেশ মুখ নামিয়ে শামসুদ্দিনের কাছাকাছি এনে জিজ্ঞেস করল, 'লাগছে না তো?'

'একটু জ্বালা করছে স্যর!'

'ওহ! আচ্ছা!' বলে তুলো সরিয়ে রাজেশ ফুঁ দিতে লাগল আলতো করে। জ্বালাতে একটু আরাম হলেও শামসুদ্দিন একটু চমকে গেল। পুলিশের যে এরকম হাবভাব হয় তা কোনোদিন কারও কাছে শোনেনি। রাজেশ হঠাৎই আলতো করে জিজ্ঞেস করল, 'আয়ুবমাস্টারকে কী করে চিনলেন মাস্টারমশাই?'

'কাকে?' একটু হতভম্ব হয়েই প্রশ্নটা করল শামসুদ্দিন। 'আর গোপী দত্তকেই-বা কতদিন চেনেন?'

'কী বলছেন ঠিক বুঝতে পারছি না স্যর!'

'ওহ! তাই নাকি?' রাজেশের মুখে একটু হাসি। একটু থেমেই সে আবার বলে, 'ঠিক আছে। আপাতত আপনার আঙুলের ছাপ নেব আমরা। আর কিছু ফটো তুলব।'

নিশাকরবাবু দ্রুত নিজের সামনে বিছিয়ে রাখা ইংকপ্যাড আর ফিঙ্গারপ্রিন্ট কালেক্ট করার ফিল্ম নিয়ে কাজে লেগে পড়লেন। দু' হাতের দশ আঙুলের ছাপ নেওয়া শেষ হল। শামসুদ্দিন নিজের হাতের কালিমাখা আঙুলের ডগাগুলোর দিকে তাকিয়ে বসেই রইল। এখনও সে জানে না তাকে ধরে নিয়ে আসা হয়েছে কেন। প্রায় দু-তিন মিনিটের নীরবতার পরে রাজেশ আবার কথা বলে উঠল। তবে শামসুদ্দিনকে নয়।

'নিশাকরবাবু, আপনার কাজ শেষ?

'হ্যাঁ। এখনকার মতো।'

'বেশ। তাহলে মাস্টারমশাই, আপনি একটু আমার সঙ্গে আসুন।'

রাজেশ শামসুদ্দিনকে নিয়ে ওসি-র ঘরে যখন ঢুকল তখন প্রদীপবাবু টেবিলে একটি ফাইলের ওপর ঝুঁকে গভীর মন দিয়ে কিছু দেখছিলেন। চশমা প্রায় নাকের ডগায় চলে এসেছে। প্রায় কুড়ি-পঁচিশ সেকেন্ড দাঁড়িয়ে থাকার পরেও যখন প্রদীপ মুখ তুলে তাকালেন না, তখন রাজেশ বাধ্য হয়েই একটু গলাখাঁকারি দিল। প্রদীপ একটু সচকিত হয়ে তাকালেন চোখ তুলে।

'ওহ, রাজেশ, তুমি!'

'হ্যাঁ স্যর!'

'বলো।' অপাঙ্গে এক বার শামসুদ্দিনের দিকে তাকিয়ে প্রদীপ আবার চোখ নামালেন সামনে রাখা ফাইলে।

'স্যর — ইনি শামসুদ্দিন আলম! খাসমল্লিক কাজিপাড়া অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের টিচার। ওই 'বিশালাক্ষী ধর্ম কাঁটা' আছে না, ওরই একটু আগে স্কুলটা। উনি

বাজারে এসেছিলেন। সেখানেই একটি চটি বিক্রেতার কাছে চটির দরদাম করছিলেন। আমরা ভুল করে ওনাকে ধরে এনেছি। ওনার প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ আর প্রসেসিং হয়ে গেছে। আপনার কাছে এলাম, ওনাকে ছেড়ে দেওয়া যাবে কিনা জানতে।'

প্রদীপ একটু ক্লান্তভাবে চোখ থেকে চশমা নামিয়ে রাখলেন সামনে খুলে রাখা ফাইলের ওপর। তারপর ধীরে ধীরে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার আর ওনার থেকে জানার কিছু নেই তো?'

'না স্যর।'

'শামসুদ্দিনবাবু, আপনার চোট লাগল কী করে?'

রাজেশ কিছু বলার আগেই শামসুদ্দিন শশব্যস্ত হয়ে বললেন, 'ও কিছু না স্যর! ও কিছু না।'

'ওকে। আপনাকে জানিয়ে রাখি, এই অঞ্চলে বিগত কয়েক মাস ধরেই খবর পাওয়া যাচ্ছিল বেআইনি ওয়েপন্স ডিলিং-এর। আমরা নজর রেখেছিলাম। আজকে তাদেরই একটা বড় দলকে ধরতে সমর্থ হয়েছি আমরা। এরা বেসিক্যালি চটি কেনাবেচার ধান্দার আড়ালে চালাচ্ছিল ব্যবসাটা। সেই সংক্রান্ত একটা রেইডের সময় দুর্ভাগ্যজনকভাবে আপনিও ছিলেন ওই জায়গায়। আশা করি আপনি বুঝবেন, এইরকম ক্ষেত্রে একটু-আধটু ভুল বোঝাবুঝি হতেই পারে। আপনার অসুবিধের জন্যে আমি সত্যিই খুব দুঃখিত!'

প্রদীপের গলা যান্ত্রিক মোটেও শোনাচ্ছিল না। অন্যমনস্ক শোনাচ্ছিল। কিন্তু শামসুদ্দিনের ওসব দিকে খেয়াল করার সময় নেই। সে তখন ছাড়া পেলে বাঁচে। প্রদীপের কথা শেষ হতে-না-হতেই সে বলে ওঠে, 'সে তো বটেই স্যর! সে তো বটেই। আমি তাহলে এখন আসি, স্যর?'

'হ্যাঁ, আসুন।'

শামসুদ্দিন তদ্দণ্ডে পেছন ফিরে হনহন করে হাঁটা লাগাতে যেতেই রাজেশ মনে করিয়ে দেয়, 'আপনার ফোনটা ওই কনস্টেবলটির কাছেই রাখা আছে। রেজিস্টারে সই করে কালেক্ট করে নেবেন।'

'ও, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই!' একটু থমকেই আবার হাঁটা দেয় শামসুদ্দিন। সে চোখের আড়ালে যেতেই রাজেশ আবার প্রদীপের দিকে ঘুরে দাঁড়ায়, 'স্যর— আমি লোকটাকে একটু নজরে রাখতে চাই।'

'কেন?'

'তা জানি না স্যর! কিন্তু আমার কীরকম একটা লাগছে।'

'মানে?' ভুরু কুঁচকে যায় প্রদীপের।

'স্যর, প্রতিমদা লোকটাকে রেগে গিয়ে একটা থাপ্পড় মারে। আর লোকটা ঘুরে পাক খেয়ে গিয়ে টুলটার ওপর পড়ল। আমার চোখের সামনে। স্যর, প্রতিমদার চুয়ান্ন কেজি ওজন। লাস্ট বার যখন থাপ্পড় মেরেছিল, একটা কাঠপিঁপড়েকে— সে ব্যাটা মুচকি হেসে এক বার পেছন ফিরে তাকিয়ে চলে গেছিল। আমার নিজের চোখে দেখা। সেখানে এরকম শক্তপোক্ত চেহারার লোক ওইভাবে ডিগবাজি খেয়ে পড়ে যাওয়াটা আমার কেমন অস্বাভাবিক লেগেছে।'

'একটু বেশি পেঁচিয়ে ভাবছ মনে হচ্ছে! অপ্রস্তুতে মার খেলে ওরকম তো হতেই পারে।'

'স্যর, আমি ওর পড়ে যাওয়াটা দেখেছি। ঠিক বলে বোঝাতে পারব না। বাট মনে হল যেন ডাইভ খেলো।'

'তাই যদি হয়ে থাকে, তাতেই-বা কী?'

- 'স্যর, লোকটা আড়াই ঘণ্টা বসেছিল। এক বার বাথরুমেও যেতে চায়নি। বউকে ফোন করতে চায়নি। কোনো কান্নাকাটি, কোনো হাতে-পায়ে ধরা মানে সাধারণত পুলিশ ধরলে লোকজন যা করে থাকে, তার কিছুই না। প্রথম রিয়্যাকশন হল, যখন ডিডি থেকে

নিশাকরবাবু ঢুকলেন, তার পরে পরেই। যদিও আমি আঙুলের ছাপ নিয়ে নিয়েছি, কিন্তু আমার মনে হয়েছে লোকটা আঙুলের ছাপ দিতে চাইছিল না। তাই ইচ্ছে করে গণ্ডগোল বাধিয়ে, মার খাবার অ্যাক্টিং করে, কেটে পড়তে চাইছিল।'

‘কেন? এরকম কেন করবেন উনি?’

‘স্যর— যদি এই লোকটা এই দলের কোনো পাণ্ডা হয়, যে অসাবধানতাবশত ধরা পড়ে গেছে...'

ভারী প্রশ্নটা ঘরের নিস্তব্ধ বাতাসে ঝুলে রইল বেশ কিছুক্ষণ। অবশেষে প্রদীপ নীরবতা ভাঙলেন, 'দেখো রাজেশ, তুমি ভালোমতোই জানো আমাদের ওয়ার্কফোর্স কম। যা দরকার, তার তিন ভাগের এক ভাগ দিয়ে কাজ চালাতে হয়। তোমার রিজনিং-এ আমি কংক্রিট কিছু এখনও পাচ্ছি না, যার জন্যে আমি একটা ওয়াচার লাগাতে চাইব। অফিসিয়ালি আমি কিছু হেল্প করতে পারব না।' একটু অর্থবহ পজ দিয়ে তারপর প্রদীপ বললেন, ‘বুঝেছ?’

‘হ্যাঁ স্যর! আসি তাহলে। বাকি কাজগুলো শেষ করি।' ‘এসো।”

চলে যেতে গিয়েও কী মনে করে রাজেশ ফিরে দাঁড়ায় আবার, আপনাকে কেমন অন্যমনস্ক লাগছিল। এনি প্রবলেম? ‘স্যর-

‘নাহ, তেমন কিছু না। সামনেই হাই প্রোফাইল ভিজিট আছে কলকাতায়। রুটিন অ্যালার্ট জারি হয়েছে— অ্যাম্বার। তাই ভাবছি, আবার যত্ত ফালতু ঝামেলা!!’

মোবাইল ফোন আর সাইকেল নিয়ে শামসুদ্দিন থানা থেকে বেরিয়ে ঘড়ি দেখল, প্রায় দুটো বাজে। তারপর এগিয়ে গেল মোড়ের মাথায় গম ভাঙানোর কলটার দিকে। গমকলের পাশেই একটা বহু পুরোনো ভাঙাচোরা ধুলোয় ধুসকুড়ি দোকান। খুব ঠাহর করে দেখলে মালুম হয়, সেটা এককালে একটা পিসিও ছিল। মোবাইল, ফ্রি সিমকার্ড আর আনলিমিটেড টকটাইমের জমানায় আবছা মনে পড়ে, একসময় পাড়ার মোড়ে মোড়ে এই ধরনের বুথের রমরমা ব্যবসা ছিল। রাত দশটার পরে লোকে ভিড় জমাত দূর দেশে চাকরি করা বা পড়তে যাওয়া ছেলে, বিয়ে হয়ে বাইরে থাকা মেয়ে-জামাই বা অন্য আত্মীয়দের সস্তার কল রেটে এসটিডি করতে।

পিসিও-তে এক জন বুড়ো মতো লোক বসে, একটি ল্যান্ডলাইন আগলে। চোখে ডাঁটি ভাঙা চশমা, যার কাচ বোতলের ভাঙা টুকরোর মতো মোটা। একটা হাত বাঁকা, পেছন দিকে অদ্ভুতভাবে মুচড়ে ঘুরে আছে। মুখটাও পাকাপাকিভাবে উলটো দিকে বাঁকা। ঢুকেই শামসুদ্দিন খুব চেনা, সহজ গলায় ডাকল, ‘পরেশদা,

একটা ফোন করব।' ‘এসটিডি?’

'হ্যাঁ।'

‘তুমিই ডায়াল করে নাও।'

অভ্যস্ত হাতে ডায়াল করে শামসুদ্দিন। ওপাশে কেউ একজন ফোন তুলতেই, বলল, ‘ঈদের চাঁদ একসঙ্গে দেখব। মুবারক ভাইজান!’

পঞ্চম অধ্যায়
।। ওপেনিং গেম।।

১৯ জুলাই, ২০১৮, ভোর বেলা / নিউ দিল্লী, ভারতবর্ষ

ভোর বেলা উঠতে বরাবরই বিরক্তি লাগে অরুণের। এই বাহান্ন বছর বয়েসে পৌঁছে তো আরোই। আর্থারাইটিস, ইউরিক অ্যাসিড, সুগার, কোলেস্টেরল— সবই এক এক করে বাসা বেঁধেছে। ঘুম এমনিতেই কমে গেছে। যা যতটুকু হয় এই ভোরের দিকেই। এই ঘুমটা ছাড়তে চান না বলেই অফিসের কাছাকাছি একটু বেশি খরচ করেই ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়েছেন। রোজ আটটায় ঘুম থেকে উঠলেই চলে। অনায়াসে তৈরি হয়ে নটার মধ্যেই অফিসে পৌঁছে যাওয়া যায়। বুড়োবুড়ির সংসারে বেশি ঝামেলা নেই। তায় আবার আজকে তিনি ছুটি নিয়েছিলেন। মোটেও এত ভোরে ঘুম থেকে ওঠার কোনো ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে নিজের ইচ্ছেঅনিচ্ছে বেশি খাটানো যায় না।

যদি আপনার ফোন ভোর পাঁচটায় বেজে ওঠে, আর ফোন তুলে ফোনের অন্য প্রান্তে র-এর (রিসার্চ অ্যান্ড অ্যানালিটিক্যাল উইং) পাকিস্তান ডেস্কের জয়েন্ট সেক্রেটারির গলা শুনতে পাওয়া যায়, তাহলে ঘুম ভেঙে যেতে বাধ্য। বিশেষ করে আপনি যদি এমন এক জন রিসার্চ অ্যানালিস্ট হন, যার প্রায় পনেরো বছরের অ্যানালিস্ট জীবনে সাকুল্যে দু' বার জয়েন্ট সেক্রেটারির সঙ্গে মুখোমুখি দেখা হয়েছে, আর কথা হয়েছে মাত্র এক বার।

আজ ভোরে অরুণের সঙ্গে ঠিক তাই-ই হয়েছে। ফোন বাজতে গিন্নি একটু বিরক্তই হয়েছিলেন। পাছে তাঁর ঘুমটি পাকাপাকিভাবে ভেঙে যায়, আর তার জের সারাদিন অরুণকেই সামলাতে হয়— তাই তাড়াহুড়ো করে উঠে বেডসাইড টেবিলে রাখা ফোনটা তুলে কানে চেপে ঘর থেকে বেরোতে বেরোতেই অরুণ বলেন, 'হ্যালো!'

'অরুণ সচদেভ?' এই করাত চেরা গলার আওয়াজটি বিলক্ষণ চেনা অরুণের।

'ইয়েস স্যর!' ফোনের এপারে অদৃশ্য থেকেও তটস্থ হয়ে যান অরুণ। 'ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের অফিসটা চেনেন?'

'হ্যাঁ স্যর! নিশ্চয়ই। সর্দার প্যাটেল ভবন তো?'

'ইয়েস! এক ঘণ্টার মধ্যে সেখানে এসে আমার সঙ্গে মিট করুন।'

গ্যাস ওভেনে সসপ্যান। চায়ের জল ফুটতে থাক। বাথরুমে গিজার চালু। দাড়ি কামাতেই হবে। ছুটির দিনের কুঁড়েমি মাটি। চায়ে চুমুক দিতে দিতে তড়িঘড়ি খবরের কাগজের পাতায় চোখ বোলানো।

তিন রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের দামামা বেজেছে। কাগজের এক্সপার্ট অ্যানালিস্টদের ধারণা শাসকদলই জিতবে। প্রধানমন্ত্রীর ইমেজ তাদের বিধানসভা ভোটে রাজ্যেও জিতিয়ে আনবে। পড়তে পড়তে একটু মুচকি হাসেন অরুণ।

ততক্ষণে চায়ের জল ফুটতে শুরু করেছে। ফুটন্ত জল নামিয়ে চা-পাতা দিয়ে ঢাকা দিয়ে রাখলেন। চট করে স্নান। চায়ের সঙ্গে দুটো ক্রিম ক্র্যাকার! শার্ট না টি-শার্ট, অবশ্যই শার্ট। সাদা এবং ইস্ত্রি করা। কালো প্যান্ট। টাই—না, থাক। ছুটির দিনে অত ফর্মাল হবার কী আছে?

অ্যালার্ম ক্লকের টাইমটা সাড়ে সাতটায় সেট করে, দরজার পাশে ছোট্ট কাঠের টুলের ওপর রাখা বোল থেকে গাড়ির চাবি নিয়ে যখন অরুণবাবু বেরোচ্ছেন ঘর থেকে, তখন ঘড়িতে পাঁচটা পঁয়তাল্লিশ!

এত ভোর বেলা রাস্তায় ভিড় থাকে না। ইন্ডিয়া গেটকে ডান পাশে রেখে অশোকা রোড ধরে সোজা বেরিয়ে গেলে মিনিট পনেরোর বেশি লাগার কথা নয় সর্দার প্যাটেল চৌক পৌঁছোতে। চৌকের আইল্যান্ডকে বেড় দিয়ে, আড়াআড়িভাবে কেটে বেরিয়ে যাওয়া সংসদ মার্গকে এড়িয়ে সোজা অশোকা মার্গ ধরেই ডান দিকে সর্দার প্যাটেল ভবন।

ভবনের গেট দিয়ে ঢুকতে যাওয়ামাত্রই বাধা। সিকিউরিটি গার্ড আটকে দিল। পকেটে

আইকার্ড আছে বটে। কিন্তু মানবসম্পদ উন্নয়ন দপ্তরের কর্মচারীর কার্ড দিয়ে এই আলিবাবার গুহার দরজা খুলবে না হয়তো। সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে পকেট থেকে ফোন বার করে রিং ব্যাক করতে যাবেন, তার আগেই অরুণের নজরে এল সিকিউরিটি অফিস থেকে একটি ইউনিফর্মধারী বেরিয়ে আসছে বেশ তড়িঘড়ি। এসেই সে গাড়ি আটকে রাখা লোকটিকে চাপা স্বরে কিছু বলল এবং সঙ্গে সঙ্গে দুজনেই সসম্ভ্রমে সরে দাঁড়াল।

চোখের ইশারায় খুলে গেল স্বয়ংক্রিয় গেট। গাড়ি গেট পেরোনোর সময়, একজন দেখিয়ে দিল বাঁ-দিকে ঘুরেই পার্কিং লট। ভবনের সামনেটা প্রায় অর্ধচন্দ্রাকৃতি। পেছন দিকে একটি চৌকোনা অংশ একটু উদ্ভটভাবেই জুড়ে আছে মূল বিল্ডিং-এর সঙ্গে। দেখে মনে হবে এই অংশটির পরিকল্পনা আগে থেকে ছিল না। যেন হঠাৎ খেয়াল বা প্রয়োজন পড়াতে কেউ জুড়ে দিয়েছে, পিঠে কুঁজের মতো।

কিছুদিন আগে পর্যন্ত এই ভবন থেকে পঞ্চায়েত মন্ত্রক, স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যান্ড প্রোগ্রাম ইমপ্লিমেন্টেশন-এর ডিপার্টমেন্ট এবং আরও তিন-চারটি গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রক পরিচালিত হত। খুব সম্প্রতি নিরাপত্তা বিষয়ক ক্যাবিনেট কমিটি প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদনসহ, জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদ ছাড়া অন্য সমস্ত মন্ত্রককে অন্যত্র স্থানান্তরিত করেছে। এখন এই ভবনটি পুরোপুরি জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের দখলে।

গাড়ি পার্কিং লটে দাঁড় করিয়ে দরজা খুলে মাটিতে পা রাখামাত্রই সামনে পরিচিত মুখ দেখতে পেয়ে গেলেন অরুণ। পাকিস্তান ডেস্কের সিনিয়র চিফ অ্যানালিস্ট— নীতিন কারমালকার! অরুণের চেয়ে বয়সে বেশ খানিকটা ছোটই হবে। হয়তো কর্মকুশলতাতেও পিছিয়েই! কিন্তু সরকারি যে কোনো অফিসেই পদোন্নতির জন্য কর্মকুশলতা ছাড়াও আরও অনেকরকম গুণের দরকার হয়।

নীতিন অ্যানালিস্ট হিসেবে খুবই সাধারণ মানের হলেও অফিসের আভ্যন্তরীণ রাজনীতি আর হাওয়াবদলের সঙ্গে মানিয়ে চলতে এবং তার সুবিধে আদায় করে নিতে অত্যন্ত পটু। এই ধরনের মানুষকে একটু বিরক্তিকর লাগে অরুণের। সারাজীবন ধরে তিনি স্কিল আর এক্সেলেন্সকেই গুরুত্ব দিয়ে এসেছেন। ম্যান ম্যানেজমেন্ট বা সোজা বাংলায় বসকে তেল মারা ও সহকর্মীদের চুকলি করা অরুণের আসে না। এই না পারার মাশুল যদিও তিনি নিজের সারা কেরিয়ার জুড়ে দিয়ে এসেছেন। নাহলে আজ পাকিস্তান ডেস্কের বেস্ট অ্যানালিস্ট হয়েও তাঁকে চুকলিখোর নীতিনের তাঁবেদারি করে যেতে হত না।

এরকম তিক্ততা সত্ত্বেও নীতিনকে দেখে তাঁর কোথাও একটু যেন স্বস্তি হল। সারাজীবনে তিনি উঁচু মহলের এত কাছাকাছি কখনো আসার সুযোগ পাননি, দুএকটা ছুটকোছাটকা অফিস পার্টিতে শুকনো হাই-হ্যালো ছাড়া। তাই সকালে জয়েন্ট সেক্রেটারির কলটা পাবার পর থেকেই ভেতরে একটা উদ্বেগ কাজ করছিল। কী এমন করলেন তিনি, যে একেবারে এত ওপরতলা থেকে তলব! কুরে কুরে খাওয়া এই উদ্‌বেগটা যেন একটু হলেও কমল চেনা মুখ দেখার পরে। যতই তা অপছন্দের হোক না কেন। কী আশ্চর্য মানুষের এই মন! ভাবতে ভাবতেই নীতিনকে উইশ করলেন তিনি, 'গুড মর্নিং স্যর!'

'গুড মর্নিং অরুণ! মিঃ সেক্রেটারি লবিতেই তোমার জন্য অপেক্ষা করছেন। যাও। অল দ্য বেস্ট!'

'যাও মানে? আপনি যাবেন না?' হকচকিয়ে যায় অরুণ।

'নাহ! দে ওয়ান্ট টু টক টু ইউ! নট মি, নট এনিবডি এলস!'

একটু কি বিরক্তি আর অসূয়া প্রকাশ পেল গলায়? অস্বস্তিকর চিন্তাটাকে বাড়তে না দিয়ে ঝেড়ে ফেলে, অরুণ আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'বুঝলাম না। আপনি এখানে আছেন, তাও আপনি ভেতরে যাবেন না?'

'আমি এখানে এসেছিলাম, তুমি আসছ সেটা নিশ্চিত করার জন্য। অ্যাপারেন্টলি দে থিংক ইউ মাইট হ্যাভ গন নার্ভাস অ্যান্ড স্কিপ দ্য মিটিং অলটুগেদার। সো, টু এনশিওর ইউ আর কামিং... এনিওয়ে, ভেতরে যাও। গেলেই বুঝতে পারবে।'

'ওকে স্যর!' একটু অন্যমনস্কভাবে মাথা নেড়ে পা বাড়ান অরুণ। পেছন থেকে আবার নীতিনের গলা ভেসে আসে, 'বাই দ্য ওয়ে, অরুণ— এই মিটিং এর রিপোর্ট আমার সোমবার সকালে আমার ডেস্কে চাই। মনে রেখো, ইউ স্টিল রিপোর্ট টু মি।'

অরুণ অন্যমনস্কভাবেই ঘাড় নাড়েন। কীরকম গোলমেলে লাগছে। ভারতের যে কোনো সরকারি প্রতিষ্ঠানের মতোই র-ও প্রাতিষ্ঠানিকতা মেনে চলে অক্ষরে অক্ষরে। সেখানে তাঁর বসকে টপকে তাঁকে ডেকে পাঠানো, এবং বসকে ইচ্ছে করে লুপের বাইরে রাখা— নাহ, রোজের রুটিনের সঙ্গে মিলছে না।

মনে খুঁতখুঁতুনি নিয়ে লবিতে ঢুকলেন অরুণ। ভেতরটা এখনও ফাঁকা। রিসেপশনে কেউ নেই। ছুটির দিন। দিনের শুরুও ঠিক করে হয়নি এখনও। তাই পুরো লবি ফাঁকা, শুনশান। থমকে গিয়ে একটু এদিক-ওদিক তাকালেন অরুণ। তখনি চোখে পড়ল একটি মাথা। বিশাল লবির এককোণে, একটি পিঠউঁচু সোফার থেকে উঁকি দিচ্ছে একটি মাথা। ঘন রঙের সোফার সঙ্গে কালো চুল প্রায় মিশে থাকায় প্রথমে নজরে পড়েনি।

পায়ে পায়ে এগিয়ে কাছাকাছি যেতেই, সেই অদ্ভুত চেরা গলা বলে উঠল, 'আসুন অরুণবাবু! বসুন। আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছি।'

কথা ক'টি তিনি বললেন হাতে ধরা 'দ্য হিন্দু'-র এডিটোরিয়াল পেজ থেকে চোখ না সরিয়েই। অরুণ নিঃশব্দে বসলেন পাশের সিঙ্গল সোফায়।

টিক টিক টিক— বড় পুরোনো আমলের দেওয়াল ঘড়ির কাঁটার আওয়াজ বাজতে থাকল অস্বস্তিকর নীরবতার মধ্যে। প্রায় মিনিট পাঁচেক বাদে মুখ তুললেন রবিন ম্যাথিউ! র-এর পাকিস্তান ডেস্কের জয়েন্ট সেক্রেটারি।

প্রায় আটান্ন বছর বয়েস। বেঁটে। মোটা। গোল মুখে বয়েসের সঙ্গে সঙ্গে এদিকে-ওদিকে ঝুলে পড়েছে অনাকাঙ্ক্ষিত মাংস। মুখটা অনেকটা কোলা ব্যাঙের মতো। চোখ দুটি নিষ্প্রভ। দেখে মনে হবে কোনো বুদ্ধির দীপ্তি নেই তাতে। এবং ডাহা ভুল মনে হবে।

রবিন ম্যাথিউ কেরিয়ার স্পাই। শুরু আইবি দিয়ে। তারপর ফরেন সার্ভিস। মস্কো, প্রাগ, কাবুল এবং শেষে ইসলামাবাদ ভারতীয় হাই কমিশনে কালচারাল অ্যাটাশে হিসেবে প্রায় বছর সাত-আট। পোস্টিং-এর বহর থেকে বোঝা যায়, জীবনের বেশিরভাগ সময় জটিল এবং স্পর্শকাতর দায়িত্ব সামলে এসেছেন। র-তে আসার পরে ডেপুটি ডাইরেক্টর হওয়ার সুযোগও ছিল। কিন্তু ডেস্কে বসে পলিসি বানানো আর বাজেট অ্যাপ্রুভ করা পোষাবে না বলেই পাকিস্তান ডেস্কের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। দীর্ঘদিন আফগানিস্তান আর পাকিস্তানে কাজ করার সুবাদে এবং মস্কোতেও কিছু দুর্দান্ত নেটওয়ার্ক তৈরি করতে পেরেছিলেন বলে— এক অর্থে রবিন ম্যাথিউ ছিলেন র-এর প্রাইজ রিক্রুট!!

এইরকম একটা লোকের সামনে বসে অস্বস্তি ক্রমশ বেড়েই যাচ্ছিল অরুণের। তাকে কিছুটা রেহাই দিতেই মিঃ ম্যাথিউ বলে উঠলেন, 'চলুন, যাওয়া যাক।'

'ঠিক কোথায় আমরা যাচ্ছি স্যর?' সাহসে ভর করে প্রশ্নটা করেই ফেলেন অরুণ।

'চলুন না। গেলেই দেখতে পাবেন।' এক টুকরো মুচকি হাসি ছুড়ে দিয়ে সোফা থেকে উঠে মিঃ ম্যাথিউ হাঁটা লাগালেন লিফটগুলোর দিকে। পেছন পেছন হাঁটা লাগালেন অরুণ সচদেভও।

লিফটে করে তিন তলায়। নামতেই শীতল অভ্যর্থনা জানায় শুনশান করিডোর। এই অফিসে আগে কখনো আসেননি অরুণ। লোকমুখে বহু কথা, প্রবাদ শুনেছেন। তার মধ্যে কতটা গুজব আর কতটা সত্যি, তা বলা শক্ত।

এখন এই নিঃস্তব্ধ করিডোরে নিজের পায়ের আওয়াজের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এগিয়ে যেতে যেতে সেই সব উড়ো কথা মনে পড়ছিল অরুণের। এই অফিসেই বসতেন দোর্দণ্ডপ্রতাপ ব্রজেশ মিশ্র। ১৯৫১-তে ইন্ডিয়ান ফরেন সার্ভিস। ১৯৬২-র চীন যুদ্ধের পরবর্তী স্পর্শকাতর সময়ে বেজিং-এ পোস্টিং। অটল বিহারী বাজপেয়ী যখন দিল্লির মসনদে, তখন ইনিই ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি। এই পদে বাজপেয়ীর বিশ্বস্ত ডানহাত

হিসেবে তিনি হয়ে ওঠেন প্রভূত ক্ষমতাশালী। অনেক ক্যাবিনেট মিনিস্টারের চেয়েও দিল্লির রাজনীতির অলিন্দে তাঁর প্রভাব ছিল অনেক বেশি।

বাজপেয়ীর প্রধানমন্ত্রীত্বেই ১৯ নভেম্বর, ১৯৯৮ জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদ বা ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের গোড়াপত্তন। মূলত জাতীয় নিরাপত্তা বিষয়ক ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীকে পরামর্শ দেবার জন্যই এই দপ্তর গঠন করা হয়। জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা, তাঁর সহকারী, প্রতিরক্ষামন্ত্রী, বিদেশমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং অর্থমন্ত্রী এই পরিষদের সদস্য। এই প্রাতিষ্ঠানিক গঠন, নিয়ম-কানুন, কাজ করবার ধরন— এর অনেকটাই, সম্ভবত পুরোটাই সেই প্রবাদপ্রতিম ব্রজেশ মিশ্রর অবদান।

উচ্চতম অলিন্দে যাঁদের বিচরণ— এই ভবন তাঁদেরই বিচরণভূমি। সেই জায়গা দিয়ে হেঁটে যেতে যেতে আজীবন ডেস্ক অ্যানালিস্ট অরুণের গায়ে কাঁটা দিচ্ছিল থেকে থেকে।

‘আসুন অরুণবাবু, এইখানে। আসুন।'

একটি সাধারণ দেখতে কাঠের দরজায় নক করে, একটু অপেক্ষা করলেন মিঃ ম্যাথিউ। তারপর বললেন, ‘আসুন।’

ভেতরে ঢুকেই প্রথমে যেটা চোখে পড়ল অরুণের তা হল একটা বিশাল ডেস্ক। কাঠের। ওপরে কাচের বড় স্ল্যাব দিয়ে চাপা দেওয়া। কী কাঠ— অরুণ অতশত চেনেন না। তবে ডেস্কের ওপারে যে মানুষটি বসে আছেন, তাঁকে অরুণ বিলক্ষণ চেনেন। আসলে তাঁকে ভারতের প্রায় প্রত্যেক শিক্ষিত মানুষ চেনেন। প্রধানমন্ত্রীর প্রতিটা সফরে, প্রতি ভাষণে, প্রতি স্টেজ উপস্থিতি আর প্রতি সাক্ষাৎকারে এঁর নীরব উপস্থিতি থাকে। দূরদর্শনের পর্দায় চোখ রাখলেই দেখা যায়।

কিন্তু পর্দায় দেখা একরকম, আর টেবিলের উলটো দিকে সশরীরে বসে থাকা অবস্থায় কাউকে দেখা আর একরকম।

ময়লাটে গায়ের রং। পাকানো দড়ির মতো চেহারা। মাথার সব চুল সাদা। গোঁফও। কিন্তু চৌকো চোয়াল আর ঝিকমিক চোখের মণিতে বয়সের ছাপ পড়েনি এখনও অতটা। পরনে কড়া ইস্ত্রি করা সাদা পুরো হাতা শার্ট আর কালো ফর্মাল ট্রাউজার্স।

‘আসুন মিঃ ম্যাথিউ। আসুন মিঃ সচদেভ!’

বিশাল ডেস্কের ওপার থেকে গমগমে আওয়াজে ডেকে উঠলেন ভারতের ত্রয়োদশ জাতীয় নিরাপত্তা বিষয়ক উপদেষ্টা! এক বছরও হয়নি, প্রোমোটেড হয়ে প্রধানমন্ত্রীর আপ্ত সহায়ক থেকে প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি ও ন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যাডভাইজর হয়েছেন রঘুনাথ শেখরণ!

ষষ্ঠ অধ্যায়
।। অ্যাক্টিভেটিং দ্য স্লিপিং পন।।

৩০ মে, ২০১৮, গভীর রাত্রি / নিউ দিল্লী, ভারত দূর থেকে দেখলে সবুজ গালচের মতো লাগে মাঠটা। কিন্তু এখন, এই ঘাসের ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে খুব কাছ থেকে দেখে প্রত্যেকটা ঘাসের শরীর আলাদা করে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। এখন আর তত সংঘবদ্ধ, জমাট লাগছে না ওদের। সবাই কেমন আলাদা আলাদা। ব্লেডের মতো সবুজ এবং ধারালো এই সব ঘাসের পাতায় শিশিরদানার মতো লেগে আছে কিছু কালচে লাল বিন্দু। প্রায় জমাট বেঁধে যাওয়া ঘন রক্ত। একটি-দুটি করে পিঁপড়ে আস্তে আস্তে জড়ো হচ্ছে। ভাবছে এটা কোনো খাবারের গন্ধ। চশমাটা চোখ থেকে খুলে গেলেও সব স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে সে। দূরে হাওড়া ব্রিজের পেছনে অস্ত যাচ্ছে সূর্য। অস্ত যাবার আগে সে যেন তীব্র আলোর বর্শায় শেষ বারের মতো বিদ্ধ করছে কোনো প্রাগৈতিহাসিক জন্তুকে।

সেই হত্যালীলাকে আড়াল করে এক জোড়া পা এসে দাঁড়াল তার চোখের সামনে। অল্প চোখ কুঁচকে ওপর দিকে তাকিয়ে সে দেখতে গেল কে এই পা জোড়ার মালিক। ভালো দেখা গেল না। সূর্য পেছনে থাকায় লোকটার মুখ অন্ধকারেই রয়ে গেল। কিন্তু হাতে উদ্যত আগ্নেয়াস্ত্রটির চকচকে নল পড়ন্ত রোদে এক বার ঝিকিয়ে উঠে নিজের অস্তিত্ব জানিয়ে দিল নির্ভুল।

সে জানে সে হেরে গেছে। এ সময় লড়ার চেষ্টা বৃথা। আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে হাত ওঠাতে যায় সে। ঠিক তখনি ধাতব শব্দের ঝনঝনানি!!

চমকে ঘুম ভেঙে ধড়মড়িয়ে বিছানায় উঠে বসেন রাকেশ সাখাওয়াত। ঘামে শরীর ভিজে সপসপ করছে। মান্ধাতা আমলের উইন্ডো এসি একঘেয়ে আওয়াজে নিজের উপস্থিতি জানান দিচ্ছে। কিন্তু ঠান্ডা ততটা করতে পারছে না।

ঘুমের ঘোরে খাটের পাশে ছোট টুলে রাখা গোল অ্যালার্ম ক্লকটি হাতে লেগে পড়ে গেছে মাটিতে। তারই ঝন ঝন আওয়াজে ঘুম ভেঙেছে তাঁর।

মিনিট দুয়েক লাগল ধাতস্থ হতে। তারপর হাত বাড়িয়ে মাথার দিকের সুইচ বোর্ডের সুইচ টিপে সিলিং ফ্যানটাও চালিয়ে দিলেন সাখাওয়াত। টুল থেকে জলের বোতল নিয়ে ছিপি খুলে বেশ খানিকটা জল খেলেন ঢক ঢক করে।

চশমাটা কোথায় গেল? আহ, এই তো, বালিশের পাশে! আর হাতঘড়িটা? এই যে—বালিশেরই নীচে!

সময় দেখাচ্ছে চারটে চল্লিশ!

বিছানা থেকে নেমে ধীর পায়ে এগিয়ে প্রথমে ঘরের লাইট জ্বেলে ঢুকলেন বাথরুমে। বাথরুমে দরজার সামনাসামনি ঝকঝকে বেসিন। তার মাথায় প্রমাণ মাপের আয়না। চশমাটা খুলে বেসিনের ধারে রেখে, ট্যাপ খুলে চোখে-মুখে জলের ঝাপটা দিয়ে আয়নার দিকে তাকালেন সাখাওয়াত।

শেষ এগারো মাসে তার বয়েস বেড়েছে প্রায় এগারো বছর। চুলে পাক ধরেছে। তার চেয়েও লক্ষণীয়ভাবে বেড়েছে চোখের তলায় ভাঁজ। বেড়েছে মুখের বলিরেখা। চিবুকের ক্লান্তি। ঝুলে পড়েছে কাঁধ। আয়নায় দুদে ইন্টেলিজেন্স অফিসার সাখাওয়াত নয়, যাকে দেখা যাচ্ছে তিনি লড়াইতে হেরে, ব্যর্থ, পেনশনভোগী অকর্মণ্য সৈনিক।

চন্দন সামল!!

তার প্রতিশোধ এখনও, এতদিন পরেও থাবার চিহ্ন রেখে যাচ্ছে রোজ। দুঃস্বপ্নে!

হ্যাঙারে ঝোলানো তোয়ালেতে মুখ-চোখ মুছে আবার ঘরে ফেরত এলেন সাখাওয়াত। বাথরুম থেকে আসা আবছা আলোতেও টেবিলে রাখা পার্সেলটা দেখা যাচ্ছে। পড়ে আছে আধখোলা অবস্থায়। আলো-আঁধারিতে ভালো দেখা যায় না তার ভেতরে কী আছে। তবে সাখাওয়াত জানেন। সন্ধে বেলা পার্সেলটা এসে পৌঁছোনোর পরেই তিনি খুলে

দেখেছেন। আছে একটি বার্নার ফোন আর একটি চিরকুটে টাইপ করা একটি ফোন নাম্বার।

কলকাতায়, যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বিরুপাক্ষবাবু গুলি খেয়ে নিহত হবার পর থেকে কেটে গেছে প্রায় এক বছর। অপরাধী ও চক্রান্তকারীরা কেউ ধরা পড়েনি। সাখাওয়াতকে সঙ্গে সঙ্গেই সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল তদন্তকারী দল থেকে। শুধু তাই নয়। প্রধানমন্ত্রীর অঙ্গুলিহেলনে তাকে জনগণের চোখ থেকে, মিডিয়ার ক্যামেরার ফ্ল্যাশ-বাল্ব থেকে আর ইন্টেলিজেন্সের ঘুলঘুলিওয়ালা ভুলভুলাইয়া থেকেও সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল অবিশ্বাস্য দ্রুততায়।

এমন নয় যে সাখাওয়াত বাচ্চা ছেলে। তিন দশকের ইন্টেলিজেন্স কেরিয়ার তাঁর। কিন্তু সেই তিনিও অবাক হয়ে গেছিলেন দেখে, যে এত বড় একটা ইন্টেলিজেন্স ফেলিওরের পরেও মূল ভারপ্রাপ্ত অফিসারকে কী মোলায়েম স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে সরিয়ে নেওয়া গেছিল ঘটনার মূল স্রোত থেকে, শুধুমাত্র দেশের সর্বোচ্চ ক্ষমতাশালী মানুষটির আগ্রহে। কোনো শাস্তি হওয়া তো দূরস্থান, সাখাওয়াত তাঁর পেনশন, অবসরকালীন সমস্ত সুযোগ-সুবিধা এবং লোকচক্ষুর আড়ালে, একটি সাধারণ পাড়ায় একটি সাধারণ অথচ আরামদায়ক ফ্ল্যাট পেয়ে গেছিলেন বিনা চেষ্টায়। ম্যাজিকের মতো আশেপাশের সমস্ত বন্ধ দরজা খুলে গেছিল নিঃশব্দে। গণেশনগর এলাকাটি নয়ডা লিংক রোডের ঠিক গা বরাবর। পোস্ট অফিস শাকারপুর। দিল্লি কনভেন্ট স্কুল এই এলাকাতেই।

সেই ১২ জুন, ২০১৭-র পর থেকে আজ প্রায় এক বছর হয়ে গেল। মাঝে এক-দু' মাসের জন্য কিছু অখ্যাত হোটেলে সাময়িক আত্মগোপন ছাড়া সাখাওয়াতের পাকাপাকি ঠিকানা এখানেই।

ডি- ১৬৮, গণেশনগর, নিউ দিল্লি।

এই ঘুমন্ত সরু গলিতে সারাদিনের বেশিরভাগ সময়েই ছায়া থাকে। একমাত্র যখন মাথার ওপরে সূর্য, তখনই একটু রোদ পায় এই গলির রাস্তা। তাই এখানে চারপাশে একটা কেমন সোঁদা গন্ধ লেগেই থাকে। অন্ধকারের গন্ধ। সরু পথের দু' দিকে একে অপরের ঘাড়ে চড়ে দাঁড়িয়ে আছে নড়বড়ে ফ্ল্যাটবাড়িগুলো। বিষণ্ণ! পরনির্ভরশীল। যেন মনে হয়, পাশের বাড়ির কাঁধে ভর না দিতে পারলে হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়বে রাস্তার ওপর। যত ওপরের ফ্লোরে ওঠা যায়, রাস্তার উলটো দিকে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকা বিল্ডিং-এর সঙ্গে দূরত্ব যেন কমতেই থাকে। সবচেয়ে ওপরের ফ্লোর দুটি তো চুম্বনোদ্যত একেবারে।

এখানেই একটি প্রায়ান্ধকার দুই কামরার ফ্ল্যাটে থাকেন যে বয়স্ক বিপত্নীক মানুষটি— তাঁকে আশেপাশের প্রতিবেশিরা বিশেষ পাত্তা দেন না। তিনি আসার পর প্রথম প্রথম গায়ে পড়ে দু-এক জন আলাপ করতে গিয়ে দেখেছে লোকটা মোট্টে মিশুকে নয়। দশটা প্রশ্ন করলে একটার উত্তর পাওয়া যায়। তাও পরে ভেবে দেখলে বোঝা যায় যে সে উত্তর থেকে কিছুই জানা যায় না। যেমন এক বার মিসেস ভার্মা জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'আপনার ছেলে-মেয়ে কী করে? কোথায় থাকে?

'ছেলে-মেয়েদের কথা আর তুলবেন না। সবাই কি আর আপনার

ছেলেমেয়ের মতো? দেখিতো। কী শান্ত, ভদ্র!' হাসিমুখে জবাব দিয়েছিল লোকটা। ভার্মা গিন্নি এমনিতেই নিজের ছেলে-মেয়ের সম্বন্ধে দশখানা করে বলতে ভালোবাসেন। তার ওপর এই চুপচাপ লোকটার মুখে কথা ফোটাতে পেরেছেন এই গর্বে আটখানা হয়ে পরের ঝাড়া কুড়ি মিনিট কেন ঋষভ ভার্মা বা নন্দিনী ভার্মার মতো ছেলে-মেয়ে আজকের যুগে বিরল সেই ব্যাখ্যান শুনিয়েছিলেন।

বাড়ি আসার দু' দিন পরে ফালোরদের বড় বউমার কাছে এই গপ্পো করতে গিয়ে প্রথম বার তাঁর খেয়াল পড়ল— তাই তো, লোকটার ছেলে-মেয়ের ব্যাপারে তো কিছুই জানা গেল না। এমনকী ছেলে-মেয়ে আছে কিনা ছাই, তাও জানা গেল না।

আস্তে আস্তে ভার্মা গিন্নির মতো আরও কয়েক জনেরও একই হাল হতে, প্রতিবেশি

মহিলামহল সমবেত সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিল যে, কোনো চিটফান্ডে প্রচুর টাকা মেরে একগাদা কালো টাকা নিয়ে এখানে এসে লুকিয়ে আছে বুড়ো ভাম। একবার সব্বাই ভেবেছিল পুলিশে গিয়ে জানাবে তাদের এই সন্দেহের কথা। তারপর বেশিরভাগেরই নিজেদের আলমারির শাড়ির খাঁজে, ঘরের বাক্সে রাখা কাপড়ের পুঁটলি আর রান্নাঘরে রাখা আটার ড্রামের কথা মনে পড়তেই সেই প্ল্যান অচিরে বাতিল। খাল কেটে কুমির ডেকে কী লাভ?

সেই থেকে সাখাওয়াত একাই থাকেন। মৌখিক হাই-হ্যালো, দেঁতো হাসির সৌজন্য আর দোকানদার-সবজিওয়ালাদের সঙ্গে নৈমিত্তিক আদান-প্রদানটুকু ছাড়া চুপচাপ থাকেন। ঘরে টিভি নেই। রেডিয়ো নেই। স্মার্টফোন নেই। বই, সকাল-বিকেল হাঁটাহাঁটি, রান্না— আর বাকি সময় জুড়ে শুধু নিজের কেরিয়ারের শেষ লড়াইয়ের পরিণতির মুখোমুখি হওয়া— এই জীবনে বেশ অভ্যস্ত হয়ে উঠছিলেন তিনি। খুব ধীরে ধীরে হলেও সময়ের একটা পাতলা প্রলেপ পড়ছিল পরাজয়ের দগদগে ক্ষতস্থানগুলোতে। ধীরে ধীরে দুঃস্বপ্নের রাতগুলোও সংখ্যায় কমতে শুরু করেছিল।

কেবল দুটি খচখচানি লেগে থাকত মনে। কী কারণে এরকম ব্যর্থতার পরেও তাকে ছুড়ে ফেলা দূরস্থান, উলটে এত সুন্দরভাবে সাধারণ একটা জীবন কাটানোর সুযোগ করে দেওয়া হল? কেন তাঁর ‘কেউ নয়’ হয়ে টিকে থাকাটা প্রধানমন্ত্রীর কাছে এত জরুরি ছিল?

আর একটা কথা তাঁকে রাতের পর রাত জাগিয়ে রাখে। কী হল ছিটেফোঁটার? সীতাংশু আর প্রভাতাংশু মাদিয়া সে রাত্রে সবার চোখে ধুলো দিয়ে পালাল কী করে? কোথায়ই-বা গেল তারা? পৃথিবীব্যাপী নাড়া দেওয়া এই হত্যাকাণ্ডের দুই নায়ক— কী করে পুলিশ, সিবিআই আর আইবি-র চোখে ধুলো দিয়ে টিকে গেল?

মনের কোণে গেঁথে থাকা এই দুটি অস্বস্তিকর কাঁটা ছাড়া সাখাওয়াত ভালোই ছিলেন। অন্তত তাঁর কোনো অভিযোগ ছিল না এই নিস্তরঙ্গ জীবন নিয়ে। তবে এখন মনে হচ্ছে নিথর জলের চাদরে কোথাও একটা হালকা পালক পড়েছে। ক্ষীণ ঢেউ উঠেছে জলাশয়ে! খুবই ক্ষীণ। কিন্তু চির উৎসুক তাঁর স্নায়ুতে ধরা পড়ছে সেই কম্পনটুকু।

কাল সন্ধে বেলা এসেছে এই পার্সেলটা। কুরিয়ারে। সন্ধে না বলে, রাত বলাই ভালো। একটি ছেলে এসে দিয়ে গেল। সঙ্গে সই করিয়ে নিয়েও গেল। তখন থেকেই এই আপাত রহস্য। কিন্তু সাখাওয়াত এই ইশারা বোঝেন। ফিল্ডে থাকা কোনো আন্ডারকভার এজেন্টের সঙ্গে যখনই যোগাযোগ করার দরকার পড়েছে, এমনভাবে, যাতে কোনো ট্রেস না থাকে— তখনই তিনি নিজেও এই ধরনের কৌশল অবলম্বন করতেন।

কেউ একজন তাঁকে কাজে লাগাতে চাইছে।

কিন্তু কেন?

কল করবেন কী করবেন না, সেই ভাবনায় দুলছিলেন সারা সন্ধে ও রাত। এখন এই ভোররাত্তিরে, দুঃস্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙে জেগে ভূতগ্রস্তের মতো বসে আছেন বিছানায়। প্রায় বৃদ্ধ মানুষটি এখন আবিষ্কার করছেন যে এতদিন তিনি ভালো ছিলেন না। এই নিরামিষ, ঢেউহীন জীবন তাঁর পোষায় না। তিনি যোদ্ধা। মৃত্যুও যদি হয়, যুদ্ধক্ষেত্রই সেক্ষেত্রে শ্রেয়তর, রোগশয্যার চেয়ে।

আস্তে আস্তে টেবিলের কাছে উঠে গেলেন সাখাওয়াত। টাইপ করা নম্বরটি ডায়াল করলেন বার্নার ফোনটিতে। ওপাশে দু’ বার রিং হওয়ামাত্রই কেউ একজন ফোনটা তুলল। একটু গম্ভীর এবং খুব চেনা টানে বলে উঠল, ‘পাণ্ডবনগর গুরুদ্বারা, কাল, সন্ধে সাতটা। পায়ে হেঁটে। কিপ দিস ফোন উইদ ইউ!’

ফোনটা রেখে রাকেশ সাখাওয়াত চেয়ারে বসলেন। প্রায় এক বছর বাদে আবার! সুষুপ্তিতে থাকা আদিম বাঘ ধীরে ধীরে আড়মোড়া ভাঙছে। যেন কোনো অতল নদীপারের গহীন জঙ্গল তাকে ডাকছে। অমোঘ সে ডাকে রক্তে চাঞ্চল্য জাগছে তাঁর।

শিকার করা তাঁর অভ্যেস। শিকার করা তাঁর পেশা। এক বার শিকার পালিয়ে গেলেও, আবার, আবার ঝাঁপিয়ে পড়তেই হবে। হবেই!

গালে হাত বুলিয়ে নিজের মনেই ঘাড় নাড়লেন সাখাওয়াত। দাড়ি কামাতে হবে। গুড দ্যাট হি ওক আপ আর্লি। আজকের দিনটা তাড়াতাড়ি শুরু হওয়াই ভালো। কিছু প্রস্তুতি নেওয়ার আছে।

অকেজো বোড়েকে যখন খেলার মূল স্রোতে ফেরানো হয়, তা করা হয় দুটো কারণে। হয় তাকে প্রোমোট করে মন্ত্রী বানানোর জন্য, নাহয় তাকে স্যাক্রিফাইস করে কোনো সুবিধে আদায় করার জন্য।

সাখাওয়াতকে সাবধান হতে হবে দ্বিতীয় কারণটা থেকে।

সপ্তম অধ্যায়
।। দ্য নাইট ভেঞ্চার্স ।।

২৬ জুলাই, ২০১৮, সকাল বেলা / ধাড়সা, পঃ বঙ্গ, ভারত

'আপনি কী করে খেয়াল করলেন? মানে অত রাত্তিরে আপনি বাড়ির বাইরে কী করছিলেন?'

যে মেয়েটি প্রশ্ন করছে তার সিল্কের মতো নরম নরম চুল। লম্বা ছিপছিপে চেহারা। একদম সতেজ সজনে ডাঁটার মতো, লকলকে। চোখগুলো পুরো 'মিমি'র মতো। যেন আয় আয় করে ডাকছে। আর... আর... এরকম করে কাজল লাগানোর কী আছে? এরপর যদি মনিরুলের সব ভুল হয়ে যায়, তাহলে সেটা কার দোষ?

ওই চোখ দুটোর দিকে তাকিয়েই মনিরুল অন্যমনস্ক হয়ে গেছিল। একটু আগে অবধি সে ভাবছিল কালকের দিনটাই তার জীবনের সেরা দিন হয়ে থাকবে। ধাড়সা ভ্রাতৃ সংঘের একচেটিয়া সেন্টার ফরওয়ার্ড, মনিরুল ইসলাম। কালকে তাদের এগজিবিশন ম্যাচ ছিল সাতাশি ইয়ংস্টার ক্লাবের সঙ্গে। সাতাশি ক্লাবের সঙ্গে তাদের বেশ পুরোনো আকচা-আকচি। লিগের খেলায় কখনো এ জেতে তো কখনো ও।

কালকের ম্যাচটা যদিও এগজিবিশন ম্যাচ ছিল। ধাড়সায় ফি বছর একটা করে কালচারাল নাইট হয়। ওই একটু মদ খেয়ে ফুর্তিফার্তা, নাচানাচি, একটু পাগলু ডান্সের গান— সব মিলিয়ে ওই মোচ্ছবের সাড়ে বত্রিশ ভাজা। তো সেই কালচারাল নাইটের খরচের পয়সা তুলতে প্রতি বছর তার এক সপ্তাহ আগে করা হয় এই এগজিবিশন ম্যাচ। এই ম্যাচে যা লোক হয়, দশ টাকা টিকিট করে, আর কার্ড সেল করে আজ পর্যন্ত ওই কালচারাল নাইটে কোনোদিন মদের কমতি পড়েনি।

গত বছর যদিও মনিরুল ভালো করে আনন্দ করতে পারেনি। ম্যাচে ধাড়সা স্পোর্টিং ক্লাব হেরে গেছিল! এক গোলে। তবে এবারে তারা তেড়ে প্র্যাকটিস করেছিল। মনিরুল তো রোজাও রাখেনি। যদিও ম্যাচ ইদের অনেক পরে। কিন্তু মনিরুল কোনো চান্স নিতে চায়নি। এই নিয়ে যদিও আব্বুর সঙ্গে খিটিরমিটির হয়েছে, কিন্তু আম্মি আর দাদা সব ম্যানেজ দিয়ে দিয়েছে।

খেলাটা হয়েছিল নয়াবাজ নিউ মর্নিং স্টারের মাঠে। প্রতি বছর এখানেই হয়। এ তল্লাটে এত বড়ো মাঠ আর নেই। সাঁতরাগাছি কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের কাছে আর একটা মাঠ আছে বটে। তবে সেই ন্যাড়া মাঠে ভালো খেলা হয় না। আর মাঠটাও বেশ ছোট।

মনিরুল কিন্তু ওর রোজা না রাখার ফল মাঠে দেখিয়ে দিয়েছে। হ্যাটট্রিক করে একাই শুইয়ে দিয়েছে সাতাশি ক্লাবকে। মাঠ থেকে ধাড়সা মনসাতলা বাজার পর্যন্ত প্রায় দেড় কিলোমিটার রাস্তা মনিরুলকে একবারও হাঁটতে হয়নি। এসেছে ক্লাবের আর পাড়ার লোকের কাঁধে কাঁধে। ওর সাইকেলটা ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে এসেছে কানি। ব্যাটার ফোকলা দাঁতে হাসি আর ধরে না।

মনিরুল ম্যাচের সেরা হয়ে হাজার টাকা পেয়েছিল। কানিকে একশো দিয়েছে তার থেকে। জানে, ওর বাপ কেলিয়ে কেড়ে নেবে হয়তো। তবু দিয়েছে। ছেলেটার একটা প্যান্ট দরকার— যদি কিনে নিতে পারে।

এর চেয়ে ভালো দিন যে হতে পারে, সেটা মনিরুল ভাববে কী করে? কিন্তু এখন মনে হচ্ছে ওসব কিছুই না।

প্রথমে সে অত খেয়াল করেনি। সকালে ঘুম থেকে উঠতে একটু দেরি হয়ে গেছিল। রুটি খাবার পর, মা বলল, 'মিষ্টি কিনে নিয়ে আয়। বাড়িতে কুটুম আসবে।' তাই সে এসেছিল 'মা গঙ্গা মিষ্টান্ন ভাণ্ডার'-এ। ধাড়সা মনসাতলা বাজারেই দোকানটা। এ তল্লাটের সেরা রসকদম আর ছানার মুড়কি বানায়।

আড়াইশো ছানার মুড়কি আর কুড়িটা রসকদমের অর্ডার দিয়ে ও খবরের কাগজটা খুলেছিল। জেলার পাতাগুলোয় আঁতিপাঁতি করে খুঁজছিল, কোথাও একচিলতে খবরও বেরিয়েছে কিনা তাদের খেলার, তার হ্যাটট্রিকের। ইন্দ্রদা কাগজের আপিসে চাকরি করে। বলেছিল খবর ছাপিয়ে দেবে। খুঁজে না পেয়ে একটু হতাশ হয়ে গেছিল মনিরুল। তখনি কানে এল একটা লোক শিবেনকাকাকে বলছে, 'আমরা কাগজের আপিস থেকে আসছি। একটা গাড়ির খোঁজ করছি। মাথায় লালবাতি লাগানো থাকার কথা। জানেন কিছু?'

মুখ তুলে মনিরুল দেখে একটা বেঁটে-মোটা লোক। ইস্টবেঙ্গলের জার্সির রঙের একটা গেঞ্জি আর একটা জিন্স প্যান্ট। ইস্টবেঙ্গলের জার্সি দেখে, না খবরের কাগজের আপিস শুনে— কোনটাতে মনিরুল বেশি চেতিয়ে উঠল কে জানে, তবে পট করে মুখ ফসকে বলে ফেলল, 'আমি দেকেচি। কালো স্করপিও গাড়ি। কাল রাত্তিরে। পার্টি আপিসের সামেনখানে দাঁইড়েছিল।'

বলেই সে একটু থমকে গেল। কে জানে মুখ খোলা ঠিক হল কিনা। শিবেনকাকাও তার দিকে কটমট করে চেয়ে আছে। কিন্তু আর কিছু করার নেই। গুলি বন্দুক থেকে বেরিয়ে গেছে।

'আপনি কী করে খেয়াল করলেন? মানে অত রাত্তিরে আপনি বাড়ির বাইরে কী করছিলেন?'

হ্যাটট্রিকের চেয়েও বেশি আকর্ষণীয় চোখওয়ালা মেয়েটা কী যেন একটা বলছে। ঠোঁট নড়ছে তার।

কিছু জিজ্ঞেস করছে কি? ওর শরীর থেকে কেমন একটা গন্ধ আসছে। তাতে সব কিছু গুলিয়ে যাচ্ছে মনিরুলের। অতি কষ্টে মনটাকে জড়ো করে সে প্রশ্নটা শুনতে পেল।

'আসলে কাল খেলায় জিতেচি। আমি তিনখানা গোল মেরে হ্যাটটিরি করেচি। তো, মাথাটা গরুম ছিল। তাই রাত্তিরে ঘুম আসছিল না। এট্টু বাইরে বেইরে হাওয়া খাচ্চিলাম এদিক-সেদিক হেঁটেহঁটে। আমাদের বাড়িখান আবার ওই পার্টি আপিসের গায়েই কিনা। তোকুনি দেকলুম একটা বড় কালো গাড়ি এসে থামল। আর একটা মেলেটারি ডেরেস পরা লোক বেইরে গাড়ির মাতা থেকে বাতিটা খুলে নিল। তাপ্পর আবার এস্টার্ট দিয়ে চলে গেল।'

'গাড়ির ভেতরে কাউকে দেখতে পেয়েছিলে? নাম্বার প্লেটটা দেখেছিলে গাড়ির? কোনদিকে গেল গাড়িটা দেখেছ?'

একসঙ্গে এতগুলো প্রশ্ন কেউ কোনোদিনও মনিরুলকে করেনি। সে ঘাবড়ে গিয়ে চোখ পিটপিট করে দেখতে থাকল মেয়েটিকে।

মেয়েটি অর্থাৎ মোনালিসা। অধৈর্য হওয়ার জন্য তাকে কোনোমতেই দোষ দেওয়া চলে না। কাল রাত্তির থেকে সে হন্যে হয়ে ঘুরছে স্কুটির পেছনে দেবদীপ্তকে বসিয়ে।

এস. এস. কে. এম. থেকে বেরিয়ে প্রায় ঝড়ের গতিতে স্কুটি চালিয়েছিল সে। মাত্র কুড়ি মিনিটে পৌঁছে গেছিল লেক কান্ট্রি ক্লাবে। গেটম্যানকে পটিয়ে ভেতরে ঢুকতে দেবদীপ্তকে বিশেষ বেগ পেতে হয়নি।

ভেতরে ঢুকেই সে অবলীলায় মোনালিসাকে ঠেলে দিয়েছিল সামনে, 'গেটম্যান বলল অভিজাত বারে আছে। চলো। তুমিই লিড করো।'

একটু থমকে গেলেও চট করে সামলে নিল নিজেকে মোনালিসা। লোকটাকে যতটা খারাপ ভাবা গিয়েছিল, দেখা যাচ্ছে ততটা নয়। বারের দিকে এগোতে এগোতে মোনালিসা জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কী করবেন?'

'আমি দেখব।'

বোঝো।

বারটি বেশ আপস্কেল। ভেতরে মৃদু আলো। অল্প দু-চার জন লোক এদিকসেদিক ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসে আছে। বেশবাস দেখেই মনে হয় উঁচুঘরের মানুষ। কথাবার্তা নেই প্রায়

কোনো। যা যেটুকু হচ্ছে, খুবই মৃদুস্বরে। দামি সাউন্ড সিস্টেমে অরিজিৎ সিং গাইছেন, 'আজ জানে কী জিদ না করো...'

মোনালিসা চারপাশটা একটু মেপে নিয়ে বারটেন্ডারের দিকে এগিয়ে গেল। ছেলেটা অল্পবয়েসি। কিন্তু বেশ বড়সড় চেহারার। দেখলেই মনে হয় জিমে লোহা তোলে। থুতনিতে অল্প দাড়ি। চওড়া কাঁধ। ঠোঁট দুটি পাতলা হওয়ায় মনে হয় মুখে সবসময় একটা হাসি লেগেই আছে। মোনালিসা সপ্রতিভভাবে বার-স্টুলগুলোর একটাতে বসে বলল, 'আ ব্লাডি মেরি প্লিজ!'

ছেলেটি ওর দিকে তাকিয়ে অল্প হেসে, মাথা ঝাঁকিয়ে কাউন্টারের একপাশে সরে গেল ড্রিংক বানাতে। আধ মিনিটের মাথায় একটি টিস্যু পেপার রেখে তার ওপর টকটকে লাল বর্ণের তরলে ভরা পেয়ালাটি রেখে সরে যাওয়ার আগেই মোনালিসা একটু হেসে তাকে বলল, 'খুব বিজি?'

ছেলেটি চলে যেতে গিয়েও ফিরে দাঁড়াল। পেশাদারি ভদ্রতায় একটু হেসে বলল, 'নো ম্যাম! বলুন। কীভাবে হেল্প করতে পারি!'

'আমার ব্যাপারটা একটু পার্সোনাল।' একটু দ্বিধাজড়িত গলায় বলল মোনালিসা। মনে মনে মুনমুন সেনকে প্রণাম জানিয়ে আবার বলল, 'জানি না তুমি— সরি, তোমাকে তুমি বললাম, কিছু মনে করলে না তো?'

'নো ম্যাম। ইটস অ্যাবসোলিউটলি ফাইন। কী দরকার বলুন।' ছেলেটি এবার একটু এগিয়ে আসে কাউন্টারের দিকে।

'আসলে অভি আমার ওপর রাগ করে বেরিয়ে এসেছে কটেজ থেকে। মোবাইলে ফোন করে যাচ্ছি, তুলছে না। হি ওয়াজ, ইউ নো, অলরেডি ড্রাঙ্ক! আমি জানি এখানেই কোথাও আছে, আমার চোখকে লুকিয়ে। একটু ডেকে দেবে প্লিজ?'

শেষের প্লিজটা অভিনয়ের আতিশয্যে মুনমুন সেনকে টপকে প্রায় সানি লিওনের মতো শুনতে লাগল। মোনালিসা নিজেই মনে মনে নিজের গালে একটা ঠাস করে চড় কষাল। ছেলেটি মনে হয় ততটা খেয়াল করেনি। সুন্দরী মেয়ে সাহায্য চাইলে এখনও পুরুষরা মাথার বদলে অন্য কোনো অঙ্গ দিয়েই বেশিরভাগ সময়ে ভেবে থাকে।

'অভি বলতে কি ম্যাম, অভিজাতস্যরের কথা বলছেন?'

'ও মা, না হলে আর কার কথা বলব?' এবারে গলাটা মাপমতো আদুরে।

'কিন্তু ম্যাম, অভিস্যর তো বেরিয়ে গেছেন। তা ধরুন মিনিট কুড়ি আগে। ওনার বডিগার্ড আর ড্রাইভার মিলে ধরাধরি করে ওনাকে নিয়ে গেল তো।'

'আর ইউ শিওর?' একইসঙ্গে চাপা উত্তেজনা আর হতাশা দানা বেঁধে উঠছে গলায়। সেটাকে কোনোমতে লুকিয়ে অভিনয় চালিয়ে যাচ্ছে মোনালিসা।

'ইয়েস ম্যাম। ওনার ক্রেডিট কার্ডটা কাউন্টারে দেওয়া ছিল। সেটা ফেলেই উনি চলে যাচ্ছিলেন। আমি আবার ওনার বডিগার্ডকে ডেকে দিয়ে দিলাম সেটা।'

'শিট,' আদুরে প্রেমিকার খোলস খসে পড়ে মুহূর্তে। কী করবে ভেবে না পেয়ে তড়াক করে লাফিয়ে স্টুল থেকে নেমে সে হনহন করে বেরিয়ে আসে বারের বাইরে। পেছনে বারটেন্ডার ছেলেটি তাকে চেঁচিয়ে ডাকছে বোধহয়। সেদিকে কান না দিয়ে সে ইতিউতি খুঁজতে থাকে দেবদীপ্তকে। বারের সামনেটাতেই খোলা জায়গায় একটা ঘেসো জমি। আর তার ওপরে ছোট ওয়াটারবডি বানিয়ে তিনচারটে ফোয়ারা পাশাপাশি লাগানো আছে। গভীর রাতে তাতে লোভনীয় রঙিন আলো জ্বলছে-নিভছে।

সেই আলো-ছায়ায় কিছুক্ষণের জন্য মন ধাঁধিয়ে গেল মোনালিসার। কয়েক সেকেন্ড পরে পেছনে পায়ের শব্দ পেয়েই সে চট করে ঘুরল। ঘুরে দেবদীপ্তকে দেখে সে আশ্বস্ত হলেও দেবদীপ্তর মুখ থমথমে। কাছে এসেই সে হিসহিসে গলায় বলল, 'মাতাহারি সেজেছিলে? নিউজ কভার করতে এসে মাজাকি হচ্ছে? থাবড়ে থোবড়া বিলা করে দেব। নিজের এমন কভার তৈরি করবে কেন, যা পাঁচ মিনিটে সিল্কস্মিতার আঁচলের মতো খসে

পড়বে? এই বালবাজারিগুলোর জন্যেই আমি বিজনদাকে মেয়েদের নিতে বারণ করি। নার্ভ ঠিক রাখতে পারো না তো এ লাইন ছেড়ে দাও, বুঝলে মামণি!'

ঝড়ের মুখে ভেসে যেতে যেতে কুটো আঁকড়ানোর মতো করে মোনালিসা বলতে যায়, 'কিন্তু দেবদা...' তার মুখের কথা শেষ না করতে দিয়েই দেবদীপ্ত আবার বলে ওঠে, 'চোপ! আর একটাও কথা নয়। চলো এবার।

মাথা নীচু করে হাঁটতে শুরু করে মোনালিসা। গেট অবধি রাস্তাটা যেন কত দূর। অপমানে সারা শরীর থরথর করে কাঁপছে। আজ পর্যন্ত কেউ খোলাখুলি এইভাবে অপমান করেনি তাকে। এত কাঁপুনি দিচ্ছে শরীরে, মনে হচ্ছে গেটে পৌঁছোনোর আগেই পড়ে যাবে। ভাবল এক বার দেবদীপ্তর হাতটা ধরে। কিন্তু সাহস হল না।

দু' পা এগোতে-না-এগোতেই টাল সামলাতে না পেরে পড়ে যাচ্ছিল সে। খপ করে তার কবজিটা ধরে ফেলল দেবদীপ্ত। সুইমিং পুলের পাশ দিয়ে হাঁটছিল ওরা। আর একটু অসাবধান হলেই পুলে পড়ে যেত মোনালিসা। মুখ তুলে সে দেবদীপ্তর দিকে তাকাল। অতি কষ্টে চোখের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসা জল ঠেলে ভেতরে চালান করে সে শুধু বলতে পারল, "থ্যাংকস!' কান্না চেপে গলাটা কেমন বিকৃত শোনাল।

কী মনে হওয়ায় দেবদীপ্ত বলল, 'একটু বসে নাও এই চেয়ারে।' সুইমিং পুলের ধারেই লম্বা হয়ে শুয়ে বিশ্রাম নেবার সারি সারি কাঠের আরামকেদারা টাইপের জিনিস। এই রাত্তিরে, সেগুলো সবই ফাঁকা। মোনালিসা তারই একটাতে গিয়ে বসল। দেবদীপ্ত এবারে আরও একটু নরম গলায় বলল, 'জল খাবে?'

মাথা নেড়ে মোনালিসা জানাল সে খাবে না। এতক্ষণে সে একটু হলেও সামলে উঠেছে। মাথা নীচু করেই সে বলল, 'সরি ফর দ্য গুফ-আপ দেবদা।' 'ইটস ওকে। ইনফো আমরা পেয়েই গেছিলাম। বাট, একে আর পরে কাজে লাগানো মুশকিল। লাগতে পারত। ভাইটাল কিছু জিনিস জানা যেত।' 'যেমন?'

'যেমন সঙ্গে কেউ ছিল কিনা! কোনো ফোন এসেছিল কিনা! অন্য কেউ দেখা করতে এসেছিল কিনা।'

'সঙ্গে মনে হয় আর কেউ ছিল না। ছেলেটা তো বলল ওর বডিগার্ড আর ড্রাইভার মিলে ওকে ধরাধরি করে নিয়ে গিয়েছিল।'

'হুম। বাই দ্য ওয়ে, আমি তোমার থেকে সাড়ে চারশো টাকা পাই।'

'কীসের?' একটু ভুরু কুঁচকে যায় মোনালিসার।

'ব্লাডি মেরি। আপনি পয়সা না দিয়েই চলে এসেছিলেন ম্যাম। পেছন থেকে ছেলেটা চেঁচিয়ে ডাকতে ডাকতে গলা চিরে ফেলল বোধহয়। বারের অন্য লোকগুলো দেখছিল। অগত্যা, কী করি? লজ্জা বাঁচাতে, তোমার সেক্রেটারি সেজে আমিই পে করে এলাম।'

'এ বাবা! আই অ্যাম রিয়েলি সরি দেবদা। আমি এক্ষুনি দিয়ে দিচ্ছি।' বলেই সে পার্স খুলতে যায়। দেবদীপ্ত ওকে বাধা দিয়ে বলে, 'পরে দিলেও চলবে। এখন চলো।'

মোনালিসা উঠে পড়ে। হাঁটাও লাগায়। এখন বেশ হালকা লাগছে। হাঁটতে হাঁটতেই জিজ্ঞেস করে, 'কোথায় যাচ্ছি আমরা?'

'ব্যাক টু প্যাভিলিয়ন। নতুন করে চেষ্টা করতে হবে অভিজাতকে ধরার। মালটা হয়তো জানেই না ওকে পুলিশ খুঁজছে। হয়তো ডাইরেক্টলি ওদের পাল্লাতেই গিয়ে পড়বে। অ্যাট এনি রেট— ওর নাগাল আমাদের পেতেই হবে। আর সেটা ও পুলিশ হেফাজতে যাবার আগে পেলেই ভালো হয়।"

ক্লাবের মূল বিল্ডিং থেকে গেটটা প্রায় পাঁচশো মিটার। মোনালিসা ওদের স্কুটিটা বাইরেই রেখেছিল। আন্দাজ করতে পারেনি ক্লাবের ভেতরটা এত বড়। বাকি রাস্তাটা দুজনে মুখ বুজে হাঁটল।

গেট পার হওয়ার সময় দেবদীপ্ত চট করে গিয়ে দুই গেটকিপারকে দুটো করে চারটে সিগারেট দিয়ে এল। ততক্ষণে স্কুটিতে স্টার্ট দিয়েছে মোনালিসা। দেবদীপ্ত বিনা বাক্যব্যয়ে

এসে পেছনে উঠে বসল। পাঁচ মিনিটের মধ্যে কোনা এক্সপ্রেসওয়ে। রাতের ফাঁকা রাস্তায় ঝড়ের মতো স্পিড তুলেছে মোনালিসা। দেবদীপ্ত সিঁটিয়ে বসে আছে পেছনে। দশ মিনিটের মধ্যে সাঁতরাগাছি স্টেশনের আলো দেখা গেল রাস্তার ডান দিকে। এতক্ষণ দুজনেই মুখ বুজে ছিল। এবারে পেছন থেকে দেবদীপ্ত বলল, 'চায়ের দোকানে প্রথম উনুন ধরানোর পর, ভোর বেলার ফার্স্ট চা খেয়ে দেখেছ?'

'নাহ! আমি চা খাই না।'

'আরে ধুস! এ জিনিস না খেলে মানবজনমই বৃথা হে। দাঁড়াও দাঁড়াও ওই বাঁ-হাতি চায়ের দোকানটার কাছে দাঁড়াও।'

একটু দূরে একটা চায়ের দোকান। কোল্ড ড্রিঙ্কসের বিজ্ঞাপন দেওয়া গ্লো সাইন নীলচে আলো ছড়াচ্ছে। তার নীচে টালির চালের চায়ের দোকানের সামনে জ্বলেছে উনুন। ধিকিধিকি কয়লার আগুনের আভা দেখা যাচ্ছে। কেটলি চাপেনি তখনও। ইন্ডিকেটর দিয়ে, আস্তে আস্তে স্পিড কমিয়ে দোকানটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল মোনালিসা। সাধারণ চায়ের দোকান। টালির চালা আঁচল বাড়িয়ে ফুটপাথের মাথা ছেয়ে দিয়েছে। দু' দিকে দুটি বাঁশের খুঁটি দিয়ে তাকে দাঁড় করানো। আর দোকানের গা থেকে ওই বাঁশের খুঁটি পর্যন্ত দু' জোড়া তক্তা পাতা। খদ্দেরদের বসার জন্য। কাচের বয়ামে লেড়ো, প্রজাপতি ও বাসনা বিস্কুট। বুড়ো দোকানি তখন সসপ্যান ধুয়ে তাতে প্যাকেট কেটে দুধ ঢালছে।

দুজনে পায়ে পায়ে দোকানে ঢুকে বসল। এই ভোরেও দোকানে একজন খদ্দের ওদেরও আগে থেকে বসে আছে। ওদের আসতে দেখে সেও একটু নড়েচড়ে বসল। লোকটার পরনে হালকা আকাশি স্ট্রাইপ দেওয়া শার্ট। কালো প্যান্ট। পায়ে বুটজুতো। এই ভোর বেলা, এরকম জায়গায় এরকম পুরোদস্তুর কাজের পোশাকে লোকটি কেমন যেন বেমানান। যদিও কেমন যেন চেনা চেনা লাগছে লোকটা।

মোনালিসা ঠিক লোকটার মুখোমুখি উলটো দিকের বেঞ্চিতে বসল। দেবদীপ্ত বসল লোকটার পাশেই। লোকটা একবার দেবদীপ্তর দিকে তাকাতেই দেবদীপ্ত দেঁতো হেসে বলল, 'ভালো তো?'

লোকটা সঙ্গে সঙ্গে বিগলিত হয়ে ঘাড় হেলিয়ে বলল, 'হ্যাঁ স্যার! আপনি ভালো তো?'

'ওই, একরকম। তা, বাড়ির সব্বাই ভালো?'

'হ্যাঁ স্যার, তা মোটামুটি... কিন্তু স্যার, মানে স্যার...'

ওই 'চিনতে পারছ না তো? আরে তোমার নাম সনৎ না শ্রীধর কী যেন, কান্ট্রি ক্লাবে চাকরি করো তো?'

চকিতে মোনালিসার মনে পড়ে যায়, তাই তো— এই ইউনিফর্মের কালার তো ও এই পনেরো মিনিট আগে দেখে এসেছে কান্ট্রি ক্লাবের গেটে সিকিউরিটি গার্ডদের পরনে।

'হেঁ-হেঁ স্যার, ঠিকই ধরেছেন। তবে আমার নাম সনৎ বা শ্রীধর নয় স্যার, আমি সুদীপ!'

'হ্যাঁ, ওই নামটা গুলিয়ে গেছিল।'

'তা কী হয়েছে স্যার— আপনি যে আমাকে মনে রেখেছেন... হেঁ-হেঁ লোকটা একেবারে মাটিতে নুয়েই পড়ে প্রায়।

দেবদীপ্ত এবার দোকানদারের দিকে তাকিয়ে বলে, 'কাকা, তিনটে স্পেশাল চা। মালাই দিয়ে। সঙ্গে আমাকে একটা বাসনা দেবে। তোমরা কী নেবে?'

মোনালিসা আর সুদীপের দিকে প্রশ্নটা ছুড়ে দেয় দেবদীপ্ত। মোনালিসা কিছু বলে না। সুদীপ বলে, 'আমার একটা প্রজাপতি।

দোকানি সুদীপকে বলে ওঠে, 'তোর তো তাহলে গাড়ি মিস করে ভালোই হল। চেনা নোকের সঙ্গে দেকা হয়ে গেল।'

'তা যা বলেছ। আজই বাঁ... সরি স্যার, বদ অভ্যেস।' বলেই আড়চোখে এক বার মোনালিসার দিকে তাকিয়ে সুদীপ আবার বলে, 'আজই হতচ্ছাড়া অফিসের গাড়িতে অন্য

লোক আছে যে সোজা যাবে। তাই আর গলিতে বেঁকল না।'

'তা তুই যে আর কী একটা গাড়ি দেখে ছুটে গেলি চেল্লাতে চেল্লাতে...'

'আরে সেও বেফালতু। ইস্পিড আস্তে হল বলে গেলাম। শালা, মুখে একগাদা ধুলো উড়িয়ে চলে গেল বেঁকে। মাথায় আবার লালবাতি জ্বালানো। কে জানে কোন লাটের বাঁট যাচ্ছেন।'

লালবাতি জ্বালানো শুনেই মোনালিসা সচকিত হয়ে উঠছিল। দেবদীপ্ত মৃদু ইশারায় সতর্ক করল তাকে। তারপর স্বাভাবিক গলাতেই বলে উঠল, 'কাকা, আমার চা কিন্তু ভাঁড়ে। দিদিমণি কীসে নেবে জিজ্ঞেস করে নাও।'

'আমাকেও ভাঁড়ে।' মোনালিসা বলে উঠল।

দেবদীপ্ত এবার শহুরে টুরিস্ট বাবুদের মতো বলল, 'ওই রাস্তাটা কোথায় গেছে বেশ?'

'ও তো জগাছার দিকে গেছে।' সুদীপ বলল।

'অ।'

বলতে বলতেই চা হাজির। ধোঁয়া ওঠা কাপে একটা চুমুক মেরে মোনালিসার ভেতর থেকে যেন বেরিয়ে এল, 'আহ!'

বলে ফেলেই সে দেবদীপ্তর দিকে তাকাল। ঠিক শুনতে পেয়েছে ব্যাটা। চোখে একটা দুষ্টু হাসির ঝিলিক খেলে গেল।

ওরা চা খেতে খেতেই একটা ছোট টেম্পো এসে দাঁড়াল। কথাবার্তায় জানা গেল ওরা সুদীপের চেনা। সুদীপ তড়িঘড়ি ভাঁড়ের চা শেষ করে, ওদেরকে হেসে বিদায় জানিয়ে কেটে পড়ল।

সুদীপ চলে যাবার পর থেকেই মোনালিসা উশখুশ করছিল। কিন্তু দেবদীপ্তর কোনো তাড়া নেই। অন্তত বাহ্যিক কোনো তাড়া নেই। ধীরে-সুস্থে ভাঁড়ের চা শেষ করে দোকানিকে বলল, 'একটা গোল্ডফ্লেক দেখি কাকা। পাঁচ টাকারটা দেবে।'

পয়সা মিটিয়ে সিগারেট উনুনের আগুনে ধরানো কাগজের টুকরোতে জ্বালিয়ে— আয়েশ করে ধোঁয়া ছাড়ল দেবদীপ্ত। তারপর দোকানিকে হঠাৎ করে বলল, 'জগাছা এখান থেকে কদ্দূর গো?'

`সে আপনের এই রাস্তা ধরে পাঁচ মিনিট এগোলেই জগাছা যাবার রাস্তা, সিধে। কিন্তুন, আপনি যাবেন কোনখেনে?'

'আমি একটু থাকবার হোটেল-টোটেল খুঁজছি। রাস্তার ধারে নয়, একটু ভেতর দিকে। খুব দামি নয়, তবে ধরো কিনা, মেয়েছেলে নিয়ে থাকবার মতো।' বলে একটু কায়দা করে ইশারা করার মতো চোখ টেপে।

মোনালিসা হাঁ করে শুনছিল। নাহ, লোকটার এলেম আছে। যদি অভিজাত সত্যিই গাড়ি নিয়ে এই রাস্তায় ঢুকে থাকে তাহলে কোথাও রাত কাটাবে বলেই। দেবদীপ্ত কায়দা করে সেটারই খবর নেওয়ার চেষ্টা করছে। শুনতে পায়, দোকানি বলছে, 'এখেনে সেসব পাবেন নে। ওই ধাড়সা মনসাতলার কাচে একখান বিয়েবাড়ি ভাড়া দেবার হল আচে। মদ্যে-মাজে ওরা দিলে দিতে পারে।'

'তুমি যেন আবার আনসান ভেবো না কাকা। আমরা বিয়েই করব। কিন্তু মেয়ের বাড়ির লোক হেব্বি বাগড়া দিচ্ছে। বিজনেসের ফ্যামিলি তো, পহেচান পোচুর। তাই কালীঘাটে গিয়ে মালাবদলটা না হওয়া অবধি একটু গা-ঢাকা দিয়ে থাকা।'

'সে আমি দেকিই বুজতি পেরিচি। বয়েস তো আর কম হল নে। দেকে দেকে হনু হদ্দ, বসে গেনু হাত চোদ্দো। তা আপনে ওইখেনেই যান। দাশগুপ্তদের বাড়ি বলেই নোকে চেনে। এখান থেন খানিক দূর পড়বে যদিও। তেবু, ওইখেনেই যান গিয়ে।'

'বেশ। চললাম। ভালো থেকো কাকা, আবার দেখা হবে।'

দেবদীপ্তর কথা শেষ হতে হতেই মোনালিসা বেরিয়ে এসেছিল দোকানের চালার নীচ থেকে। তার অস্থির অস্থির লাগছে। মনে হচ্ছে ভাগ্যক্রমে হারিয়ে ফেলা সুতোর খুঁট যদি-বা

খুঁজে পেয়েছে, বেশি দেরি করলে আবার হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে।

স্কুটিতে স্টার্ট দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দেবদীপ্ত এসে বসল পেছনে। দোকানির আর সুদীপের দেখানো রাস্তা— যা দিয়ে ওই লালবাতি জ্বালানো গাড়ি চলে গেছে ঘণ্টা খানেক আগে, সেই রাস্তা ধরল মোনালিসার স্কুটি। এক-দু' মিনিট চুপচাপ চলার পর মোনালিসা বলল, 'কয়েকটা জিনিস জানার ছিল, দেবদা।'

'বলো।'

'ইউনিফর্ম দেখে নাহয় কাজ করে কোথায় জানলে, কিন্তু ওর নাম কী করে জানলে তুমি?'

'জানতাম না তো। তবে এস দিয়ে বাঙালিদের কয়েকটা কমন নাম আছে। তাই আন্দাজ লাগালাম। না মিললে ভুল হয়েছে, সরি, বলে মিটিয়ে দিতাম। তখন তো আর জানতাম না ওই ব্যাটার থেকে কাজের কিছু পাব।'

'তার মানে কোনো ডিডাকশন নয়? পুরোটাই হাঞ্চ?' একটু যেন দমে গেল মোনালিসার গলা। বুঝতে পেরে দেবদীপ্ত আবার সেই ব্যঙ্গের গলায় বলল, 'শোনো মামণি — বাস্তব জীবনে জার্নালিস্টদের যাবতীয় বড় ব্রেক, তার আশি পার্সেন্ট হচ্ছে ওই যেখানে দেখিবে ছাই— মানসিকতার ফল। আর লেগে থাকার ক্ষমতা। তাকে ইঞ্জিরিতে হাঞ্চ বলুক, কী লাঞ্চ— সেটাই সত্যি।'

মোনালিসা এবারে আর ওই টোনটা অতটা গায়ে মাখে না। এতক্ষণে গাসওয়া হয়ে গেছে। সে আবার জিজ্ঞেস করে, 'তুমি কী করে নিশ্চিত হচ্ছ যে অভিজাত এই এরিয়াতেই রাত কাটাতে চাইবে? ও তো অন্য কোথাও চলে যেতেই পারে। সঙ্গে গাড়ি আছে। পয়সার অভাবও নেই।'

'অবশ্যই পারে। আমি একদমই নিশ্চিত নই যে সে এদিকেই এসেছে। তবে হ্যাঁ, একই সময়ে একাধিক লালবাতিওয়ালা গাড়ি কোনো এক্সপ্রেসওয়ে দিয়ে যাবে, এমন সম্ভাবনা থাকলেও খুবই কম। আর যদি এটাই সেই গাড়ি হয়ে থাকে, তাহলে সে লোকালয় খুঁজছে। কারণ লুকোনোর, গা-ঢাকা দেওয়ার সেরা জায়গা হচ্ছে লোকালয়। ভেবে দেখো, ঘটনাটা ঘটার পর, অর্থাৎ সিএম আছাড় খাবার পর প্রায় ঘণ্টা তিন-চার কেটে গেছে। এই খবরটা ওর লেক কান্ট্রি ক্লাবে থাকাকালীনই পেয়ে যাওয়া উচিত। কেউ-না-কেউ ফোনে জানিয়ে দেবেই। তখনও তো ও সন্দেহভাজন নয়। এখন, যদি ও রিয়েল গিলটি হয়, তাহলে ভালোমতোই জানবে যে পুলিশ খুঁজতে শুরু করবে হাইওয়ে বরাবর। তাই আশেপাশের এই কনজেস্টেড লোকালয়গুলোতে ঢুকে পড়লে গা-ঢাকা দেওয়া বেশি সোজা...'

শুনশান রাস্তা দিয়ে গাড়ি চালাতে চালাতে একমনে কথাগুলো শুনছিল মোনালিসা। সায়ন ঠিকই বলেছিল। আ লট টু লার্ন ফ্রম হিম। দেবদীপ্ত একটানা বলেই চলেছে, "...সুতরাং, ওই যে বললাম— যেখানে দেখিবে ছাই... ওই দেখো ইউবিআই ব্যাঙ্কটা। বুড়োটা এখানে এসেই কাউকে জিজ্ঞেস করে নিতে বলেছিল।'

'কখন আবার বলল সে কথা?'

'যখন তুমি অধৈর্য হয়ে বেরিয়ে এসে স্টার্ট দিচ্ছিলে তোমার গাড়িতে।' যদিও ভোরের আলো ফুটতে শুরু করেছিল, তবুও রাস্তা দেখানোর লোক পাওয়া মুশকিল।

সেই কখন ওই ব্যাঙ্কের কাছ থেকে শুরু হয়েছে অভিজাত নামের আলেয়ার পেছনে ধাওয়া করা। এখন বেলা দশটা বাজে। দু' কাপ চা আর আধ বোতল জল ছাড়া কিছু পেটে পড়েনি মোনালিসার। বাথরুমেও যেতে পারেনি সে। মনে হচ্ছিল এবার বাড়ি ফিরে যেতে পারলেই বাঁচে। ঠিক তখনি হারানো সুতোর খেইটা আবার ভেসে উঠল। তাই নিজের আগ্রহ চেপে রাখতে না পেরে সে একেবারে গোটা তিনেক প্রশ্ন ছুড়ে দেয় এই অল্পবয়েসি ফুটবলার ছেলেটির দিকে, যে সেই তখন থেকে ওর চোখ থেকে চোখ সরায়নি এক বারও।

'গাড়ির ভেতরে কাউকে দেখতে পেয়েছিলে? নাম্বার প্লেটটা দেখেছিলে গাড়ির?

কোনদিকে গেল গাড়িটা দেখেছ?'

কোনোক্রমে নিজেকে সামলে চোখ পিটপিটিয়ে মনিরুল বলে, 'কালো কাচ ছেল। ভেতরবাগে কাউকে দেখে পাইনি। লম্বরও দেকিনি।'

বেশ জোরে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল মোনালিসা। জিজ্ঞেস করল, 'কোনদিকে গেল গাড়িটা?'

'ওই সোজা, নবশক্তি কেলাবের দিকে।'

ততক্ষণে আরও জনা কয়েক লোক জড়ো হয়ে গেছে। পাড়া-ঘরে লোকজন খবরের কাগজের লোককে ভালোবাসে। ভাবে তাদের সঙ্গে কথা বললে কাগজে নাম ছাপা হবে বেশ। সেই চক্করে পড়ে লোকজন প্রচুর ভুলভাল খবরও দিয়ে থাকে। কিন্তু এই ছেলেটার হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে না বানিয়ে বলছে বলে। দেবদীপ্ত এক বার চারপাশে তাকিয়ে ভিড়ের উদ্দেশেই বলে, 'রাস্তাটা ওইদিকে কদ্দূর গেছে?'

'সোজা গিয়ে মাকড়দা রোডে পড়ছে।' একজন বলে উঠল।

দেবদীপ্ত এবারে মোনালিসার দিকে তাকায়। টানা আট-ন' ঘণ্টা মেয়েটা স্কুটি চালাচ্ছে। বিধ্বস্ত হয়ে আছে। দেবদীপ্তর অভ্যেস আছে। মেয়েটার অতটা নেই। ওকে একটু রেস্ট দিতে হবে।

ভিড় কাটিয়ে একটু পাশে সরে আসে সে মোনালিসাকে টেনে নিয়ে। বলে, 'এবার তুমি ফিরে যাও। রেস্ট নাও। সন্ধে বেলা আটটায় অফিসে এসো। আমি ওখানেই মিট করব তোমাকে।'

'আর তুমি?'

'আমি দেখি আর একটু, এদিক-ওদিক।'

'সে আবার হয় নাকি? গেলে একসঙ্গেই ফিরব।'

'তাতে কোনো কাজ হবে না। তোমাকে এখন আমার ফ্রেশ দরকার। এই অবস্থায় তুমি বেশিক্ষণ টানতে পারবে না। বাড়ি যাও। বরং এক কাজ ক'রো— এই নম্বরটাতে যোগাযোগ ক'রো। সাধনবাবু, দ্য ইনভিজিবল ম্যান। কাল রাত্রে যার সঙ্গে কথা বলছিলাম। সব জায়গায় আছেন অথচ কারও নজরে পড়েন না। আমার সোর্স। অবিশ্যি সাধনবাবু এনার আসল নাম নয়। তবে তুমি এই নামেই ডেকো। এঁর থেকে খবর নিও কাল রাত্রে অভিজাতর দেহরক্ষীর ডিউটি কার বা কাদের ছিল? আর ড্রাইভারই-বা কে ছিল? তাদের ট্রেস করে খোঁজ করো অভিজাত বা ওই দুজনের চেনা কেউ এই অঞ্চলে থাকে বলে বের করতে পারো কিনা। ফেসবুক প্রোফাইল, সাধনবাবুর দেওয়া ইনফো, তোমার নিজের যদি কিছু সোর্স থাকে, বিজনদা— মোট কথা কভার অ্যাজ মাচ গ্রাউন্ড অ্যাজ পসিবল।'

পকেট থেকে একটা নম্বর লেখা চিরকুট বের করে দেবদীপ্ত ধরিয়ে দিল মোনালিসার হাতে।

দেবদীপ্তর বলার ধরনের মধ্যে কিছু একটা ছিল। একটা বাড়তি তাড়াহুড়ো, এক চিলতে বাড়তি যত্নের ছোঁয়া যেন বা! শীতের রোদের মতো সেই স্নেহের ওমটুকু গায়ে মেখে নিল মোনালিসা। আর বেশি ঝামেলা করল না। এমনিতে ওর শরীরও আর দিচ্ছিল না। চুপচাপ হেলমেট মাথায় দিয়ে স্কুটি চালু করল ফের। ফেরার পথে আবার নাহক পনেরো কিলোমিটার গাড়ি চালানো। এবারে ট্র্যাফিকও থাকবে।

মোনালিসা গাড়ি স্টার্ট করতে, হাঁপ ছেড়ে একটা সিগারেট ধরায় দেবদীপ্ত। ততক্ষণে মিষ্টির দোকানের ভিড় আলগা হয়ে গেছে। কেবল ওই যে ছেলেটি গাড়িটা দেখেছে সে রয়ে গেছে। ওর দিকেই তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে। দেবদীপ্ত ইতস্তত ঘুরতে ঘুরতে একটু আড়াল খুঁজতে যায়। অনেকক্ষণ হিসি পেয়েছে। তার নজরে আসে বাজারের মাঝামাঝি একটি ঘেরা জায়গা। দুর্গন্ধে আন্দাজ করা যায়, ওটাই বাথরুম। ও সেদিকে এগিয়ে যেতেই একটা কচি গলা কানে আসে, 'মণিদা শুধু গাড়ি দেখেছে। আমি আরু দেখেচি।'

ফিরে তাকিয়ে দেখে একটা রোগাভোগা, কালো ছেলে। কণ্ঠার হাড় উঁচু। চুলে তেল

নেই। সারা গায়ে ধুলো। জামার একটাও বোতাম নেই। জিরজিরে হাড়পাঁজরা গোনা যায়। প্যান্টটা যদিও মনে হচ্ছে নতুন। বেশ নতুন। একটা নাক দিয়ে শিকনি গড়িয়ে পড়ে পড়ে শুকিয়ে ঠোঁটের ওপরে মড়মড়ি পড়ে গেছে।

দেবদীপ্ত ওর দিকে একটুও না এগিয়ে জিজ্ঞেস করে, 'কী দেকিচিস?'

ছেলেটা ঘুরে পানের দোকানের দিকে তাকায়। তার সামনের বয়ামে ছোট ছোট প্লাস্টিকের জারে করে জেলি লজেন্স বিক্রি হচ্ছে। একটা আঙুল তুলে সেদিকে দেখায়।

দেবদীপ্ত চট করে গিয়ে দোকান থেকে দুটো জেলি লজেন্সের প্যাকেট কিনে এনে ছেলেটার হাতে দেয়, 'কী নাম তোর?'

'কানি।'

'ভালো নাম?'

'কানন গুছাইত।'

'কানন, ইশকুলে পড়িস?'

'হ্যাঁ, খিচুড়ি ইশকুলে যাই, মদ্যে-মাজে।'

'মণিদা কে?'

'যার সঙ্গে তুমি কতা কইলে। ওই দিদিমুনিটা কতা কইল। মণিদা।' 'তুই কী দেকিচিস, যা মণিদা দেখেনি?'

"মণিদা তো রাস্তায় ছেল। পেছন থেন দেকেচে। আমায় বাপ খুব কেলাইন দিল। তাই আমি জালনায় বসে কাঁদচিলুম। তোকুন গাড়িটা এল। দেকলুম পেচোনের লোকটা ঘুমুচ্ছে। মুখটা এদিগের জালনার কাচে ঠেসানো।' 'আর, আর কী দেখলি?

'ওই লোকটাকে টিপিতে দেকিয়েছিল। এক বার দেকেচি। আর মেলেটারি লোকটাকে এইমাত্তর দেকেচি।'

শুনেই চমকে ওঠে দেবদীপ্ত।

'এইমাত্র? কোথায়?'

'ওই পানের দোকানে দাঁইড়েছিল। আপনেরা যে কতা কইচিলেন, তোকুন।' দেবদীপ্ত ব্যগ্র হয়ে চারপাশে তাকায়। তাকাতে তাকাতে জিজ্ঞেস করে, 'কোনদিকে গেল দেকিচিস?'

'ওই আচ্ছমের দিকে। মাত্তি আচ্ছম।'

দেবদীপ্ত আন্দাজে বুঝল ওটা 'মাতৃ আশ্রম'। জিজ্ঞেস করল, "সেটা কোনদিকে?'

কানি আঙুল তুলে দেখাল রাস্তার দিকে, 'দেকলিই বুজতে পারবে, মুকোমুকি পীর বাবার থান আর আচ্ছম।'

কানির দেখানো রাস্তায় হাঁটতে শুরু করল দেবদীপ্ত। পাঁচ-সাত মিনিট হেঁটে বড় রাস্তা থেকে বেশ কিছুটা ভেতর দিকে ঢুকে এসেছে সে। এই রাস্তাগুলোর দু' পাশে বড় বড় গাছ। প্রচুর ছায়া। সিমেন্টের বাঁধানো রাস্তার পাশ দিয়ে আঢাকা নর্দমা। কোথাও টালির চালের সিমেন্টের দেওয়ালের ন-চ্যাংড়া ক্লাব, কোথাও হাঁটু অবধি ঘাস গজিয়ে যাওয়া পতিত জমি। আধভাঙা পঞ্চায়েতি টিউবওয়েল, শান বাঁধানো শনিমন্দির— যত এগোচ্ছিল, তত দেবদীপ্ত বুঝতে পারছিল যে সে এই ধাড়সা নামের আধা মফস্সলের শরীরের ভেতরে ঢুকে পড়ছে আরও বেশি।

আরও মিনিট দুই-তিন হাঁটতেই একটা সাইনবোর্ড দেখতে পেল দেবদীপ্ত। লেখা আছে 'মাতৃ আশ্রম', আর একটা তীর চিহ্ন দেওয়া আছে একটা গলির দিকে। গলিটায় ঢুকতেই কেমন যেন একটা শান্তির পরিবেশ। দু' পাশে প্রচুর গাছপালা। এই গলিতে কোনো দোকানপাট নেই। লোকজনের চলাচলও নেই। এক বার এদিক-ওদিক তাকিয়ে গলিটার মধ্যে ঢুকে পড়ল সে। মনে মনে ভাবতে থাকল অভিজাতকে খুঁজে বার করে তার প্রথম প্রশ্ন কী হবে। পকেট থেকে টেপরেকর্ডারটা বার করে দেখে নিতে হবে সব ঠিকঠাক রেডি আছে কিনা।

ব্যস্ততার মাঝে সে খেয়াল করল না, তার পেছনে গলির মুখে আরও একটি লোক

ঢুকছে। পরনে তার সিকিউরিটি পার্সোনেলের পোশাক। ঠিক যেমনটি ভিভিআইপিদের দেহরক্ষীরা পরে থাকে।

অষ্টম অধ্যায়
।। দ্য উইক ডিফেন্স।।

১৭ জুলাই, ২০১৮, সন্ধে বেলা / করাচী, পাকিস্তান

পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী ও কর্মকুশল গুপ্তচর সংস্থা কোনটি? লোকের মধ্যে মতানৈক্য থাকতে পারে। কেউ বলবে মোসাদ, কেউ বলবে সিআইএ। ঠান্ডা যুদ্ধের সময়কালীন কেজিবিও এই বিষয়ে খুব একটা পিছিয়ে থাকবে না।

কিন্তু যদি জিজ্ঞেস করা হয় পৃথিবীর সবচেয়ে সন্দেহবাতিক, অবিশ্বাসী গুপ্তচর সংস্থা কোনটি? এই পেশার সঙ্গে জড়িয়ে থাকা শতকরা নব্বই শতাংশ মানুষ একমত হবেন... আইএসআই।

আইএসআই অর্থাৎ ইন্টার সার্ভিস ইন্টেলিজেন্স— পাকিস্তানের গুপ্তচর সংস্থা। ১৯৪৮ সালে তৈরি হওয়া এই সংস্থাটির তখনকার মতো উদ্দেশ্য ছিল সেনাবাহিনীর তিনটি প্রধান শাখা, স্থলবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনীর মধ্যে তথ্যের অবাধ আদান-প্রদান। নাম থেকেই মালুম হয় যে মূলত এই সংস্থায় আর্মড সার্ভিস থেকেই লোক নিয়োগ করা হয়। তবে বিগত তিন দশক ধরে আইএসআইএর সাধারণ নাগরিক নিয়োগের সংখ্যা ক্রমশ বেড়েছে।

এদের ভারতীয় কাউন্টারপার্ট র-এর অর্গানাইজেশনাল গঠন সম্বন্ধে প্রায় কিছুই জানা যায় না। শুধু জানা যায় যে তাদের আলাদা আলাদা ডেস্ক রয়েছে আলাদা আলাদা দেশ বা কখনো কয়েকটি দেশের জোট সম্বন্ধীয় তথ্য জোগাড় এবং বিশ্লেষণ করার জন্য।

আইএসআই-এর গঠন কিন্তু সে তুলনায় যথেষ্ট প্রচারিত। মোটামুটিভাবে দশটি আলাদা আলাদা দপ্তর আছে এদের। তার মধ্যে স্ট্র্যাটেজিক্যালি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলতে তিনটি দপ্তর। জয়েন্ট ইন্টেলিজেন্স এক্স এবং জয়েন্ট কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো হচ্ছে পুরোপুরি তথ্য সংগ্রাহক। মূলত ইন্টেলিজেন্স ও তার অ্যানালিসিসই এদের কাজ। জিক্স (জয়েন্ট ইন্টেলিজেন্স এক্সকে এই দুনিয়ার লোকজন এই নামেই ডাকে) হচ্ছে কোঅর্ডিনেশন করার দপ্তর। অন্য ন'টি দপ্তরের ডেটা-ইন্টেলিজেন্স জড়ো করে, ঝাড়াই-বাছাই করে, গুপ্তচর জগতের ভাষায় অ্যাকশনেবল ইন্টেলিজেন্সের রিপোর্ট বানানো এদের মূল দায়িত্ব। অন্যটি, অর্থাৎ জয়েন্ট কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো হচ্ছে ভারত নিবেদিত প্রাণ। র-এর যেমন একটি আলাদা ডেস্ক আছে পাকিস্তান বা আরও বিশেষ করে বললে আইএসআই-এর গতিবিধি ও কার্যকলাপের ওপর নজর রাখার জন্য, ঠিক তেমনি আইএসআই-এর আছে জেসিআইবি।

এ ছাড়া আছে একটি দপ্তর। বিশেষ দরকার না পড়লে তাদের ডাক আসে না। এ জগতের পরিভাষায় তারা আসে 'ওয়েট জব' বা 'ডার্টি জব' করতে। দীর্ঘ সোয়া দুশো বছরের গেরিলা যুদ্ধের অভিজ্ঞতা নিয়ে বেড়ে ওঠা পাশতুনদের নিয়ে মূলত এই বাহিনী গঠিত হয়। পাকিস্তান সরকারের যে অংশটি গণতান্ত্রিক ধোঁকার টাটি দুনিয়ার সামনে বজায় রাখতে চায়, তাদের অধিকাংশই এদের অস্তিত্ব সম্বন্ধেও ওয়াকিবহাল নয়। আর যারা জানে, তারা ব্যক্তিগত পরিসরেও নিতান্ত দায়ে পড়লে ফিসফিস করে এদের কথা বলে। এদের ক্যাড বা কোভার্ট অ্যাকশন ডিভিশন বলা হয় অফিসিয়ালি।

বাস্তবে এরা আইএসআই-এর কিলিং মেশিন। ওয়াকিবহাল মহলে এদের আনুগত্য নিয়ে সন্দেহ থাকলেও এদের কাজের নিষ্ঠুর পেশাদারিত্ব ও প্রশ্নাতীত দক্ষতা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। নতুন কেউ দপ্তরে ঢুকে যদি সামান্য সন্দিহান থাকে, তাকে শোনানো হয় যে ১৯৪৭-এ, এই দপ্তর তৈরি হওয়ারও আগে, এই পাশতুনরা কীভাবে মান্ধাতা আমলের অস্ত্রশস্ত্র ও বিনা রসদে আধা-কাশ্মীর এনে দিয়েছিল পাকিস্তানি সরকারের পায়ের তলায়,

যাকে দুনিয়া আজকে পিওকে বলে চেনে।

আব্বাস দিলদার সিদ্দিকি পেশায় ও নেশায় বিজনেসম্যান। পেট্রোল পাম্প, প্রোমোটিং ইত্যাদি ছাড়াও উর্দু ভাষায় একটি চব্বিশ ঘণ্টার খবরের চ্যানেল আছে তাঁর। ন্যাশনাল এক্সপ্রেস নিউজ। শৌখিন লোক। সুন্দরী বিবি। ঘরে দাওয়াত

মেহফিল লেগেই থাকে। তাতে করাচির অনেক কেওকেটাকেও প্রায়শই দেখা যায়। রকমারি দিকে ধান্দা ছড়িয়ে থাকার ফলে দিলদারভাই সোসাইটির সব লেভেলের খবরের খনি। তার মধ্যে বেশিরভাগ হচ্ছে পেজ থ্রি-র গসিপ। সেগুলোই এই সব পার্টি-মেহফিলের জান। কিন্তু এর বাইরের কিছু খবর থাকে। সেগুলোর পেহচান থাকে শুধু জহুরির কাছে। দিলদারভাই গসিপের থেকে আসলি খবর আলাদা করতে পারেন। যেমন হাঁস জল থেকে দুধ আলাদা করে নিতে পারে। আর তাই, এই ক্রাইম অধ্যুষিত চানেসার গোঠে আইএসআই-এর চোখ, কান, নাক— সবই

এ ব্যাপারটা যদিও মোটেও খুব একটা গোপন নয়। জানকার লোকজন সবাই জানে। জানে ইফতিকারও। আর জানে বলেই সে দিলদারভাইয়ের এই অতিরিক্ত মেহমান-নওয়াজি, ভাবির জবরদস্তির আবদার— সব সহ্য করে নেয়। কারণ সে অপেক্ষা করে আছে। সোজা রাস্তায় পরীক্ষা দিয়ে সরকারের উঁচু জায়গায় যাওয়ার আশা সে প্রায় ছেড়ে দিয়েছে। এখন একটাই উপায়। কিছু করে দিলদারভাইয়ের নজরে আসা। যদি সেখান থেকে আইএসআই-এ চ্যানেল বাগানো যায় তাহলে তরক্কির সিঁড়ি তো বটেই— নাগালে আসবে ইফতিকারের পছন্দের কাজও।

আজ এতদিনে হয়তো সেই সুযোগ পাওয়া গেছে।

সকাল থেকে প্রচুর টালমাটাল গেছে। মাথা স্থির করে ভাবার সময় পায়নি

সকালে মতিহার এসে খবর দিতে প্রথমটায় বিশেষ গা করেনি ইফতিকার। চ্যানেসার গোঠে মার্ডার মোটামুটি কাবাবের মতোই সুলভ। হরবখতই হচ্ছে। ধীরে-সুস্থে গেলেই হবে। তাই সে ঘাড় নেড়ে আবার মন দিয়েছিল ইউনিফর্ম ধোয়ায়। বমির দাগটা বেশ জিদ্দি। হলদে দাগটা উঠতেই চাইছিল না।

মোটামুটি একটা হিল্লে করে জামাটা আবার গায়ে চড়ায় ইফতিকার। তারপর বাথরুম থেকে বেরিয়ে অর্ডার দেয় গাড়ি বের করার। থানা থেকে রেল ইয়ার্ডের রাস্তা মেরে-কেটে দেড় কিলোমিটার। কিন্তু ইমাম আহমেদ রোড প্রায় পুরোটা জুড়েই ট্র্যাফিক ধীরে চলে। সেটাই দস্তুর। রাস্তায় থাকা ট্র্যাফিক পুলিশ নিজের মাসকাবারি আদায়পত্র নিতে বেশি ব্যস্ত থাকে, তাই গাড়িঘোড়ার ভিড় অতটা সামলে উঠতে পারে না। ওইটুকু রাস্তা পেরোতেই প্রায় আধ ঘণ্টা লেগে গেল।

সাইট অফিসের চারপাশে তখন ভিড় জমেছে। গোটা সাইটেরই কাজ প্রায় বন্ধ। সুপারভাইজার আফজল বেগ দু-এক বার খেস্তাখিস্তি করে দেখেছে কোনো লাভ হবে না। খুন-জখম, অপরাধ, পুলিশ— এসবের নিষিদ্ধ আকর্ষণ এতটাই প্রবল যে এখন লোকজনকে নড়ানো মুশকিল। তা ছাড়া পুলিশ এমনিতেই হয়তো সব্বাইকে তলব করবে। এই সব সাত-পাঁচ ভেবে বেগ তাই এখন চুপ করে গেছে।

ইফতিকার নেমে চারপাশটা এক বার চোখ বুলিয়ে দেখে নিল। নতুনত্ব কিছু নেই। এই জায়গাটা বহু বার আগে দেখেছে সে। অফিসঘরটার দিকে এগোতে এগোতে সে বেগকে জিজ্ঞেস করল, 'লাশ বা ঘরের অন্য কোনো জিনিসে কেউ হাত দেয়নি তো?'

'আমি আসার পর আর কাউকে কিছু করতে দিইনি হুজুর। আপনার ইন্তেজার করছিলাম। তবে আমি আসার আগে এই মুখ্যুগুলো কিছুতে হাত দিয়ে থাকলে সে খবর জানি না। আপনার ধারালো চোখ। ইনশাল্লাহ আপনার কিছুই নজর এড়াবে না!'

'হুম।'

সঙ্গের পুলিশ ততক্ষণে আশেপাশে কর্ডন লাগাতে শুরু করেছে। ঘরে ঢুকে লাশ দেখে প্রথমেই একটু ভুরু কুঁচকে গেল ইফতিকারের। মাথাটা পুরো থেঁতলে দেওয়া হয়েছে। মুখের ছবি তুলে শনাক্ত করার কোনো উপায় নেই। এরকমভাবে সাধারণত গ্যাং-এর লোকেরা একে অন্যকে মারে না। সেখানে ছুরির ঘায়েই বেশি মরে লোকে।

উবু হয়ে লাশের পাশে বসে একটু খুঁটিয়ে দেখতে শুরু করে ইফতিকার। ফ্রন্টাল লোব আর কিছু অবশিষ্ট নেই। গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গেছে। ভারী বোল্ডার বা কংক্রিটের চাঙড়ের মতো খুব ভারী কিছু দিয়ে না মারলে এতটা বাজে অবস্থা হয় না। আর মারা হয়েছে সামনে থেকে। কারণ পেরিয়েটাল আর অক্সিপিটাল অংশগুলো অতটা ক্ষতিগ্রস্ত নয়। সেটাই আরও আশ্চর্য লাগছে ইফতিকারের। সামনে থেকে এরকম একটা ভারী জিনিস দিয়ে কাউকে আঘাত করাটা খুব সোজা কাজ নয়। ওরকম ভারী জিনিস তুলতে যা ক্ষমতা আর সময় লাগবে, তাতে যাকে মারতে যাওয়া হচ্ছে তার প্রতিরোধ করার বা পালিয়ে যাবার সুযোগ অনেক বেশি। যদি না সে হাত-পা বাঁধা থাকে বা আগেই মারা গিয়ে থাকে। এই সম্ভাবনাটার কথা মাথায় আসতেই ইফতিকার মতিহারের দিকে তাকায়, 'গ্লাভস!'

মতিহার বিনা বাক্যব্যয়ে এগিয়ে দেয় গ্লাভস। পুলিশের ফোটোগ্রাফার ততক্ষণে আশেপাশের ফোটো তুলতে শুরু করে দিয়েছে। এক বার সেদিকে তাকিয়ে ইফতিকার গ্লাভস পরে নেয় হাতে। সন্তর্পণে উপুড় হয়ে থাকা শরীরের খুলির পেছনের হাড়ে আঙুল ছোঁয়ায়। মচ করে আওয়াজ করে খোলামকুচির একটা টুকরোর মতো পেরিয়েটালের একটা অংশ খুলে গেল। চট করে হাত সরিয়ে নিল ইফতিকার। কিন্তু সেইসঙ্গে সে যা সন্দেহ করছিল, দেখতেও পেল।

খুলির হাড়ের খাঁজে আটকে থাকা বুলেটের খোল।

তার মানে মৃত্যুর কারণ গুলি এবং সেটা মাথায় করা হয়েছে সামনে থেকে। মাথায় গুলি মানে ফ্যাটাল শট। তাহলে আবার এরকম ভারী কিছু দিয়ে আঘাত করে...

খুব সন্তর্পণে বুলেটের খোলটা দু' আঙুলে তুলে আনে ইফতিকার। হাতের কাছে মতিহার একটা এভিডেন্স ব্যাগ এগিয়ে দেয়। তাতে খোলটা ভরে রেখে লাশের পাশ থেকে গা ঝাড়া দিয়ে উঠে পড়ে ইফতিকার। নিজের টিমকে নির্দেশ দেওয়ার জন্য ফিরে তাকিয়ে বলে, 'ফরেনসিক টিম কি আসছে?'

'প্রায় পৌঁছে গেছে স্যার।' কে একজন বলে উঠল।

'ওদের কাজ হয়ে গেলে বডি পোস্ট-মর্টেম করার জন্য পাঠিয়ে দেবে।' 'ওকে স্যার।'

'এখন এক বার পকেটগুলো সার্চ করে জিনিসগুলো নিয়ে এসো। আমি ততক্ষণ লোকগুলোর সঙ্গে একটু কথা বলি।'

বলতে বলতে পায়ে পায়ে ইফতিকার এগিয়ে যায় সেদিকে, যেদিকে সুপারভাইজারের পেছনে সার দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে মজদুরগুলো। এদেরই কেউ প্রথম দেখেছে লাশটা। গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করে, "কে প্রথম দেখতে পায় লাশ?'

সুপারভাইজার কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল। তার আগেই হাউমাউ-কিচকিচ করে চারটে লোক একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল, আর আট-আনা চোখের জল, চারআনা নার্ভাসনেসের সঙ্গে চার-আনা কথা মিশিয়ে কীসব বলতে থাকল। প্রায় দশ মিনিট ধরে তাদেরকে শান্ত করে, এক এক করে তাদের কথা শুনে ছবিটা পরিষ্কার হল ইফতিকারের কাছে। অন্তত এটা বোঝা গেল যে এরা বিশেষ কিছুই জানে না যা থেকে এই তদন্তে সাহায্য হতে পারে। তবু, পুলিশি কানুন বলে কথা।

এদের চার জনকেই থানায় নিয়ে যেতে হবে। এদের বয়ান নিতে হবে। প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিতে ও মতিহারের দিকে ফিরতেই দেখল একটা খবরের কাগজের ওপর কয়েকটা

জিনিস নিয়ে মতিহার দাঁড়িয়ে আছে।

‘এগুলো কী?’

‘ওই লাশের পকেট থেকে পাওয়া গেছে হুজুর।'

‘আবে উল্লুক কাঁহিকা, ওই টেবিলে রাখো। এরকম করে দেখা যায়? একটু উত্তেজিত হয়ে চেঁচিয়েই ফেলে ইফতিকার। অস্বস্তিকর চিন্তার পোকাটা মাথার ভেতর কুড়কুড় করছে। খুলি ভেঙে দেবার কী দরকার ছিল?

মতিহার একটু থতোমতো খেয়ে সরে যায়। সাহেবকে সে এতদিনে বিশেষ মেজাজ গরম করতে দেখেনি। সন্ত্রস্ত পায়ে গিয়ে চটপট সে একটা কাঠের চালার ওপর সাজিয়ে ফেলে লাশের পকেট থেকে পাওয়া জিনিসগুলো।

বিশেষ কিছুই নেই। কিছু খুচরো পয়সা, একটা রুমাল, সাদা রঙের ময়লা হয়ে এখন হলদেটে ভাব নিয়েছে। আর আছে একটা সিএনআইসি কার্ড। কার্ডটা নেড়েচেড়ে দেখল ইফতিকার। নাম লেখা আছে রাজ্জাক আলি। খুব কমন নাম। জন্ম তারিখ দেওয়া আছে ১২ মার্চ, ১৯৮৭। কার্ডের নাম্বারটা দেখে, কী মনে হওয়াতে কার্ডটা নিজের পকেটে রেখে দিল ইফতিকার।

তারপর মুখ তুলে বলল, ‘আমি অফিস চললাম। মতিহার, ফরেনসিকের কাজ শেষ হলে জায়গাটা সিল করে এসো।'

‘জি স্যার।’ মতিহার বাধ্য ছেলের মতো ঘাড় নেড়ে সায় দিল।

‘তোমার বাইকের চাবিটা দাও। তোমরা গাড়িতে চলে এসো।'

মতিহার বাইকের চাবিটা অনিচ্ছাসত্ত্বেও তুলে দেয় স্যারের হাতে। নতুন লাল টুকটুকে হন্ডা সিজি ১২৫। বিবির বায়নায় কেনা, মাহরের যা টাকা জমেছিল তার সঙ্গে নিজের জমানো কিছু টাকা দিয়ে সে বাইকটা কিনেছে সপ্তাহ খানেক হল। থানায় সবাই খুব নজর দিচ্ছিল চড়বে বলে। হারামিগুলোকে হটিয়ে দেওয়া গেছে। তা বলে সাবকে তো আর না বলা যায় না।

ইফতিকার মতিহারের থেকে চাবিটা নিয়ে বেরিয়ে যখন বাইক স্টার্ট করল তখন ঘড়িতে তিনটে চল্লিশ। স্টার্ট দেওয়া বাইকে বসেই সে মোবাইলে একটা নাম্বার ডায়াল করল। ওপাশে সাড়া পেতেই বলল, ‘ইউসুফভাই! আস্সালাম আলাইকুম! আছেন কেমন মিয়াঁ?’

......

‘হ্যাঁ। আমিও আছি একরকম। লাহোর ছেড়ে আসার পর আপনাদের মিস করি খুব।

......

‘সে তো বটেই। এখন আপনার থেকে একটা ফেভার চাই ভাই।'

......

‘না না, ছি ছি, এ কী বলছেন? রোজই মনে পড়ে আপনার আর ভাবির কথা। সময় হয়ে ওঠে না একদম, কাজের চাপে'

.....

‘হ্যাঁ, আসলে একটা সিএনআইসি কার্ড পেয়েছি। আমি তার নম্বরটা বলছি। আপনি একটু বলতে পারবেন কোন এরিয়ার কার্ড?’

.....

‘হ্যাঁ, তা পারব। কিন্তু তাতে নাহক অনেকটা সময় যাবে। আমি শুধু একটা ছোট্ট জিনিস চেক করে নিতে চাইছি।'

.....

‘হ্যাঁ, লিখে নিন—৪৭৬১৪। পাঁচটা ডিজিটই লাগে তো এরিয়া জানতে?’

.....

‘হ্যাঁ, হ্যাঁ। সন্ধের মধ্যে হলেই চলবে। শুক্রিয়া ভাইজান! ভাবিকে আমার আদাব

জানাবেন। খুদা হাফিজ!!'

ফোন রেখে একটা চেপে রাখা নিঃশ্বাস ফেলে ইফতিকার। বাইকের অ্যাক্সিলারেটরে মোচড় দিয়ে এগিয়ে গেল। মাথার ভেতরে একটা অস্বস্তি বিনবিন করে বাড়ছে। খুলিটা ভেঙে দেবার কী দরকার ছিল, লোকটা যখন মরেই গিয়েছিল? পোস্ট-মর্টেমের রিপোর্ট আর ইউসুফভাইয়ের জবাবের অপেক্ষা করা ছাড়া কোনো গতি নেই এই মুহূর্তে।

ফরেনসিকের কাজ শেষ করিয়ে, লাশ মর্গে পাঠিয়ে মতিহাররা যখন থানায় ঢুকল ততক্ষণে সন্ধে গড়িয়ে যেতে চলেছে। ঘড়িতে পৌনে সাতটা। অসরের নামাজের সময় পেরিয়ে মাঘরিবের নামাজের সময় প্রায় চলে এসেছে।

এই পুরোটা সময় জুড়ে ইফতিকারের মনে রকমারি চিন্তা খেলা করেছে। কখনো সে অস্থির হয়ে পায়চারি করেছে থানার ঘর জুড়ে। কখনো পেপারওয়েট ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে লাট্টু বানিয়েছে। এত অস্থির তার কোনোদিন লাগে না। খালি মনে হচ্ছে কিছু একটা ঘটতে চলেছে আর সে সতর্ক না থাকলে সে তার অংশ হতে পারবে না।

দু-তিন বার মোবাইলে ইউসুফভাইকে ডায়াল করতে গিয়েও নিজেকে আটকেছে। ইউসুফ হামজা উঁচু দরের সরকারি কর্মচারী। প্রচণ্ড ব্যস্ত। সে যে বিনা প্রশ্নে ওকে সাহায্য করতে রাজি হয়েছে, এই অনেক। আব্বার মিঠাইয়ের দোকানের পরিচয় কাজে লেগে গেল এ যাত্রা। অবশ্য আগে ইনফর্মেশনটা পাওয়া যাক, না আঁচালে বিশ্বাস নেই।

থানায় ঢুকে মতিহার জানাল ফরেনসিকের লোক ফিঙ্গারপ্রিন্টস নিয়ে চলে গেছে। বডি চলে গেছে মর্গে। রিপোর্ট পেতে দু' জায়গাতেই কম সে কম এক সপ্তাহ লেগে যাবে।

শুনে দাঁতে দাঁত চেপে খিস্তিটা বেরিয়ে আসা থেকে আটকায় ইফতিকার। এদেশে কোনোদিন উন্নতি হবে না। বিরক্তিটা গিলে ফেলে সে বাথরুমের দিকে পা বাড়াল। অনেকক্ষণ চেপে আছে।

সবে বাথরুমে গিয়ে হালকা হতে শুরু করেছে, আবার ভগ্নদূতের মতো মতিহার দৌড়ে এল, 'স্যার, আপনার ফোন।'

কোনোমতে প্যান্টের চেন আটকে তড়িঘড়ি ফোনটা ধরে ইফতিকার। হাত না ধুয়েই। হ্যাঁ, ঠিকই ভেবেছে। ইউসুফভাই ফোন করেছেন। সে কোনোমতে ফোনটা কানে লাগিয়ে বলল, 'আস্সালাম আলাইকুম ভাইজান!'

.....

'আপনি শিওর তো?'

.....

'শুক্রিয়া ভাইজান! জি জরুর! জি খুদা হাফিজ!'

পকেট থেকে কার্ডটা বের করে আর এক বার দেখে ইফতিকার। তারপর হাত ধোয়ার কাজটা বেমালুম ভুলেই হাঁটা লাগায় অফিসঘরের দিকে।

এক বার দিলদারভাইয়ের সঙ্গে দেখা করা দরকার। আজকের লাশটা কোনো পাকিস্তানি গ্যাংস্টারের না। তাহলে এটা কার লাশ? তার পরিচয় গোপন করার দরকার কেন পড়ল?

নবম অধ্যায়
।। দ্য প্ল্যান।।

।। ৯.১।।
।।অল দ্য কিংস হর্সেস।।

৩১ মে, ২০১৮, সন্ধে বেলা / নিউ দিল্লী, ভারত

পাণ্ডবনগর গুরুদ্বারা যথেষ্ট সমৃদ্ধিশালী একটি গুরুদ্বারা। গণেশনগরে মিঃ সাখাওয়াতের বাড়ি থেকে অটোয় দূরত্ব মিনিট দশেক। সাদা ও অফ-হোয়াইট দামি মার্বেলের বিল্ডিং। এক মানুষ সমান পাঁচিলের সামনে মজবুত ও চকচকে স্টিলের গেট। গেট পেরোলেই থাকে থাকে সিঁড়ি উঠে গিয়েছে গুরুদ্বারার মূল প্রবেশদ্বারের দিকে। সিঁড়িগুলো প্রশস্ত। উঠতে ও নামতে থাকা পুণ্যার্থীদের আলাদা রাখার জন্য সিঁড়ির মাঝ বরাবর আছে একটি স্টিলের ডিভাইডার। চার চাকার পার্কিং একটু দূরে। কিন্তু দু’ চাকার যাত্রীরা পাঁচিলের গা ঘেঁষে নিজেদের গাড়ি পার্ক করতে পারে।

যদিও সাখাওয়াতের পার্কিং স্পেসের কোনো দরকার নেই। ফোনে অদৃশ্য গলার দেওয়া নির্দেশমতো তিনি অটো থেকে এক স্টপ আগে নেমে পায়ে হেঁটেই এসেছেন বাকি রাস্তা।

ঘড়িতে এখন সাড়ে ছ'টা। এখন তিনি দাঁড়িয়ে আছেন গুরুদ্বারার থেকে একটু এগিয়ে উলটো ফুটপাথে একটি নিরামিষ রেস্টুরেন্টের সামনে। এক গ্লাস লস্যির অর্ডার দিয়ে বাইরেই অপেক্ষা করছেন।

আজকের মিটিং-এর জন্য একটু বিশেষ সাজগোজ করেছেন তিনি। গুপ্তচরের কাজে ঢোকার ট্রেনিং-এর সময় তাঁর সবচেয়ে পছন্দের বিষয় ছিল ছদ্মবেশ। জনপ্রিয় হিন্দি সিনেমায় গুপ্তচরদের যে ধরনের ছদ্মবেশ দেখানো হয়, তা যে কত হাস্যকর তা, যারা এই পেশার সঙ্গে যুক্ত, তারাই জানে।

ছদ্মবেশ যত সূক্ষ্ম, নজরে পড়ার সম্ভাবনা ততই কম। খুব বিশদ জ্ঞান থাকতে হয় দৈহিক অ্যাপিয়ারেন্সের বিষয়ে। টাইট-ফিটিং লম্বা স্ট্রাইপ পোশাক পরলে লম্বা দেখানো যায়। ঢোলা পোশাকে আপাতভাবে দৈর্ঘ্য কমে যায়। ভ্রূর আকার, চুল আঁচড়ানোর ভঙ্গি ইত্যাদি অল্পস্বল্প পরিবর্তনেও একটি মানুষের বাহ্যিক অ্যাপিয়ারেন্সে আমূল পরিবর্তন আনা যায়।

আজ সাখাওয়াতের পরনে একটা ঢোলা পাঠান স্যুট। পেটে আর পিঠে মানানসইভাবে বাঁধা আছে তাঁর ফ্ল্যাটের সোফাসেট থেকে নেওয়া দুটি পাতলা কুশন। চোখে পাতলা সুর্মা, আর আসার আগে পর পর তিনটি খয়ের বেশি দেওয়া পান চিবিয়ে তার ঠোঁট, ঠোঁটের কষ আর দাঁতে এখন লাল ছোপ ছোপ। কাঁধের ওপর ফেলা একটা পাতলা চেক চেক তোয়ালে।

একনজরে দেখলে দোহারা চেহারার মধ্যবয়েসি মুসলিম ভদ্রলোক বলেই ভুল করবে যে কেউ। হয়তো খতিয়ে দেখলে মানুষটাকে চিনতে পারা যাবে। কিন্তু সেটা দেখতে ওই যে দু-পাঁচ সেকেন্ডের দেরি, ফিল্ডে ওইটুকুই দরকার।

সাখাওয়াত লস্যির গ্লাস নিয়ে অন্যমনস্কভাবে দূরের দিকে তাকিয়ে আছেন। আসলে তাঁর তীক্ষ্ণ চোখ স্ক্যান করছে গুরুদ্বারার আশেপাশে এসে থামা প্রতিটি গাড়ি, প্রতিটি মানুষকে। সময় নিয়ে দেখতে থাকলে যে কোনো জায়গায় আসাযাওয়া মানুষের গতিবিধির একটা প্যাটার্ন দেখা যায়। অভিজ্ঞ গুপ্তচরের চোখ সেই প্যাটার্নের সামান্য ভাঙচুর, ছোট্ট কোনো বেমানান উপস্থিতি খুঁজে নেয়। কোনো এমন গাড়ি যা পার্ক করা হচ্ছে রাস্তার দিকে মুখ করে, যাতে মুহূর্তের মধ্যে বেরিয়ে যেতে পারে; বা কোনো এমন লোক, যার আসলে কোনো কাজ নেই অথচ একই এলাকায় বার দু-তিন পায়চারি করে যাচ্ছে। এরকম অজস্র

আপাতভাবে নজর এড়িয়ে যাওয়া লক্ষণ ধরা পড়ে অভিজ্ঞ চোখে।

সাখাওয়াত এই দোকানে পৌঁছেছেন সোয়া ছ'টায়। শেষ পনেরো মিনিট ধরে তিনি সেরকমই কিছুর অপেক্ষায়। জানেন, এত বড় ও ব্যস্ত একটা এলাকা মাত্র একজনের নজরে স্ক্যান এবং রেকি করার জন্য এত কম সময় একেবারেই যথেষ্ট নয়। তার ওপর স্বাভাবিকভাবেই তাঁর কাছে কোনো আধুনিক সরঞ্জাম নই। তবু, তিনি তাঁর দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার ওপর ভরসা রেখেছেন। রহস্যময় প্রথম যোগাযোগটি অন্য পারের লোকের ইচ্ছেমতো ঘটেছে। দ্বিতীয় মোলাকাত তিনি নিজের টার্মসে করতে চান।

নজর রাখতে রাখতে তিনি একমুহূর্তের জন্য লস্যির পয়সা দিতে যখন চোখটা সরাচ্ছিলেন, তখনই চোখের কোণে কী একটা ছবি ভেসে উঠল। চট করে ঘাড় ঘুরিয়ে তিনি দেখতে পেলেন এতক্ষণ যা খুঁজছিলেন। যেখানে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন সেখান থেকে আন্দাজ গজ বিশেক দূরে গুরুদ্বারার গেট থেকে বেশ কিছুটা দূরে ইউ টার্ন নিল একটি ছাই ছাই রঙের ইন্ডিকা। টার্ন নিয়ে উলটো দিকের ফুটপাথে গিয়ে গাড়িটা দাঁড়াল। কিন্তু কেউ নামল না। এক মিনিট... দু' মিনিট... ঘড়িতে এখন ছ'টা বিয়াল্লিশ! গাড়ির পেছন দিকের দরজাটা এক বার খুলল। কেউ নামল কিনা দেখা গেল না। রাস্তার লোকজনের ভিড়ে আড়াল হয়ে গেল।

সাখাওয়াত চট করে ফুটপাথ ছেড়ে নেমে এলেন রাস্তায়। দৌড়োনো চলবে না। রাস্তায় দৌড়োতে থাকা মানুষ সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আর তা ছাড়া মেক-আপের গুণে তিনি এখন মোটা বৃদ্ধ মানুষ। জোরে দৌড়োনো বেমানান। একটু দ্রুত হাঁটতে হাঁটতেই দেখতে পেলেন। দুজন। গাড়ি থেকে নেমে পেছন দিকে গুরুদ্বারার গেটের ঠিক মুখের সামনে এক জন। আর এক জন গুরুদ্বারা আর সাখাওয়াতের মাঝামাঝি মোড়ের মাথায়, উলটো ফুটে। দুলকি চালে হাঁটতে হাঁটতে গাড়িটার দিকে এগোতে থাকা সাখাওয়াতের ভুরু কুঁচকে গেল একটু। লোক দুটোর চুলের ছাঁট, দাঁড়ানোর ভঙ্গি আর চেহারা বলে দিচ্ছে এরা সম্ভবত এসপিজি কম্যান্ডো।

স্ট্যান্ডার্ড ডায়াগোনাল কভার নিয়েছে। ডিফেন্সিভ স্টান্স। মানে এরা কাউকে ধরতে আসেনি। এসেছে কাউকে গার্ড দিতে। কাকে? সে কি গাড়ির ভেতরে এখনও? একা? সেই কি ফোন করেছিল?

ভাবতে ভাবতে গাড়ির প্রায় কুড়ি ফুটের মধ্যে এসে গেছেন তিনি। ফুটপাথে মাঝারি ধরনের ভিড়। আর এসপিজির কম্যান্ডোরা একটি মাঝবয়েসি ফিট চেহারার প্রৌঢ়কে প্রত্যাশা করছে। তাই মোটাসোটা পানখেকো মুসলিম বুড়োটাকে কেউ খেয়াল করেনি এখনও। গাড়ির কাছাকাছি এসে সামনের উইন্ডস্ক্রিন দিয়ে সাখাওয়াত দেখলেন, সামনে কেউ নেই, শুধু ড্রাইভার। তার মানে ভেতরে যেই থাক, সঙ্গে কোনো কম্যান্ডো নেই। থাকলে সামনের সিটেই থাকত।

স্লপি!

শেষ পাঁচ পা একটু দ্রুত হেঁটে গিয়ে কেউ কিছু বোঝার আগে গাড়ির পেছনের দরজা এক হ্যাঁচকায় খুলে ভেতরে ঢুকে পড়লেন সাখাওয়াত। ওঁর অ্যান্টেনা ততক্ষণে সিগন্যাল দিয়েছে যে রাস্তার দু' ধারে দাঁড়িয়ে থাকা দুই কম্যান্ডো ছিলে ছেঁড়া তিরের মতো ছুটে আসছে। খুব বেশি হলে ছ-সাত সেকেন্ড।

পকেট থেকে ছোট .৩২ ক্যালিবারের রিভলবার বেরিয়ে এসেছে। রিভলবারের নল আর সাখাওয়াতের চোখ একইসঙ্গে উঠল সিটে বসে থাকা লোকটির মুখের দিকে। চোখ পড়ামাত্র সাখাওয়াতের মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল, 'শেখরণ, আপনি?'

'ইউ আর আর্লি মিঃ সাখাওয়াত।'

শুধু এইটুকুই বলার সময় পাওয়া গেল। ততক্ষণে দুই কম্যান্ডো এসে হাজির হয়েছে আর দুটি মৃত্যুশীতল গ্লক ১৯-এর গম্ভীর নল উদ্যত হয়ে আছে সাখাওয়াতের মাথার দিকে।

শেখরণ মৃদু ইশারায় তাদের নিরস্ত করে গাড়িতে ঢুকতে বললেন। তারপর ড্রাইভারের

দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বিকাশ মার্গের দিকে চলো!'

সে বেচারা এতক্ষণ চোখের সামনে যা দেখছিল সেটা নিজেও বিশ্বাস করতে পারছিল না। ভেবেই নিয়েছিল যে এ যাত্রা আর বাড়ি ফেরা হল না। সেই খাদের ধার থেকে ফিরে এসে গাড়ি চালানোর আদেশ পাওয়ামাত্র যেন প্রাণ ফিরে পেল ড্রাইভারটি। মুহূর্তের মধ্যে গাড়ি চালু করে ছোটাল বিকাশ মার্গের দিকে।

প্রায় পনেরো-কুড়ি মিনিট সবাই চুপচাপ। শারাফা বাজার পেরোনোর সময় শেখরণ ড্রাইভারকে গাড়ি থামাতে বললেন। গাড়ি বাঁ-দিক করে থামতেই শেখরণ সঙ্গের দুই দেহরক্ষীর উদ্দেশে বললেন, 'আপনারা এবার যেতে পারেন। এখান থেকে আমি আমার পুরোনো বন্ধুর সঙ্গে একটু আলাদা সময় কাটাতে পছন্দ করব।'

দেহরক্ষীদের মধ্যে যে আপাতভাবে সিনিয়র, সামনের সিটে বসেছিল। সে আপত্তির সুরে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু শেখরণ তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'ইটস অ্যান অর্ডার, জেন্টলমেন!'

'শিওর স্যর!'

দুজন মানুষ ভাবলেশহীন মুখে নেমে গেল বাজারের মুখে। ওরা নেমে যেতেই শেখরণ তাকালেন ড্রাইভারের দিকে। ছেলেটি বিনা বাক্যব্যয়ে নেমে গেল।

পেছনের সিটের দুই প্রৌঢ় যাত্রী জায়গা বদল করে চলে এলেন সামনের সিটে। শেখরণ ড্রাইভিং সিটে। পাশের সিটে সাখাওয়াত। গুছিয়ে বসে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'কোথায় যাচ্ছি আমরা?'

'ফার্ম হাউস।' একটা মৃদু রহস্যময় হাসি হেসে জবাব দিলেন শেখরণ!

মিনিট চার-পাঁচ গাড়ি চলার পর এল বিকাশ মার্গ। বিকাশ বা উন্নতির জন্য ততটা বিখ্যাত নয়। তবে এই রাস্তাটি কুখ্যাত দিনের যে কোনো সময় হওয়া ট্র্যাফিক জ্যামের জন্য। এমনিতে এই রাস্তাটি দিল্লির অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি রাস্তা। যমুনার দুই পারের জনজীবনের প্রধানতম যোগসূত্র এখনও এই রাস্তা। কিন্তু ভারতবর্ষের যে কোনো মেট্রো শহরের মতোই এই শহরেও এই রাস্তাটি অদক্ষ পরিকল্পনা ও কাজ করার সদিচ্ছার অভাবের কুফল হিসেবে এক আদর্শ দৃষ্টান্ত।

মুহূর্তের মধ্যে সাখাওয়াত ও শেখরণের গাড়িকে ঘিরে ফেলল বাস, ট্যাক্সি, অ্যাপ ক্যাব, টোটো, অটো, ই-রিক্সা, পথচারী, ফুটপাথের হকার ইত্যাদির মিলিত একটি ক্যাকোফোনি।

শেখরণ গাড়ির কাচ তুলে, এসি চালিয়ে দিলেন। চারপাশের আওয়াজ, ধুলো আর ধোঁয়ার মধ্যে একটু স্বস্তি। সাখাওয়াত মনে মনে তারিফ করলেন এই ধূর্ত আমলাটির। কোনো গোপন আলোচনা করার জন্য গোটা দিল্লি খুঁজে এর চেয়ে ভালো জায়গা পাওয়া মুশকিল। এই জটপাকানো বিশৃঙ্খল রাস্তায় কাউকে অনুসরণ করা বা কারও কথাবার্তায় আড়ি পাতা কার্যত অসম্ভব।

শেখরণ অল্প গলাখাঁকারি দিয়ে বললেন, 'তোমার ধার খুব একটা কমেনি রাকেশ।

'অনেকটাই কমেছে। নাহলে তোমাকে দেখে চমকে যাবার বদলে আগে তোমার ড্রাইভারকে অজ্ঞান করে, তোমাকে ইনক্যাপাসিটেট করে, গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে যেতে পারতাম। দশ-দশটা সেকেন্ড ছিল আমার হাতে। প্রচুর টাইম।' 'কী ভাগ্যিস! নাহলে বেচারা ড্রাইভার খামোকা চোট পেত।' মৃদু শব্দ করে হেসে উঠলেন শেখরণ।

'সেটা তোমারই দায় হত। একটা রিটায়ার্ড সরকারি পেনশনভোগী বৃদ্ধের সঙ্গে এত নাটক করে দেখা করার কী দরকার ছিল?'

'দরকার ছিল বই কী। তুমি রাজেশ ফালোরকে চেনো?'

'হুম। চিনি। আমারই প্রতিবেশি।'

'শুধু তাই নয়। উনি সিবিআই-এর লোক। তোমাকে নজরে রাখার জন্যই রিক্রুটেড। পিএম-এর সরাসরি হস্তক্ষেপ সত্ত্বেও বিরুপাক্ষবাবুর মার্ডারের তদন্তে তোমার নামকে এড়ানো

যায়নি। আর আমরাও একটা পর্যায়ের পরে নিজেদের প্রভাব খাটাতে পারি না। বুঝতেই পারছ, সংসদে আর ভোটের বাক্সে বাজে প্রভাব পড়ে। আমাদের তো দু' দিক সামলেই চলতে হবে।'

'বুঝলাম।'

কাজের আগেই পরিণামের হুমকি। মনে মনে হাসলেন সাখাওয়াত। টিপিক্যাল গভর্নমেন্ট জব। শেখরণ বলে চললেন, 'আর আমি চাইনি আমাদের যোগাযোগের কথা অন্য কেউই জানুক।'

'অন্য কেউ?' জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাইলেন সাখাওয়াত।

'দেখো রাকেশ— আমাদের আজকের কথাবার্তায় ঢোকার আগে কতগুলো কথা তোমার কাছে স্পষ্ট করে দিতে চাই। আজকে যে বিষয় নিয়ে আমরা কথা বলব, সেটা সম্বন্ধে আমরা দুজন বাদে আর এক জনই জানেন। পিএম নিজে। তাঁরই পরামর্শে আমি তোমার কাছে এসেছি। তুমি আমার প্রথম পছন্দ ছিলে না। ইন ফ্যাক্ট, তুমি আমার কোনো পছন্দই ছিলে না।'

চুক চুক করে একটা আওয়াজ করে সাখাওয়াত বললেন, 'নট ভেরি ইমপ্রেসড উইথ মি! আর ইউ?'

'ইউ কান্ট ব্লেম মি, ডিয়ার! আফটার হোয়াট হ্যাপেনড ইন কোলকাতা...' সাখাওয়াতের মুখ তাঁর অজান্তেই সামান্য কুঁচকে ওঠে। এখনও ক্ষতটা পুরোপুরি শুকোয়নি। আঘাত লাগে। সেটা বুঝতে পেরেই শেখরণ চটজলদি নিজের কথার মোড় ঘুরিয়ে নেন, 'এবারে বলি কী কী নট টু ডু আছে। প্রথমত, তুমি, আমি ছাড়া কারও সঙ্গে এই নিয়ে কোনো রকমের আলোচনা করতে পারবে না।

দ্বিতীয়ত, তুমি অফিসিয়ালি আমাদের সঙ্গে কোনোভাবেই যুক্ত নও, ফলে কোনো মাইনে, সুযোগ-সুবিধে অফিসিয়ালি তুমি পাবে না। আমি পিএম-এর থেকে একটা কন্টিনজেন্সি ফান্ড ম্যানেজ করেছি। পুরো কাজটা সেটা দিয়েই করতে হবে। ইস নট হিউজ, বাট আই থিংক ইট শুড বি সাফিসিয়েন্ট! তৃতীয়ত, যদিও সম্ভাবনা প্রায় নেই বললেই চলে, তবু, যদি এই কাজে জড়িয়ে তোমার কোনোরকম শারীরিক ক্ষতি হয় বা প্রাণহানি হয় বা তুমি ন্যাশনাল এমব্যারাসমেন্টের কারণ হও— দেন উই উইল ডিজওন ইউ। আর ইউ ক্লিয়ার?'

'ক্রিস্ট্যাল! এবারে, অ্যাজ ইউ মাইট হ্যাভ এক্সপেকটেড, আমার কিছু পূর্বশর্ত আছে। সেগুলো পালন হলে তবেই আমি কাজটা নেওয়ার কথা ভাবব। 'সব প্রিকন্ডিশন মঞ্জুর।

'আগে শুনে নাও। প্রথমত, কাজটা কী সেটা আমি পিএম-এর উপস্থিতিতে শুনতে চাই। নিশ্চিত হতে চাই যে এই কাজে তাঁর সম্মতি আছে। দ্বিতীয়ত, এই কাজে আমার যদি কোনো হেল্প বা অ্যাসিস্ট্যান্স লাগে, সেটা আমি রিক্রুট করব এবং সে ব্যাপারে কোনো কথা কেউ বলতে পারবে না। তৃতীয়ত, কাজটা কী, সেটা না শুনে আমি আমার মত জানাব না। যদি শোনার পর মনে হয় আমি কাজটা করব না, তাহলে আই শুড বি লেফ্ট অ্যালোন।'

'অ্যাজ আই অলরেডি সেড— সব শর্তই মঞ্জুর। তুমি যে শর্তগুলো দিলে তার সব ক'টাই আমাদের প্রত্যাশিত ছিল। আর তোমার দেওয়া প্রথম শর্তটা আগাম আন্দাজ করেই তোমার সঙ্গে এত ঘুরপথে যোগাযোগ করতে হয়েছে।'

'বুঝলাম না...' সাখাওয়াতের কথা শেষ হতে-না-হতেই গাড়িটা হঠাৎ বাঁদিকে বাঁক নিল। এতক্ষণে গাড়িটা প্রায় সেই জায়গায় চলে এসেছিল যেখানে বিকাশ মার্গ থেকে ঘুরে সচিবালয় মার্গে পড়া যায়। সেই রাস্তাটা সাখাওয়াতের চেনাও।

কিন্তু এখন যে রাস্তায় গাড়িটা ঢুকল, সাখাওয়াত এই রাস্তাটা কোনোদিন দেখেননি। গলিই বলা উচিত। ঢোকার মুখটা সরু এবং একটা নো এন্ট্রি বোর্ড আর দুটো ডিভাইডার দিয়ে ব্লকড। এখন ডিভাইডারগুলো একটু সরানো| শুধু এই গাড়িটা ঢোকার মতোই জায়গা আছে। একটু ঢুকলেই কিন্তু বেশ চওড়া রাস্তা। একদিকে বাঁধানো ফুটপাথে বড় বড় গাছ। ফাঁকে ফাঁকে ল্যাম্পপোস্ট। অন্যদিকে বাড়ি। অভিজাত। নিরালা। আলো এখানে অন্ধকার দূর

করেনি। ছায়ার সঙ্গে মিশে সৃষ্টি করেছে এক চিরকালীন রহস্যময়তার, এক সম্ভ্রান্ত ফিসফিসানির।

সাখাওয়াত আশ্চর্য হয়ে দু' দিকটা দেখতে দেখতে জিজ্ঞেস করলেন, 'এটা কোন জায়গা? এরকম কোনো জায়গা কোনোদিন ম্যাপে দেখেছি বলেও তো মনে পড়ে না।'

'ট্যাকটিক্যাল ম্যাপ, মিউনিসিপ্যালিটির ম্যাপ বা গুগল ম্যাপে এটা দেখতে না পাওয়াই স্বাভাবিক। এখানে যাঁরা বাস করেন, তাঁরা এমনটাই চান। সরকার তাঁদের সেই অনুমতি দিয়ে থাকেন, কারণ আমরাও মাঝেসাঝে এর সুবিধে নিয়ে থাকি। দিল্লির হুজ হু মহলের একদম উঁচু সারির যাঁরা একটা কর্মব্যস্ত দিনে ক্ষমতার পাঞ্জা লড়ে ক্লান্ত হয়ে পরের দিনের লড়াইয়ের জন্য রিচার্জ করতে চান, এটা তাঁদের ঠিকানা।'

'তোমরা কীরকম সুবিধে নিয়ে থাকো?'

'যেরকম আজ নিচ্ছি।'

বলতে বলতে গাড়ি এক জায়গায় দাঁড়ায়। এখানে আলোর চেয়ে ছায়ার ভাগ যেন আরও একটু বেশি। সাখাওয়াত সামনের প্যাসেঞ্জার সিটের জানলা দিয়ে বাঁ-দিকে তাকিয়ে দেখেন একটি বুটিক রেস্টুরেন্টের ফ্রন্ট। খুব হালকা নিয়নে লেখা নামটা পড়া যায়, 'ফার্ম হাউস ক্যাফে'।

ওকে। এটাই ফার্ম হাউস। দুজনেই চটপট গাড়ি থেকে নেমে পড়লেন। সঙ্গে সঙ্গে ছায়ার মধ্যে থেকে একটি ইউনিফর্ম পরা গার্ড বেরিয়ে এল। শেখরণ এবং সাখাওয়াত— দুজনেরই ফ্রিস্ক সার্চিং হল। তল্লাশি চলাকালীন সাখাওয়াত এক বার ছদ্ম-অনুযোগের চোখে শেখরণের দিকে তাকাতেই শেখরণ বলে উঠলেন, 'এগেন... ইউ কান্ট ব্লেম মি, ডিয়ার...'

ভাবলেশহীন রক্ষীটি দুজনের খোঁজতল্লাশি শেষ করে অদৃশ্য কোনো কমিউনিকেশন সিস্টেমে জানাল— অল ক্লিয়ার।

শেখরণের চোখের ইশারায় আবার পা বাড়ালেন দুজনেই, 'ফার্ম হাউস'এর গেটের দিকে। কাচের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলে দেখা যায় একটা মাঝারি ধরনের চওড়া করিডোর। তার দু' দিকে সারি সারি ক্লোজড বুথ। ভারী কাঠের দরজা, কাচের সাউন্ডপ্রুফ দেওয়াল আর ভারী পর্দা দিয়ে ঘেরা। ডান দিকে প্রথম স্লটটি কেবল ওপেন। আসবাবপত্র দেখলে আন্দাজ করা যায় সাধারণত এটি রিসেপশনের কাজ করে। আজ যদিও ফাঁকা।

সাখাওয়াত বিলক্ষণ আন্দাজ করতে পারছেন আগামী কয়েক মিনিটের মধ্যে কী ঘটতে চলেছে। এই দেশের সর্বোচ্চ ক্ষমতাবান মানুষটির সঙ্গে জীবনে দ্বিতীয় বার মুখোমুখি দেখা হতে চলেছে তাঁর।

প্রথম বারের অপরাধবোধ এখন আর অতটা তীক্ষ্ণ না। তার বদলে ধীরে ধীরে চঞ্চলতা ফিরে আসছে ধমনীতে। অব্যবহারে ঝিমিয়ে পড়া অ্যাড্রিনালিনের ঘুম ভাঙছে ধীরে ধীরে।

একের পর এক বুথ পেরোতে পেরোতে ডানহাতি তৃতীয় বুথের দরজায় টোকা দিলেন শেখরণ। ভেতর থেকে আওয়াজ এল, 'কাম ইন!'

দরজা ঠেলে ঢুকলেন আগে শেখরণ ও পেছনে সাখাওয়াত।

'ওয়েলকাম মিঃ সাখাওয়াত। আমি দুঃখিত, আপনার অবসরের মধ্যে বিঘ্ন ঘটানোর জন্য। তবে হয়তো এ ছাড়া কোনো উপায় ছিল না।'

'নো প্রবলেম স্যর! ইট ইজ অলওয়েজ এ প্লেজার ওয়ার্কিং ফর ইউ।'

হেসে প্রত্যুত্তর দিয়ে সাখাওয়াত এক বার চট করে চোখ বুলিয়ে নেন চারপাশে। ছোট্ট ঘর। বড়জোর একশো-একশো কুড়ি স্কোয়ার ফুট। আলোকোজ্জ্বল। আসবাব বলতে দুটি সোফা, একটি নীচু গ্লাসটপ টেবিল। একটি সোফায় বসে আছেন তিনি। হাতের ইশারায় উলটো দিকের সোফা দেখিয়ে দিলেন।

সাখাওয়াত বসলেন। শেখরণও। কিছুক্ষণের নীরবতা। সেটা ভেঙে সাখাওয়াত প্রথম বলে উঠলেন, 'আমি প্রস্তুত, শোনার জন্য।'

একটু গলাখাঁকারি দিয়ে শেখরণ বললেন, 'আপনার কী মনে হয়? এতদিনেও ভারত কেন সুপার পাওয়ার হতে পারল না? ইউএন-এর সিকিউরিটি কাউন্সিলের সদস্যপদ বা জি-এইট এর সদস্যপদ— কোনোটাই পেলাম না কেন আমরা এখনও পর্যন্ত?

অফিসিয়াল পরিবেশে শেখরণ তাকে 'আপনি' বলতে শুরু করেছেন সেটা সাখাওয়াতের কান এড়ায় না। চোরা চোখে একবার পিএম-এর দিকে দেখে নিয়ে তিনিও গলার স্বরে কেজো পেশাদারিত্ব বজায় রেখে বলেন, 'এর উত্তর তো আমার থেকে অনেক ভালো দিতে পারবেন ডিপ্লোম্যাটরা, নেতারা, মিঃ শেখরণ! আমার মনে হয় না, একজন অবসরপ্রাপ্ত বৃদ্ধ ব্যর্থ গোয়েন্দা এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার উপযুক্ত ব্যক্তি।'

'তবু যদি আপনাকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ, যেটা প্রথম মাথায় এসেছে, সেটা বলতে বলা হয়?' স্বয়ং পিএম এবার যোগ দেন।

'তাহলে স্যর আগাম ক্ষমা চেয়ে নিয়ে বলব, আমাদের দেশনেতারা চান না বলে!'

শেখরণ খুব অস্ফুটে একটা শিস দিয়ে ওঠেন। পিএম-এর চোখের পলক পড়ে না। এক সেকেন্ড... দু' সেকেন্ড...

শীতল গাম্ভীর্য ভেঙে মৃদু হাসি ফুটে ওঠে মানুষটির মুখে, 'আর আজ যদি একজন সেরকমই অপদার্থ দেশনেতা তোমার সামনে দাঁড়িয়ে বলে, যে সে চায় এই দেশকে পাকাপোক্তভাবে সুপার পাওয়ার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে যেতে? আজ যদি একজন তোমাকে বলে যে সে চায় এই দেশের দীর্ঘদিন ধরে হয়ে চলা মধ্যম মানের ট্র্যাডিশনকে ভেঙে ফেলে একে এক হ্যাঁচকায় আন্তর্জাতিক রাজনীতির ফার্স্ট বেঞ্চে এনে বসাতে? তাহলে... তাহলে তোমার কী উত্তর হবে, রাকেশ?'

আবেগে সামান্য যেন কেঁপে ওঠে পলিতকেশ মানুষটির গলা।

সাখাওয়াত একটুক্ষণ চুপ করে থাকেন। তারপর বলেন, 'ইচ্ছা আর সাধ্যের মধ্যে অনেক পার্থক্য থাকে স্যর! আমাদের সীমান্তের স্পর্শকাতর চরিত্রের ফলে আমাদের দেশকে সুরক্ষিত রাখতেই প্রচুর টাকা খরচ হয়। লোকবলও। আমাদের পলিসি-মেকার, অ্যাডভাইজর— এঁদেরও সময় ও এনার্জির একটা বড় অংশ ব্যয় হয় আমাদের প্রতিবেশি দেশগুলির সঙ্গে আমাদের কনফ্লিক্টের দীর্ঘমেয়াদী সমাধান খুঁজে পেতে। তাও সেসব বেশিরভাগ সময়ই একটা ব্যর্থ চেষ্টায় পর্যবসিত হয়। এই সব দিকে একটু কম মনোযোগ দিতে হলেই আমরা আমাদের বেসিক জায়গাগুলো মেরামত করার দিকে বেশি মনোযোগ দিতে পারতাম। এডুকেশন, হেলথ, ট্রান্সপোর্ট, জব ক্রিয়েশন— সব দিকেই। আমার মনে হয় প্রধানত আমাদের দেশকে সুরক্ষিত রাখাটাই একটা এত বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে যে আমরা বাকি প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রগুলোতে শুধু সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করে যাচ্ছি। কোনো ফরোয়ার্ড প্ল্যানিং করতে পারছি না। আওয়ার ডিফেন্স ইজ প্রুভিং টু বি আওয়ার ওনলি অ্যান্ড ওয়ার্স্ট অফেন্স!'

পিএম শেখরণের দিকে চেয়ে একটু হাসলেন। সেই হাসির অর্থ দাঁড়ায়, 'কী, বলেছিলাম না?'

শেখরণ যোগ দেন, 'আমরা আপনার সঙ্গে সম্পূর্ণ সহমত। আর সেক্ষেত্রে এটা বলতেও বাধা নেই যে সীমান্তে আমাদের যে অস্থিরতা, তার পেছনে সবচেয়ে বড় অবদান পাকিস্তান ও তার মদতপুষ্ট জঙ্গি ঘাঁটিগুলির।'

'কারেক্ট। বাট, আমি এখনও বুঝছি না, এ বিষয়ে আমি কী করতে পারি? আমি নিশ্চিত, পাকিস্তানের সঙ্গে আমাদের নীতি ঠিক কী হওয়া উচিত তা নিয়ে র-এর পাকিস্তান ডেস্কের নিজস্ব বক্তব্য রয়েছে। সেটা অনেক বেশি ইনফর্মড রেকমেন্ডেশনই হবে। হোয়্যার ডু ইউ নিড মি হিয়ার?'

'এখানেই আমাদের এই আলোচনার মূল জায়গায় ঢুকছি।' শেখরণ বলেন। তিনি দৃশ্যতই খুশি কারণ কথাবার্তা-আলোচনা স্পষ্টতই তাঁর আন্দাজমতোই এগিয়েছে। 'পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ভারতে আসছেন সামনের আগস্ট মাসে।'

'তাই নাকি? সেরকম কিছু খবর তো দেখলাম না!' একটু আশ্চর্য শোনায় সাখাওয়াতের গলা।

'এ খবরটা এখনও প্রেসের কাছে দেওয়া হয়নি। সিচুয়েশন সেনসিটিভ। খবরটা ডিপ্লোম্যাটিক লেভেলে আর পিএমও-র মধ্যেই লিমিটেড রাখা হয়েছে। আরও কিছুদিন গেলে প্রেসকে জানানো হবে। ততদিন, ইউ নো...' কথাটা অর্থবহভাবে অসমাপ্ত রাখেন শেখরণ!

'অফ কোর্স! গোজ উইদ ইওর কন্ডিশনস এনিওয়ে!' তৎক্ষণাৎ জবাব দেন সাখাওয়াত। 'ভিজিটের অফিসিয়াল রিজন?'

'মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট ভিজিট... কলকাতা। ডিপ্লোম্যাটিক্যালি ক্রিটিক্যাল এবং সেন্সিটিভ। বাংলাদেশের সঙ্গে বন্ধুত্বের ও মৈত্রীর চিহ্নস্বরূপ শেখ মুজিবুর রহমানের সম্মানে কলকাতায় একটি সৌধ তৈরি হয়েছে শুনেছেন বোধহয়?'

'শুনেছি। শুনলাম নাম রাখা হচ্ছে 'মাতৃভাষা'! মিডিয়া তো বলছে এটা পৃথিবীর সমস্ত বাংলা ভাষাভাষী মানুষের একটা কমন মিলনক্ষেত্র!'

একটা মৃদু অবজ্ঞাসূচক শব্দ যেন ভেসে আসে কোথাও থেকে। শেখরণ বলেন, 'ওই 'মাতৃভাষা'-র উদ্বোধন হবে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর পৌরোহিত্যে!'

'হোয়াট?'

অবিশ্বাস্য খবরের ধাক্কায় সোফা ছেড়ে একটু উঠে পড়েন সাখাওয়াত।

'অ্যান্ড হি এগ্রিড টু ডু দ্যাট?'

'ইট ইজ হি, হু ইনসিস্টেড, হি শুড বি অ্যালাউড টু ডু দ্যাট!'

'ইনক্রেডিবল!'

সাখাওয়াত তখন বিশ্বাস করতে না পেরে ঘাড় নাড়ছেন। পূর্ব পাকিস্তান হাতছাড়া হয়ে যাওয়া পাকিস্তানের শরীরে সবচেয়ে দগদগে ঘা। কাশ্মীরের থেকেও জ্বালা ধরানো। কাশ্মীর তো পার্টিশানগত সমস্যা। পূর্ব পাকিস্তান হাতছাড়া হওয়া তাদের কাছে ভারতের কাছে শোচনীয় পরাজয়ের অভিজ্ঞান। সেই দেশের প্রাণপুরুষকে স্বীকৃতি দিতে – উর্দুর তলায় যে বাংলা ভাষাকে চাপা দিয়ে দেওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা ছিল তাদের— সেই বাংলা ভাষাকে স্বীকৃতি দিতে আসছেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী!!

নাহ! সত্যিই বাস্তব অনেক কল্পনার চেয়ে অবিশ্বাস্য!

'ইয়েস! ট্রুলি ইনক্রেডিবল! ইয়েট, অ্যাট দ্য সেম টাইম, দিস ইজ প্রোবাবলি আ ওয়ান্স ইন আ লাইফটাইম চান্স টু অ্যাচিভ হোয়াট উই জাস্ট স্পোক অ্যাবাউট!'

'হাউ সো?'

শেখরণের জবাবে চোখ সরু হয়ে আসে সাখাওয়াতের।

'আমরা চাই, মানে পিএম চান, মানে...' হঠাৎ শেখরণের মতো দুদে আমলাও একটু ইতস্তত করতে শুরু করেন। ঠিক সেই খেই হারানোর জায়গা থেকেই পিএম খেই ধরেন, 'যে কাজটা তোমাকে করতে অনুরোধ করছি, ভারত কেন, পৃথিবীর ইতিহাসে কোনো দেশ কূটনৈতিক বা রাজনৈতিক বা সামরিক স্তরে এই ধরনের কাজের কথা ভাবেনি। হাই রিস্ক জব বললে কিছুই প্রায় বলা হয় না। তবে, যদি তুমি, আমি— আমরা সফল হতে পারি, তাহলে ভারতের ভবিষ্যতের ইতিহাস অন্যরকমভাবে লেখার পরিকল্পনা করতে হবে। ইতিহাস আমাদের মনে রাখবে ভারতে স্থায়ী ও দীর্ঘমেয়াদী শান্তি আর উন্নতির পথ প্রদর্শক হিসেবে। আর যদি ব্যর্থ হই, আমার জায়গা হবে রাজনৈতিক আস্তাকুঁড়ে। আমি এই ঝুঁকিটা নিতে রাজি। তুমি?'

চশমার নীচে জ্বলজ্বলে এক জোড়া চোখ যেন লোহার জ্বলন্ত শিক দিয়ে ফুঁড়ে দেখে নিচ্ছিল সাখাওয়াতের অন্তঃকরণ! সাখাওয়াত চোখ সরালেন না। তিনি এতদিনে বুঝেই গেছেন এই প্রধানমন্ত্রীর ইতিহাসের পাতায় নাম লেখানোর অদম্য ইচ্ছে। বিগত চার বছরে এঁর কার্যকলাপের মধ্যে সেই ইচ্ছে ক্রমশ স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠছে। তিনি জবাবে

শুধু বলেন, 'প্ল্যানটা কী স্যর?'

'প্ল্যান তো আমাদের কিছু নেই। প্ল্যান বানাবে তুমি।' শেখরণ এতক্ষণে নিজের গলার স্বর খুঁজে পেয়েছে আবার। সেইসঙ্গে ফিরে এসেছে পরিচিত 'তুমি' সম্বোধন। মনে মনে কিছুটা হলেও নিশ্চিত হয়েছে, সাখাওয়াত কাজটা করতে রাজি হয়ে যাবেন। ভুল ভাবেনি খুব একটা, সাখাওয়াত মনে মনে ভাবলেন।

'আমাদের একটা অ্যাম্বিশান আছে বলতে পারো। বেশ এমন একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি হোক, যাতে ভারত সরকারের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই— অথচ যা পরোক্ষভাবে দুটো দেশকেই ফোর্স করবে পাকিস্তানি প্রধানমন্ত্রীর সৌজন্য সাক্ষাৎকে একটা মিনিংফুল 'পিস টক'-এ পরিণত করতে। আর সেই আলোচনার টেবিলে যাওয়ার সময় যেন ভারতের হাতে বেশি ট্রাম্প কার্ড থাকে। হ্যাঁ, এখানে খেয়াল রাখতে হব, যে পাকিস্তানি প্রধানমন্ত্রীরও যেন মুখরক্ষা হয়। তিনিও যেন দেশে ফিরে আইএসআই এবং পাকিস্তানের জনতাকে কনভিন্স করতে পারেন যে এ ছাড়া তাঁর কাছে আর কোনো উপায় ছিল না। সংক্ষেপে বললে উই ওয়ান্ট হিম টু বি কোক্সড ইনটু টকিং কাশ্মীর উইদ আস।'

শেখরণ কথা ক'টি বলেই হাঁপ ছাড়লেন। যেন তার বুকের থেকে একটা বড় ওজন নেমে গেল।

ঘরে এখন নিশ্ছিদ্র নিস্তব্ধতা। আজকের দিনটাই অবিশ্বাস্য! সাখাওয়াত আর টলে যাচ্ছেন না। তবে এটা মারাত্মক পাঞ্চ। আঘাতে প্রায় দমবন্ধ হয়ে যেতে পারে। কোনো একটি দেশের প্রধানকে নিজের দেশের মাটিতে সিচুয়েশনালি ম্যানিপুলেট করা— তাও আবার ভারত-পাকিস্তান শান্তি চুক্তির মতো উচ্চাকাঙ্ক্ষী কাজের জন্য— এত হঠকারী, এত দুঃসাহসী প্ল্যান বোধহয় সত্যিই পৃথিবীর ইতিহাসে কখনো ঘটেনি।

পাক্কা পাঁচ মিনিট স্তব্ধতার পরে নীরবতা ভাঙলেন সাখাওয়াত, "দিস প্রোপোজাল, স্যর, ইজ সো প্রিপশ্চারাস অ্যান্ড ইনক্রেডিউলাস, দ্যাট আই ওয়ান্ট টু গিভ ইট এ ট্রাই।'

শেখরণ আর পিএম চুপ। তাঁরা অপেক্ষা করছেন, কারণ তাঁরা নিশ্চিত সাখাওয়াত আরও কিছু বলতে চান। সাখাওয়াত আবার শুরু করলেন, "আমি স্বভাবতই জানি না এটা আদৌ সম্ভব হবে কিনা বা হলেও কীভাবে। সময়ও খুবই কম। তবে আমি এক সপ্তাহ সময় চেয়ে নিচ্ছি। এক সপ্তাহ পরে আমি আপনাদের দুজনের কাছে রিপোর্ট করতে চাই। যদি কোনো কাজে লাগার মতো পরিকল্পনা করে উঠতে পারি তো ভালো। নচেৎ.......'

আবার এই অসমাপ্ত কথাটি তার ভার নিয়ে ঝুলে থাকল বাতাসে, বেশ কিছুক্ষণ। তারপর শেখরণ বললেন, 'এই মিটিংটা অ্যারেঞ্জ করতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে দু' ঘণ্টার জন্য বেপাত্তা করে দেওয়া সহজ কাজ নয়। আর আরসিআর-এ তোমাকে দেখা করতে যেতে বলতে পারি না। সেখানে সব ভিজিটরের ডিটেলস রেকর্ডেড থাকে। তাই আমার মনে হয়, তোমার রিপোর্ট তোমায় আমাকেই শোনাতে হবে রাকেশ। অফ কোর্স, আমি স্যরকে সেটা দেখিয়ে নিতেই পারি, সময়-সুযোগ করে।'

সাখাওয়াত দেখলেন পিএম সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়লেন। বললেন, 'তবে তাই হোক। লেট আস মিট ইন আ উইক!'

'ধন্যবাদ রাকেশ! এই ঝুঁকিবহুল উচ্চাকাঙ্ক্ষাতে নিজের নাম জড়িয়ে ফেলতে রাজি হওয়ার জন্য।'

'ইটস মাই প্লেজার স্যর। একটা কথা আছে না, ইংরেজিতে— ইট ইজ সো ব্যাড দ্যাট ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি ভেরি গুড!! আপনাদের এই অবজেক্টিভটিও ঠিক সেইরকম। চুম্বকের মতো এর আকর্ষণ কারণ এটা সম্ভব বলে মনেই হয় না।'

মৃদু হাসলেন মানুষটি। তারপর সোফা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'তাহলে, আমি তোমার প্ল্যানের অপেক্ষায় থাকব।'

সাখাওয়াত আর শেখরণও উঠে দাঁড়ালেন। প্রধানমন্ত্রীর বাড়িয়ে দেওয়া হাতে হাত মিলিয়ে সাখাওয়াত বললেন, 'আমিও, স্যর!'

২৫ জুন, ২০১৮, দুপুর বেলা / কলকাতা, ভারত

উত্তর কলকাতার অলিগলিতে আজও এরকম রেস্তরাঁ পাওয়া যায় যাতে পর্দাঘেরা কেবিন আছে। কয়েক দশক আগে যখন প্রেম ব্যাপারটা একটা সামাজিক লজ্জা বলে বিবেচিত হত তখন বেচারা প্রেমিক-প্রেমিকা একটু নিজেদের মতো সময় কাটানোর জন্য এইরকম পর্দাঘেরা কেবিনে ঢুকে পড়ত। মূলত সেই কারণেই খাবার বা পানীয়র মান উঁচু দরের না হলেও এগুলো বেশ রমরমিয়ে চলেছে একসময়। শাহরুখ খান, সেন্ট্রাল পার্ক, আর্চিজ গ্রিটিংস থেকে পায়ে পায়ে রণবীর কাপুর, মল, ভিডিয়ো চ্যাটে পৌঁছে যাওয়া এখনকার প্রেমিক-প্রেমিকাদের আড়াল লাগে না ততটা। তাই এই ধরনের রেস্তরাঁগুলোর সময়ও মন্দা।

এরকমই একটি রেস্তরাঁ হল মনোরমা কেবিন, হাতিবাগান। বিধান সরণি থেকে যে রাস্তাটা ঢুকে যাচ্ছে রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রিটের দিকে, ঠিক ওই মোড়ের মাথায়। ভালো করে ঠাহর না করলে দেখতে পাওয়া যাবে না। কারণ এর মদমত্তা যৌবন, এর প্রগলভা মধ্যাহ্ন অতিক্রান্ত হয়ে গেছে তাও প্রায় এক-দেড় দশক আগে। অতীতের মেহফিলের মধ্যমণি তায়েফকে যেমন কুৎসিত, পৃথুলা, ঝগড়াটি ও একা সেই বৃদ্ধার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় না, তেমনি কুড়ি বছর আগের মনোরমা কেবিনের বাঁ চকচকে রূপ আজকে এর সামনে দাঁড়িয়ে কল্পনাও করা যাবে না। যে ভাঙাচোরা বাড়ির নীচের তলায় এই রেস্তরাঁ, তার অবস্থা এতটাই জীর্ণ যে মনে হয় পৌরসভার অনুমোদন অনেকদিন আগেই ফুরিয়েছে এবং বাড়ি ভাঙার নোটিসও হয়তো ঠিকানা ভুল করে এখানে পৌঁছোবে না। সারা শরীরে বট-অশ্বত্থের শিকড়ের বলিরেখা। তাদের গা বেয়ে জল ছুঁয়ে ছুঁয়ে বাইরের দেওয়ালে আলতামিরার গুহাচিত্র এঁকে রেখেছে ময়লা চুনকামের ওপর। অসংখ্য লেকট্রিকের মিটার। বে মিটারে রিডিং যাঁরা দেখতে আসেন তাঁরা নির্ঘাত ছুলিপির পাঠোদ্ধার করতেও সক্ষম হবেন একটু চেষ্টা করলেই। জল নিকাশি একটু ওন্দ্র থেকে কেটে যাওয়ায় জল বেরিয়ে নোংরা হয়ে আছে রেস্তরাঁর প্রবেশপথের কালভার্টটি।

এসব পেরিয়ে রেস্তরাঁতে ঢুকে পড়লে অতটা খারাপ লাগবে না যদিও। ঢুকতেই বাঁ-হাতে কাউন্টার কাম রিসেপশন। সেটা বাঁ-দিকে রেখে এগিয়ে গেলে ফের বাঁ-হাতে কিচেনের দরজা। তার পরেই পর পর দু' সারি বেঞ্চি পাতা। আর ডান হাতে হচ্ছে সেই আশ্চর্য কেবিন। পর পর চারটি কেবিন। লাল রঙের সস্তার ভেলভেট কাপড়ের পর্দাঘেরা। এসি নেই। তবে গরম লাগে না অতটা। প্রত্যেকটা কেবিনে দেওয়াল থেকে ঝুলছে ক্যান। তার হাওয়া তত বেশি নয়। তবে একটা উপকার হয়। যা আওয়াজ, তাতে পাশের কেবিন বা পর্দার ওপার থেকে কারও পক্ষে কিছু শুনতে পাওয়া অসম্ভব।

কাউন্টারে আজ নিয়ে প্রায় তিরিশ বছর ধরে বসছেন দত্তবাবু। বরুণ দত্ত।

অনেকরকম জুটি দেখেছেন। রাজযোটক থেকে শুরু করে বাঁদরের গলায় মুক্তোর মালা পর্যন্ত সব ধরনের। কিন্তু আজকে যে জুটিটা লাস্ট দু' ঘণ্টা ধরে তিন নম্বর কেবিনটা দখল করে আছে, তাদের মতো জুটি দত্তবাবু কোনোদিনও দেখেননি।

দুই বুড়োরই বয়স পঞ্চাশের ওপর। ষাটের ওপর হলেও দত্তবাবু আশ্চর্য হবেন না। ঢুকেছে দশ মিনিট আগে-পরে। এক প্লেট করে চিকেন চাউমিন অর্ডার দিয়েছিল। তারপর থেকে কাপের পর কাপ চা অর্ডার দিয়ে চলেছে। আর কেবিনের প্লাই-ঘেরা দেওয়ালের আর ছাদের মাঝখানের যে ফাঁকটুকু— সেখান দিয়ে অনর্গল বেরোচ্ছে সিগারেটের ধোঁয়া। কিন্তু বুড়ো দুটো আর বেরোচ্ছে না।

দুটো বুড়োর কী এত কথা থাকতে পারে রে বাবা? ছেলে-ছেলের বউয়ের নিন্দে

কিংবা গিন্নির নজর এড়িয়ে নোলায় শান দেওয়া— এ ছাড়া এই বয়েসের বাঙালি বুড়োর আর করার আছেটাই-বা কী? আর সে দুটোর কোনোটাতেই কি এত টাইম লাগে, না সেসব করতে লোকে পর্দাঘেরা কেবিন খোঁজে?

দত্তবাবু যখন এই সব আগড়ম-বাগড়ম ভেবে যাচ্ছিলেন তখন কেবিনের ভেতরের মিটিং প্রায় শেষ হবার মুখে। শেখরণ তখন সাখাওয়াতকে বলছেন, 'মাই গড় রাকেশ! দিস ান অ্যাকচুয়ালি ওয়ার্ক! আমার বিশ্বাসই হচ্ছে না! রিয়েলি, দিস ক্যান অ্যাকচুয়ালি... রাকেশ... ইউ আর দ্য বেস্ট!'

'নট সো ফাস্ট রঘু! তুমিও জানো এই প্ল্যানে অনেক চান্স ফ্যাক্টর। অনেক অ্যাজাম্পশন। রিস্কের কথা বাদই দিলাম। কিন্তু হ্যাঁ— সময়ের টানাটানি আর আমাদের অবজেক্টিভের অবিশ্বাস্যতার কথা মাথায় রাখলে এর চেয়ে বেটার কিছু আমার মাথায় অন্তত আসছে না।'

'আই এগ্রি। আই উইল রান দিস বাই হিম টুনাইট।'

'ইউ ডু দ্যাট। আমার কয়েকটা জিনিস লাগবে।'

'বলো।'

'আমার অফিস আমি নিজে সেট-আপ করব। তার ফান্ড লাগবে। অফিনের লোকেশন তোমরা জানবে না। প্লসিবল ডিনায়াবিলিটি। আমি কিছু লোক অ্যাপয়েন্ট করতে পারি। ক্যুড বি ফ্রম সার্ভিস অর আউটসাইড। অবশ্যই তারা ততটুকুই জানবে যতটুকু তাদের প্রয়োজন। আমার যখন দরকার পড়বে, তাদের ব্যাকগ্রাউন্ড চেক দরকার লাগবে। নো কোয়েশ্চেনস আস্কড। একটা ননট্রেনেবল ন্যাটি-ফোন চাই। আর চাই তোমার সঙ্গে কমিউনিকেট করার জন্য একটা সেপারেট চ্যানেল। সিকিওর অ্যান্ড এক্সক্লুসিভ।'

'কনসিডার ডান।'

'উই নিড এ নেম। এ কোড নেম।'

কিছুক্ষণের নীরবতা নেমে আসে কেবিনে। শূন্যে ধোঁয়া ছেড়ে, একটু উদাস গলায় ছুঁদে আমলা বলে ওঠেন, 'আই প্রপোজ শতরঞ্জ। দ্য রিস্কিয়েস্ট অ্যান্ড মোস্ট গ্লোরিয়াস গেম হিউম্যান এভার ইনভেন্টেড।' 'তবে তাই হোক। শতরঞ্জ ইট ইজ!!'

দশম অধ্যায়

।। দ্য এক্সিকিউশনার।।

।। ১০.১।।

।। দ্য এনিগম্যাটিক কুইন।।

১৫ জুলাই, ২০১৮, সকাল বেলা / ভুবনেশ্বর, ওড়িশা, ভারত

বিজু পট্টনায়ক এয়ারপোর্ট ছোট হলেও, মনোরম ও আধুনিক। এভিয়েশন মিনিস্ট্রির উদ্যোগে ২০১৩ থেকে সারা ভারতের যে পঁয়ত্রিশটি বিমানবন্দর ঢেলে সাজানো হয়েছে এটি তার অন্যতম। অধুনা যে টার্মিনাল ১, সেটিকে পুরো ঢেলে সাজানো হয় সেই সময়। টার্মিনাল ১ এখন মূলত আন্তর্দেশীয় যাত্রী পরিবহণ সামলায়।

টার্মিনাল ২ হচ্ছে আন্তর্জাতিক টার্মিনাল। খুব বড় নয় এটিও। এয়ার এশিয়ার একটিই রুট চালু এখান থেকে। কুয়ালালামপুরগামী! সাকুল্যে ছ'টা চেক ইন কাউন্টার, দশটা ইমিগ্রেশন কাউন্টার এবং চারটে কাস্টমস কাউন্টার।

এখানে যারা কাজ করেন, তাঁদের মধ্যে ব্যস্ততার লেশমাত্র নেই। থাকবেইবা কেন? কাজের চাপ কোথায়? তাই এঁরা মাঝেমধ্যে বিদেশ থেকে আগত যাত্রীদের সঙ্গে খোশগল্প করে থাকেন। যাত্রীরাও তাতে বিশেষ দোষ দেখেন না। আগত যাত্রীরা বেশিরভাগই হয় বাড়ি ফিরছেন ছুটির মেজাজে বা ঘুরতে যাচ্ছেন পুরী-কোনারক! এ সময় দুটো বাড়তি কথা বলতে কারোরই মন্দ লাগে না চট করে।

তবে মাঝেমধ্যে দু-একটা গোমড়ামুখো লোক যে পাওয়া যায় না, তা নয়। যেমন সুমিত পেয়েছেন। সুমিত পণ্ডা এমনিতে খুবই চটপটে। শুধু গল্প করছেন বলেই একটু ধীরে ধীরে চেক করছিলেন ভদ্রলোকের পাসপোর্ট, ভিসা ইত্যাদি। মালয়েশিয়ান পাসপোর্ট। অথচ নামটা তো পুরোদস্তুর এদেশীয়। সেটা দেখেই গল্প করার ইচ্ছে চাগিয়ে উঠল সুমিতের। হালকা চালে জিজ্ঞেস করল, 'আপ ওড়িয়া হো?' হিন্দিটা সেফ। মোটামুটি সবাই বোঝে। "

'নেহি, বাঙ্গালি! কিউ?'

'আরে বাহ! আমিও প্রায় বাঙালি বলতে পারেন। আপনার নামটা দেখেই আন্দাজ করেছিলাম, এই নামটা আমাদের দেশের লোকের না হয়েই যায় না।'

লোকটা চুপ করে থাকে। মুখের ভঙ্গি দেখে মনে হয় গল্প করতে সে আদৌ আগ্রহী নয়। সুমিত তবু নাছোড়বান্দা, 'ব্যবসাপত্তর আছে নাকি?' 'না না, ঘুরতে এসেছি।' 'একাই?'

'কেন? এনি প্রবলেম?' একটু তিরিক্ষে মেজাজে যেন বলে লোকটা। সুমিতের পাশের কাউন্টার থেকে রোশনিও মুখ তুলে তাকায় এক বার। সুমিত নিজেকে সামলে নেয়। আড়চোখে এক বার হুইলচেয়ারের দিকে চেয়ে বলে, 'নাহ! নো প্রবলেম। এই নিন। হ্যাভ আ নাইস স্টে হিয়ার!'

বিনা বাক্যব্যয়ে পাসপোর্টটা নিয়ে পাশের গেট দিয়ে লাগেজ কালেকশন করার দিকে এগিয়ে যায় লোকটা। তার যন্ত্রচালিত হুইলচেয়ারের দিকে একটা চাউনি ছুড়ে দিয়ে সুমিত রোশনির দিকে ফিরে বলে, 'বাব্বা, কী মেজাজ রে!'

'হুম। কিছু লোকের মধ্যে একটা তিক্ততা থাকে, অকারণ! আমি দেখেছি।'

'নামের সঙ্গে একেবারে মানানসই অ্যাটিটিউড!'

'কী নাম?' হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করে রোশনি।

'রাজকুমার, রাজকুমার দেব!!'

৩০ জুন, ২০১৮, দুপুর বেলা / কলকাতা, ভারত

'নাম কী তোমার?'

'আর্য। আর্য তনভীর।

'তোমাকে কী ব্রিফিং দেওয়া হয়েছে?'

'নাথিং স্যর! শুধু বলা হয়েছে আপনার সঙ্গে দেখা করতে আর আপনি যা বলবেন, কোনো কোয়েশ্চেন না করে সেটা করতে।'

'কী করে বুঝলে, তোমাকে যার সঙ্গে দেখা করতে বলা হয়েছে, আমিই সেই লোক?'

বেড়াল যেমন ইঁদুরকে ফাঁদে পেলে খেলানোর জন্য গুছিয়ে ওত পেতে বসে, সাখাওয়াতের শরীরে ও গলার আওয়াজে সেই সুর।

'আপনার ড্রেস, অ্যাপিয়ারেন্স, ভেন্যু, সেখানে ঠিক কোথায় বসবেন, সবই আমাকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল।' ছেলেটার গলায় ঘাবড়াবার বা চাপে পড়ার কোনো লক্ষণ খুঁজে পাওয়া যায় না।

'তাতেও কি নিশ্চিতভাবে কিছু প্রমাণ করা যায়?' চুক চুক করে একটা আওয়াজ করে মাথা নেড়ে বলতে থাকেন সাখাওয়াত, 'আসল আমাকে কিডন্যাপ করে টর্চার করে এই তথ্যগুলো হাসিল করে নেওয়া খুব একটা শক্ত কাজ কিছু না। তারপর নকল আমি এসে বসে পড়ব তোমার সঙ্গে দেখা করতে। ইজন্ট ইট ভেরি মাচ পসিবল?'

'ইট ইনডিড ইজ স্যর! কিন্তু আপনি নকল নন। কারণ আপনাকে আমি এই পাঁচ মিনিট আগে আমার সিও-র সঙ্গে ফোনে কথা বলতে শুনেছি।'

এবারে সাখাওয়াতের চমকানোর পালা।

'মানে?'

'আই বাগড্ ইউ স্যর! হোপ ইউ ডু নট মাইন্ড!

'আই ডোন্ট। বিকজ আই নো ইউ আর ব্লাফিং মাই বয়। আমি এখানে বসার আগে এই টেবিল, এর ওপরের অ্যাশট্রে, ফুলদানি— সব কিছু চেক করে নিয়েছিলাম। দে আর নট বাগড্।'

'নট দেম স্যর। অ্যাজ আই সেড, আই বাগ্ড ইউ। রিমেম্বার দ্য শোভ অ্যাট দ্য এন্ট্রান্স?'

সাখাওয়াতের চকিতে মনে পড়ে যায়, ঢোকার মুখে তার সঙ্গে একটি অল্পবয়েসি ছেলের হালকা কাঁধ ঘষাঘষি হয়েছিল। একটু অপ্রস্তুত হলেও সাখাওয়াতের ঠোঁটের কোণে সেইসঙ্গে একটু আত্মপ্রসাদের হাসি ভেসে ওঠে। তিনি ভুল লোককে বাছেননি।

যদিও সেই কাজটা সোজা ছিল না।

স্ট্যান্ডার্ড কোভার্ট অপারেশনে অন্তত চার ধরনের লোক দরকার হয়।

দ্য প্ল্যানার— যিনি সমস্ত অপারেশনটা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরিকল্পনা করবেন। প্রতিটি ধাপ, প্রতিটি ধাপের বিকল্প ধাপ, কে কোন কাজটা কবে করবে - সমস্ত কিছু। এখানে সাখাওয়াত নিজে সে দায়িত্ব পালন করবেন।

দ্য রিভিউয়ার— যিনি প্ল্যানারের সমস্ত প্ল্যান রিভিউ করবেন। কোনো ছোটখাটো ভুল, কোনো দুর্বল ধাপ, কোনো ঝুঁকিপূর্ণ অ্যাজাম্পশন— সেগুলো পর্যালোচনা করে বদলানোর, বিকল্প দেওয়ার দায়িত্ব পালন করবেন। আপাতত এই কাজে অন্য কাউকে ভরসা করে সে দায়িত্ব দেওয়া যায় না। শেখরণ কিছুটা হলেও সেই দায়িত্ব পালন করবেন। তবে মূলত সমস্ত পরিকল্পনা সাখাওয়াতের ওপরই নির্ভর করবে।

দ্য এক্সিকিউশনার— এঁর কাজ, সমস্ত পরিকল্পিত ধাপ ও কাজকে বাস্তবে রূপ দেওয়া। দ্য ম্যান অফ অ্যাকশন। এই লোকটিকে হতে হবে একাধারে বহুরূপী, বহু ভাষাবিদ,

ধূর্ত এবং সেইসঙ্গে অ্যাকশনে দক্ষ।

সব শেষ কাজ থাকে জ্যানিটরের। অপারেশন শেষ হবার পর, তার আলগা সূত্র, তার সমস্ত ট্রেস মুছে, শেষ করে দেবার কাজ।

সাধারণত প্রথম দুটি দায়িত্ব থাকে ইন্টেলিজেন্সের লোকের। আর শেষ দুটি দায়িত্বের জন্য বেছে নেওয়া হয় এলিট ফোর্সের এক বা একাধিক লোককে। ভারতে র এবং আইবি দীর্ঘদিন ধরে মোটামুটি এই পদ্ধতিতেই কাজ করে এসেছে। শেখরণের সঙ্গে মনোরমা কেবিনে শেষ সাক্ষাতের পর সাখাওয়াত স্থির করেন সময় এসেছে অন্তত এক জনকে রিক্রুট করার। এক্সিকিউশনারকে।

যারা ভারতের এলিট ফোর্স সম্বন্ধে একটু-আধটু খোঁজ রাখেন তারা জানেন, ভারতে মোটামুটিভাবে এলিট ফোর্স আছে চারটি। মার্কোস হল ইন্ডিয়ান নেভির। গরুড় হল ইন্ডিয়ান এয়ারফোর্সের। ঘাতক ইন্ডিয়ান ইনফ্যান্ট্রি ফোর্সের। কোবরা অর্থাৎ কম্যান্ডো ব্যাটেলিয়ন ফর রেজোলিউট অ্যাকশন হল সেন্ট্রাল রিজার্ভড পুলিশ ফোর্সের অংশ।

এবং তারা বেশিরভাগই ভুল জানেন। এই চারটি বহুল প্রচারিত এলিট ফোর্সের সঙ্গে সঙ্গে ভারতে আরও একটি এলিট ফোর্স অ্যাক্টিভ। তাদের নাম স্পেশাল ফ্রন্টিয়ার ফোর্স। এই ছায়ার জগতের যে কতিপয় লোক এদের নাম জানেন, তাঁরা অবশ্য এই নামে চেনেন না।

এই বাহিনীর প্রথম ইনস্পেকটর জেনারেল, মেজর জেনারেল সুজন সিং উবান দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটিশ অধীনস্থ ২২ মাউন্টেন ডিভিশনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ইউরোপের রণাঙ্গনে। সেই সূত্র ধরে এদের চালু নাম হয়ে দাঁড়ায় এস্টাব্লিশমেন্ট ২২ বা আরও সংক্ষেপে ২২।

১৯৬২ সালের ইন্দো-চীন যুদ্ধের সময় সীমান্তের ওপারে গিয়ে গেরিলা যুদ্ধের জন্য মূলত এই বাহিনী গঠন করা হয়েছিল। পরে এদের কাজে লাগানোর পদ্ধতি ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হতে হতে নব্বই দশকের মাঝামাঝি নাগাদ এটি পুরোপুরি ব্ল্যাক-অপস বাহিনী হয়ে দাঁড়ায়। সাদা বাংলায় বললে র বা আইবি যে ধরনের কাজের কথা ঢাক-ঢোল পিটিয়ে জনসমক্ষে বলতে পারবে না, অথচ করাটা খুবই দরকারি— সেই ধরনের কাজের জন্যই মূলত এদের ডাক পড়ে।

আমাদের রোজের চেনা পৃথিবীর চোখের আড়ালে এদের রেখে দেওয়ার জন্য ভারত সরকার বিশেষ যত্নশীল। সেজন্য পারতপক্ষে এদের নাম মিডিয়া বা অন্য কোনো ধরনের প্রচারের আলোতেই আসে না। মার্কোস বা গরুড় বাহিনীর বিক্রম বা কর্মকুশলতা নিয়ে সারা দেশে প্রশংসার বান ডাকে। খবরের চ্যানেলে প্যানেলে প্যানেলে তথাকথিত বিশেষজ্ঞরা বসে গর্বিত কবুতরের মতো গলা ফুলিয়ে বকম বকম করতে থাকেন।

হয়তো ঠিক সেই সময়ে ২২-এর কম্যান্ডোরা সেই প্রশংসার রোদ এড়িয়ে নিভৃতে ছায়ায়, ভিন দেশের বিপজ্জনক অচেনা মাটিতে একা একা বা কখনো ছোট দলে গিয়ে এমন কাজ সম্পন্ন করে আসছে যার কথা পৃথিবীর কোনো দেশের কোনো খবরের কাগজে বা চ্যানেলে স্থান পাবে না। না তাদের নিজেদের দেশ কোনোদিন ঘোষণা করবে, না স্বীকার করবে সেই দেশ, যাদের বুকে রক্তক্ষরণ ঘটেছে। একদল কূটনীতির ঘোলা জলে নিজেদের হাত ধুয়ে নেবে, আর অন্যদল নিজেদের পরাজয়ের, অপ্রস্তুত হওয়ার কথা বেমালুম ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করবে।

দগদগে ক্ষত থেকে যায় সেসব দেশে। কিন্তু ওইটুকুই সার। এস্টাব্লিশমেন্ট ২২-এর বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেওয়ার চিন্তা করাও বাতুলতা, কারণ এই দলটি নিজেদের দেশেও প্রায় হাওয়ায় মিশে থাকে। এতটাই— যে জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের সব সদস্যও এদের সব খবর জানেন না। অশরীরীদের বিরুদ্ধে কোনো অ্যাকশন নেওয়ার উপায় আধুনিক গুপ্তচরবৃত্তিতেও অনাবিষ্কৃত, আজও।

সাখাওয়াত কোনো বিশেষ বাহিনীর প্রতি পক্ষপাত নিয়ে এগোতে চাননি। তিনি জানেন, তাঁর যা কাজ তা করতে এমন একজন লোক দরকার যে প্রায় প্রবাদপ্রতিম হবে।

ভিড়ে মিশে থাকবে সাধারণের চেয়েও সাধারণ হয়ে। অন্তত তিন-চারটে ভাষা, বিশেষত বাংলা-হিন্দি-উর্দুতে দখল বাধ্যতামূলক। সেইসঙ্গে থাকতে হবে নজরদারি করার ও দূরপাল্লার লক্ষ্যভেদ করার ক্ষমতা। যে কোনো এলিট ফোর্সের কম্যান্ডোই হাতাহাতি লড়াই থেকে শুরু করে ছুরি, রিভলবার, এক্সপ্লোসিভ এবং অ্যাসল্ট রাইফেল ব্যবহারে দক্ষ হয়েই থাকে। তাদের অমানুষিক কঠিন ট্রেনিং প্রোগ্রামে এই শিক্ষাগুলো খুবই বুনিয়াদি।

এদের মধ্যে কিছু থাকে বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন।

যেমন স্নাইপার। ভারতের এলিট ফোর্সগুলিতে এমন স্নাইপারও আছে যারা আটশো-নশো মিটার দূর থেকে নিখুঁত লক্ষ্যভেদ করতে পারে। এরা অলিম্পিকে গেলে পদকও নিয়ে আসতে পারে অনায়াসে। কিন্তু এরা যায় না। পৃথিবীকে নিজেদের ক্ষমতা জানানোর অধিকার এদের নেই। শিকার নিজের অজান্তে গুটিগুটি ঢুকে পড়ে শিকারির ঘেরাটোপের আওতায়। গোটা দুনিয়ার চোখের আড়ালে বহু দূর থেকে কোনো এক অজ্ঞাতপরিচয় শিকারির ছোড়া মৃত্যুবাণে লেখা থাকে তার নিয়তি। বেচারা জানতেও পারে না।

যেমন ট্র্যাকার। সিনেমায় যেভাবে অনুসরণ করা দেখানো হয়, কোনো পেশাদার ট্র্যাকার তা দেখলে লজ্জায় আত্মহত্যা করবে বা পরিচালককেই খুন করে বসবে। বাস্তব জগতে অনুসরণের প্রাথমিক শর্ত হল যে তোমাকে দেখা যাবে না। কোনোভাবেই। ট্র্যাকারদের মধ্যে একটা চালু বয়েত আছে— যাকে অনুসরণ করছ, তার গন্তব্যে পৌঁছে তার জন্য অপেক্ষা করো। সেটাই সবচেয়ে ভালো অনুসরণ পদ্ধতি। যদি তা না সম্ভব হয়, তাহলে মনে রেখো, সে যে যে জায়গা দিয়ে যাবে, সব জায়গার সঙ্গে তাল মিলিয়ে ক্যামোফ্লেজ করে যেতে হবে তোমাকে, ঠিক বহুরূপী গিরগিটির মতোই, ক্ষণে ক্ষণে রং বদল করতে করতে।

আর এসব ছাড়াও কিছু জনের থাকে কিছু বিশেষত্ব। অপারেশন যত ভালো করেই প্ল্যান করা হোক না কেন, ফিল্ড অপারেটিভ মাত্রই জানে যে তা হুবহু প্ল্যানমাফিক চলবে না কোনোদিনই। সেখানেই দরকার পড়ে ইম্প্রোভাইজেশনের। পরিমিত ইম্প্রোভাইজেশনের। সময়, পরিবেশ ও পরিস্থিতি বুঝে নিজেকে মানানসই করে নেওয়ার ক্ষমতা। দ্রুত, সেকেন্ডের ভগ্নাংশের মধ্যে নির্ভুল সিদ্ধান্ত নেবার মতো ক্ষমতা। মনে রাখতে হবে, যে খেলায় এরা নামে, তাতে সামান্য ভুলের পরিণতি মৃত্যু।

আর দুর্ভাগ্যজনকভাবে এদের কাজ, কৃতিত্ব ও অস্তিত্বের মতোই এদের মৃত্যুও বেনামি।

সাখাওয়াত এমন কাউকে খুঁজছিলেন যার মধ্যে এই সব ক'টি গুণ থাকবে।

পরের দিনই তাঁর হাতে এসে পৌঁছেছিল একটি ল্যাপটপ আর একটি সিকিওর স্যাটেলাইট ফোন। আর সেই ফোন চালু করামাত্র সেখানে এসেছিল শেখরণের প্রথম কল, 'তুমি আমার সঙ্গে সেফ, আনট্রেসেবল, সিকিওর লাইন চেয়েছিলে। হিয়ার ইট ইজ। পিএম ছাড়া আর কেউ এই কথাবার্তার কথা কোনোদিনও জানতে পারবে না, দ্যাট মাচ হ্যাজ বিন এস্টাব্লিশড।

'গুড। থ্যাংকস। নাও, আমার একটা জিনিস চাই।'

'কী?'

'ভারতের সমস্ত এলিট ফোর্সের সমস্ত কম্যান্ডোদের পার্সোনাল অ্যান্ড প্রফেশনাল ডিটেলসের ফাইল।'

'সব?' বেশ আশ্চর্য শুনিয়েছিল শেখরণের গলা।

'ইয়েস। সব।' বেশ জোরের সঙ্গেই বলেছিলেন সাখাওয়াত। সেইসঙ্গে মনে মনে একটু অবাকও হয়েছিলেন— এতে এত অবাক হওয়ার কী আছে?

'ওকে। এনক্রিপ্টেড লিস্ট অফ অল অপারেটিভস— তোমার ইমেলে পৌঁছে যাবে উইদিন এ কাপল অফ আওয়ার্স।' শেখরণ ফোন রেখে দিয়েছিলেন।

কথা রেখেছিলেন শেখরণ। এবং সেই লিস্ট পাওয়ামাত্র সাখাওয়াত বুঝতে

পেরেছিলেন তিনি একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলেছেন। এই কারণেই শেখরণ অত আশ্চর্য হয়েছিল।

ভারতের সমস্ত এলিট ফোর্স মিলিয়ে সব কম্যান্ডোদের ডিটেলসই পাঠিয়েছিলেন শেখরণ। বেশি না, মাত্র তেরো হাজার সাতশো পঞ্চাশ জন। যার মধ্যে দশ হাজার কোবরা, ছশো পঞ্চাশ জন ঘাতক, দু' হাজার মার্কোস, এক হাজার গরুড় এবং মাত্র একশো জন কম্যান্ডো এস্টাব্লিশমেন্ট ২২ থেকে।

লিস্ট দেখে একটু থিতিয়ে গেলেন সাখাওয়াত। দমে গেলেন না। আইবি-র দীর্ঘ অভিজ্ঞতা তাকে শিখিয়েছে যে ধৈর্যই শেষমেশ বেশিরভাগ যুদ্ধে জেতায়। বিশেষ করে শতরঞ্জে!!

প্রথমেই তিনি বাদ দিলেন বিবাহিতদের। যে কাজের জন্য তিনি রিক্রুট করবেন, সেই কাজে কারও কোনো দুর্বলতা থাকলে চলবে না। কম্যান্ডোরা যদিও এই সব সাধারণ দুর্বলতার কারণে কোনোদিন কোনো মিশনে ফেল করেননি— কিন্তু সাখাওয়াত কোনো চান্স নিতে চান না। আসলে... তিনি কোনো চান্স নিতে পারেন না।

বিবাহিতদের বাদ দিতেই সংখ্যা এক ঝটকায় কমে দাঁড়াল পাঁচ হাজার একশো ছিয়াত্তর। এবারে তিনি চোখ রাখলেন এদের ল্যাঙ্গুয়েজ প্রফিশিয়েন্সির কলামে। ওঁর কাজের লোককে অবশ্যই উর্দু এবং বাংলাতে স্বচ্ছন্দ হতে হবে। ফলে বাদ চলে গেল বাকিরা।

পড়ে রইল একশো বত্রিশ জন। তার মধ্যে বিশেষ করে নজর কাড়ল দুটি প্রোফাইল। এক জন মার্কোস, আর এক জন ২২ কম্যান্ডো। দুজনেই টপ অফ দ্য লাইন কম্যান্ডো। দুজনেই সাখাওয়াতের পছন্দের সব ঘরে টিক মারতে পারে। সাখাওয়াত আরও ডুবে গেলেন দুজনের ফাইলে।

প্রথম জন স্বদেশ বড়ুয়া। মার্কোস। বয়েস সাতাশ। অন্তত বারোটি কোভার্ট অপারেশনের অভিজ্ঞতা। বাংলা, হিন্দি, উর্দু আর ইংরেজি ছাড়াও অসমিয়া ভাষায় স্বচ্ছন্দ। ইংরেজি বাদে সব ক'টিই মাতৃভাষার মতোই বলে। আর ইংরেজিতেও শিক্ষিত ভারতীয়ের মতো ঝরঝরে।

দ্বিতীয়জন আর্য, আর্য তনভীর। পরিবারের জায়গায় দেওয়া আছে নট অ্যাপ্লিকেবল। বয়েস ছাব্বিশ। সাতটি ব্ল্যাক অপারেশন। যার মধ্যে একটির কোনো ডিটেলস উল্লেখ নেই কারণ তা লেভেল ফাইভ কনফিডেনশিয়াল। অর্থাৎ শুধুমাত্র স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রী ও তাদের সচিবরাই দেখতে পারেন সেই অপারেশনের ইতিবৃত্ত। কিন্তু ভালো করে নজর করলে বোঝা যায় বা অন্তত আন্দাজ করা যায় সেটা কী হতে পারে। আর্যও স্বদেশের মতোই বাংলা, হিন্দি, ইংরেজি ও উর্দুতে মাত্রাতিরিক্ত স্বচ্ছন্দ। সেইসঙ্গে তার লিস্টে যোগ হয়েছে আরও একটা ভাষা। পাশতুন। ভাষার তালিকায় এর উপস্থিতি ফিসফিস করে যে নামটা অভিজ্ঞ লোকের কানের কাছে বলে যায়, তা হল— বালুচিস্তান।

গত এক-দেড় দশক ধরে পাকিস্তানের সঙ্গে শান্তিচুক্তির ও সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের অবসানের বিষয়ে আলোচনার ব্যর্থ চেষ্টার পাশে পাশে ভারত সরকার আরও একটি কাজ করে গেছে অতি যত্ন সহকারে... বা অফিসিয়ালি বললে, করেনি।

বালুচিস্তান লিবারেশন আর্মি ২০০৪ সাল থেকে পাকিস্তান সরকারের সঙ্গে এক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে মেতে রয়েছে, বালুচ লোকেদের স্বাধীন দেশের দাবিতে। দাবির সারবত্তা বা প্রকৃত কতটা জনসমর্থন তারা তাদের নিজেদের গোষ্ঠীর লোকেদের থেকেই পায়— সেই তর্কে না গিয়ে শুধু এটুকু বলা যায়, ভারতের যেমন কাশ্মীর, পাকিস্তানের জন্য তেমনি হয়ে রয়েছে বালুচিস্তান।

কূটনৈতিক স্তরে ভারত তীব্র ভাষায় নিন্দে করে এসেছে বালুচিস্তানের বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের। সমর্থন করে এসেছে পাকিস্তানকে। আর সেই একই সময়ে কিছু বেতনভুক অশরীরী কাজ করে এসেছে খোদ শত্রুপক্ষের ডেরায় তাদের বুকের ওপর বসে।

তারা নিশ্চিত করে এসেছে সেই অবস্থার কোনো উন্নতি যেন না হয়, যেন

পাকিস্তানের মাথাব্যথা ক্রমশ বাড়তে থাকে। সেই ছায়া-মানুষদের কোনো দেশ নেই। কারণ তাদের নাম আলোয় এলে, তাদের দেশ তাদের স্বীকার করে নেবে না। তারা কোনো অজানা-অচেনা মাটিতে মিশে যাবে নামহীন লাশ হয়ে।

আর্য তনভীরের পাশতুন ভাষায় দক্ষতা আর লেভেল ফাইভ গোপনীয়তার অপারেশনের অভিজ্ঞতা দেখে সাখাওয়াতের পোড়-খাওয়া চোখ অনায়াসে পড়ে নিয়েছিল তার অনুল্লিখিত অতীত।

সাখাওয়াতের আর কোনো অসুবিধে হয়নি পছন্দটিকে বেছে নিতে। সব মিলিয়ে পাঁচ ঘণ্টার পরিশ্রম। সাখাওয়াত বিন্দুমাত্র হাঁপ না ছেড়েই ফোন করেন শেখরণকে। আর সেখানেই ঠিক হয় আজকের রাঁদেভু।

মাত্র আঠেরো ঘণ্টার নোটিস দেওয়া হয়েছিল এই ছেলেটিকে, বেলগাওঁতে নিজের ইউনিট থেকে এসে সাখাওয়াতের কাছে রিপোর্ট করার জন্য। তার মধ্যে এসে সে সাখাওয়াতকে ট্রেস করেছে— না হলে তাঁর ফোন 'বাগ' করে তাঁর কথায় আড়ি পাতা যায় না।। রাঁদেভু পয়েন্ট স্ক্যান করেছে, না হলে সুযোগ বুঝে ইমপ্ল্যান্টের কাজটা করা যায় না। সাখাওয়াতের শরীরে লিসেনিং ডিভাইস ইমপ্ল্যান্ট করেছে—একজন চার দশকের পোড়-খাওয়া ইন্টেলিজেন্স অফিসারকেও অসতর্ক করে কাজ মিটিয়ে সরে গেছে।

সাখাওয়াত ওয়াজ রিয়েলি ইম্প্রেসড। এবারে একটু সামনে ঝুঁকে টেবিলে নিজের কনুই দুটি রেখে তিনি চোখ রাখলেন ছেলেটির দিকে। পাঁচ ফুট দশ ইঞ্চি মতো উচ্চতা। এলোমেলো চুল, মাথা-ভরতি। যে কোনো সময়ে যে কোনো ধরনের আকার ও রং নিতে পারে তা। সুদর্শন, তবে স্বাভাবিক। এমন নজরকাড়া নয় যে চোখে পড়ার কিছুদিন পরেও মনে থাকবে। সব মিলিয়ে এমন তার উপস্থিতি যা কারও মনোযোগ আকর্ষণ করে না।

কিন্তু প্রথম ঝলকের পরে যদি কেউ একটু গভীরে তাকায়, যেমন সাখাওয়াত তাকালেন, তখন দেখা যায় চোখ দুটি ইস্পাতের পালিশ করা ঝকঝকে ও শীতল। বুদ্ধি ও সাহস থেকে থেকে ঝিলিক দিয়ে ওঠে চোখের হালকা বাদামি মণি থেকে। আর ঢোলা গোলগলা টি-শার্ট আর ঢোলা জিন্সের আবডালে চোখ চালালে বোঝা যায় তার ভেতরের শরীরটি সুগঠিত ও শক্তিশালী। বোঝা যায় এর পেশিতে পেশিতে খেলা করে বেড়াচ্ছে বিদ্যুৎ। মস্তিষ্কের অনুশাসনে তা শান্ত। প্রয়োজনীয় নির্দেশে শিকারি চিতার মতোই ক্ষিপ্র ও ঘাতক হয়ে উঠতে পারে এই শরীর। সাখাওয়াত বললেন, 'আই নিড ইউ টু ডু ফিউ থিংস ফর আস।'

'এই 'আস'-টা কে, জানা যেতে পারে কি স্যর?'

'দুর্ভাগ্যবশত, না।'

'বেশ। আমায় কী করতে হবে।'

'আপাতত একটি কাজ। আমার শরীরে কোথায় লিসনিং ডিভাইস প্ল্যান্ট করেছ, সেটা খুলে নাও। নাহলে আমি আসল কাজের ইন্সট্রাকশন দেবার ঝুঁকি নিতে পারি না।'

'সরি স্যর! সেটা সম্ভব না।' খুব শান্ত গলায় জানাল আর্য।

'কেন?'

'কারণ দেয়ার ইজ নো ডিভাইস অন ইউ স্যর। ইউ আর নট বাগ্ড। আই ওয়াজ অ্যাকচুয়ালি ব্লাফিং ইউ!' নিরুত্তাপ ছেলেটির চোখে তখন ঝিকমিক দুষ্টু হাসি।

একটা ঝটকায় সিধে হয়ে বসলেন সাখাওয়াত।

'মানে?' অস্ফুটে তার মুখ থেকে তার অজান্তেই প্রশ্নটা বেরিয়ে এল।

'আমি আপনাকে রাস্তার ফুটপাথ থেকে খেয়াল করছিলাম। সেখান থেকেই দেখতে পাই, ঢোকার মুখে আপনার সঙ্গে একটি ছেলের অল্প ধাক্কা লাগে। অ্যান্ড দেন...'

ইম্প্রোভাইজেশান!

কথাটা অসম্পূর্ণ থাকলেও সাখাওয়াতের মনে সম্পূর্ণ হয়ে যায়। এই একটা জিনিস, যা হাজার ট্রেনিং-এও কাউকে শেখানো যায় না। কারও কারও এটা স্বাভাবিকভাবেই থাকে।

আবার কারও শত চেষ্টাতেও হয় না। এই ছেলেটির আছে। একে দিয়ে হবে। সাখাওয়াতের যে প্রায় অসম্ভব পরিকল্পনা, সেটার বাস্তব রূপায়ণের জন্য এই মুহূর্তে আর্য তনভীরের চেয়ে উপযুক্ত লোকের খোঁজ অন্তত তাঁর কাছে নেই।

চোখ থেকে চশমা খুলে তার কাচ মুছতে মুছতে সাখাওয়াত একটু সামলে নিলেন ঝটকাটা। তারপর বললেন, ‘ইউ আর ইন। আমার মনে হয় তুমি পারবে কাজটা করতে।'

‘আমারও তাই মনে হয়। কিন্তু কাজটা ঠিক কী, সেটা এখনও জানলাম না স্যর!’

‘তোমাকে এক বার জেলে যেতে হবে ইয়ং ম্যান।'

একাদশ অধ্যায়
।। দ্য ফার্স্ট স্যাক্রিফাইস।।

২৬ জুলাই, ২০১৮, সন্ধে বেলা / কলকাতা, ভারত

'কী অলবড্ডে মেয়ে বাবা। সেই রাত থাকতে বেরিয়েছিল। একপ'র বেলায় ফিরল উমনো-ঝুমনো হয়ে। ফিরে যে একটু মাকে বলবে এতটা সময় কার সঙ্গে ছিল, কোন কাজ করে উদ্ধার করছিল— সেসব কিছু না। ওই রাস্তার নোংরা কাপড়ে পেছন উলটে ঘুম হল— ইশ, ম্যাগো!! এবারে উঠে মহারানির হুকুম হয়েছে ভাত খাবেন— এই ভর সন্ধে বেলায়। তার আর কী? হুকুম দিয়েই খালাস। বাড়িতে তো বিনা মাইনের দাসী-বাঁদি আছেই। বেলা দুটো অবধি ভাত কোলে করে বসে থাকবে... আবার সন্ধে বেলা অসময়ে হেঁসেলে ঢুকবে... রাতভর দুগ্গা নাম জপবে। পইপই করে ওর বাবাকে বলেছিলুম, এই অনাছিষ্টির খবরের কাগজের চাকরি করাতে মত দিও না। আইবুড়ো মেয়েদের এই ধিঙ্গিপনা মানায় না। তা, তিনি মেয়েকে আদিখ্যেতা দিয়ে মাথায় তুলে কেটে পড়লেন। এখন এই পাপকে নিয়ে আমি কী করে চলি, হে ভগবান...'

শাওয়ারের জলের আওয়াজ ছাপিয়ে মায়ের গজগজানি শুনতে পাচ্ছিল মোনালিসা। বিশেষ পাত্তা দিচ্ছিল না যদিও। ওর মা একমুহূর্ত চুপ করে থাকতে পারে না। সব কথায় কান দিতে গেলে মোনালিসা নিজের কাজকর্ম আর কিছুই করে উঠতে পারবে না।

স্নানটা ওর দরকার ছিল। ধাড়সা থেকে ফিরতে ফিরতে বেলা প্রায় সাড়ে বারোটা বেজে গেছিল। শরীর তখন ভেঙে পড়ছিল ক্লান্তিতে। এতক্ষণ নাগাড়ে স্কুটি চালানো ওর অভ্যেস নেই। তায় রাত জেগে। তাই এসে কোনোদিকে না তাকিয়ে, ধড়াচুড়ো পরেই ধপাস করে শরীর ছুড়ে দিয়েছিল বিছানায়।

যখন ঘুম ভাঙল তখন ঘড়িতে তখন প্রায় পাঁচটা। অসময়ে ঘুমিয়ে পড়ার পরে এত বেলায় উঠলে মাথাটা কেমন বোদা মেরে থাকে। ভার ভার লাগে। বিছানায় কিছুক্ষণ থম মেরে বসেছিল মোনালিসা। তারপর মায়ের তাড়নাতেই একরকম— বাথরুমে ঢোকে।

এখন শাওয়ারের ঠান্ডা জলবিন্দুগুলো শরীরের কোষে কোষে পৌঁছে ক্লেদ, ক্লান্তি ও জড়তা ধুইয়ে দিচ্ছিল। মনের ভেতরে জট পাকিয়ে থাকা চিন্তাগুলো গুছিয়ে নিতে শুরু করল সে। এক বার ওই সাধনবাবুকে ফোন করতে হবে। তারপর দেবদার সঙ্গে ফোনে কথা বলে বোঝা যাবে আজকে অফিসে যাওয়ার দরকার আছে কিনা।

বেশ খানিকক্ষণ মনের আশ মিটিয়ে স্নান করে বেরিয়েই মোনালিসা দেখে টেবিলে তার খাবার সাজানো, আর মা সেখানেই বসে।

গরম ধোঁয়া ওঠা ভাত, মুসুর ডাল, আলুভাতে— সরষের তেল, কাঁচা লঙ্কা আর ভাজা বড়ির গুঁড়ো দিয়ে মাখা— সেইসঙ্গে বেগুনের ঝাল।

ভেতরের ঘুমিয়ে পড়া খিদেটা চাগাড় দিয়ে উঠল মোনালিসার। চুল-ফুল না আঁচড়েই হাঘরের মতো সে টপ করে বসে পড়ল খাবার থালার সামনে। হাপুসহুপুস করে খেতে শুরু করে দিল। সেইসঙ্গে চলতে থাকল মায়ের গজগজানি, 'কোথায় কোথায় ঘুরলি সারারাত?'

'সে অনেক জায়গা। হাসপাতাল, একটা ক্লাব, আবার ধাড়সা বলে একটা জায়গা।'

'হাসপাতাল? তুই হাসপাতালে গেসলি কেন? কাকে দেখতে? কে ভরতি আছে? একেই বলে ঘর জ্বালানে পর ঢলানে। অফিসের লোকের জন্য রাতবিরেতে হাসপাতালে হত্যে দিয়ে পড়ছে। আর আমি কবে থেকে বলছি আমার ডান হাঁটুটা মচমচ করছে, সেদিকে কান দেবার ফুরসতই নেই।'

'ওফ মা। হাসপাতালে মুখ্যমন্ত্রী ভরতি আছেন। বাথরুমে পড়ে গিয়ে চোট পেয়েছেন। সেই খবর জোগাড় করতেই যাওয়া।'

'তা মুখ্যমন্ত্রী বাথরুমে পড়ে গিয়ে চোট পেলেও কাগজের লোকজনকে যেতে হয়?

কই, সুনন্দার...’

‘ওসব তুমি বুঝবে না। উনি এমনি এমনি পড়ে যাননি। কেউ ওনাকে কায়দা করে ফেলে দিয়েছে, মারার জন্য।

‘সে কী রে?’

‘হুম।’

‘তা সেইসব খুনে লোকেদের খবর নিতে তুই একা গেসলি?’

‘না, একা কেন? দেবদা, মানে দেবদীপ্তদা ছিলেন তো।' মোনালিসার মা, সুমিতা দেবী একটু নড়েচড়ে বসেন। ‘দেবদীপ্ত কী রে? মানে পদবি কী?’

খাওয়া থামিয়ে মোনালিসা এক বার মায়ের দিকে তাকায়। তারপর মাথা নেড়ে আবার খাওয়ায় মন দেয়। উত্তর না পেয়ে সুমিতা দেবীও গজগজ করতে শুরু করেন, ‘তুমি আর মায়ের কষ্ট কী বুঝবে? পেটে ধরো আগে। আইবুড়ো মেয়ে বুকের ওপর পাথর হয়ে চেপে বসে থাকে...’

মায়ের কথাবার্তার মধ্যেই খাওয়া শেষ করে উঠে হাত ধোয়ার বেসিনের দিকে এগিয়ে যায় মোনালিসা। সুমিতা দেবী এঁটো বাসন গুছিয়ে নিয়ে কিচেনে সিংকে এগোন। মুখ থামে না তার। কিন্তু আইবুড়ো মেয়ের প্রসঙ্গটা উঠতেই তাঁর একটা কথা মনে পড়ে যায়। একটা ফোন এসেছিল। মানু তখন ঘুমোচ্ছিল বলে উনি আর ডেকে বিরক্ত করেননি। একটু গলা তুলে রান্নাঘর থেকেই বলে ওঠেন, ‘তোর একটা ফোন এসেছিল। যখন ঘুমোচ্ছিলি।'

‘কার?’ আঁচানো শেষ করে ততক্ষণে রান্নাঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে মোনালিসা।

‘তা জানি না। তবে একটা মেয়ে। গলা শুনে অল্পবয়েসিই মনে হল।' ‘নাম জিজ্ঞেস করোনি?’

‘অত কথা হল কই? জিজ্ঞেস করল তুই আছিস কিনা। বললাম ঘুমুচ্ছে। ডাকা যাবে না। তাই শুনে পট করে কেটে দিল! ভারী অভদ্র মেয়েটি বাপু।'

‘এই নাম্বারটা থেকে ফোন এসেছিল?’ নিজের ফোনের কল হিস্ট্রিতে একটা নম্বর দেখিয়ে মাকে জিজ্ঞেস করল মোনালিসা।

‘নম্বর-টম্বর মনে নেই। তবে দুপুরে ওই একটাই কল এসেছিল তোর ফোনে।'

মোনালিসা চট করে এক বার ডায়াল করে। যান্ত্রিক গলা জানায় ‘আপ যিস নাম্বার পে কল কর রাহে হো, উও গলত হ্যায়! কৃপয়া দোবারা যাঁচ করে!’ ধুস!

ততক্ষণে মায়ের রান্নাঘরের কাজ শেষ। মা-মেয়ে গিয়ে জড়ো হল একচিলতে লিভিং রুমে। সুমিতা দেবী ডিভানের এককোণে বসলেন একটি পত্রিকা হাতে নিয়ে। মোনালিসা সাধনবাবুর যে নম্বরটা দেবদীপ্তর কাছ থেকে লিখে নিয়েছিল, সেটা ডায়াল করল নিজের মোবাইল থেকে।

‘হ্যালো, সাধনবাবু বলছেন? আমায় দেবদীপ্তদা আপনার নাম্বার দিয়ে বলেছিলেন কল করতে...’

‘আরে মুনু যে!’ মোনালিসার মুখের কথা শেষ হতে না দিয়ে প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়েন ওপাশের লোকটি, ‘কদ্দিন বাদে। এতদিনে মনে পড়ল কাকুকে?’

প্রথমটায় একটু হকচকিয়ে যায় মোনালিসা। কিন্তু ধরতে বেশি সময় লাগে না, যে লোকটা অভিনয় করছে। কেন? আশেপাশে কেউ আছে? সেও চটপট সামলে নিয়ে তালে তাল মেলায়, ‘আরে না না কাকু, মনে ঠিকই থাকে। আসলে কাজের চাপে...'

‘হুম। তাও তো কী ভাগ্যিস পাসপোর্টের জন্য দরকার পড়ল। নাহলে তো ফোন করতি না!’

‘কী যে বলো কাকু।'

‘আচ্ছা শোন, তোর যা দরকার সব একটা লিস্টি বানিয়ে আমি ওই বিদ্যুৎকে দিয়ে দিয়েছি... আরে বিদ্যুৎ... বিদ্যুৎ বোস, তোদের ড্রাইভারটা রে!’

মানে বিদ্যুৎ হচ্ছে ড্রাইভারের নাম।

'হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে আছে। তাহলে ওঁর নাম্বারটা দিন। আমি ফোন করে নিচ্ছি।' সাধনবাবু ফোন নম্বরটা বলতেই খসখস করে একটা প্যাডে লিখে নেয় নম্বরটা। পাশে লেখে, ড্রাইভার, বিদ্যুৎ বোস। তারপর আবার বলে, 'আর ওই যে আপনার বন্ধুটির কথা বলেছিলেন, তার কিছু...'

'না না! তার কোনো খবরই নেই। তুই বরং কাল সন্ধে বেলা আর এক বার ফোন কর। তার মধ্যে যদি পারি তার সঙ্গে যোগাযোগ করে রাখব। ব্যাটা দরকারে কোথায় যে গা-ঢাকা দেয়।'

বডিগার্ডটির কোনো খবর তাহলে এখনও পাওয়া যায়নি। মোনালিসা ফোনে বলল, 'আচ্ছা, থ্যাংক ইউ কাকু। আমি আবার আপনাকে ফোন করব।' 'না, শোন, তুই ফোন করতে পারলে তোর দাদাকে বলিস করতে। সে পারবে।'

'আচ্ছা, ঠিক আছে। রাখছি কাকু।'

পরের ফোন ওই বিদ্যুৎ বোসকে। ডায়াল করতেই 'ইনভ্যালিড নম্বর'। এক বার, দু' বার— পর পর তিন বার একই ফল। জিও আসার পর এই সব নেটওয়ার্কের আচরণের কোনো মা-বাপ নেই। হতাশ হয়ে মোনালিসা আপাতত দেবদীপ্তকে ফোন করে আপডেট দেবে ভেবে তার নম্বরটাই ডায়াল করল।

উফ, কী জ্বালাতন! এটাও নট রিচেবল। সব ব্যাটা কোথায় ঢুকিয়ে রেখেছে নিজেদের মোবাইল? বিরক্ত মোনালিসা ফোন করল অফিসের ল্যান্ডলাইনে। সায়নের ডেস্কে। এ সময়টা সায়ন নিজের ডেস্কেই থাকে। সন্ধে থেকে রাত্তির ন'টা অবধি ও সারাদিনে ওর তোলা ফোটোগুলোর সঙ্গে প্রেমালাপ করে।

এক বার রিং হতেই সায়ন তুলল। মোনালিসা বলল, 'আমি বলছি। এক বার দেখ না দেবদা অফিসে এল কিনা। এলে আমায় ফোন করতে বল প্লিজ। আমি ওর ফোনে পাচ্ছি না।'

'মানে? দেবদা তোর সঙ্গে নেই? আমরা তো সবাই ভাবছি তোরা একসঙ্গেই আছিস। কাল রাত্রে তো তাই বেরোলি।'

'ওয়েট, ওয়েট! তার মানে দেবদা এখনও ফেরেনি।'

'তুই কোথায় এখন?' সায়ন জানতে চায়।

'আমি ওই সাড়ে বারোটা নাগাদ বাড়ি ফিরেছি। দেবদার সঙ্গে একটা লিড ফলো করে এক জায়গায় গেছিলাম। সাড়ে দশটা নাগাদ দেবদা আমায় ফিরে আসতে বলল। বলল ও-ও কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরবে। তারপর উই উইল রিগ্রুপ অ্যান্ড টেক ইট ফ্রম দেয়ার। আমি তো এখন ফোন করেও পেলাম না। নট রিচেবল বলছে। তুই বলছিস অফিসেও আসেনি। এক কাজ কর তো, বিজনদার ঘরে একটু কলটা ট্রান্সফার কর তো।'

সায়ন কলটা ট্রান্সফার করে। বার দুয়েক টুংটাং জলতরঙ্গের আওয়াজ। তারপরই ওপারে বিজনদার চেনা ধরা ধরা গলা, 'বলো মোনালিসা।'

'দাদা, দেবদা কোথায় আপনি জানেন? আপনাকে কি কিছু ইনফর্ম করেছে?'

'না, স্পেসিফিক কিছু বলেনি। তবে ওই বেলা এগারোটা নাগাদ ফোন করে বলল ও কী একটা নতুন লিডের সন্ধান পেয়েছে। সেটা চেক করে তারপর অফিসে ফিরবে। দেরি হতে পারে। আজ নাও ফিরতে পারে।'

'এগারোটায় এসেছিল বললেন?'

'হ্যাঁ, কেন বলো তো?'

'না, বিশেষ কিছু নয়। আসলে ওই সময়েরই পাঁচ-দশ মিনিট আগে আমি দেবদার সঙ্গেই ছিলাম। তারপর ফিরে আসি। মানে, আমি রিটার্ন করার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আপনাকে ফোন করে একটা নতুন লিড পেয়েছে বলল। অথচ আমাকে এক বারও ফোন করল না, তাই ভাবছি।'

'হুম।' সামান্য চিন্তিত শোনায় বিজনের গলা। সে বলে ওঠে 'কাল রাত থেকে কী কী হয়েছে আমাকে একটু ডিটেলসে বলো তো। কিছু বাদ দেবে না।'

মোনালিসা হাসপাতাল, লেক কান্ট্রি ক্লাব, হাইওয়ের ধারে চায়ের দোকান আর ধাড়সা মনসাতলা বাজার— পুরো গল্পটি বিস্তারিত শোনায় বিজনদাকে। মাঝে মাঝে ওকে থামিয়ে দু-একটা প্রশ্ন করা ছাড়া বিজনদা কোনো বাধা দেন না। একদম সাধনবাবুর সঙ্গে ফোনে কী কথা হয়েছে শোনার পর বিজনদা বললেন, 'আমাকে ওই ড্রাইভারের নাম আর নাম্বারটা দাও তো। আমি একটু আমার মতো করে খোঁজখবর করি।'

'বলছি, লিখে নিন— 89108275। আর একটা কথা বিজনদা।'

'হ্যাঁ, বলো।'

'বলছি, আজ এখন আমি আর অফিসে যাচ্ছি না।'

'নো প্রবলেম। তোমার মতো করে খোঁজখবর চালানোর কাজটা কিন্তু করে যাও। কাল অফিসে ন'টা নাগাদ মিট করো। আশা করি দেবদীপ্তও ততক্ষণে ফিরে আসবে।'

'শিওর। রাখি তাহলে?'

'চলো। বাই!'

ফোন রেখে মোনালিসা ভাবতে বসে। কাল রাত্তির থেকে দেবদীপ্তকে দেখে তার অন্তত কোথাও মনে হয়নি ক্রেডিটের পুরো ক্ষীর একা খেয়ে নেওয়ার মতো পাবলিক। তাহলে বিজনদার কথামতো যদি সে এগারোটার সময় ফোনে বলে থাকে যে সে নতুন লিড পেয়েছে— তাহলে মোনালিসা তখনও ধাড়সা পেরোয়নি। ওকে ফোন করে অনায়াসেই ফেরত ডেকে নেওয়া যেত। সেটাই যেন দেবদার পক্ষে স্বাভাবিক হত। কিন্তু সেটা করেনি। কেন? এখন ফোনে পাওয়া যাচ্ছে না কেন?

'কেন'গুলো নিয়ে ভেতরে ভেতরে অস্থির হয়ে পড়ে মোনালিসা। এক বার গেলে হত না? ওই বাজারে গেলে একটা কিছু খবর পাওয়া যাবেই। তার বেরিয়ে আসামাত্রই দেবদা যদি নতুন লিড পেয়ে থাকে তাহলে সেটা ওই জায়গাতেই পেয়েছে। হয়তো এখন গেলে সেও পাবে।

তবে একা যাওয়া যাবে না। ভাবতে ভাবতেই সে আবার ফোন ওঠায়। আবার সায়নকে। তবে এবারে ওর মোবাইলে। ফোনে প্রস্তাব দিতেই এককথায় রাজি। বলল, 'তুই রেডি হয়ে থাক। আমি আধ ঘণ্টার মধ্যে পৌঁছোচ্ছি। তোকে আমার বাইকেই তুলে নেব।'

স্কুটি চালাতে হবে না ভেবে মনে মনে একটু স্বস্তিই পেল মোনালিসা। ফোন রাখতেই মা বলল, 'আবার বেরোবি? ক'টা বাজে সে খেয়াল আছে?'

পোশাক ছাড়ার জন্য ঘরের দিকে যেতে যেতে মোনালিসা ঘড়িতে দেখে সাতটা পনেরো। কথা না বাড়িয়ে ঘরে ঢুকে যায়। কাল রাতের জিন্স-টি-শার্ট আর পরতে ইচ্ছে করে না। সালোয়ারই ভালো। একটা হলুদের ওপর কালো বুটি দেওয়া কামিজ। সঙ্গে ম্যাচিং পাতিয়ালা। কপালে হালকা হলুদ টিপ। লিপস্টিক লাগাতে গিয়েও কী ভেবে রেখে দিল।

সুমিতা দেবী পেছন পেছন এসে ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে আড়চোখে দেখছিলেন মেয়ের রকমসকম। একসময় জিজ্ঞেস করলেন, 'একা যাবি? নাকি ওই দেবদীপ্ত?'

'সায়ন আসছে। ওর সঙ্গে যাব।' বলার সময় মেয়ের কানের গোড়ায় আর গালে হালকা সিঁদুরের ছোঁয়া লেগে গেল মুহূর্তের জন্য। সুমিতা দেবীর নজর এড়াল না সেটা। মোনালিসার তৈরি হওয়া শেষ হতে-না-হতেই কলিং বেল বেজে উঠল। বিছানা থেকে ব্যাগ আর মোবাইল তুলে নিয়ে মেয়ে দৌড় লাগাল। সুমিতা দেবী এক বার বললেন, 'ওড়না নিলি না?'

দরজার দিকে যেতে যেতেও পেছন ফিরে মায়ের দিকে চোখ পাকিয়ে তাকায় মোনালিসা। তারপর এগিয়ে যায় দরজা খুলতে। মচমচে হাঁটু নিয়ে সুমিতা দেবীও পেছনে পেছনে যান। দরজার কাছাকাছি যেতেই দেখলেন দরজায় দাঁড়িয়ে আছে শ্যামলা রঙের একটি ছেলে। গালে হালকা নরম দাড়ি। চোখগুলো বেশ বড় বড় ও হাসিখুশি। বেশ লম্বা-

চওড়া আছে ছেলেটা।

সুমিতা দেবীর দিকে চোখ পড়তেই সে একগাল হেসে বলে, ‘হাই মাসিমা, ভালো আছ?' বড় আপন শোনাল এই তুমি তুমি করে ডাকটুকু। সুমিতা দেবী স্মিত হেসে ঘাড় নেড়ে বললেন, ‘ভালো, বাবা। তুমি ভালো?’

মোনালিসা স্বিকার পায়ে রেডি। সায়ন ওর দিকে এগিয়ে দিল হেলমেট। মৃদু আপত্তি জানিয়ে মোনালিসা বলল, “প্লিজ। চুলটার বারোটা বাজবে। এ যাত্রা মাথায় স্কার্ফ বেঁধে নেব নাহয়।

‘নো ক্যান ডু, ম্যাম! হেলমেট না পরলে আমি নেই।'

সুমিতা দেবীর চট করে ভালো লেগে গেল ছেলেটিকে। বেশ দায়িত্ববান ছেলে। মোনালিসা বাধ্য মেয়ের মতো হেলমেট পরে নিল। সুমিতা দেবী জিজ্ঞেস করলেন, ‘রাত্রের খাবার কি করব?’

‘হ্যাঁ, আমি বাড়িতেই খাব। সায়নও। আসছি মা।'

সুমিত্রাদেবী মুখে দুগ্গা দুগ্গা বলতে বলতেই মনে মনে বাবা লোকনাথের কাছে প্রার্থনা করলেন— এ যাত্রা যেন জোড়টা বেঁধে যায় ঠিকঠাক।

এবারে যাবার সময় বেশি সময় লাগল না। এক তো বাইক। আর তা ছাড়া এবারে আর থেমে থেমে জিজ্ঞেস করার কোনো ব্যাপার নেই। মোটামুটি মিনিট পঁয়তাল্লিশের মধ্যেই দুজনে আবার পৌঁছে গেল সেই ‘মা গঙ্গা মিষ্টান্ন ভাণ্ডার’-এর সামনে।

সায়ন বাইক স্ট্যান্ড করে ফোনটা নিয়ে একপাশে সরে গেল। ফোনটা রিং হচ্ছিল অনেকক্ষণ ধরেই। মোনালিসা এগিয়ে গেল মিষ্টির দোকানের দিকে।

সকালের সেই দোকানদারটা এখনও টাটে বসে আছে। পরনে লুঙ্গি আর স্যান্ডো গেঞ্জি। মোনালিসা মুখে হাসি এনে বলল, “কী কাকু? চিনতে পারছেন তো?’

‘নাহ!’ এক বার মুখ তুলে তাকিয়ে খুব নিরাসক্তভাবে আবার মুখ নামিয়ে নিল সে।

‘সেই যে সকালে এসেছিলাম। সঙ্গে আর এক জন মোটামতো ছেলে ছিল। সেই খবরের কাগজ থেকে।'

‘মনে নেই দিদি। সারাদিনে কত লোক আসচেন!’

‘আরে আপনার দোকানে সেই ফুটবলার ছেলেটা ছিল তখন— সেই যে হ্যাটট্রিক করেছে নাকি...’

‘বললাম তো দিদি, মনে নেই! কেন বেফালতু দিক করচেন? ধান্দার সময়ের অত আনসান কতা মনে থাকে না...

মোনালিসা একটু থমকে গেল। এবারে সে রাস্তা বদলাল। এবার আক্রমণের সময়।

‘বেশ। এর ন্য আপনার ওপর যা পাপ বর্তাবে তার জবাব দেবেন নাহয় আপনি ওপরওয়ালার কাছে। আপনারও দিন আসবে। কাউকে-না-কাউকে আপনারও দরকার পড়বে। বিধবা মায়ের এক ছেলে, সারারাত বাড়ি ফিরবে না। মা হার্টের রোগী, কেঁদে কেঁদে হয়তো মারাই যাবে। আমরা তাকে গিয়ে বলি, মানুষ আজকাল বড় স্বার্থপর হয়ে গেছে। একটু সাহায্যের হাত কেউ বাড়ায় না।'

একদমে কথাটা বলেই বেরিয়ে যাবার ভান করে পেছন ফেরে মোনালিসা। প্রত্যাশামতোই পেছন থেকে একটা মিনমিনে ভীরু কণ্ঠস্বর ভেসে আসে, ‘অ দিদিমুনি! রাগ করেন কেন? শাপ-মান্যি করে চলে যেতে নেই গো।'

মোনালিসা কিছু না বলে শুধু ফিরে তাকায়। লোকটা বলে, ‘আমি দেকিচি আমনার সঙ্গে ওই মোটাসোটা দাদাবাবুকে। আমনি চলে যাবার পরে দাদাবাবু কানির সাতে কী কতা কইলেন। তারপর গেলেন ওই আশ্রমের দিকে।'

হাত তুলে রাস্তাটা দেখিয়ে দেয় দোকানদার। দিকটা ভালো করে বুঝে নিয়ে মোনালিসা দোকানদারকে থ্যাংক ইউ বলেই বেরিয়ে আসে দোকান থেকে। ততক্ষণে সায়ন ফোন রেখে বাইকে চড়ে বসেছে। বাইকে উঠতে উঠতে মোনালিসা শুনতে পেল, “কী দিলি

কাকা? এ তো পুরো সন্ধ্যারানি!'

'আমার মায়ের সঙ্গে কাটাও না বাপু একটা সপ্তাহ। তুমিও অলোকনাথ হয়েই বেরোবে। ওসব ছাড়, ফোন কে করেছিল?'

'বিজনদা। তোর সাধনবাবু মালটি হর্তেল ঘুঘু একটি।'

'কেন?'

'উনি তোকে যে নম্বরটি দিয়েছিলেন সেটা খেয়াল করে দেখেছিস?'

'কেন বল তো?'

'তাতে আটটা ডিজিট। ওটা ফোন নাম্বার বলে দেওয়া হলেও আদৌ ওটা ফোন নাম্বার নয়।'

'হোয়াট? শিট! এটা তো আমি খেয়ালই করিনি।'

'সেটাই তো বিজনদার সঙ্গে বাকিদের পার্থক্য।

'তাহলে ওটা কী?'

'গাড়ির নম্বর। যে গাড়িতে অভিজাত রায় কাল রাত্রে ছিলেন। অন্তত অফিসিয়ালি।'

'আট ডিজিটের গাড়ির নম্বর?' মোনালিসার গলা আরও অবিশ্বাসী শোনায়। 'হ্যাঁ। তোর দেওয়া নম্বরটা ছিল 89108275। কী? তাই তো?'

'হ্যাঁ।'

'89 হল কল্যাণী আরটিও-র কোড। 10 মানে টেন্থ লেটার, মানে J তাহলে পুরো নম্বর WB 89J 8275!!'

'আচ্ছা!! এখন বুঝতে পারছি, কেন লোকটা বলল তুই ফোন করতে না পারলে তোর দাদাকে দিস। মানে হয়তো দেবদার সঙ্গে এই ধরনের কোড চালাচালি হয়েছে আগে। ওয়াও! নাও দ্যাট উই হ্যাভ দ্য নাম্বার, উই ক্যান ট্রেস দেম। আর বিদ্যুৎবাবু সম্বন্ধে কিছু জানা গেল?'

'ওটাও কোড। যদিও বিজনদা সেটা প্রথমে বুঝতে পারেনি। কিন্তু ওই নম্বরের গাড়ির ড্রাইভারের নাম খোঁজ করতেই পেল, তার নাম তড়িৎ শীট। তড়িৎ— বিদ্যুৎ, সিট— বোস। হোপ ইউ আর গেটিং ইট!'

'মাই গড। এত কোড। বাট হোয়াই? এত লুকোচুরি কেন?' 'হয়তো এমন কেউ সামনে ছিল যার সামনে এই সংক্রান্ত কোনো তথ্য সোজাসুজি দিলে সাধনবাবু নামের বিশ্বস্ত সূত্রটি ছিঁড়ে যেত।'

কথা বলতে বলতে তারা এসে পৌঁছোল সেই মাঝারি চওড়া গলিটার মুখে, যেখানে ঘণ্টা দশেক আগে পা রেখেছিল দেবদীপ্ত। সন্ধে ঘন হয়ে এসেছে। গলিটায় আলোর চেয়ে আঁধারই বেশি। গোটা গলিতে দুটি লাইটপোস্ট। একটি মুখের দিকে, আর একটি মাঝামাঝি। তাও পোস্টে লাগানো বাল্বগুলি প্রায় বিস্মৃত হয়েছে যে আসলে তাদের কাজ আলো দেওয়া।

খুব ধীরগতিতে বাইক কিছুটা এগোতেই ওদের চোখে পড়ে মাতৃ আশ্রমের সাইনবোর্ড। তির চিহ্ন দিয়ে দেখাচ্ছে আরও সরু একটি তস্য গলির রাস্তা। সায়ন বাইকটা হঠাৎ পাশে সাইড করে মোনালিসাকে ইশারা করে নামতে। নামতে নামতে মোনালিসা বলে, 'কী হল?'

'অনেকক্ষণ চেপেচুপে আছি। ব্লাডার খালি করব।'

'উফ, বর্বর কোথাকার!' কৃত্রিম বিরক্তি আর ছদ্ম-কোপ নিয়ে মোনালিসা অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়ায়। সায়ন উলটো দিকের ফুটপাথের কাঁচা নর্দমা পেরিয়ে একটু ঢুকে যায় আগাছার জঙ্গলে। হঠাৎ তার পায়ে কী একটা নরম নরম ঠেকে। সায়ন চট করে দু' পা পিছিয়ে আসে। সাপখোপ নয়তো? পকেট থেকে মোবাইলটা বার করে টর্চটা জ্বালে সে।

টর্চের আলো ঘাসের ওপর স্থির হতেই তার মুখ থেকে সম্মোহিতের মতো বেরিয়ে এল, 'মোনা, এক বার এদিকে আয়!'

মোনালিসা ঝাঁঝিয়ে উঠতে যাচ্ছিল 'আমার কি মাথা খারাপ হয়েছে', কিন্তু সায়নের

গলা শুনে কী মনে হতে সে দৌড়ে গেল রাস্তার অন্য পারে, সায়নের পাশে।

দুই ভ্রূর মাঝখানে টিপের মতো একটি ক্ষত। বাকি শরীরে কোথাও কোনো ক্ষতচিহ্ন খালি চোখে ধরা পড়ে না। মৃত্যু এসেছে বোঝার আগেই দেহ থেকে বেরিয়ে গেছে প্রাণ। মুখে মৃত্যু-যন্ত্রণার সামান্য বিকৃতিটুকুও ধরা পড়ছে না এই অল্প আলোয়।

আবছা দেখা গেলেও, মুখটা মোনালিসার ভীষণ চেনা। এই একটু আগেই সে ছবিটা দেখেছে সায়নের মোবাইলে। বিজনদা পাঠিয়েছেন।

যেন পরম ক্লান্তিতে এখানেই ঘুমিয়ে পড়েছেন ফেরারি অভিজাত রায়ের ড্রাইভার—তড়িৎ শীট!

দ্বাদশ অধ্যায়
।।দ্য গেম বিগিন্স।।

২০ জুলাই, ২০১৮, গভীর রাত / নিউ দিল্লী, ভারত

লাল চোখে ডিজিটাল ঘড়িটা জানান দিচ্ছে, বিছানায় শুতে যাবার সময় অনেকক্ষণ পার হয়ে গেছে। ঘড়িতে এখন একটা পঁয়ত্রিশ। অরুণের মনে পড়ে না শেষ কবে এত রাত্তির অবধি জেগেছিলেন।

তাদের ছেলেপুলে নেই। হয়নি। তার স্ত্রী মৃণালেরই কোনো সমস্যা ছিল জরায়ুতে। মৃণাল অনেক বার চেষ্টা করেছেন অরুণকে রাজি করিয়ে একটা দত্তক নেবার। কিন্তু অরুণ কিছুতেই রাজি হননি। তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য ছিল যে ছেলেপুলে স্বাভাবিকভাবে যখন হয়নি তখন আর যেচে ঝামেলা ঘাড়ে নেওয়ার কোনোই মানে হয় না। অরুণবাবু অন্তত কোনো ট্যানজিবল বেনিফিট দেখতে পাননি তাতে। সারাজীবন তাদের জন্য নিজেদের সমস্ত শখ-আহ্লাদ বিসর্জন করে, রাত জেগে, টেনশন করে, অকারণে নিজের বয়সের চেয়ে বেশি বয়স্ক জীবন কাটিয়ে খুটুর খুটুর করে তাকে বড় করো। পাখির মতো দু' ডানায় আগলে রাখো শাবককে। তারপর একদিন সে যখন বড় হবে তখন উড়ে যাবে নিজের জন্য অন্য কোথাও বাসা খুঁজতে। দোষের কিছু না। জীবনের এটাই নিয়ম। কিন্তু সেই তো তারপর বুড়ো-বুড়ির একলা থাকা। একা একা শেষ প্রহরের দিকে গড়িয়ে যাওয়া।

তাহলে আর যেচে নিজেদের জীবনের সবচেয়ে ভালো সময়টা এমন একটা কারণে বিসর্জন দেওয়ার কী অর্থ? মৃণাল কিছুতেই অরুণকে বোঝাতে পারেননি যে, মা না হতে পারলে, মেয়েদের জীবনে কোথাও একটা শূন্যতা কাজ করে। যদিও মৃণালের সমস্ত শূন্যতা ভরে দেওয়ার জন্য অরুণ আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। নিজের কাজের জগতের উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে বরাবরই একটা লাগাম পরিয়ে রেখেছেন। প্রথম জীবনে যখন কেন্দ্রীয় সরকারের আইএ অ্যান্ড এএস-এ জুনিয়র অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ গ্রেডে কাজ করেছেন তখনও যেমন নির্দিষ্ট সময়ের বাইরে একমুহূর্তও অফিসে থাকেননি; বাড়ি ফিরে এসে স্ত্রীকে সঙ্গ দিয়েছেন— ঠিক তেমনি র-এর মতো এত স্পর্শকাতর, গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরে পাকিস্তান ডেস্কে কাজ যখন করেছেন— তখনও সেটাকে অনেকটাই দশটা-পাঁচটার চাকরির মতোই চালিয়ে এসেছেন।

এর ভালো আর খারাপ— দু' রকমেরই ফল পেয়েছেন।

পারিবারিক জীবনে অরুণবাবু খুঁজে পেয়েছেন অসম্ভব শান্তি। এই দীর্ঘ দাম্পত্যের পরেও তাঁর আর মৃণালের সম্পর্কে কোনো শিথিলতা, কোনো শীতলতা বাসা বাঁধেনি। হয়তো শরীরের অংশগ্রহণ কমেছে, কিন্তু মনে মনে এখনও অরুণ আর মৃণাল একে অপরের সবচে' ভালো বন্ধু। ঝগড়াঝাঁটি যে হয় না তা তো নয়। ঝগড়াঝাঁটি, ভাব-সাব, মিলেমিশে রান্না, ইকেবানা বা ওরিগ্যামি শেখা— সব মিলিয়ে তাঁদের দাম্পত্য জীবন অন্য যে কোনো দম্পতির মনে হিংসে ধরানোর মতো।

আবার উলটো দিকে এর মাশুল গুনেছেন নিজের প্রফেশনাল লাইফে।

অ্যানালিস্ট বা অডিটর হিসেবে অরুণবাবু জানেন, তিনি একেবারে প্রথম সারির। তাঁর ডিটেলস দেখার নজর, অসংখ্য আপাত বোরিং ডেটা আর ইনফর্মেশনের ভিড়ে লুকিয়ে থাকা প্যাটার্ন খুঁজে বার করার ক্ষমতা তাঁর সহজাত। নীরস, অর্থহীন শুকনো তথ্যের খাঁজে খাঁজে লুকিয়ে থাকা ইঙ্গিতগুলি তাঁর সতর্ক চোখ অনায়াসে খুঁজে নিতে পারে। কর্মজীবনের প্রথম দিকে অডিটর হিসেবে ট্রেনিং পাওয়ার ফলে একটা চির সন্দিগ্ধ, চির খুঁতখুঁতে মন তাঁকে অনায়াসে ঝাঁকের কইয়ের থেকে আল করতে পারত। কিন্তু ভারতে সরকারি-বেসরকারি প্রায় সমস্ত অফিসেই মানুষের কর্মদক্ষতার বিচার হয় সে কত লম্বা সময় অফিসে কাটাচ্ছে তা দিয়ে। তাই সারা কেরিয়ার জুড়ে অরুণের সতীর্থ আর বসেদের কাছে ওর ইম্প্রেশন তৈরি হয়েছে কাজ করতে না চাওয়া উদ্যমহীন, ক্ষমতাহীন একজন মানুষের। সেই

'অলসো র‍্যান' ঘোড়ার মতো, যার ওপর কেউ কখনো বাজি ধরে না। সে শুধু ফাঁকা দৌড়োনোর লেন ভরতি করতে, কোটা পূরণ করতে দৌড়োচ্ছে।

সাধারণত এতদিন অফিসের এই মনোভাব নিয়ে অরুণ বেশি মাথা ঘামাননি। তিনি মেনে চলতেন, 'যো কুছ নেহি করতে হ্যায়, উও কামাল করতে হ্যায়!!'

কিন্তু আজ হঠাৎ করে ভাবতে হচ্ছে। ভাবতে হচ্ছে কারণ সেই 'অলসো র‍্যান' ঘোড়াটার ওপর হঠাৎ আলো পড়ছে কোনো এক অজানা উৎস থেকে।। জোরালো সার্চলাইট। হঠাৎ মনে হচ্ছে তাঁর নিশ্ছিদ্র অদৃশ্য গুটির মধ্যে থেকে তাকে টেনে বের করে আনছে কেউ।

আজকে সকালে... টেকনিক্যালি গতকাল ভোর বেলা যখন জয়েন্ট সেক্রেটারির ফোন পেয়েছিলেন তখন থেকেই মাথার মধ্যে এই অস্বস্তির পোকাটা ঢুকেছে।

তারপর সেই সর্দার প্যাটেল ভবনের বিশাল আলো-ছায়া পুরোনোগন্ধী ঘরে দেখা হল এমন এক লোকের সঙ্গে, যার সঙ্গে প্রফেশনাল জীবনে মুখোমুখি দেখা হবে এটা কোনোদিনও ভেবেই দেখেননি অরুণ। আর সেই মানুষটা তাঁকে যে কথাগুলো বলছিলেন সেগুলো তো আরোই চমকপ্রদ। তিনি বলছিলেন, 'মিঃ সচদেভ, আপনি হয়তো আশ্চর্য হয়েছেন আপনাকে এত সকাল বেলা ডেকে পাঠানোয়...'

বাক্যটা সম্পূর্ণ করেন না শেখরণ! ইচ্ছা করেই।

খুব আলতো জিজ্ঞাসা এভাবে ভাসিয়ে দিয়ে উলটো দিকের লোকের পেট থেকে অনেক কথা টেনে বার করে নেওয়া যায়। ক্লোজ এন্ডেড প্রশ্ন, যাতে হ্যাঁ বা না-এ জবাব দেওয়া যায়, সে প্রশ্ন করে লাভ হয় না। তাই প্রশ্ন এমন করতে হয় যাতে উত্তরদাতা উৎসাহিত হয় বিস্তারিত উত্তর দিতে। বেশিরভাগ সাধারণ মানুষ চায় তার কথা লোকে শুনুক। কিন্তু ছা-পোষা মানুষের কথা শোনার জন্য কে আর বসে আছে? কে জানতে চায় মানিকতলার অভয় পোদ্দার সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়কে বাজে অভিনেতা মনে করেন কেন বা ঝাড়সুগুদার শ্রীধর মিশ্রর মতে কেন হকি, ক্রিকেট বা ফুটবলের চেয়ে অনেক ভালো খেলা? লোকের এই যে একান্ত উদগ্র বাসনাটুকু— নিজের কথা চারপাশের মানুষকে জানানোর— এরই ফায়দা তোলে ইন্টেলিজেন্সে কাজ করা অভিজ্ঞ ফিল্ড এজেন্টরা। ঠিক এইরকম ওপেন এন্ডেড প্রশ্ন বাতাসে ভাসিয়ে দিয়ে।

কিন্তু অরুণ সচদেভ ছা-পোষা হলেও সাধারণ নন। আপাত সাধারণ মানুষটির দু' কানের মাঝের অংশটি প্রচণ্ড শক্তিশালী। খুব কম মানুষই তার আন্দাজ পেয়েছেন কর্মজীবনে। তাই অরুণ, শেখরণের পাতা ফাঁদের, হয়তো আপাত নির্দোষ ফাঁদের, ধারকাছ দিয়েও গেলেন না। নিরুত্তর মুখে হাসি নিয়ে বসে রইলেন শেখরণের দিকে তাকিয়ে।

প্রশ্নটা অস্বস্তিকরভাবে বাতাসে ঝুলে রইল প্রায় সেকেন্ড চল্লিশেক। তারপর একটু বিব্রতভাবেই শেখরণ বাধ্য হয়ে তাকে গিলে নিয়ে আবার শুরু করলেন, 'মিঃ সচদেভ, আমি বুঝতে পারছি আপনি পুরোপুরি কমফোর্টেবল নন, এবং সেটা স্বাভাবিক। আপনি এতদিন যে পর্যায়ে কাজ করে এসেছেন তাতে মিঃ ম্যাথিউ বা আমি— কারোর সঙ্গেই আপনার কোনো সরাসরি ইন্টারঅ্যাকশন হয়নি। হয়তো নীতিন থাকলে আপনি বেশি স্বচ্ছন্দ হতেন। কিন্তু এই বিষয়টিতে আমরা সরাসরি আপনার সঙ্গেই কথা বলব বলে স্থির করেছি।'

'কী বিষয়, যদি বলেন স্যর!' খুব ঠান্ডা, খুব হিসেবি গলা। এই প্রথম মুখ খুললেন অরুণ।

'বলব। অবশ্যই বলব। তার আগে আপনার থেকে একটা বিষয় জেনে নেওয়ার আছে। নিছক ফর্মালিটি যদিও।

কথাটা বলতে বলতে শেখরণ তাঁর দিকের টেবিলের ড্রয়ার থেকে কয়েকটি ফুলস্কেপ, স্টেপল করা কাগজ বের করেন। কাগজগুলি আধুনিক কেতামাফিক প্রিন্ট আউট নয়। টাইপ করা। একটি নির্দিষ্ট ফন্টে... ক্যুরিয়ার এম।

কয়েক গজ দূর থেকেও দেখে অরুণ বলে দিতে পারেন, এটা কী। তাই শেখরণের

পরের প্রশ্নে তাঁকে কোনো অসুবিধায় পড়তে হল না।

“কাশ্মীর, দ্য অ্যাক্সিডেন্টাল ওয়াটারলু’ ...এটা কি আপনারই তৈরি করা রিপোর্ট?'

‘হ্যাঁ... কিন্তু এ তো প্রায় এক-দেড় বছর আগের তৈরি করা রিপোর্ট স্যর! আমি নীতিনকে দিয়েছিলাম। তারপর আমি আর কিছু শুনিনি এ ব্যাপারে!'

‘জানেন নিশ্চয়, অরণ্যের প্রাচীন প্রবাদ— সরকারি অলিন্দে কাগজের গতি কচ্ছপের চেয়েও শ্লথ!' মুচকি হেসে পাশ থেকে ফুট কাটেন মিঃ ম্যাথিউ। শেখরণ তাঁর গম্ভীর গলাকে এই হালকা রসিকতায় একটুও ভিজতে দেন না, ‘এই রিপোর্টের বিষয়ে আপনার বক্তব্য শুনতে চাই। অ্যাজ অ্যান অ্যানালিস্ট! একদম ক্যান্ডিড, অনেস্ট মতামত। মনে রাখবেন আপনার মতামতের সততার ওপর এবং নিরপেক্ষতার ওপর হয়তো আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে থাকতে পারে।

‘আমার মতামত তো আমি রিপোর্টেই লিখেছিলাম স্যর। আমার মনে হয় সেটা যথেষ্ট ক্যান্ডিড এবং অনেস্টও।'

একটু নড়েচড়ে বসেছিলেন অরুণ। তাঁর মন বলছে খেলা এখনও শুরুই হয়নি। এ নিছক ওয়ার্ম-আপ চলছে।

‘আচ্ছা, প্রশ্নটা আমি একটু অন্যভাবে করি। পিএম সম্বন্ধে, তাঁর অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এবং পলিটিক্যাল লাইফ, লিডারশিপ ও লংজিভিটি সম্বন্ধে আপনার কী মত?

‘ভেরি গুড স্যর। পিএম খুবই ডায়নামিক। পলিটিক্যালিও তাঁকে ঘিরে রয়েছেন তাঁর বিশ্বস্ত অনুগামীরা। কোনো অপোজিশান নেই। ফলে হি ইজ সিকিওর। ওঁর বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতা ওঁকে সমসাময়িকদের থেকে এত এগিয়ে রেখেছে যে ইট সিমস হি ক্যান রিটায়ার অ্যাজ এ প্রাইম মিনিস্টার অ্যাজ অ্যান্ড হোয়েন হি প্লিজেস!'

কিছুক্ষণ গোটা ঘর নিস্তব্ধ। শুধু ঘড়ির টিকটিক শব্দটা জানান দিয়ে চলেছে যে পৃথিবী এবং সময় কেউই থেমে নেই। নীরবতা ভেঙে শেখরণ গলাখাঁকারি দিলেন এক বার। তারপর এক বার চোরা চোখে মিঃ ম্যাথিউর দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘মিঃ সচদেভ, প্লিজ। আমি আপনাকে স্তাবকতার জন্য নয়, সত্যি কথা বলার জন্য ডেকেছি। আমি জানি আপনি অত্যন্ত বুদ্ধিমান। আপনিও দয়া করে আমার বুদ্ধিকে ইনসাল্ট করবেন না।'

শেখরণের গলা এবার আরও গম্ভীর। চোখের চাউনি থমথমে। এবারে সত্যি কথা বলার সময় এসেছে। অরুণ একটু গলাখাঁকারি দিয়ে বললেন, ‘আমি অ্যানালিস্ট মাত্র স্যর। কোনো কাজের ঠিক-ভুল বিচার করার বিচারক আমি নই। আমার টেবিলে নানা জায়গা থেকে, নানা মাধ্যমে ইন্টেলিজেন্স এসে জড়ো হয়। খবরের কাগজের রিপোর্টের কাটিং, স্থানীয় মানুষের কথাবার্তার অংশ, কোনো জনসভার, মিটিং-এর ভিডিয়ো বা অডিয়ো ক্লিপ। আরও হাজার কিসিমের তথ্য এসে জড়ো হয় রোজ। আমাকে বাছতে হয়, কোনটা ভুল, কোনটা বানানো, কোনটা

ঠিক, কোনটা ভুলের আড়ালে লুকিয়ে রাখা ঠিক বা মিথ্যের আড়ালে লুকিয়ে রাখা সত্যি। আর তার ওপর নির্ভর করে রিপোর্ট বানাতে আর রেকমেন্ড করতে হয়। কাজটাই এমন স্যর, যে না চাইলেও নিজস্ব একটা মতামত তৈরি হতেই থাকে। আর মতামত তো ভুল বা ঠিক হতেই পারে। তাই, আমার মতামতকে...'

‘উই আর ইন দ্য সেম বিজনেস ফর সেভারেল ডিকেডস নাও, মিঃ সচদেভ!' মিঃ ম্যাথিউ বলে ওঠেন, ‘আমার মনে হয়, ডিসক্লেমার বাদ দিয়ে আপনি শুরু করতে পারেন।'

‘বেশ। তাহলে প্রথমে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন নিয়ে বলি। দ্য জেনেরিক ইম্প্রেশন ইজ, নিজের আশেপাশে ইয়েসম্যানের ভিড় চান। যদিও সেটা ইউনিক কিছু না। প্রবল চরিত্রের বেশিরভাগ প্রশাসকই সেরকমই চান। ইন্দিরা গান্ধী চাইতেন। স্তালিন চাইতেন।'

‘তাহলে সমস্যা কোথায়?'

‘সমস্যা এই যে— যদি প্রশাসক হিসেবে নিজের লেগ্যাসি রেখে যাওয়ার উচ্চাকাঙ্ক্ষা

থাকে, যা আমার মনে হয় আমাদের পিএম-এর আছে, সেক্ষেত্রে এটা মোটেই স্বাস্থ্যকর অভ্যাস নয়। ইয়েসম্যানরা ঘিরে থাকার ফলে উনি সত্যিকারের দূরদর্শী পলিসিমেকারদের সঙ্গে দূরত্ব বাড়িয়ে ফেলছেন। এই লোকগুলি মুখের ওপর অপ্রিয় সত্য বলে দেয়। উনি হয়তো সেটা পছন্দ করছেন না।'

'আপনার হিসেবমতো তাতে পলিটিক্যাল লস আছে পিএম-এর। কোথায়? কীভাবে?'

একটু কি অধীর শোনায় শেখরণের গলা? অরুণের চকিতেই একবার মনে পড়ে যায় সকালে দেখা খবরের কাগজের হেডলাইনের কথা। মনে মনেই সামান্য হেসে অরুণ নিজের কথার খেইটা আবার ধরে নেন।

'দেখুন, পাকিস্তান বা কাশ্মীর সম্পর্কে ওঁর বিগত পাঁচ বছরের স্ট্র্যাটেজি খুঁটিয়ে দেখলে বোঝা যায় যে তাতে উনি পার্টিলাইন মেন্টেন করে চলেছেন বটে। কিন্তু কূটনৈতিক সমস্যা ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিগড়েছেন।'

'কেন এমন মনে হল?' এবার প্রশ্ন করলেন ম্যাথিউ।

'উদাহরণ হিসেবে কাশ্মীরের কথাই বলি স্যর। এমন নয় যে এসব আপনারা জানেন না। তবু, শুনতে চেয়েছেন যখন... দেখুন... স্পষ্ট কথা স্পষ্টভাবে বলা

ভালো... জাতীয়তাবাদ, দেশের অখণ্ডতা, স্বাধীনতা বা বিচ্ছিন্নতাবাদ— এসব বইতে বা খবরের কাগজে পড়তে ভালো লাগে। আমরা জানি কাশ্মীর আসলে ব্যবসা। এক কাশ্মীরের প্রতিরক্ষার জন্য ভারত বছরে যা অস্ত্রশস্ত্র কেনে তার অর্থমূল্য কমবেশি প্রায় বারোশো কোটি টাকা। মিডিয়া বলে প্রায় প্রতিদিন ওখানে ভারতের বর্তমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা বজায় রাখতে ভারত সরকারকে প্রায় ছ' কোটি টাকা খরচ করতে হয়। আমরা জানি, পরিমাণটা আরও অনেক বেশি। এবার এই খরচের বেশিরভাগটাই আমদানিতে খরচ। প্রতিরক্ষা, নজরদারি— এসব বিষয়ের অত্যাধুনিক সমস্ত ইকুইপমেন্টসই আজও আমরা বাইরে থেকেই কিনি। অস্ত্র আমদানিতে আমরা এক নম্বরে। প্রায় তিরিশ-পয়ত্রিশ হাজার কোটি টাকার অস্ত্র আমদানি করে ভারত। এখন সেটা বেড়েছে, আরও। যেসব ম্যানুফ্যাকচারারদের থেকে ভারত এগুলো মূলত কেনে তারা প্রায় সবাই, এই যেমন লকহিড, বোয়িং, নরথর্প গ্রুম্যান, রেথিওন— এরা সবাই মার্কিন কোম্পানি। আমেরিকা আফগানিস্তানের মাটি থেকে সৈন্য ফিরিয়ে নিয়ে আসার সময় থেকেই এদের রেগুলার রেভিনিউতে একটা বড় ধাক্কা লাগে। এদের রোজগার এবং তার ট্যাক্সের টাকাতেই আমেরিকার খরচ চলে মূলত। তাই এদের লবিয়িস্টরা ওখানে সেনেটে বা কংগ্রেসে খুবই প্রভাবশালী। উদারচেতা ওবামাই হোন বা খ্যাপাটে ট্রাম্প— এদের এড়িয়ে প্রেসিডেন্সিতে টিকে থাকা কারও পক্ষেই সম্ভব নয়। আর এই লবিয়িস্টরা জানেন কাশ্মীর অঞ্চলে যে কনফ্লিক্ট, আইসিস বা রাশিয়া-ইউক্রেনের এমনকী ইজরায়েল-প্যালেস্টাইন ঝামেলার মতোই তা দশকের পর দশক টিকিয়ে রাখলে তবেই এরা নিজেদের লাভের অঙ্ক বজায় রাখতে পারবে। আর কাশ্মীরের কনফ্লিক্ট বজায় রাখার জন্যই এরা চাপ দিয়ে, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোনোভাবেই আমেরিকাকে পাকিস্তানের বিরোধিতা করতে দেবে না। চীনও পাকিস্তানের পাশেই থাকবে, কারণ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় নিজের প্রাধান্য বজায় রাখতে গেলে তাদের ভারতকে ব্যস্ত রাখতে হবে এই সব কাজে... 'সেইসঙ্গে হাইয়েস্ট সুইট ওয়াটার সোর্স...'

ক্লাসরুমে টিচার সোজা প্রশ্ন করলে ভালো ছাত্র যেমন বেশিক্ষণ উত্তর না দিয়ে থাকতে পারে না, তেমনি, ম্যাথিউর পক্ষেও চুপ করে থাকা শক্ত হয়ে উঠছিল।

'একদম! আকসাই চীন সংলগ্ন এলাকা-সহ গোটা কাশ্মীর হচ্ছে এই ভৌগোলিক অঞ্চলে সবচেয়ে উঁচু মিষ্টি জলের উৎস। কৌশলগত কারণেই এই অঞ্চলের ওপর চীন ভারতকে অবাধ কর্তৃত্ব করতে দিতে পারে না। তাহলে সব মিলিয়ে দেখা গেল কী? না আন্তর্জাতিক রাজনীতির দুই সবচেয়ে বড় নির্ণায়ক শক্তি এখন চাইতে বা না চাইতে কাশ্মীরের সমস্যা মেটানোয় কোনো আগ্রহ দেখাবে না। আর পাকিস্তানও এই বিষয়ে ওয়াকিবহাল। তাদের তরফ থেকে চীনকে তাতানোর আর ভারতকে খোঁচা দেওয়ার চেষ্টারও ঘাটতি দেখা

যায় না।' 'এসব তো নোন সমস্যা। বেরোনোর উপায় কী? পিএম তো তারই রাস্তা খোঁজার চেষ্টা করছেন।'

'মে বি! বাট আই থিংক, হি মিস্ড আ পয়েন্ট দেয়ার! অ্যান্ড সো ডিড দ্য হোল হোম মিনিস্ট্রি। এই অবস্থায় আন্তর্জাতিক মঞ্চে ভারতের পক্ষে যেতে পারত কাশ্মীরের লোকেদের সমর্থন। হয়তো আমার বলা শোভা পায় না স্যর, তবে আপনি সততার সঙ্গে বলতে বলেছেন বলেই বলছি— পিএম নিডস টু পে অ্যাটেনশন টু দ্য 'নো'জ হি হিয়ারস। আমাদের পেশায় সামওয়ান হু সেজ 'নো' ইউজুয়ালি হি নোজ!' -

'হুম। তার মানে আপনি বলছেন পিএম-এর কাশ্মীর নীতি ভুল?'

'না। তা বলিনি স্যর। তবে সেই নীতি গ্রহণ করার আগে হয়তো সব দিক খতিয়ে দেখা হয়নি।'

'ইলেকশনে এর কোনো প্রভাব?

'বলা শক্ত স্যর। মেইনলি এটা আইবি-র লোকজন বলতে পারবে হয়তো। বাট ইফ ইউ আস্ক মি, আমি বলব পড়তে পারে স্যর। আমাদের দেশের শহুরে ও আধা শহুরে ভোটাররা চিরকাল একটু সেরিব্রাল টাইপের নেতাদের ওপর আস্থা রেখে এসেছেন। পিএম ইজ, হাউ ডু আই পুট ইট— এ ম্যান অফ মাসেস। এমনিতেও প্রথম বার যখন উনি জিতে এসেছিলেন, সেটা অনেকটাই ছিল আগের প্রশাসনের প্রতি রিজেকশন। কিন্তু এখনও ওঁর অ্যাকসেপ্টিবিলিটি শহুরে ও আধা শহুরে ভোটারদের মধ্যে খুব বেশি নয়। তার অন্যতম প্রধান কারণ হল উনি মুখে আগ্রাসী মনোভাব দেখানো সত্ত্বেও এই গোষ্ঠী বিশ্বাস করে যে আন্তর্জাতিক চাপের কারণেই ওঁর পক্ষে পাকিস্তান ও কাশ্মীর সমস্যার কোনো ফলপ্রসূ সমাধান করা সম্ভব নয়। সেইসঙ্গে যদিও চাকরি, জাতপাত— এই সব খুচখাচ সমস্যা আছে, কিন্তু ভারতে এই দেশের অখণ্ডতা, বৈচিত্র্য, সংখ্যালঘুদের আস্থা আর পাকিস্তানের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের রসায়ন— বরাবরই একজন প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা বাড়ানোয় বা কমানোয় সাহায্য করেছে। ইন্দিরা গান্ধীর জরুরি অবস্থা জারি করা— ওঁর অন্যতম রাজনৈতিক ভুল ছিল। কিন্তু বুঝতে হবে, উনি এই ভুলটা করেছিলেন কারণ উনি ৭১-এ পাকিস্তানকে হারানোর পরে যে পরিমাণ আনুগত্য পেতে শুরু করেছিলেন তা ওঁর আগে কোনো প্রধানমন্ত্রীই পাননি। হ্যাঁ, উনি সেই আনুগত্যের ভুল মানে করেছিলেন। কিন্তু সেটা সম্পূর্ণ অন্য গল্প।'

অরুণের অ্যানালিসিস সম্ভবত এই প্রথম এত উঁচু পদের দুটি লোক মন দিয়ে শুনল। ভেতরে ভেতরে অরুণ একটু আত্মপ্রসাদ অনুভব করছিলেন। ঠিক তখনি শেখরণের পরের প্রশ্ন একটু আচমকা ভেসে এল, 'আপনি কি মনে করেন এই ধরনের গ্রহণযোগ্যতা কমে যাওয়ার কারণে প্রধানমন্ত্রীর কোনো জীবনহানির আশঙ্কা রয়েছে? কোনো অ্যাসাসিনেশান অ্যাটেম্পট?'

'হোয়াট?' একটু চমকেই যান অরুণ। মাথা নেড়ে বলেন, 'নো, নো, নট অ্যাট অল স্যর! এই ডিস্যাটিসফ্যাকশনটার কোনো ভায়োলেন্ট আউটকাম অন্তত আমি দেখছি না। পুরোটাই সিটিজেন ডিস্যাটিসফ্যাকশন'

'সে তো ইন্টারন্যালি। হাউ অ্যাবাউট অ্যাট দ্য আদার সাইড?'

'বাই আদার সাইড ইফ ইউ মিন পাকিস্তান— তাহলে বলব, কিছু চ্যাটার্স, কিছু গুজব খবরের ছদ্মবেশে সবসময়ই উড়ে আসে আমার ডেস্কে। কিন্তু এখনও এমন কিছু পাইনি যা দেখে মনে হয়েছে দিস ক্যুড বি সিরিয়াস।'

'নাথিং? নাথিং অ্যাট অল?' এবার আবার ম্যাথিউয়ের তরফ থেকে প্রশ্ন ভেসে এল।

'নো স্যর। শুড আই হ্যাভ?' পালটা জিজ্ঞাসা চোখে নিয়ে সরাসরি শেখরণের চোখে চোখ রাখেন অরুণ সচদেভ। সে কথার উত্তর না দিয়ে শেখরণ পালটা প্রশ্ন করেন, 'আপনার কি কোনো অ্যাসেট আছে ওখানে?'

'মে বি।' সতর্ক অরুণ।

'অ্যান্ড?' আবার সেই অসম্পূর্ণ প্রশ্ন বাতাসে ঝুলিয়ে রাখা। কিন্তু অরুণ সতর্কতার বর্ম খোলেনি এখনও।

'স্যর, হ্যান্ডলারকে অ্যাসেটের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা আর সাংবাদিককে তার সোর্সের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা... ইউ নো... আই কান্ট।'

'আমি আপনাকে পিএম-এর প্রিন্সিপ্যাল সেক্রেটারি হিসেবেই শুধু নয়, ন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যাডভাইজর হিসেবে বলছি...'

'সরি স্যর!' শেখরণের কথা শেষ করতে না দিয়েই বলে ওঠে অরুণ।

এতক্ষণ শেখরণ বসে ছিলেন নিজের চেয়ারে হেলান দিয়ে। হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে টেবিলের ওপর দুটো হাত সশব্দে নামালেন। হঠাৎ যেন আগ্নেয়গিরির চেপে থাকা লাভা কঠিন ঠান্ডা পাথর ফাটিয়ে লকলক করে লাফিয়ে উঠল। তখন চেয়ারে বসে থাকা অরুণের দিকে ঝুঁকে তিনি হিসহিস করে বললেন, 'হ্যান্ডলার হিসেবে আপনি জানেন কি মিঃ সচদেভ, সে বেঁচে আছে কিনা? এখন? এই মুহূর্তে?

এবারে অরুণকে একটু অপ্রস্তুত দেখাল। ভীত নয়। অপ্রস্তুত।

বিদেশে থাকা আন্ডারকভার এজেন্ট, বিশেষত যারা ডিপ্লোম্যাটিক ইমিউনিটির নিরাপদ ছাতার তলায় থাকে না— তাদের সঙ্গে তাদের হ্যান্ডলারদের এমনিতে রোজ যোগাযোগ হয় না। আর এই হাই-টেক যুগেও এই দুনিয়ার সবাই টেকনোলজিকে এড়িয়ে চলতে চায়। কারণ এরা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে টেকনোলজি যত উন্নত, তাকে হ্যাক করা এবং নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করার কাজটাও ততটাই রিওয়ার্ডিং! তথ্যের সুরক্ষার জন্য এখনও মানুষের ছোঁয়াই ইন্টেলিজেন্স দুনিয়ার বর্ষীয়ানদের সবচেয়ে বেশি ভরসার জায়গা।

অরুণের সঙ্গে অরুণের অ্যাসেটের যোগাযোগও হয় সেরকমই একটি বেশ সেকেলে পদ্ধতিতে এবং সেটা হয় শুধুমাত্র প্রয়োজনেই। আর সেই প্রয়োজন যে রোজই হবে তার কোনো মানে নেই। গত প্রায় সপ্তাহ তিনেক তেমন কোনো প্রয়োজন পড়েনি অরুণের। ওদিক থেকেও তেমন কোনো খবর আসেনি। ব্যাপারটা অস্বাভাবিক কিছু না। এরকম আগেও হয়েছে। তাই অরুণের মাথায় কোনো কুচিন্তা আসেনি। কিন্তু এখন হঠাৎ এই প্রশ্ন শুনে তার বুকের পাঁজরের জোড়গুলো হঠাৎ সামান্য হালকা হালকা লাগতে শুরু করল।

কিছু না বলে অরুণ তাকালেন শেখরণের দিকে। তার চাউনিতে অনিশ্চয়তা। ইতিমধ্যে শেখরণ নিজেকে গুছিয়ে নিয়েছেন। আবার বসেছেন চেয়ারে। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিনি বললেন, 'খবরটা খুবই গোপন। খুব সম্ভবত দিন দুয়েক আগে পাকিস্তানে একটি আন-আইডেন্টিফায়েড বডি পাওয়া গেছে। বডি যদিও এখনও, এই মুহূর্ত পর্যন্ত পাকিস্তান গভর্নমেন্টের দখলে, কিন্তু আমাদের কিছু উপায় তো থাকেই এসব খবর পাওয়ার। আমরা জানি সে কে। আমাদের সোর্স আরও জানিয়েছে, দ্য ডেডবডি ক্যারিড এ মেসেজ। একটি এমন মেসেজ হুইচ সেন্ডস ডেফিনিট অ্যান্ড ফ্যাটাল থ্রেট টু পিএমস লাইফ। আগামী এক-দু' মাসের মধ্যে পিএম-এর ওপর একটা এমন অ্যাটাক হতে পারে— যা আনপ্রিসিডেন্টেড। নিউজটা কনফার্মড!'

বেশ কিছুক্ষণ সবাই চুপ। এরপর কথাবার্তার সুতো তুলে ধরলেন রবিন ম্যাথিউ, 'লেট আস কাট দ্য লং স্টোরি শর্ট, অরুণ। শ্যাল উই?' 'বাই অল মিনস, স্যর!'

'আমাদের ধারণা যে ডেডবডি পাওয়া গেছে এবং এখনও আইডেন্টিফাই করা যায়নি, সেটি আপনার অ্যাসেটেরই।'

'সেটা কী করে নিশ্চিত হওয়া গেল স্যর?'

'কারণ বাকি সবার ক্ষেত্রে অ্যাসেটের উপস্থিতি অ্যাকাউন্টেড ফর।'

'ওকে। দেন আই উইল মেক এনকোয়ারিজ টু'

'সে তো আপনি করবেনই। তবে সেইসঙ্গে আইদার ওয়ে, আপনাকেই এই পার্টিকুলার থ্রেট অ্যাসেসমেন্টের কাজটাও করতে হবে।'

'সরি, আই ডিড নট গেট ইউ স্যর!' নিজের কানকে ঠিকঠাক বিশ্বাস করতে পারেন না অরুণ।

এবার আবার গলা আসে শেখরণের, 'আমরা চাই, আপনি এই তদন্তটা পুরোপুরি সামলান। আপনার সামনে তিনটে লক্ষ্য। এক, ইভ্যালুয়েট পিএম-এর ওপর এই থ্রেটটা কতটা ক্রেডিবল। দুই, ক্রেডিবল হলে ট্র্যাক করুন এই ষড়যন্ত্রতে কারা জড়িত। দরকার হলে প্রমাণসমেত। যদি আমরা পাকিস্তান সরকারকে সরাসরি ইমপ্লিকেট করার মতো কিছু পাই, তাহলে তো খুবই ভালো। সম্ভবত সেটা পাব না। তবে ওদের মাটিতে অস্তিত্ব থাকা কোনো টেররিস্ট অর্গানাইজেশনকেও যদি লিংকড পাই, দেন উই ক্যান ইনক্রিজ প্রেশার! তিন, অ্যান্ড লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট— শুধু ট্র্যাক করা নয়, এই অপারেশনের সমস্ত দায়িত্ব আপনার। তাই একে ফয়েল করার কাজও সামলাতে হবে আপনাকেই।'

অরুণের মুখে কিছুক্ষণ কোনো কথা জোগায় না। তারপর তিনি কোনোরকমে বলেন, 'কিন্তু স্যর, আমি একজন মামুলি অ্যানালিস্ট। কোনোদিন কোনো ফিল্ড অপারেশন চালাইনি।'

'সব কিছুরই একটা প্রথম বার থাকে। তা ছাড়া, এই কাজে অ্যানালিসিসের ভাগই বেশি। বাকি কাজের জন্য আপনি স্বাধীনতা পাবেন পছন্দমতো লোক নিয়োগ করার। উই উইল হেল্প ইউ আউট দেয়ার।'

'আমি... আমি... আমি জানি না স্যর... এত গুরুত্বপূর্ণ, এত ক্রিটিক্যাল একটা অপারেশন। র-এ আরও কত কত লোক আছে আমার চেয়ে এই ব্যাপারে অনেক বেশি যোগ্য। হোয়াই মি স্যর?'

'কয়েকটা কারণ আছে বই কী। এক, যদি মৃত আন-আইডেন্টিফায়েড মৃতদেহটি আপনার অ্যাসেটেরই হয়, সেক্ষেত্রে আপনার পক্ষেই সবচেয়ে সুবিধে ট্র্যাক করা যে সে মারা যাবার আগে এই বিষয়ে ফারদার কোনো লিড, কোনো মেসেজ অন্য কোথাও রেখে গেছে কিনা। দুই, পাকিস্তান ডেস্কের সমস্ত অ্যানালিস্টদের আমরা যাচাই করেছি। আপনারই একমাত্র কোনো ঘোষিত রাজনৈতিক আনুগত্য নেই কোনো রাজনৈতিক দলের প্রতিই। আমাদের ধারণা এই ধরনের আনুগত্য ক্যান ক্লাউড ওয়ানস জাজমেন্ট। তিন, মে বি ইটস ইওর টাইম আফটার অল।' বলে একটু শব্দ করে হালকা হাসলেন ম্যাথিউ।

অরুণ চুপ করে বসে থাকেন কিছুক্ষণ। তারপর বলেন, 'আমি একটু নীতিনের সঙ্গে পরামর্শ করতে চাই স্যর। হি ইজ মাই বস। তার পারমিশন আমার চাই।'

'না, চাই না। এখন থেকে ধরে নিন মিঃ ম্যাথিউ আপনার বস। আর আপনি এই বিষয়ে নীতিন শুধু না, আমাদের দুজন ছাড়া আর কারও সঙ্গেই কথা বলতে পারবেন না। এমনকী যাদের রিক্রুট করবেন, যদি করেন— তাদের কাছেও ইনফরমেশান যেন কম্পার্টমেন্টালাইজড থাকে।'

'কেন স্যর?' নতুন করে আর আশ্চর্য হবার ক্ষমতাও হারিয়ে ফেলছিলেন অরুণ। তবু প্রতিবর্ত ক্রিয়ায় প্রশ্নটা মুখ থেকে বেরিয়েই এল।

'কারণ এটা যদি সত্যি হয় তাহলে এই লেভেলের কনস্পিরেসিতে সর্বোচ্চ লেভেলের লিক থাকাটা আশ্চর্য কিছু না।'

'ওকে। কিন্তু আমার তো অন্য অনেক ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে কোলাবোরেশানের, তাদের থেকে ইনফর্মেশন ও অন্যান্য হেল্প নেওয়ার দরকার পড়বে।'

'আপনার সমস্ত প্রয়োজন, সব ইনফর্মেশন রিকোয়ারমেন্ট— আমার থ্রু দিয়ে যাবে। হাইয়েস্ট প্রায়োরিটি!' শেখরণ জানান।

আবার তিরিশ সেকেন্ড থেকে এক মিনিট গোটা ঘর চুপচাপ। তারপর অরুণ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে বলেন, 'কখন শুরু করতে হবে স্যর?'

'হাউ অ্যাবাউট নাও?' মুখে সেই মুচকি হাসি। ম্যাথিউয়ের মনে হয় রক্তচাপ বলে কিছু নেই।

এটা জিজ্ঞাসা নয়। নির্দেশ। অতএব করার কিছুই নেই। যে ঘরে মিটিং হয়েছিল, সেই ঘরের থেকে দুটি ঘর পরে, করিডোরের এককোণে একটি অফিসঘর তাঁর জন্য বরাদ্দ করা হল। নীতিনকে কী ভুজুং-ভাজুং দেওয়া হল ম্যাথিউই জানে। সেসব আর অরুণ জিজ্ঞেস করেননি।

নিজের বরাদ্দ অফিসে বসে প্রথমে আধ ঘণ্টা নিয়েছিলেন ধাতস্থ হতে। ততক্ষণে তাঁর ঘরে পৌঁছে গেছে প্রয়োজনীয় ফাইলটি। খুবই রোগাসোগা সে ফাইল। দেখলে বোঝাই যায়, বিশেষ কোনো তথ্যই নেই তাতে।

ফাইল খোলার আগে অরুণ ঘরের লাগোয়া বাথরুমে গিয়ে থাবড়ে থাবড়ে জল দিয়েছিলেন নিজের চোখে-মুখে-ঘাড়ে। একটি আদ্যন্ত মিডিওকার কেরিয়ারে হঠাৎ এরকম নাটকীয় মোড় এসে পড়লে দিশেহারা লাগাটা স্বাভাবিক। প্রথম প্রশ্ন যেটা মাথায় আসে, সেটা অরুণ সরাসরি করেওছিলেন। ওই 'হোয়াই মি'-এর উত্তরে তিনি পুরোপুরি সন্তুষ্ট হতে পারেননি।

কিন্তু সেসব পরে। আগে জব অ্যাট হ্যান্ড।

বাথরুম থেকে ফিরে, ফাইলের মধ্যে ডুবে গেছিলেন অরুণ। বিশেষ কিছু দেখার নেই। একটি ডেডবডির অত্যন্ত অস্পষ্ট ছবি। বোঝাই যায় তাড়াহুড়োয় তোলা হয়েছে সস্তার মোবাইল ক্যামেরায়। শুধু শরীরটা দেখা যায়। এটুকু বোঝা যায় মুখের ও মাথার কিছু প্রায় অবশিষ্ট নেই। চেনার উপায় নেই কার দেহ।

সঙ্গে যে এজেন্টের থেকে ইনফর্মেশন এসেছে, তার নোট; যাতে লেখা আছে অনেক কিছুই। যদিও তার মোদ্দা কথাটি শেখরণ বলেছেন ইতিমধ্যেই। প্রধানমন্ত্রীর ওপর একটা সুপরিকল্পিত এবং প্রাণঘাতী হামলার ছক কষা হচ্ছে বর্ডারের ওপার থেকে। কবে, কীভাবে, সেসব সম্বন্ধে কোনো আন্দাজও দেওয়া নেই। তবে এটুকু আশঙ্কা করা আছে যে সম্ভবত এ পারের কোনো উঁচু পদের সরকারি আমলা এই ষড়যন্ত্রে যুক্ত।

একদম নীচের প্যারাগ্রাফে দেওয়া আছে ডেডবডির প্রাপ্তিস্থান, 'চানেসার, করাচি, পাকিস্তান!' দমবন্ধ করে সোজা হয়ে কিছুক্ষণ বসে রইলেন অরুণ।

১৯ জুলাই, গভীর রাত

মাঝরাতে জেগে বসে আছেন অরুণ। রেডিয়ো সেটটা অন করা আছে সামনে। ঘড়ির লাল কাঁটা জানাচ্ছে একটা পঞ্চাশ। আর মাত্র দশ মিনিট... উত্তরটা পাওয়ার জন্য আর মাত্র দশ মিনিট অপেক্ষা করতে হবে অরুণকে।

তাঁর অ্যাসেটের লোকেশনও তো ছিল চানেসার গোঠ।

ছিল? না আছে এখনও?

ত্রয়োদশ অধ্যায়
।। দ্য ডার্ক বিশপস ।।

৭ জুলাই, ২০১৮, সন্ধে বেলা / তিহার জেল, ভারত

খাটে পা ঝুলিয়ে লোকটার মুখোমুখি বসল তৌকির। মুখ নীচু করে বসে আছে লোকটা। যা মার খেয়েছে, মনে হচ্ছে ঘা শুকোতে সময় লাগবে ভালোই। তৌকির একটু নরম গলায় বলল, 'আস্সালাম আলাইকুম!'

লোকটা অতি কষ্টে মুখ তুলে তাকিয়ে, কোনোমতে হাতটা কপালে ছুঁইয়ে ইশারায় উত্তর দিল। ভারি মায়া হল তৌকিরের। গাণ্ডুর বাচ্চা, এই পুলিশগুলো কী মার মেরেছে। সে আবার বলল, 'আমার নাম তৌকির। অবশ্য এটা ডাকনাম। আমার আব্বাজান নাম রেখেছিল আবদুল রিহান কুরেশি।'

লোহার সঙ্গে অমসৃণ সিমেন্টের ঘটানিতে একটা অদ্ভুত অস্বস্তিকর আওয়াজ বেরোয়। গায়ের লোম খাড়া হয়ে যায়। শিউরে উঠতে হয়। আর কারও হয় কিনা জানা নেই। তবে তৌকিরের খুব অসুবিধে হয়।

এই মাঘরিবের নামাজের পরের সময়টুকু একটু পড়াশোনা করে তৌকির । সিরিয়াস কিছু না। সেসব তো এখানে উপায়ও নেই। ওই, টুকটাক ম্যাগাজিন, গল্পের বই, কবিতা। গুলজারের কবিতা তৌকিরের খুব পছন্দের।

নামাজের তৃতীয় রাকাতের সময় থেকেই মনটা অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছিল বার বার। অন্য দিনের মতো সে আজকে আর নাফল্গুলো পড়ল না। দ্বিতীয় সুন্নাহ্ পড়তে পড়তেই মাথায় বেশ জেঁকে বসেছিল কালকে সন্ধে বেলা পড়া লাইনগুলো, 'দিন কুছ অ্যায়সে গুজরতা হ্যায় কোই য্যায়সে এহ্সান উত্তরতা হ্যায় কোই দিল মে কুছ অ্যায়সে সামহলতা হুঁ গম ব্যায়সে জেবর সামহলতা হ্যায় কোই।'

ধীরে ধীরে শব্দের নেশা চারিয়ে আসছিল। ঠিক সেই সময় ওই কর্কশ আওয়াজটাতে ভুরু কুঁচকে গেল তার। হাঁটু গেড়ে বসে থাকা অবস্থাতেই মুখ ফেরাল আওয়াজের দিকটা আন্দাজ করে। দরজা খুলে গার্ডরা একজন বন্দিকে ঢোকাচ্ছে। এই সেলটায় দুজন থাকতে পারে। দুটো সিঙ্গল খাট। দুটো করে মগ, থালা আর গ্লাস — স্টেনলেস স্টিলের। দু' দিকের দেওয়ালে দু' সেট হ্যাঙার, জামাকাপড় ঝুলিয়ে রাখার। এতদিন এক জনই ছিল। তৌকির। প্রায় ছ' মাস ধরে একা থাকতে থাকতে একা থাকাটাই অভ্যেস হয়ে যাচ্ছিল তার। আজ তাই দেখে প্রথমটায় একটু বিরক্তিই জাগল। -

তারপর গার্ড সেলের দরজা টেনে বন্ধ করে দিয়ে বেরিয়ে যাবার পরে নতুন আসা লোকটি তার দিকে ফিরল। লোকটার মুখের দিকে চোখ পড়তেই তৌকির আঁতকে উঠল!

সন্ধের অন্ধকার নামাটা বোঝা যায় এই সেল থেকে। ছাদ ছুঁই ছুঁই একটা ছোট্ট জানলা দিয়ে চাঁদ-সূর্যের আলো সময় জানান দেবার কাজ করে। এখন এই সন্ধের আলোতে খুব স্পষ্ট দেখা যায় না মানুষের মুখের প্রতিটি রেখা। কিন্তু

এটুকু বোঝা যায়, এই লোকটির মুখে আর কোনো রেখা নেই-ই প্রায়। মনে হচ্ছে খুব বলিষ্ঠ আঁচড়ে ফুটিয়ে তোলা একটা ছবিতে জল ফেলে কেউ ধেবড়ে দিয়েছে ছবিটা।

দুটো চোখ ফুলে, প্রায় বুজে গেছে। অমানুষিক মার খেতে খেতে গোটা মুখের রং লালচে-বেগুনি হয়ে গেছে। ওপরের আর নীচের ঠোঁট দুটো ফুলে দলা পাকিয়ে এক হয়ে একটা মাংসের পিণ্ড হয়ে গেছে। সারা শরীর থেকে কোনো রক্ত বেরোচ্ছে না। কিন্তু লোকটার নড়াচড়া থেকে বোঝা যায় একটা-দুটো পাঁজরাও ভেঙেছে অন্ততপক্ষে।

লোকটা নিজের বিছানায় থিতু হয়ে যতক্ষণে বসল, ততক্ষণ তৌকির ওর মুখের থেকে চোখ সরাতে পারছিল না। একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকতে থাকতেই নিজের মাদুরটা গুটিয়ে তুলে রাখল খাটের পাশতলার দিকে। দুটো খাটের মাঝে ফুট দুই-আড়াই জায়গা। খালি

জায়গা। ওইটুকুতেই মাদুর বিছিয়ে নামাজ পড়ে থাকে তৌকির।

মাদুর তুলে ফেলার পর জায়গাটুকু ফাঁকা হয়ে গেল। সেলের ভেতরে কোনো আলো নেই। সিকিউরিটির জন্য। এইমাত্র বাইরের করিডোর থেকে সেলের দিকে তাক করা জোরালো আলো জ্বালিয়ে দেওয়া হল। হলদে আলোর বন্যায় ভেসে গেল একটু আগেই আলো-ছায়ায় লুকোচুরি খেলতে থাকা সেলের আনাচ-কানাচ।

খাটে পা ঝুলিয়ে লোকটার মুখোমুখি বসল তৌকির। মুখ নীচু করে বসে আছে লোকটা। যা মার খেয়েছে, মনে হচ্ছে ঘা শুকোতে সময় লাগবে ভালোই। তৌকির একটু নরম গলায় বলল, 'আস্সালামালাইকুম!'

লোকটা অতি কষ্টে মুখ তুলে তাকিয়ে, কোনোমতে হাতটা কপালে ছুঁইয়ে ইশারায় উত্তর দিল। ভারী মায়া হল তৌকিরের, দেখে। গাণ্ডুর বাচ্চা, এই পুলিশগুলো কী মার মেরেছে। সে আবার বলল, 'আমার নাম তৌকির। অবশ্য এটা ডাকনাম। আমার আব্বাজান নাম রেখেছিল আবদুল রিহান কুরেশি।'

'আমি কাসিদ।' অতি কষ্টে ঠোঁটগুলো ফাঁক করে বলল লোকটা। 'কাসিদ! খুব সুন্দর নাম। এখানে কী জন্য?'

লোকটা মাথা নাড়াতে থাকে দু' ধারে। তৌকির আবার জিজ্ঞেস করে, 'কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে?'

'হুমম।' কোনোমতে সায় দেয় কাসিদ।

'বেশ বেশ। বেশি তকলিফ করার দরকার নেই। আমাদের এখন অঢেল সময়। পরে কথা বলা যাবে 'খন।'

দুজনেই নিজের নিজের বিছানায় শুয়ে পড়ে। নবাগত কাসিদ শোয়ার একটু পরেই তার নড়াচড়া বন্ধ হয়ে গেল। প্রহৃত, ক্লান্ত শরীর বিশ্রামের প্রথম সুযোগেই সর্বযন্ত্রণাহর ঘুমের কোলে ঢলে পড়েছে।

তৌকিরের চোখে ঘুম আসে না অত সহজে। জেলখানার ভেতরে সময় কাটতে চায় না মোটে। অথচ এই মাত্র কয়েক বছর আগে পর্যন্ত, সময় কেটে যেত পক্ষীরাজ ঘোড়ার পিঠে ভর দিয়ে।

তৌকিরের জন্ম ১৯৭২-এ। বাবা হাজি এহ্সান কুরেশি কাপড়ের মিলের শ্রমিক। মা জুবেইদা বেগম। পাঁচ বোন, তিন ভাই, বাবা, মা নিয়ে তাদের বড় সংসারে দারিদ্র্য ছিল, তবে সেইসঙ্গে লেখাপড়ার চর্চাও ছিল। তার ভাই-বোনেরা প্রত্যেকেই শিক্ষিত এবং সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে নিজেদের জীবনে। তৌকির ছাত্র হিসেবে চোখ ধাঁধানো না হলেও ভালো ছাত্র ছিল। সেকেন্ডারি স্কুল সার্টিফিকেটে তার প্রায় সাতাত্তর পার্সেন্ট নাম্বার। তারপর ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইলেকট্রনিক্সে ডিপ্লোমা। প্রথম চাকরি একসেন্ট্রিক সলিউশন্স-এ। সালটা ১৯৯৬; তার বয়স তখন মাত্র চব্বিশ। তখন অবশ্য তার নাম তৌকির নয়। মুম্বাইয়ে তার চেনা লোকজন তাকে রিহান বলেই ডাকে।

তৌকির হয়ে ওঠার সে অধ্যায় শুরু হবে আরও বেশ কয়েক বছর বাদে। একসেন্ট্রিক সলিউশন্স থেকে ভারত পেট্রোকেমিক্যালস হয়ে উইপ্রোতে যোগ দেয় রিহান। ১৯৯৯ সালে।

এই বছরই আরও দুটো উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে রিহানের জীবনে। এক, সে আরিফাকে বিয়ে করে, নিজের পৈতৃক ভিটে ছেড়ে দক্ষিণ মুম্বাইয়ের ডোঙ্গরিতে বাসা বাঁধে।

আর, এই বছরই তার দেখা হয় সফদার নাগোরির সঙ্গে। ১৯৯৯ সালে সফদার নাগোরি ছিলেন ভারতের শিক্ষিত মুসলিম যুবসমাজের একটা বড় অংশের হিরো। ব্যক্তিত্ববান, শিক্ষিত, কথাবার্তায় চৌকস এই মানুষটি যখন নেহেরু-গান্ধী জুটির প্রতি মুসলিম অনাস্থার কারণ নিজের শাণিত যুক্তির সঙ্গে পেশ করতেন, যখন তথ্য-প্রমাণ দিয়ে দেখাতেন কীভাবে মুসলিম জনজাতি এই দেশে দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিকের মর্যাদা পেয়ে এসেছে, কীভাবে তাদের ওপর সংখ্যাগুরুদের বিশ্বাস জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে— তখন

তাঁর বক্তব্যের দাপটে, তাঁর বাগ্মিতায় মুগ্ধ অডিটোরিয়ামে বা জনসভায় হাততালির চোটে পায়রা উড়ে যেত।

স্টুডেন্টস ইসলামিক মুভমেন্টস অফ ইন্ডিয়া বা সংক্ষেপে সিমি তখনও ব্যান্ড অর্গানাইজেশন হয়নি। সফদার নাগোরি ছিলেন তার সাধারণ সম্পাদক। এই সময়ই রিহানের সঙ্গে তার দেখা। আর এই সময় থেকেই রিহানের দ্রুত পরিবর্তন শুরু।

২০০১ সালে আধ্যাত্মিক অন্বেষণের অজুহাতে উইপ্রোর চাকরি ছেড়ে

রিহান যখন সিমি-তে যোগদান করে, ততদিনে তার নতুন নাম হয়েছে তৌকির। এই তো মাত্র কয়েক বছর আগের কথা। তারপর দেড় দশকে দক্ষিণ মুম্বাইয়ের সাধারণ মধ্যবিত্ত চাকুরে ছেলে রিহান কীভাবে আজকের তৌকির, ভারতের 'ওসামা বিন লাদেন' হয়ে উঠেছে, কীভাবে এই ষোলো-সতেরো বছরে সে একটা প্রায় নন-এক্সিস্টেন্ট সংস্থা 'ইন্ডিয়ান মুজাহিদিন'-কে শুধু ভারতে নয়, আন্তর্জাতিক ইসলামিক আন্দোলনের (কাফেররা যদিও ভাবে টেররিস্ট) অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নাম করে তুলেছে— সেই লোম খাড়া করে দেওয়া গল্প যে কোনো সিনেমাকেও হার মানায়।

এমনকী, আজও, জানুয়ারি, ২০১৭-তে গ্রেফতার হবার দেড় বছর পরেও সে জেলের ভেতর থেকে, বিচারাধীন বন্দি থাকাকালীনই আইএম-এর সাংগঠনিক কাজকর্ম চালিয়ে যাচ্ছে নির্বিবাদে। হ্যাঁ, সে নিজে আর সাফদার দুজনেই জেলে থাকায় ফান্ডিং-এর একটু সমস্যা হচ্ছে বটে। কিন্তু সেসব সাময়িক। কিছুদিনেই কাটিয়ে ওঠা যাবে। মধ্যপ্রাচ্যের তেলের টাকা কম নয়। তার ছিটেফোঁটা দিয়েও এই দেশের যে কোনো প্রান্তে দাবানল জ্বালিয়ে দেওয়া যায়।

এই সব সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে রাতের খাবার চলে এসেছিল। জেলে রাতের খাবার তাড়াতাড়িই দিয়ে দেয়। খেতে খেতে সে আড়চোখে দেখেছিল, পাশের বেডের চোট পাওয়া লোকটি তখনও ঘুমোচ্ছে। লোকটার খাবার পড়েই রইল। তাকে আর ডেকে বিরক্ত না করে খাওয়া-দাওয়া মিটিয়ে শুয়ে পড়ল তৌকির।

ঘড়িতে ন'টা বাজতে না বাজতেই রাতের রোল কল শেষ। তারপর সেলের বাইরের আলোটা নিভে গেল। জেলে থাকাকালীন রাত্তিরবেলা ঝিঁঝির ডাকও শোনা যায় না। একঘেয়ে নিস্তব্ধতা ভাঙতে মাঝে মাঝে গার্ডরা লাঠি দিয়ে ঠুকে আওয়াজ করে যায় সেলের দরজায়। সেইটুকু ছাড়া পুরোটাই কালো নিস্তব্ধতা।

প্রথম প্রথম হাঁপিয়ে উঠত তৌকির। কিন্তু আস্তে আস্তে সয়ে গেছে। এখন শুয়ে শুয়ে ওপরের ভেন্টিলেটারের ফাঁক বেয়ে চুঁইয়ে পড়া অল্প আলো দেখতে দেখতে কখন ঘুম এসে যায় তার চোখে।

আজ ঠিক ঘুম আসার মুহূর্তে, অন্ধকারে হঠাৎ তার হাতের তালুতে কীসের ছোঁয়া! এক সেকেন্ডে বুঝে যায় তৌকির; মানুষের হাতের। ধড়মড় করে উঠে বসতে যায়। মুখ দিয়ে একটা খিস্তি বেরিয়ে আসে নিজের অজান্তে। ও শুনেছে জেলে এই সব ঘিনঘিনে ব্যাপার হয়। ছেলেরা ছেলেদের সঙ্গে...

ইশ! ছি ছি! ওরকম তৌকির কোনোদিন করতে পারবে না। আরিফা তার বিবি। তিনখানা ফুটফুটে বাচ্চা আছে। হ্যাঁ, হয়তো দশ বছর তাদের মুখ দেখেনি। এই দশ বছরে অন্য মেয়েছেলের শরীরও যে ঘাঁটেনি তা নয়। তা বলে ব্যাটাছেলে?

মুখ দিয়ে অর্ধেক বেরোনো খিস্তিটা যদিও প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই গিলে নিয়েছে তৌকির। প্রথম বিস্ময়ের ধাক্কাটা কাটিয়ে উঠতেই সে বুঝতে পেরেছে কী হচ্ছে। লোকটা তালুতে আঙুল বুলিয়ে কিছু একটা লিখছে! কী যেন একটা বোঝানোর চেষ্টা করছে!

তালুতে আঙুল বুলিয়ে যে চিহ্নটা আঁকা হচ্ছে, যে প্রতীকটা... সেটা তার খুব চেনা। ব্যান হওয়ার আগে সিমি-র অনেক কনফারেন্সে, হাফিজ সাইদের অনেকগুলো ভিডিয়ো কনফারেন্সে সে উপস্থিত ছিল। সাফদারের পাশেই তার জায়গা হত শেষদিকে। তখনই সে কাছ থেকে লক্ষ করেছে হাফিজ সাইদের গলার ডান পাশে উল্কি করে এঁকে রাখা প্রতীকটি।

তা ছাড়া ছেলেটি আরও কিছু লিখছে... মনে হচ্ছে উর্দুতে... হ্যাঁ, তাই তো... আঙুল বুলিয়ে বুলিয়ে একটা একটা করে শব্দ।

তার সেল ম্যাক্সিমাম সিকিউরিটি সেল। রাতের অন্ধকারে ঘুমিয়ে পড়ার সময়টুকু ছাড়া সে সবসময় সিসিটিভির আর লিসেনিং ডিভাইসের নজরবন্দি।

রাত্রের অন্ধকারে সিসিটিভি কাজ না করলেও লিসেনিং ডিভাইস ঠিকই কাজ করে। তাই, এই উপায়!!

বার্তাটা যত পরিষ্কার ফুটে উঠছে তত রক্ত গরম হয়ে উঠছে তৌকিরের। কাজ এসেছে। বড় কাজের নির্দেশ। ওপার থেকে এসেছে বার্তা। বার্তা নিয়ে এসেছে এই লোকটি। হঠাৎই তৌকিরের খেয়াল হল, 'তাই তো! লোকটা নাম বলেছে কাসিদ! কাসিদ মানে তো মেসেঞ্জার। বার্তাবাহক!!'

খুবই অপ্রশস্ত একটা ঘর। ঘরটায় কোনো এসি নেই। পাঁশুটে রঙের দেওয়াল। একটি সস্তা কাঠের টেবিল আর তার দু' দিকে দুটি নড়বড়ে চেয়ার। ঘরে কোনো জানলা নেই। শুধু একটি দরজা। ফ্যান চলছে বটে, তবে শুধু সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য। এই বদ্ধ বাতাসে নতুন কোনো শীতলতা সঞ্চার করার ক্ষমতা তার নেই। শাকিল খান তাঁর দামি স্যুটে বসে বসে দরদর করে ঘামছেন। প্রায় পাঁচ মিনিট হয়ে গেল, এখনও তাঁর মক্কেলের পাত্তা নেই।

শাকিল খান দেড়লাখি মনসবদার। আসলে যদিও প্রতি হিয়ারিং-এ তার চেয়ে আরও অনেকটাই বেশি নেন। তবে দেড় লাখের ওপরে বাকিটার রং কালো। উঁচু লেভেলের ক্রিমিনাল কেস লড়েন। বড়লোকের ছেলে ড্রাগের নেশায় কাজের মেয়েকে রেপ করে খুন করে ফেলেছে? শিল্পপতির বিরুদ্ধে অভিযোগ জমি না দেওয়ায় চাষিকে খুন করার? ধনী মহিলা সোশ্যালাইট পেডোফিলিয়াক এবং অভিযুক্ত?

কোনো সমস্যা নেই। ব্রিলিয়ান্ট, ধারালো, দাপুটে আইনজীবী শাকিল খান তাঁদের জন্যই পসরা সাজিয়ে বসে আছেন। একটা অত্যন্ত দক্ষ টিম আছে তাঁর। রিসার্চার, জুনিয়র উকিল, প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটরদের। সেইসঙ্গে আছে সোর্স। পুলিশের বড়কর্তা, বিচারক মহল— সব জায়গাতেই তাঁর কান ছড়িয়ে আছে। এই সব মিলিয়ে সামাজিকভাবে প্রভাবশালী, পয়সা খরচ করতে পারে এরকম অপরাধীদের আইনের সূক্ষ্ম ফাঁকফোকর দিয়ে বের করে আনতে শাকিল খানের জুড়ি নেই।

পিটিশন ফাইল করা, রিসার্চ করা, উইটনেস তৈরি করা— এসবের জন্য তাঁর টিম আছে। তিনি এখন এই সব কাজে সময় দিতে পারেন না। কিন্তু আজকের সকালের তলবটা অন্যরকম।

আবদুল রিহান কুরেশি— ইন্ডিয়ান মুজাহিদিনের মাথা। অন্তত এই অভিযোগেই তাঁকে গ্রেপ্তার করেছে দিল্লি পুলিশ। কেস চলছে দিল্লি হাইকোর্টে। হাই প্রোফাইল কেস। মিডিয়া ইতিমধ্যেই তাকে ভারতের 'ওসামা বিন লাদেন' তকমা দিয়েছে। এই কুরেশিই শাকিল খানের ক্লায়েন্ট। শাকিল খান সচরাচর টেররিজমের কেস নেন না। দেশাত্মবোধ-টোধ না। যে থালায় খাব সেই থালায় ফুটো করব না— এই বাস্তববোধ থেকেই এড়িয়ে এসেছেন এই ধরনের কেস।

এবারে পারেননি। পারেননি, কারণ কিছু অস্বস্তিকর ফোন আসতে শুরু করল। সেই ফোনে কোনো স্পষ্ট হুমকি থাকত না। কিন্তু অচেনা প্রাইভেট নাম্বার থেকে অচেনা গলায় আপাত ঠান্ডা ঠান্ডা প্রফেশনাল কথাবার্তায় যেন মর্গের শীতলতা লেগে থাকত।

আজও একটা কল এসেছিল। এটা যদিও তিহার জেল থেকে। কুরেশি সেখানেই আছে। ফে তাকে বলা হয়েছিল যে তার মক্কেল তার সঙ্গে এক বার কথা বলতে চায়। তাই শাকিল খান নিজেই এসেছেন জেল চত্বরে। সে প্রায় কুড়ি মিনিট হতে চলল। তারপর সইসাবুদের পালা চুকিয়ে ঘরে এসে বসে আছেন তো আছেনই।

আরও প্রায় মিনিট দুয়েক পর দরজা খোলার শব্দ হল। ঘুরে তাকালেন শাকিল খান।

একটি জেলরক্ষীর সঙ্গে ঘরে ঢুকল তার মক্কেল। এর আগে শেষ যেদিন এসেছিলেন, ছেলেটিকে দেখে মনে হচ্ছিল অনেকটা উইথড্রন। বিমর্ষ মতো। আজ চোখ-মুখ বেশ ঝকঝকে লাগছে। ধীর পায়ে হেঁটে এসে সে বসল মিঃ খানের মুখোমুখি।

জেলরক্ষীটি দাঁড়িয়ে রইল দরজার কাছেই। শাকিল খান উঠে ঘুরে দাঁড়ালেন লোকটির মুখোমুখি। তারপর চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন, 'আপনি এই ঘর থেকে বেরিয়ে যান। আপনি জানেন, যতক্ষণ আমি আমার মক্কেলের সঙ্গে কথা বলব, আপনার এই ঘরে থাকার কোনো অধিকার নেই।'

জেলরক্ষীটি এক বার জ্বলন্ত ঘৃণার চোখে মিঃ খানের দিকে তাকিয়ে বেরিয়ে গিয়ে দরজাটা সশব্দে বাইরে থেকে বন্ধ করে দিল। খান এবারে আবার ঘুরে এসে বসলেন নিজের মক্কেলের মুখোমুখি। বললেন, 'বলুন, কী বলার আছে?' 'আমি খবরের কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দিতে চাই।' 'মানে? কীসের বিজ্ঞাপন? কী ব্যাপার?'

'ও একটা পারিবারিক মিটিং-এর ব্যাপার। সব কিছু আপনার জানার দরকার নেই। বিজ্ঞাপনের ম্যাটার আমি দিয়ে দিচ্ছি। এটা বাংলার সমস্ত নিউজপেপারে আগামী পরশু যাতে বেরোয় সেটা আপনাকে নিশ্চিত করতে হবে। আর এটা যেন কাগজের তিন নম্বর পাতায় বেরোয়, সেটাও দেখবেন। টাকা যা লাগার, আপনি পেয়ে যাবেন।'

শাকিল খান কিছুক্ষণ গম্ভীর হয়ে বসে রইলেন। ব্যাপারটা কী, সেটা তাঁর মতো লোকের বুঝতে অসুবিধে হওয়ার কথা নয়। লোকটি নিজের দলের কোনো লোকের কাছে কিছু মেসেজ পাঠাতে চাইছে। উকিলের মাধ্যমে সে কাজটা করার সুবিধে এই, যে কেউ তা জানতে পারবে না। উকিল-মক্কেলের মধ্যেকার গোপনীয়তা অলঙ্ঘনীয়। কিন্তু ইন্ডিয়ান মুজাহিদিনের প্রধান নিজের দলের লোককে কী মেসেজ পৌঁছে দিতে চাইছে? শাকিল খান মক্কেলের স্বার্থ রক্ষা করতে গিয়ে কোনো সন্ত্রাসবাদী পরিকল্পনার অংশ হয়ে পড়বেন না তো? বোধহয় তাঁর মনের কথা আন্দাজ করেই রিহান কুরেশি আবার বলে উঠল, 'আপনি চাইলে এমন ব্যবস্থা করতে পারেন যাতে ইট ক্যান নট বি ট্রেসড ব্যাক টু ইউ। আই ডোন্ট কেয়ার অ্যাবাউট দ্যাট। বাট দ্য মেসেজ মাস্ট গো।'

শাকিল খান যখন গাড়িতে উঠে বসলেন তখন তিনি ভারি অন্যমনস্ক। তাই খেয়াল করলেন না— একটি কয়েদি ছাড়া পেয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। পরনে সাধারণ ঢোলা প্যান্ট-শার্ট। চোখ-মুখগুলো কেমন যেন ফুলে রয়েছে। আশ্চর্যের ব্যাপার, তাকে বাড়ি থেকে কেউ নিতে আসেনি।

শাকিল খানের গাড়ি জেলের গেট থেকে বেরিয়ে হুস করে মিশে গেল শহরের রাস্তায়।

ছাড়া পাওয়া কয়েদিটি জেলের গেটের বাইরে হেঁটে বেশ কিছুটা এসে পকেট থেকে ফোন বার করে একটা ফোন করল, 'দ্য মেসেজ ইজ সেন্ট।'

.....

'শামসুদ্দিন আলম। বারুইপুর।'

.....

'শিওর।'

ফোন পকেটে রেখে লোকটিও মিশে গেল রাজধানীর রাজপথে আরও হাজার হাজার মানুষের ভিড়ে।

ঠিক সেই সময়েই শেখরণের ফোন বেজে উঠল। ফোন তুলতেই ওপার থেকে একটি সতর্ক গলা বলে উঠল, "হি নিডস টু বি সেন্ট টু সলিটারি কনফাইনমেন্ট নাও।'

চতুর্দশ অধ্যায়

॥দ্য ক্রিপি ক্রলি ভ্যারিয়েশন॥

॥১৪.১॥

।। দ্য আননোন ভেরিয়েবল।।

২৮ জুলাই, ২০১৮, ভোর বেলা / নিউটাউন, কলকাতা, ভারত

'কোথাও চললে নাকি, সক্কাল সক্কাল?'

একটু চমকে গেলেও, পেছনে না তাকিয়েও সে বুঝে গেল এটা কার গলা। তার প্রতিবেশি বৃদ্ধ। বয়সের কারণেই ঘুম কমেছে। এখন প্রায়ই রাত থাকতে উঠে পড়েন আর কম্পাউন্ডের বাগানের গাছগাছালি পরিচর্যা করেন। নিরীহ লোক। কিন্তু এই দেশের সনাতন ঐতিহ্য (!) মেনেই সদা কৌতূহলী। পেছন ফিরেই জবাব দিল, 'হ্যাঁ। অফিসে যাচ্ছি এক বার, আঙ্কল!'

'এত ভোর বেলা?'

'হ্যাঁ, আমাদের ক্লায়েন্ট সিঙ্গাপুরের তো। আমাদের চেয়ে ওদের টাইম এগিয়ে। কিছু একটা প্রবলেম হয়েছে হয়তো। ডাক পড়েছে। তাই সকাল সকাল যেতে হচ্ছে।' দরজায় চাবি দিয়ে এবারে মুখোমুখি হল সে।

'ও। তা সঙ্গে একেবারে বাক্স-প্যাঁটরা? অফিসেই ডেরা বাঁধবে নাকি হে ইয়াং ম্যান!!' নিজের রসিকতায় নিজেই হো-হো করে হেসে ওঠেন বৃদ্ধ।

'না, মানে, ওই, ইয়ে আর কী— মানে অফিস যা বলছে তাতে তেমন ইমার্জেন্সি হলে আমাকে এক-দু' সপ্তাহের জন্য হয়তো সিঙ্গাপুরেও চলে যেতে হবে।'

'বাব্বা! রাতারাতি বিদেশ। তোমাদের আইটি-র ব্যাপার-স্যাপার কিছুই বুঝি না বাপু।'

'হেঁ-হেঁ.......' বলতে বলতে লিফটের দিকে পা বাড়ায় সে। কী মনে হতে এক বার পেছন ফিরে তাকায় ফ্ল্যাটের বন্ধ দরজার দিকে। তারপর আবার এগিয়ে যায়। নীচে দুজনে একসঙ্গেই নামে। বৃদ্ধ টুকটুক করে এগিয়ে যান নিজের স্থবির সঙ্গীসাথিদের দেখভাল করতে। সে এগিয়ে যায় গেটের দিকে।

এই মাস সাত-আট হল এই কো-অপারেটিভ বিল্ডিংটায় বসত শুরু হয়েছে। তার বাবা আর তাঁর অফিসের কয়েক জন কলিগ মিলে বহু আগে সস্তায় নিউটাউনের এই জমিটা কিনে রেখেছিলেন। তখন এসব জায়গা জলা আর বাদাবন ছিল। প্রায় জলের দরেই পাওয়া গেছিল জমিটা। কিন্তু ফ্ল্যাট তৈরি করা শুরু করতে করতে লেগে গেল অনেকটা সময়। সরকারি কেরানিদের মাইনের টাকায় এসব চট করে হওয়া মুশকিল।

বছর তিনেক আগে যখন বাড়ি তৈরি শুরু হল, তখনও বাবা বেঁচে। বেশ কয়েক বার তাকে বলেছিলেন সঙ্গে এসে বাড়ির কাজ কেমন এগোচ্ছে দেখে যেতে। নিতান্ত অনিচ্ছা নিয়ে প্রথম বার এসেছিল সে। নিউটাউন ততদিনে আলো ঝলমলে শহর। শহরের আধুনিক উচ্চবিত্ত বা উচ্চ-মধ্যবিত্ত গোষ্ঠী যাদের প্রফেশন কম্পিউটারের সঙ্গে জড়িয়ে, তারা সবাই আস্তে আস্তে জড়ো হয়ে গেছে এই অঞ্চলে। চওড়া রাস্তা, তিন তারা-চার তারা হোটেল, ঝকঝকে শপিং মল, আধুনিক হাসপাতাল, বহুতল অফিস আর রকমারি রঙের-ঢঙের বাক্স-বাসা বা ফ্ল্যাট। তখনও মূল কলকাতার মতো জনবহুল নয়। তবে মূল কলকাতার মতো

অপরিকল্পিতও নয়। নিজের দীর্ঘদিনের চেনা পাড়া, বন্ধুবান্ধব ছেড়ে কোনো একদিন এখানে চলে আসতে হবে ভেবেই প্রথমটায় অনিচ্ছা ছিল তার।

কিন্তু এসে, বাড়ির লোকেশন দেখে, শহরের ঝাঁ-চকচকে রূপ দেখে সে মজে গেল। বাবা মারা যাবার এক সপ্তাহ আগে সে নিয়োগপত্র পেয়েছিল চাকরির। কিমাশ্চর্যম— চাকরির জায়গা এই বাড়ি থেকে মাত্র দশ মিনিটের হাঁটা পথ। সেই কত বছর আগেই কি বাবা জানত সে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে আইটি-তে চাকরি পাবে, তাও আবার এই কোম্পানিতে? এই কথা নিয়ে বাপ-ছেলেতে কত হাসাহাসিই না হল। তারপর, ক'দিন যেতে-না-যেতেই বাবা চলে

গেলেন। কয়েক দিনের নোটিসে— ডেঙ্গুতে। চাকরির তখন এক-দু' বছর বাকি ছিল হয়তো। মা আগেই গেছিলেন। ফ্ল্যাটবাড়ি তৈরি শেষ হতে তখন ঢের বাকি। সে কী কম হুজ্জতির কাজ? যদিও তাকে সেসব কিছুই পোহাতে হয়নি। সজ্জন, ভদ্র বাবার সহকর্মীরাও তদ্রূপ। তারাই দায়িত্ব নিয়ে তার ভাগের ফ্ল্যাটটিও দাঁড়িয়ে থেকে যত্ন সহকারে বানানো করাল বিল্ডারকে দিয়ে। নকশা বাবা বেঁচে থাকতেই ফাইনাল করা হয়েছিল। ইন্টিরিয়র সে নিজে করাল এক বন্ধুর কোম্পানিকে দিয়ে। বেশ খরচাপাতি করেই। পাকাপাকিভাবে উঠে এসেছে তা প্রায় ছ' মাসের বেশিই হয়ে গেল।

বড় শখের এই ফ্ল্যাট ছেড়ে তাকে চলে যেতে হচ্ছে আজকে। নিজের ইচ্ছেয় নয়, একেবারেই। জানে না কবে ফিরতে পারবে বা আদৌ ফিরতে পারবে কিনা!

বছর দেড়েক আগের সেই একটি দুর্মতির রাত তার গলায় যে এমন অদৃশ্য বকলস পরিয়ে দিয়েছে, সেটা সে এই দিন তিনেক আগেও বুঝতে পারেনি। কোম্পানি থেকে কাজে বিজনেস ভিসায় পাঠিয়েছিল কুয়েত।এক রাত্রে সেখানকার কলিগ বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে মদ খেয়ে ফুল আউট হয়ে গেছিল। তারপর কলিগদেরই একজন তাকে নিয়ে গেছিল আল-জাহরায়। হালকা আপত্তি হয়তো সে করে থাকবে। কিন্তু মনে নিষিদ্ধ জিনিসের প্রতি আকর্ষণও ছিল দুর্নিবার।

এমনিতে কুয়েতে দেহ ব্যবসা বেআইনি হলেও কয়েকটি পকেটে বেশ রমরমিয়েই চলে। সেরকমই একটি এই আল-জাহরা, যেখানে বাংলাদেশি, ইন্ডিয়ান আর পাকিস্তানি মেয়েদেরই ভিড়। ধরা পড়লে কখনো ডিপোর্ট বা কখনো গুড কন্ডাক্টের মুচলেকা লিখিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয় দেহপসারিনিদের। দালালদের হয়তো জেল-টেল হয়।

সেদিনকে তার ভাগ্যই খারাপ ছিল।

তারা যেখানে গেছিল, সেখানেই পুলিশের রেইড হল। আর সবার সঙ্গে ধরা পড়ল সে আর তার সহকর্মী, দুজনেই। পুলিশ হয়তো তাদের নাম-ধাম রেকর্ড করে ফাইন করে ছেড়েই দিত। কিন্তু জানাজানি হলে চাকরি যাওয়া নিশ্চিত ছিল তাদের দুজনেরই। কোম্পানির কড়া নিয়ম- কোনো দেশে গিয়ে সেখানকার আইন ভাঙা যাবে না কোনোভাবেই।
-

তারা যখন পুলিশের হাতে-পায়ে ধরছিল, কাকুতিমিনতি করছিল তাদের ছেড়ে দেওয়ার জন্য, তখন কোথা থেকে একটি সুদর্শন, সুবেশ অল্পবয়েসি ছেলের উদয় হল। নাম বলল জব্বার। চোস্ত কুয়েতি আরবিতে পুলিশদের সঙ্গে তার কী যে কথা হল, প্রায় পনেরো মিনিট ধস্তাধস্তি করে শেষমেশ তাদের ছেড়ে দিল পুলিশ।

জব্বার তখন তাদের কাছে ভগবান। তারা কীভাবে কৃতজ্ঞতা জানাবে ভেবে পাচ্ছিল না। জব্বার হাত নেড়ে আশ্বস্ত করেছিল। তারপর দুজনেরই ফোন নম্বর নিয়ে বলেছিল, 'আল্লাহর ইচ্ছা হলে কোনো একদিন আমার আপনাদের দরকার পড়বে। সেদিন কিন্তু ফেরাবেন না দোস্ত।'

অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে, নিজেদের ফোন নম্বর আর মেল আইডি শেয়ার করে চলে এসেছিল তারা। হোটেলে ফেরার পথে নিজেদের ভাগ্যকে আর জব্বারকে ধন্যবাদ দিতে দিতে নাক-কান মলেছিল। আর কোনোদিন এরকম আহাম্মকি করবে না। বিশেষত বিদেশে এসে।

হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছিল, যে এত অল্পের ওপর দিয়ে, সামান্য ধমক-ধামকের ওপর দিয়ে ফাঁড়া কেটে বেরিয়ে গেছে।

ভুল ভেবেছিল তারা। অন্তত সে নিজে ভুল ভেবেছিল। আজ থেকে ঠিক চার দিন আগে ফোনটা যখন এল, তখনি সে বুঝতে পারল, বাবা প্রায়ই কেন বলত, 'পাপে ছাড়ে না বাপেরে!'

ফোনটা অচেনা একটা নম্বর থেকে আসছিল। ধরতেই একটা অচেনা গলা চোস্ত ইংরেজিতে বলে উঠল, 'কেমন আছেন দোস্ত?'

'ভালো। কে বলছেন?'

'গলা শুনে যখন চিনতে পারলে না, তখন নাম বললে কি মনে পড়বে? 'সরি! মাস্ট বি রং নাম্বার!' কাজের মধ্যে কেউ ফোন করে খেজুর করলে তার ভালো লাগে না। পট করে কেটে দিয়েছিল ফোনটা একটু বিরক্ত হয়েই। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তার ফেসবুক মেসেঞ্জারে একটা টুং করে শব্দ এল।

সে দেখে একটা মেসেজ রিকোয়েস্ট। ফ্রেন্ডলিস্টে না থাকা প্রোফাইল থেকে কোনো মেসেজ এলে সেটা সরাসরি দেখা যায় না প্রথমেই। সেটা আসে মেসেজ রিকোয়েস্ট হিসেবে। অ্যাকসেপ্ট করলে তবে মেসেজ দেখা যায়।

মেসেজ এসেছে একটি অচেনা প্রোফাইল থেকে। প্রোফাইলের নাম 'জিব্রাঈলের ডানা'। বাপের জন্মে এমন প্রোফাইলধারী কাউকে চেনে না সে। তবু কৌতূহলী হয়ে সে মেসেজটা দেখতে যায়। একটি ভিডিয়ো। সাধারণত যেরকম ভিডিয়ো ভাইরাল হয়ে প্রোফাইল থেকে প্রোফাইলে ঘুরে বেড়ায়, সেরকম কিছু একটা হবে হয়তো।

তবে দেখে কীরকম চেনা চেনা মনে হওয়ায় এক বার চালায় সে। আর ভিডিয়ো চলতে শুরু করা মাত্র হাড় হিম হয়ে যায় তার। প্যান্ট, জাঙিয়া কোমর থেকে নামানো অবস্থায় ছুটছে একটা লোক... অনেক লোকের ভিড়... ছুটতে ছুটতেই প্রাণপণে প্যান্ট কোমরে তোলার চেষ্টা করছে... পুলিশ জেরা করছে সেই লোকটাকে... লোকটা হাতে-পায়ে ধরে কাকুতিমিনতি করছে... পেছনেই একদল স্বল্পবসনা মেয়ে।

ভিডিয়োতে আওয়াজ না থাকলেও বোঝা যাচ্ছে কী ঘটে চলেছে। আর কার সঙ্গে ঘটে চলেছে? লোকটাকে যে সে বিলক্ষণ চেনে। এ যে তারই ভিডিয়ো। দেড় বছর আগের কুয়েতের সেই লজ্জার রাত।

কে এতদিন পরে কবর থেকে খুঁড়ে তুলে আনতে চাইছে সেই লজ্জাজনক অধ্যায়টা?

হতভম্ব হয়ে চেয়ারে বসে থাকতে থাকতেই মিনিট খানেকের মধ্যেই তার ফোনটা আবার বেজে উঠল। আবার সেই নম্বর। ফোন তুলতেই আবার সেই গলা, 'দোস্ত, চিনতে পারা গেল?'

এবারে আর তার এই কণ্ঠস্বর চিনতে ভুল হয় না।

'জব্বারভাই!' শুকনো গলায় অস্পষ্ট আওয়াজে সে কোনোমতে বলে।

'আরে, কেয়া বাত! এই না হলে বন্ধুত্ব! লাস্ট টাইম চিনতে পারলেন না দেখে মনটা খারাপ হয়ে গেল। হে-হে...'

'বলুন, কী ব্যাপার!' তখনও গলার শুকনো ভাবটা কাটেনি।

'কী আবার। দোস্ত হয়ে দোস্তকে ফোন করা যায় না?' আবার আওয়াজ করে হেসে ওঠে জব্বার।

'না না, সে তো বটেই।' একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে সে। শুকনো ঠোঁট দুটো নিজের অজান্তেই আরও শুকনো খরখরে জিভ দিয়ে চেটে ভিজিয়ে নেবার একটা চেষ্টা করল। অফিসের প্রত্যেক ফ্লোরে গোটা চারেক সাইলেন্ট বুথ বানানো হয়েছে সম্প্রতি। লোকজন তার ভেতরে ঢুকে ফোনে কথা বলতে পারে।

কথা বলতে বলতে সে ইতিমধ্যেই পায়ে পায়ে সেরকম একটা বুথে ঢুকে পড়েছে।

'কী ব্যাপার বলুন! হঠাৎ এতদিন পর মনে পড়ল আমাকে?'

'হঠাৎ কেন দোস্ত? বলেছিলাম তো আপনাকে, দরকার পড়লে একদিন ঠিক মদত চাইব।

'হেল্প চাইতে হলে কি কেউ ব্ল্যাকমেল করার ভয় দেখায়?' কথায় কথায় নার্ভাসনেসটা একটু কমতেই মুখ দিয়ে কথাটা বেরিয়ে আসে। একটু উৎকণ্ঠিত হয়ে ওঠে সে। কিন্তু ফোনের ওপারে জব্বার রেগে যায় না।

'ছি ছি, ব্ল্যাকমেল কী বলছেন? রিমাইন্ডার বলুন। ফ্রেন্ড কি ফ্রেন্ডকে কখনো ব্ল্যাকমেল করতে পারে?'

'বেশ। আপনি যা বলবেন। এবার বলুন— কী করতে পারি আপনার জন্য?'

'আপনার একটা ফ্ল্যাট আছে না, নিউটাউন এরিয়ায়?'

'হ্যাঁ।' মুখে আপাত নিরুত্তাপভাবে উত্তর দিতে দিতেও ভেতরে ভেতরে সে বিস্ময়ে ফেটে পড়ছিল। কে এই লোক, কতটা তার নেটওয়ার্ক— যে দেড় বছর আগে এক রাত্রের জন্য মোলাকাত হওয়া বঙ্গসন্তানকে সে মনে রেখে দিয়েছে আর তার সম্বন্ধে এত খোঁজখবর রাখে।

'আমার দুই ফ্রেন্ডের জন্য আপনার ওই বাড়িটা ছেড়ে দিতে হবে। বেশি না, সপ্তাহ দুয়েকের জন্য।'

'মানে?'

এতক্ষণ তার যা টেনশনের অভিমুখ, এবারে তা সম্পূর্ণ বদলে গেল। বাড়িতে দুটো ছেলেকে থাকতে দিতে হবে? কারা? কেন? হোটেলে কেন থাকছে না? এত ঝামেলা করে, তাকে ফোন করে তার বাড়িতেই রাখতে হবে কেন? সবচে' বড় আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে, তাদের রাখতে গিয়ে ওকে বাড়ি ছেড়ে দিতে হবে কেন? একসঙ্গে এতগুলো প্রশ্ন দলা পাকিয়ে ছোট্ট হয়ে বেরিয়েছিল তার মুখ দিয়ে।

পরের মাত্র পাঁচ মিনিটে তার সব জিজ্ঞাসার নিরসন ঘটিয়েছিল জব্বার। খুব স্পষ্ট ভাষায় বুঝিয়ে দিয়েছিল যে তাকে ঘরের চাবি তুলে দিতে হবে জব্বারের লোকের কাছে। এ ব্যাপারে কাউকে কিছু বলা চলবে না। জব্বারের লোকজন ওই ফ্ল্যাটে থেকে কিছু কাজকর্ম করবে। তার কোনো ভয় নেই। পাড়া-প্রতিবেশি কেউ কিছু জানতে পারবে না। তাকেও এখন জানানো হবে না কী কারণে তার ঘর নেওয়া হচ্ছে এবং যারা নিচ্ছে তাদের পরিচয়ই-বা কী। সে শুধু নির্দিষ্ট দিনে, নির্দিষ্ট সময়ে, নির্দিষ্ট জায়গায় জব্বারের লোকের হাতে বিনা প্রশ্নে তুলে দেবে নিজের ঘরের চাবি এবং আবার ঠিক তার সঙ্গে যোগাযোগ করে ফিরিয়ে দেওয়া হবে সেটা। মাঝে কী করা হবে, সে কথা তার না জানাই ভালো, তার নিরাপত্তার খাতিরে।

এইরকম একটা অবিশ্বাস্য, অবাস্তব প্রস্তাব পেয়ে প্রায় দু' মিনিট কথা বলতে পারল না সে। একটা মরিয়া সাহস ক্ষণিকের স্ফুলিঙ্গের মতো তার ভেতর জ্বলে উঠল যেন। সে গলায় একটা আপাত স্বাভাবিকতা এনে প্রশ্ন করল, 'আর যদি ঘর না ছাড়ি?'

'আপনি ভুল করছেন দোস্ত! আমি আপনাকে রিকোয়েস্ট করিনি। আমরা শান্তিপ্রিয় লোক। বেকার মারদাঙ্গা পছন্দ করি না। তবে বড় কাজের ব্যাপারে এসব ছোটখাটো বাধা বিশেষ ভাবায়ও না আমাদের। আর আপনার ক্ষেত্রে তো আমাদের কিছুই করতে হবে না। ভিডিয়োর যা কনটেন্ট— এমনিতেই ভাইরাল হয়ে যাবে। আপনার ওই যে বাগদত্তা না কী... মোনালিসা ম্যাডাম... কী মনে হয় দোস্ত? এই ভিডিয়োটা ওঁর কেমন লাগবে?' -

এই সাইলেন্ট বুথগুলোতে আয়না নেই কোনো। থাকলে সে দেখতে পেত, মুহূর্তের মধ্যে তার মুখ কেমন রক্তশূন্য হয়ে গেছে। মোনালিসার ব্যাপারটা এখনও কেউই প্রায় জানে না। দুজনের কেউই ফেসবুকে ডিক্লেয়ার করেনি। ক'টা দিন অপেক্ষা করতে বলেছিল মোনালিসা নিজেই। এরা ওর নামও জেনে গেছে? কী করে সম্ভব? তাহলে কি অনেকদিন আগে থেকেই ওকে ফলো করছে? কতদিন? ফ্যাকাশে রক্তহীন মুখে অনুচ্চারিত প্রশ্ন ও সংশয়গুলোর ছায়া গাঢ় হচ্ছিল। এরকম কোণঠাসা অবস্থায় কোনো নেগোশিয়েশন চলে না। মেনে নেওয়া ছাড়া কোনো রাস্তা থাকে না।

আর আজ তাই তার সামনে শুধু অনিশ্চিত রাস্তার বিস্তার। প্রায় পাঁচ মিনিট আগেই সে এসে পৌঁছে গেছে সেই জায়গায়, যেখানে আজ জব্বারের বন্ধুর হাতে তুলে দেবার কথা তার ঘরের চাবি। তার পরে কোথায় যাবে জানে না সে। হলদিরাম, চিনার পার্ক হয়ে যে রাস্তাটা এসে মিশছে যশোর রোডের গায়ে, ঠিক সেই মোড়ে তার দাঁড়িয়ে থাকার কথা সকাল ছ'টার সময়।

এমনিতে ব্যস্ত এই রাস্তায় এখন ভিড় নেই। ছুটির দিনের এই ভোরে সবে একটু একটু করে শহরের ঘুম ভাঙতে শুরু করেছে ।

হঠাৎ পিঠে একটা টোকা পড়তে সে ফিরে দেখল পেছনের লোকটাকে। পরনে সাধারণ চেক শার্ট। হাফ-ময়লা প্যান্ট। গালে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। ঘোলাটে চোখ। কালচে খয়েরি ঠোঁট। এলোমেলো চুল। কপালে একটা আবছা হয়ে আসা লাল তিলক। হাত গুটোনো শার্ট— কবজিতে সস্তার সবজেটে উল্কি দিয়ে লেখা এলবি। পাতাখোর চেহারা পুরো। সে একটু ভুরু উঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কিছু বলবেন?'

লোকটা কিছু না বলে হাত বাড়াল শুধু। সঙ্গে সঙ্গে সে বুঝে গেল এই সেই লোক। সেই বিদেশি, সুবেশ, স্মার্ট জব্বারের বন্ধু হিসেবে কখনোই একে মানা যায় না। কিন্তু এসব ভাবার সময়ই নয় তখন। সে বিনা বাক্যব্যয়ে চাবি দিয়ে দেয় ছেলেটির হাতে। তারপর মাটিতে পাশেই রাখা ব্যাগটা হাতে তুলে নিয়ে এগোতে যায়। কিন্তু পাতাখোর লোকটা আবার তার কাঁধে হাত রাখে। সে ফিরে তাকাতেই এলবি জিজ্ঞেস করে, 'কেউ কি আপনাকে আসতে দেখেছে?'

'নাহ! ছুটির দিন, এত সকালে কে আর দেখবে?' চট করে মিথ্যে কথা বলা অভ্যেস নেই বলেই সে একটু ইতস্তত করে উত্তর দেয়।

'ঠিক করে বলুন। আপনি না বললেও সত্যি কথাটা জানতে আমাদের অসুবিধে হবে না। আপনি বললে, আপনার সঙ্গে সম্পর্ক ভালো থাকবে।'

লোকটার চেহারার সঙ্গে ওর কথা বলার ধরনের কোনো মিল নেই। কথা বলার ধরন খুব পরিশীলিত এবং শীতল! একটু শিরশিরানি ধরিয়ে দেয় যেন। সে বলে, 'না, মানে— বিশেষ কেউ নয়। ওই, পাশের ফ্ল্যাটের আঙ্কল তো ভোর ভোর উঠে পড়েন। তাঁর সঙ্গেই দেখা হয়ে গেল।'

'কী কথা হল?'

লোকটা একটু ঘনিয়ে এল তার কাছে। এখন সবে সোয়া ছ'টা। শহর কলকাতার এই প্রান্ত এখনও ঘুমের আমেজ কাটিয়ে ওঠেনি। দুয়েকটা বাস বিক্ষিপ্তভাবে যাচ্ছে বটে— কিন্তু বেশ খানিকক্ষণ অন্তর অন্তর। পথচারী তো প্রায় নেই বললেই চলে। শুকনো ঠোঁট চেটে নিয়ে সে বলে, 'ওই আর কী, জিজ্ঞেস করছিলেন, ছুটির দিনে এত সকাল সকাল কোথায় যাচ্ছি।'

'আর আপনি কী বললেন?'

'বললাম— অফিসের জরুরি কাজ। আমাদের আইটি-র কাজ তো, ছুটির দিনেও মাঝে মাঝেই যেতে হয়, উনি আগেও দেখেছেন।'

'আচ্ছা।'

'উনি কিন্তু কিছুই সন্দেহ করেননি। কেনই-বা করবেন? এমনি ছা-পোষা মানুষ।' নিজের কানেই তার নিজের গলাটা একটু মরিয়া শোনায়।

এলবি উল্কি আঁকা লোকটা কিছুক্ষণ ওর দিকে ভ্রূ কুঁচকে তাকিয়ে রইল। তারপর একটু আওয়াজ করে হেসে উঠে বলল, 'আরে ধুর মশাই। আপনি কি ভাবলেন আপনার ওই বুড়োকে আমি খুন-টুন করে দেব? এসব কি সিনেমা চলছে নাকি? মাইরি, আপনি পারেনও বটে।'

হঠাৎ এই পট পরিবর্তনে একটু থতিয়ে যায় সে। টেনসড থেকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসতে সময় লাগে তার। কয়েক সেকেন্ড পরে একটু ক্যাবলার মতো হেসে বলে, 'না না, সে কথা বলিনি। মানে... ওই... ইয়ে...'

'থাক, থাক। আপনি এখন কোথায় যাচ্ছেন বলুন দেখি। আপনার ঘর তো আমাদের দিয়ে দিলেন।'

দিয়ে দিলামই বটে। মনে মনে বলে সে। মুখে বলে, 'শিলং-এ আমার এক বন্ধু থাকে। সেখানে যাচ্ছি।'

সে পা বাড়াল এয়ারপোর্টের রাস্তার দিকে। এখান থেকে ডোমেস্টিক ডিপার্চার বেশ অনেকটা রাস্তা। তবে এখনও তেমন রোদ ওঠেনি। সকালের ঠান্ডা ঠান্ডা আমেজে হাঁটতে

ভালো লাগবে। নিজের বাড়ি একদল অজানা-অচেনা লোকের হাতে অজানা কারণে ছেড়ে দেবার পরে কী অনুভূতি হওয়া উচিত তা সে জানে না। হয়তো ভয়, হয়তো দুঃখ হওয়া উচিত।

সে কিন্তু একটা অসাড় মন নিয়ে হেঁটে চলেছে অনিশ্চিতের দিকেই। অন্যমনস্ক বলেই সে ঠিক খেয়াল করল না। নাহলে দেখতে পেত, সে একটু দূরে যেতেই লোকটা তার পকেট থেকে ফোন বার করে কাউকে ডায়াল করে এক বার ফোনটা কানে দিল। ওপারে কাউকে জানাল, 'ডান! বাট উই হ্যাভ এ প্রবলেম। সামওয়ান স হিম!'

১৮ জুলাই, ২০১৮, বিকেল বেলা / করাচী, পাকিস্তান

‘বলুন জনাব! কী খিদমত করতে পারি আপনার?’ সাদিক ইসমাইলের গমগমে গলার আওয়াজ ঘরের চার দেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে যেন প্রতিধ্বনিত হতে থাকল। আব্বাস দিলদার সিদ্দিকির প্রাসাদোপম বাড়িতে কোনো ঘরই বিশেষ ছোট নয়। তার মধ্যে কয়েকটা, যেগুলোতে প্রধানত অতিথি আপ্যায়ন হয়, সেগুলোতে তো রীতিমতো মহল্লা ক্রিকেটের আসর বসানো যায়।

ইফতিকারের এটা প্রথম বার নয়। গত কয়েক বছর ধরে এই বাড়িতে তার প্রায় নিয়মিত যাতায়াত। কিন্তু এত বার আসার পরেও, এই অপরিমিত ঐশ্বর্য, এই বৈভবের সামনে এসে সে কেমন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে যায়। না, তার লোভ হয় না। কিন্তু খোলা মাঠের একপ্রান্তে জ্বলতে থাকা টিমটিমে একফোঁটা আলো যেমন এক সমুদ্র অন্ধকারকে মন্ত্রমুগ্ধ করে স্তব্ধ করে রাখে তার সামনে, ঠিক তেমনই ইফতিকারের মনে হয় বাইরের শুকনো, ছেঁড়াখোঁড়া, দীনহীন, অপরাধসংকুল চানেসার গোঠের অন্ধকার যেন এই বাড়িটাকে স্পর্শ করতে পারেনি কোনোদিন। কোনো মালিন্য নেই এই বাড়ির কোনো কোণে!

আজও সে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে আছে। তবে এই বৈভবের সামনে নয়। সাদিক ইসমাইলের সামনে।

সাদিক আইএসআই-এর প্রবাদপ্রতিম অপারেশন হেড। সবে মধ্য-চল্লিশ পেরোনো সুদর্শন মানুষটিকে দেখলে গোয়েন্দা বলে মনে হয় না। বরং অভিজাত কুর্তা-পাজামা, পানের রসে টুকটুকে লাল ঠোঁট আর সূক্ষ্ম সুর্মা পরা স্বপ্নালু চোখ দুটো দেখলে মনে হয় কোনো মুশায়েরায় এসেছেন বিখ্যাত কোনো শায়র। কিন্তু এটা নিছকই মলাট। ইফতিকার জানে এই সেই লোক যার নাম অরণ্যের প্রাচীন প্রবাদের মতোই ক্ষমতার অলিন্দে, গুপ্তচরবৃত্তি ও অদৃশ্য রক্তক্ষয়ী লড়াইয়ের এই অন্ধ ভুলভুলাইয়ায় সম্মানের সঙ্গে, সম্ভ্রমের সঙ্গে উচ্চারিত হয়। বিস্ময়ের সঙ্গে প্রতিধ্বনিত হয়।

এই সেই লোক যিনি র-এর ডিপ কভার এজেন্ট করণদীপকে তার লুকোনো পরিচয়ের গর্ত থেকে কলার ধরে তুলে বার করে এনে জেলে ভরেছেন। এই সেই লোক যিনি বালুচ বিদ্রোহীদের এনে ফেলেছেন হাতের মুঠোয়। এই সেই লোক, যিনি গত আট বছর ধরে সারা বিশ্বের চোখে ধুলো দিয়ে লুকিয়ে রেখেছেন দাউদ ইব্রাহিমকে।

অ্যাবটাবাদে লাদেনের হত্যার পর থেকে আন্তর্জাতিক মঞ্চে পাকিস্তানের ভাবমূর্তি ক্রমশ খারাপ হয়েছে সন্ত্রাসবাদ ও সন্ত্রাসবাদীদের আশ্রয় দেবার অভিযোগে। ধীরে ধীরে দেশের ভেতরেও একটা ক্ষমতাকেন্দ্র তৈরি হয়েছে যারা চায় না পাকিস্তানের বুকে লস্কর, আল-কায়দা বা জামাতের মতো কুখ্যাত জঙ্গি সংগঠনগুলো ঘাঁটি গেড়ে বসে থাকে। এরা চায় না হাফিজ সাইদ বা দাউদ ইব্রাহিম পাকিস্তানের মাটি থেকে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ ও অন্যান্য অপরাধমূলক কাজকর্ম চালিয়ে যাক। বিগত এক দশকে পাকিস্তানের বুকে— করাচি, ইসলামাবাদ, লাহোরে নাশকতামূলক কাজকর্মে এত সাধারণ মানুষ মারা গেছে, এত জানমালের ক্ষতি হয়েছে যে ধীরে ধীরে সাধারণ মানুষের একটা বড়সড় অংশও এই ক্ষমতাকেন্দ্রের পাশে দাঁড়িয়ে, এদের সমর্থন দিয়ে ক্রমশ শক্তিশালী করেছে। এরকম ক্রমশ শক্তিশালী রাজনৈতিক বিরুদ্ধ লবি, ইসলামাবাদের নিয়মিত বিশ্বাসঘাতকতার ঐতিহ্য এবং পাকিস্তানের সরকারের সঙ্গে আইএসআই ও মিলিটারির ক্রমাগত বেড়ে চলা বিরুদ্ধতা— এই সবের মধ্যে এই লোকটি কী অবলীলায় এই গোলকধাঁধায় ঘুরে বেড়ায়। কীভাবে যখন যাকে দরকার, তাকে অনায়াসে ব্যবহার করে নেয়, কীভাবে দিনের পর দিন দাউদের মতো হাই-ভ্যালু টার্গেটকে লুকিয়ে শুধু রাখে তাই না— তাকে লুকিয়ে রাখার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে দঁদে

ডিপ্লোম্যাটদের সহমত করে ফেলে— তা ভাবলেও আশ্চর্য হতে হয়।

সেই সাদিক ইসমাইলকে মুগ্ধ হয়ে দেখছিল ইফতিকার। আর মনে মনে ধন্যবাদ দিচ্ছিল দিলদারভাইকে। সে ফোনে কতটা কী গুছিয়ে বলতে পেরেছিল কে জানে; কিন্তু তার গলার আওয়াজে ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝতে পেরে দিলদারভাই মাত্র দু' ঘণ্টার নোটিসে এই অসাধ্য সাধন করেছে। যদিও কাকতালীয়ভাবে সাদিকের এই সময়েই চানেসারে থাকাতেও একটা সুবিধে হয়েছে। দিলদারভাইয়ের দাওয়াত কেউ এড়িয়ে যায় না পারতপক্ষে। সাদিক হ্যাঁ বলামাত্রই দিলদার পালটা ফোন করে জানিয়েছিল ইফতিকারকে।

ইফতিকার তখন থানার মধ্যে অস্থিরভাবে পায়চারি করছিল। ইউসুফ হামজার থেকে সে যা জানার জেনেছে। পোস্ট-মর্টেম রিপোর্টটা পেলে একদম নিশ্চিত হওয়া যেত। কিন্তু এই কয়েক ঘণ্টার মধ্যে প্রাথমিক রিপোর্টটুকু পাওয়ারও চান্স কম।

ফোনটা পাওয়ার পর সে নিজেকে শান্ত করে ধীরে ধীরে। একটাই সুযোগ। বড় কিছুর সঙ্গে যুক্ত হওয়ার, নিজের কেরিয়ারকে ফাস্ট ট্র্যাকে ফেলার এই একটাই চান্স। খুব বেশি সময় পাওয়া যাবে না। যতটুকু পাওয়া যাবে তার মধ্যেই তাকে সাদিক ইসমাইলকে ইন্টারেস্টেড করে তুলতে হবে।

ফোন পাওয়ার প্রায় এক ঘণ্টা পরে সে যখন দিলদারভাইয়ের বাড়ির এই বিলাসবহুল কামরায় পৌঁছোল, তখন সে পুরোপুরি প্রস্তুত। কিন্তু ওই গমগমে আওয়াজটা আবার যেন সব এলোমেলো করে দিল।

'বলুন জনাব! কী খিদমত করতে পারি আপনার জন্য?' সাদিক ইসমাইলের গমগমে গলার আওয়াজ ঘরের চার দেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে যেন প্রতিধ্বনিত হতে থাকল।

'কী যে বলেন জনাব! আপনি কি খিদমত করার লোক? আপনি এখন খিদমত নেবেন। আমরা করব!' মাঝে ঢুকে কথা বলে দিলদার পরিস্থিতিটা সামলে নিল ভাগ্যিস। ইফতিকার একটু সময় পেল নিজেকে গুছিয়ে নেওয়ার। তারপর গলা খাঁকরে বলল, 'দিলদারভাই ঠিকই বলেছেন জনাব। আমি আপনার খিদমতে বা বলা ভালো, মুলকের খিদমতে কিছু পেশ করতে এসেছি। কতটা কাজে লাগবে জানি না। তবে ব্যাপারটা গোলমেলে, সেটা নিয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই।'

'তা, গোলমেলে ব্যাপার দেখার জন্য তো পুলিশ আছে। আইএসআই কী করবে?' প্রৌঢ়ের চোখে একটা মজা পাওয়া ঝিলিক।

'আপনি যদি পুরোটা শুনে বলেন যে এটা আইএসআই-এর মাথা ঘামানোর জিনিস নয়, তাহলে তাই।'

'ঠিক তো? আপনি বা দিলদার আমাকে আবার ফরামোশ ভাববেন না তো?'

'তওবা তওবা।' দিলদারভাই জিভ কেটে মাথা নাড়িয়ে ওঠেন প্রাণপণে। 'বেশ, তবে বলুন, কী বলবেন।' সামনে রাখা নীচু টেবিলের ওপর থেকে পানের ডিবে তুলে নিয়ে পান বের করে মুখে দিতে দিতে বললেন সাদিক।

'আপনার হয়তো কানে এসে থাকবে জনাব, গতকাল সকালে চানেসার হল্টে একটি খুন হয়ে গেছে।'

'হুম, কানে এসেছে বটে এরকম একটা কথা। বাট, এই রিজিয়নে খুন-টুন তো আকছার লেগেই আছে, তাই না?'

'তা ঠিকই জনাব! লোকাল ক্রাইম, গ্যাং ফাইট লেগেই আছে এখানে। সেসব আমাদের গায়ে লাগে না অতটা। তবে এই কেসটায় শুরু থেকেই আমার গণ্ডগোল লাগছে। মনে হচ্ছে এটা কোনো গ্যাং ফাইটের রেজাল্ট নয়।'

'কেন মনে হচ্ছে এমন?'

'অনেকগুলো কারণ আছে জনাব। এক এক করে বলি। প্রথমত, লাশের মুখটা কোনো ভারী জিনিস দিয়ে থেঁতলে নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। নর্মালি মাথায় ভারী জিনিস দিয়ে আঘাত করে মারতে হলে আমরা পেছন দিক থেকে মারি। এক্ষেত্রে সামনের দিক

থেকে মারা হয়েছে। যেরকম ভারী জিনিস দিয়ে মারলে ফ্রন্টাল লোব ওরকম গুঁড়িয়ে যেতে পারে, তা চাগিয়ে তুলে এইরকম চেহারার একটা লোককে মারতে যাবার আগে হয় লোকটাকে বেঁধে ফেলতে হবে না হলে যে মারছে তাকে ক্রেনের মতো শক্তিশালী হতে হবে। অথবা আর একটা সম্ভাবনা থেকে যায় যে, আগে মেরে ফেলে তারপর ভারী জিনিস, পাথর ইত্যাদি দিয়ে মুখের সামনেটা গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। দাঁতসমেত, যাতে ডেন্টাল আইডেন্টিফিকেশনও সম্ভব না। একটু চেষ্টা করেই দেখলাম পেরিয়েটালে আটকে আছে গুলি। হেড শট। ফ্যাটাল। যদিও পোস্ট-মর্টেম হয়নি এখনও, তবু এটুক বোঝাই যাচ্ছে যে কজ অফ ডেথ ওই গুলিই। তাহলে মুখটা গুঁড়িয়ে দেওয়া হল কেন? নিশ্চিতভাবেই আইডেন্টিটি লুকিয়ে ফেলার জন্য।'

'অবভিয়াস।'

'রাইট। কিন্তু আবার গভীরে ঢুকে দেখলে সন্দেহ হয়, ততটা অবভিয়াস কি? যদি কারও আইডেন্টিটি নষ্ট করে দিতে হয়, তাহলে এত কিছুর পরেও তার পকেটে সিএনআইসি কার্ড কী করছে? যে এত নিখুঁতভাবে পুরো ফেসিয়াল রেকগনিশনের চান্সটাই নিঃশেষ করে দিতে পারে, সে কেন পকেট খুঁজে দেখবে না লাশের কোনো পরিচয়পত্র রয়ে গেল কিনা।'

এবারে সাদিক একটু নড়েচড়ে বসলেন। ইফতিকার সেটা লক্ষ করল। প্রাথমিক লক্ষ্যে সে সফল। সাদিক বললেন, 'কার্ডটা আছে, কাছে?'

পকেট থেকে কার্ডটা বার করে টেবিলে রাখে ইফতিকার। কার্ডটা আলতো করে ডান হাতে তুলে নিতে নিতে সাদিক ইফতিকারকে ইশারা করেন সামনের সোফায় বসার জন্য। এতক্ষণে ইফতিকারের খেয়াল হয় যে সে এবং দিলদারভাই দুজনেই দাঁড়িয়ে ছিল। সে বসতে বসতেই বলা শুরু করে আবার, 'আমি তাই কার্ডটা এনএডিআরএ-তে কাজ করা আমার এক পরিচিত লোককে দিয়ে সার্চ করাই।'

'রেকর্ড পেলেন সেখানে?'

'হ্যাঁ, ডেটাবেসে এন্ট্রি ঠিকই আছে।'

'তাহলে তো মিটেই গেল।'

'না, মিটল না জনাব। মিটে গেলে কি আর আমি আসতাম এখানে?' 'কেন মিটল না?' চোখ সরু করে তাকালেন সাদিক।

'কারণ এই কার্ডটা জাল।'

'কী করে বুঝলেন?'

'কার্ড অনুযায়ী ঠিকানায় গেলে বোঝাই যাবে বলে আমার বিশ্বাস। তবে আমাকে অত দূর যেতে হয়নি। দেখুন, সিএনআইসি নাম্বারের প্রথম পাঁচটি ডিজিট বোঝায় লোকটার ঠিকানা। প্রভিন্স, ডিভিশন, জেলা, তেহশিল, ইউনিয়ন কাউন্সিল...'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা সবাই জানে ইফতিকার সাব। মুদ্দে পে আইয়ে!' একটু অধৈর্য শোনায় সাদিকের গলা।

'জি জনাব। দেখুন, এই কার্ডের প্রথম পাঁচটা নাম্বার হল ৪৭৬১৪। 'তার মানে, সিন্ধ, করাচি। জেলাটা মনে পড়ছে না।'

'জেলা কোরাঙ্গি'

'রাইট, কোরাঙ্গি। কিন্তু এতে কী সমস্যা?'

'জনাব, আপনি নিশ্চয়ই আমাকে পরীক্ষা করছেন। তবু বলি, খেয়াল করে দেখুন, কার্ড ইস্যু হয়েছে এবং ডেটাবেসে রেজিস্টার্ড হয়েছে ২০০৭ সালে। অথচ কোরাঙ্গি ডিস্ট্রিক্ট ফর্ম হয়েছে ২০১৩-তে।'

'শিট। আই মাস্ট বি গেটিং ওল্ড। এটা মাথায় আসেনি। তার মানে আপনি বলছেন কেউ ব্যাক ডেটে গিয়ে ডেটাবেসে এন্ট্রি করেছে, কিন্তু করার সময় এখনকার ডেটা ব্যবহার করেছে। বেসিক মিসটেক, কোনো সন্দেহ নেই। বাট কেন? লোকটাই-বা আসলে কে?'

'সেটা আমি এখনও জানি না। তবে একটা কথা ঠিক। ভুলটা কিন্তু খুবই বেসিক।

এবং সেখানেও একটা প্রশ্ন থেকেই যায়। ভুলটা ইচ্ছাকৃত নাকি অনিচ্ছাকৃত?'

'ইচ্ছাকৃত কেন হবে?'

'আরও একটা পয়েন্ট আছে জনাব। আমি এখানে আসার আগে আমার সোর্সে একটু খবর নিয়েছিলাম। সিএনআইসি কার্ডটাতে যে ছবিটা দেওয়া আছে, সেই লোকটার পরিচয় এখানে অনেকটা আফসানভি! অনেকদিন একে কেউ চোখে দেখেনি। অন্তত লো লেভেল ক্রিমিনালরা শুধু এর নামই শুনেছে। আপনি মাকসুদ কিলভির নাম শুনেছেন, নিশ্চয়ই?

'পাকিস্তানের ল অ্যান্ড এনফোর্সমেন্টের সঙ্গে জড়িত সব্বাই শুনেছে। ড্রাগ লর্ড ছিল।' অনেকক্ষণ কথা না বলতে পারা দিলদার নিজেই এবারে যোগ দেয় এসে, 'একটা সময় আফগানিস্তানের আফিম স্মাগল করে কেরিয়ার শুরু। আস্তে আস্তে ওয়েপন সাপ্লাইয়েও ঢুকতে শুরু করেছিল। সেই সময়ই অদ্ভুতভাবে নিজের বাড়িতে থাকাকালীন গুলিতে খুন হয়। খুনিকে ধরা যায়নি। নিশ্ছিদ্র উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা বাড়ি— অন্তত এক-দেড় কিলোমিটারের মধ্যে কাক-পক্ষীর ঢোকার সুযোগ নেই। সেই জায়গায় কে, কোথা থেকে গুলি করতে পারে, সেটাই এখনও রহস্য বলেই জানি।'

'কেয়া বাত জনাব!' একটু সপ্রশংস দৃষ্টিতেই দিলদারের দিকে তাকান সাদিক।

'শুক্রিয়া দিলদারভাই!' ইফতিকার একটু শুকনো ভদ্রতা দেখিয়েই আবার কথার খেই ধরে, 'রহস্য ঠিকই। কারণ ইসলামাবাদ পুলিশ কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি, তবে কান পাতলে শোনা যায়, এ কাজ এই লোকটিরই।' 'তাই নাকি?' নড়েচড়ে বসে দিলদার। একটু সোজা হয়ে বসেন সাদিকও। 'কী শোনা যায়?'

'শোনা যায়, এই লোকটি নাকি অলিম্পিকে পদক জিততে পারত চাইলে, লং রেঞ্জ শুটিংয়ে। কিন্তু বাই চয়েস সে গান-অন-হায়ার হয়ে দাঁড়ায়! এখন এরকম একটা লোকের মৃত্যু, যদি কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে স্টেজ করতে চায়, তখন আমার কাছে একটাই মানে দাঁড়ায়— হি ইজ অন টু সামথিং বিগ, ভেরি বিগ!!'

'নাম?' একটু অদ্ভুতভাবেই প্রশ্ন করেন সাদিক। কেমন যেন সম্মোহিতের মতো চেয়ে আছেন ইফতিকারের দিকে।

'আসল নামটা জানতে পারিনি এখনও... খোঁজ চালাচ্ছি... বোঝেনই তো জনাব, এই সব ক্ষেত্রে ইনফর্মেশনের চেয়ে গালগল্পই বেশি...'

ইফতিকারের ঠোঁট থেকে কথাটা পুরোপুরি পড়তে পারার আগেই যেন লুফে নিয়ে দিলদার বলে ওঠে, 'আমিও শুনেছিলাম এই লোকটার কথা। মাফ করবেন— কে বলেছিল, বলতে পারব না।' বলেই সাদিকের দিকে একটা অদ্ভুত কায়দা করে চোখ টিপে সে কথাটা শেষ করে, 'যদ্দূর শুনেছিলাম, এর আসল নাম কেউ জানে না। লোকজন নাকি একে ভাইজান বলে ডাকে।'

'...ভাইজান... ভাইজান... তাই হবে হয়তো...' বলতে বলতে ইফতিকারও কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে যেতে থাকল আস্তে আস্তে।

সাদিকের বুক থেকে অনেকক্ষণ চেপে থাকা একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। ইফতিকার নিজের অন্যমনস্কতায় ডুবে থাকায় সেটা খেয়াল করল না। দিলদার হয়তো শুনতে পেল। অন্তত তার মুখের দিকে তাকিয়ে সেরকম কিছু বোঝা গেল না। 'ইন্টারেস্টিং। বলতেই হবে, আপনার অবজার্ভ করার, বাঁধাগতের বাইরে ভাবার ক্ষমতা আছে। অ্যান্ড আই অ্যাপ্রিশিয়েট দ্যাট। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না, এটার জন্য আপনি আইএসআই-এর থেকে কী হেল্প চাইছেন এবং কেন চাইছেন?'

'আমি হয়তো ঠিক স্পষ্ট করে বলতে পারব না। তবে আমার সিক্সথ সেন্স বলছে এটা একটা বড় কিছুর ইঙ্গিত।'

এবার একটু হেসে ফেলেন সাদিক। তারপর বলেন, 'দেখুন ইফতিকার, আপনি দিলদারের ভাই। তাই আমারও দোস্ত। আপনাকে দোস্ত হিসেবেই বলছি – ইঙ্গিতের ওপর ভরসা করে ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি চলে না।'

'কিন্তু জনাব, যদি একটু খতিয়ে দেখা যেত...'

এবারে নিজের সোফা ছেড়ে উঠে পড়েন সাদিক। স্পষ্ট ইশারা, তার সময় শেষ। উঠে দাঁড়িয়ে ইফতিকারকে মাঝপথে থামিয়েই বলেন, 'বেশ তো। আপনার কোতোয়ালির কেস। দেখুন খতিয়ে। যদি কিছু পান, তাহলে আবার না হয় এ নিয়ে কথা বলা যাবে। কেমন?

লম্বা লম্বা পা ফেলে ঘর থেকে বেরিয়ে যান আইএসআই-এর নক্ষত্র। সঙ্গে সঙ্গে অতিথিকে প্রত্যুদগমন করতে এগিয়ে যান দিলদারভাই কথা বলতে বলতে। স্থাণুর মতো ঘরের ভেতর বসে থাকে ইফতিকার।

দিলদারের বাড়ির বাইরে, নিজের অপেক্ষমান গাড়িতে উঠে ইশারায় ড্রাইভারকে গাড়ি চালানোর নির্দেশ দেন সাদিক। তারপর ফোন করেন একটা নম্বরে।

'ইফতিকার... মাহমুদাবাদ কোতোয়ালির ইনস্পেকটর। এই লোকটার সম্বন্ধে যা ইনফর্মেশন আছে, আই নিড ইট অন মাই টেবল অ্যাজ ফাস্ট অ্যাজ পসিবল! পুলিশে জয়েন করার আগে কী করেছে, কোথায় ছিল, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট কোথায় এবং তাতে কত টাকা আছে, কার সঙ্গে শোয়— এমনকী দিনে কত বার নিঃশ্বাস নেয়... আই নিড এভরিথিং!'

ওপাশের উত্তর শোনার অপেক্ষা না করেই ফোন কেটে দিলেন সাদিক। খুটখাট করে টাইপ করে মোবাইল থেকে একটা টেক্সট পাঠালেন। তারপর আর একটা নম্বরে ডায়াল করলেন, 'কী সিচুয়েশন?'

'উই কান্ট ডিলে মাচ! হি ইজ রিচিং দিল্লি ইন আ উইক অর সো!'

"..."

'হ্যাঁ। আমি আসব। ইউ স্টার্ট ইওর প্ল্যান টু পিক আপ দ্য বয়। আমি তোমাকে দু' দিনের মাথায় আবার কল করব। কিছু একটা আনপ্রেডিক্টেড ডিস্টার্ব্যান্স ক্রিয়েট হচ্ছে। আই ডোন্ট লাইক ইট।'

"..."

'ইনশাল্লাহ!'

ওই একই সময়ে আরও একটা ফোন যায় কোনো একটি অজানা নম্বরে,

'আই বিলিভ ভাইজান ইজ কামিং! গেট দ্য মেসেজ অ্যাক্রস...'

সাদিক ইসমাইলের গাড়ির আওয়াজে বাকি কথাটা স্পষ্ট করে শোনা যায় না। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ফোন কেটে, ফোনের সেটটা পায়ের তলায় দিয়ে চেপে ভেঙে ছায়ামূর্তি এগিয়ে যায় দিলদারের বাড়ির দিকেই।

২০ জুলাই, ২০১৮, সকাল বেলা / কোনারক, ওড়িশা, ভারত

সোনালি ঝুরো ঝুরো বালি পায়ের তলায় আলতো আদর দিয়ে যায়। ওপরে আদিগন্ত চেয়ে আছে ঘন নীল রঙের চাঁদোয়া। সূর্যের আলো ঢেউয়ের মাথায় হীরকদ্যুতি জ্বালিয়ে দিচ্ছে। লোনা হাওয়া এলোমেলো করে দিচ্ছে গুছিয়ে রাখা পোশাক, চুল, চিন্তাভাবনা।

আর যতদূর চোখ যায়, নির্জনতা। সমুদ্রের সঙ্গে হাওয়ার দ্বন্দ্বযুদ্ধের একঘেয়ে গর্জনটুকু ছাড়া কোথাও কোনো শব্দ নেই।

কাউকে চোখ বেঁধে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দিলে সে মনে করবে সে নির্ঘাত ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জে বা হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে চলে এসেছে। নিদেনপক্ষে আন্দামান। তারপর তার চোখ যাবে একটু দূরে একটা জং ধরে যাওয়া টিনের সাইনবোর্ডে প্রায় মুছে যাওয়া হরফে লেখাটার দিকে, 'চন্দ্রভাগা বিচ'!

অবিশ্বাস্য লাগবে। মূল ভারত ভূখণ্ডে এরকম সমুদ্রসৈকত আছে? এত পরিচ্ছন্ন! এত নির্জন!! এখনও কি কোলাহলপ্রিয় ভ্রমণবিলাসীরা এর সন্ধান পায়নি?

সেরকম তো হওয়ার কথা নয়। ভুবনেশ্বর থেকে যে আন্তর্জাতিক মানের রাস্তা চলে গেছে পুরীর দিকে, তারই মাঝামাঝি, কোনারকের সূর্যমন্দিরের অনতিদূরেই এই চন্দ্রভাগা বিচ। পাশ দিয়ে কালো মসৃণ ফিতের মতো চলে গেছে রিং রোড। আঙুলে জড়ানো মোলায়েম আংটির মতো। তার মাথায় মোহময়ী নীলার মতো ঝকঝক করছে একখণ্ড নির্জন সমুদ্র। এ জায়গা তো পর্যটকদের নজর এড়িয়ে যাওয়ার কথা নয়।

আসলে চন্দ্রভাগা বিচে লোকের ভিড় না হওয়ার কারণ তার অপরিচিতি নয়। তার অব্যবহার্যতা। এই বিচে স্নান করা যায় না। বিপজ্জনক। সমুদ্রের কোলে কিছুটা যাওয়ার পরই মাটি হঠাৎ নেমে গেছে নীচের দিকে, তীব্র ঢালে। ফলে সমুদ্র হঠাৎ করেই গভীর হয়ে গেছে।

কর্তৃপক্ষ দু' কিলোমিটার দীর্ঘ এই বিচের এক নিরালা প্রান্তে একটি প্রায় অদৃশ্য নোটিস লটকে নিজের দায় মিটিয়েছেন। বারমুডা-নাইটি শোভিত বাঙালি পর্যটককুল নিজেদের সমুদ্রস্নানের শখ মেটাতে ভিড় জমিয়েছেন ইতিমধ্যেই জনাকীর্ণ সেই পুরীর সৈকতেই।

কেবল কিছু নির্জনতা পিয়াসী মানুষ, কিছু বিদেশি সার্ফার – ইতিউতি ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকেন।

তাই বালির ওপর একটি সুদৃশ্য মাদুর পেতে শুয়ে থাকা এই অদ্ভুত যুগলটির দিকে কারও চোখ পড়ছে না চট করে। আশেপাশে কেউ নেই তো কারই-বা চোখ পড়বে?

চোখ পড়লে অবিশ্যি চোখ ফেরানো মুশকিল হত। বাদামি মসৃণ চামড়ার ওপর দিয়ে রোদ পিছলে পিছলে যাচ্ছে। পেশল শরীরে চাপা বিদ্যুৎ-তরঙ্গের মতো খেলে যাচ্ছে স্বাস্থ্য, শক্তি ও তৎপরতার প্রবাহ। দুজনেরই।

হঠাৎ দেখলে মনে হবে একই ছাঁচে তৈরি করা দুটি ব্রোঞ্জের মূর্তি। তারপর তাদের মুখের দিকে চোখ পড়লে বোঝা যাবে, তা নয়।

আধশোয়া হয়ে একটি বই পড়ছে যে মানুষটি সে নিঃসন্দেহে তরুণ। তরতরে তাজা তার মুখখানি। ছোট করে ছাঁটা চুল। চাপা ঠোঁট। বাদামি চোখ। ধারালো চোয়াল, চিবুক আর নাক। মুখের চামড়া টান টান। জীবনের দাগ পড়েনি এখনও সেই নবীন মুখটিতে।

তার পাশেই যে মানুষটি, তার চিৎপাত হয়ে শুয়ে থাকা শরীরটির ওপর যে মুখটি বসানো, সেটি একটি প্রাজ্ঞ সিংহের মতো। বয়স হয়েছে। তামাটে মুখের ওপর সাদা গুঁড়ো

গুঁড়ো নুনের মতো দাড়ি লেগে রয়েছে। কাকের পায়ের ছাপের মতো দাগে-ভরতি মুখটি জঙ্গলের লড়াই দেখে দেখে যেন ক্লান্ত। আপনি যে নতুনতর অভিজ্ঞতার কথাই শোনাতে যান না কেন, অনিবার্যভাবে হয়তো আবিষ্কার করবেন— হি হ্যাজ বিন দেয়ার অ্যান্ড ডান দ্যাট টু!

ঢেউয়ের নৈঃশব্দ্য ছাপিয়ে তরুণটির গলা শোনা গেল, "তুমি তো চাইলেই বারণ করে দিতে পারতে? পারতে না?'

'নাহ! আমাদের দুনিয়া অনেকটা বাঘের পিঠে চড়ার মতো। নামার উপায় নেই। তোমাকে তো আগেও বলেছি।'

'কাম অন! শাহজাদা না চাইলে, কে তাকে ট্র্যাক করতে পারে? গেয়ারা মুলকো কি অফসর যিসকো ঢুন্ড রহে হ্যায়...'

দুজনেই সামান্য শব্দ করে হেসে ওঠে। প্রৌঢ় মানুষটি কিছুক্ষণ অপলকে চেয়ে থাকে তার তরুণ সঙ্গীটির দিকে। তারপর বলে, 'সরকার না চাইলে, কেউ, কোনো মানুষ নিখোঁজ থাকতে পারে না, ডার্লিং! আমি যদি এতই ধরাছোঁয়ার বাইরের মানুষ ছিলাম, তাহলে এরা আমাকে খুঁজে বের করল কী করে?'

'বিকজ অফ মি......

চুক চুক করে একটা আওয়াজ করে ঘাড় নাড়েন প্রৌঢ়।

'ভুল। তুমি না থাকলেও আমাকে খুঁজে বের করতে ওদের সমস্যা হত না। প্রয়োজনে মেরে ফেলতেও... "

'তাহলে, এই যে এতদিন এত কাজ করলে, এত এত মিশন, এত ঘাম-রক্ত ঝরানো, এর কি কোনো দাম নেই?'

'আছে তো। আফটার অল, আই অ্যাম প্রফেশনাল! এতদিনকার কাজের দামই তো হচ্ছে, আমাকে আমার মতো বাঁচতে দেওয়া...' একটু থেমে, মুখের মুচকি হাসিটুকু মিলিয়ে যেতে না দিয়েই কথাটা শেষ করে '...যতদিন না তাদের আবার প্রয়োজন পড়ছে।'

'তার মানে বেসিক্যালি তুমি গভর্নমেন্টের হাতের পুতুল?' ছোকরার কথায় কি একটু শ্লেষের সুর মিশে গেল? পাত্তা না দিয়ে তার সঙ্গী বলল, 'আর্নট উই অল?' ছোট্ট কথা। কিন্তু ওজন এত বেশি, যে এই দামাল হাওয়াও তাকে একচুল নড়াতে পারল না। দুটি মানুষের মাঝেই সেই কথাটি বসে রইল কিছুক্ষণ, প্রাচীর হয়ে; অন্য কথাগুলিকে আটকে দিয়ে। তারপর ছেলেটি বলল, 'তাহলে প্ল্যান কী?' 'ইউ গেট দ্য বয় অ্যান্ড রিপ্লেস দ্য বডিগার্ড।'

'অ্যান্ড ইউ?'

চোখের তারায় একটা রহস্যময় ঝিলিক খেলে গেল। লোকটি শুধু বলল, 'উইল মিট ইউ হোয়েন দিস ইজ ওভার!'

সমুদ্রের ফেনিল জলের ওপর কিছু পাখি উড়ে বেড়াচ্ছে। ছেলেটি কিছুক্ষণ

সেদিকে অন্যমনস্কভাবে তাকিয়ে থাকতে থাকতে, হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, 'সো, আই অ্যাম দ্য ডিকয়?'

'আর্নট উই অল?'

পঞ্চদশ অধ্যায়
।।দ্য কিংস ইন্ডিয়ান ডিফেন্স।।

।। ১৫.১।।
।। দ্য সুইচ।।

২৫ জুলাই, ২০১৮, গভীর রাত / ধাড়সা, পঃ বঙ্গ, ভারত

'আমি মুতব বাঁড়া! আমাকে নিয়ে চ' ওই ঝোপের ধারে!'

জড়িয়ে জড়িয়ে কথাটা বলে উঠল অভিজাত। নেশার ধুনকিতে কিছু স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে না সে। দেখলেও বুঝতে পারছে না, কী দেখছে। কেবল খেয়াল আছে তার বডিগার্ড, তার ডার্লিং, তাকে জড়িয়ে ধরে নামিয়েছিল গাড়ি থেকে। জায়গাটায় প্রচুর গাছপালা। ঠিক নিজের বাড়ি বলে মনে হয়নি অভিজাতর। আবার হতেও পারে। বাড়ির আশেপাশেও এরকম গাছে গাছে জঙ্গল হয়ে আছে। জঙ্গল দেখেই ওর হঠাৎ তলপেটটা টনটন করে উঠল। অনেকক্ষণ পেচ্ছাপ করা হয়নি। কিন্তু বলার পরেও তাকে ঝোপের ধারে নিয়ে যাচ্ছে না কেন ছেলেটা? আচ্ছা বেয়াদপ তো! জড়ানো বিকৃত গলায় এবারে একটু চিৎকার করে উঠল অভিজাত, 'কী হল কী বাঁড়া! কথা কানে যাচ্ছে না? আমি কিন্তু এইখানে ছ্যাড় ছ্যাড় করে মুতে দেব। কখন থেকে বলছি, আমাকে ওই ঝোপের কাছে নিয়ে চ'। কানে কী গুঁজে রেখেছিস বোকাচোদা?'

অভিজাতর শরীরটা সামলে ধরে থাকা ছায়ামূর্তি নিঃশব্দে এক বার পেছন ফিরে তাকাল। এলাকাটা এত রাত্রে যদিও শুনশান, কিন্তু এই ছেলেটা এমন চেঁচাচ্ছে যে কখন কে কোথা থেকে বেরিয়ে আসে, বলা যায় না।

যদিও অভিজাত ডিসপেনসিবল। কিন্তু এক্ষুনি নয়। এই মুহূর্তে নয়। পেছন থেকে আরও অন্ধকারে মিশে থাকা মানুষটি নিঃশব্দ ইশারায় জানাল বাঁ-দিকে ঝোপের ধারে নিয়ে যেতে।

ঝোপের ধারে এগিয়ে নিয়ে যেতে-না-যেতেই অভিজাত ইতরের মতো প্যান্টের চেন খুলে অভদ্রের মতো পেচ্ছাপ করতে শুরু করে দিল। এতক্ষণ ওকে ধরে থাকা মানুষটি প্রফেশনাল। বহু অসাধারণ পরিস্থিতিতেও তার বরফ শীতল অনায়াস দক্ষতার জন্যই তার কদর এই ছায়াময় জগতে। কিন্তু সেই দক্ষতা নার্সিং-এর দক্ষতা নয়। কোনো সজ্ঞান, সুস্থ মানুষকে ধরে পেচ্ছাপ করানো তার ট্রেনিং-এর অংশ ছিল না। অস্বস্তিবশতই সে একটু সরে দাঁড়াল অভিজাতকে ছেড়ে।

প্রায় ত্রিশ-চল্লিশ সেকেন্ড ধরে পেচ্ছাপ করার পরে কোনোমতে প্যান্টের চেনটা আটকাতে পারল অভিজাত। চোখটা আঠায় জড়িয়ে আসছে যেন। কোনোমতে শুয়ে পড়তে পারলে হয়। ভাবতে ভাবতে পেছন ফিরতে যেতেই হুড়মুড় করে হুমড়ি খেয়ে পড়ল সে। একটু সরে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটি বিদ্যুতের ক্ষিপ্রতায় এসে তাকে ধরে ফেলল মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ার আগেই। দ্বিতীয় ছায়ামূর্তি চাপা স্বরে জিজ্ঞেস করল, 'কী হল?'

'পড়ে যাচ্ছিল। আটকে দিয়েছি।'

'হারামজাদাকে অন্তত একটু চুপ করিয়ে রাখা যায় না? ঝামেলা হতে পারে, এরকম বকবক করে গেলে...'

অভিজাতর নেশায় ধোঁয়াচ্ছন্ন মাথাতেও একটু চমক লাগল। দুটো গলার একটাও তো চেনা লাগছে না। সে তো এতক্ষণ ভাবছিল যে এরা তার ড্রাইভার আর বডিগার্ড। কিন্তু দুটো গলার একটাও তো তার চেনা লাগল না। আর 'চুপ করিয়ে রাখা' মানে? সে অখিলেশ রায়ের ছেলে। গোটা রাজ্যের নাম্বার টু ভিআইপি। নোবডি ক্যান শাট হিম আপ!। নেশাগ্রস্ত শরীরটা সটান করে সে বলে উঠল, 'কে বে আমাকে চু...'

মুখের কথাটা তার সম্পূর্ণ হল না। এতক্ষণ তাকে পরম যত্নে ধরে থাকা বডিগার্ডের ডান হাতটা নিঃশব্দে অথচ অত্যন্ত দ্রুততায় বাতাস কেটে নেমে এসে ল্যান্ড করল তার কণ্ঠার হাড়ের খাঁজটাতে। ছুরির মতো ধারালো হাতটা কেটে বসতেই অসহায় লতানে গাছের মতো লুটিয়ে পড়ল অভিজাতর শরীরটা বডিগার্ডটি এতক্ষণে মুখ খুলল, 'অলরেডি দেরি হয়ে গেছে। এবারে আমাকে যেতে হবে।' ।

'এত তাড়া কীসের? যাবেটা কোথায়?'

'ইউ আর নট সাপোজড টু নো দ্যাট!' চট করে জবাব দেয় প্রথম জন।

'ওকে! ওকে! আহা, চটো কেন? ভালো কথা, এ তো একটা লোক। আরেকটা বাইরে। আরেক জন কোথায়?'

'তোমাকে মাথা ঘামাতে হবে না। ইট হ্যাজ বিন হ্যান্ডলড!'

'আমাকে বলা হয়েছিল ছেলে, তার বডিগার্ড আর ড্রাইভার—তিন জনকেই সরাতে হবে। ড্রাইভারের ব্যাপারটা আনফরচুনেট। কিন্তু...' দ্বিতীয় ছায়ামূর্তির জেদি গলাটা মাঝপথেই থামিয়ে প্রথম জন বলে, 'দ্যাট ওয়াজ নট আনফরচুনেট। ওটাকে ব্লান্ডার বলে। আর সেই জন্যই তোমার দায়িত্ব কমিয়ে দেওয়া হল। এখন তুমি জাস্ট একে সরিয়ে নিয়ে যাবে। আমি পরে ফোন করে বলে দেব, কোথায় কখন একে ছেড়ে দিতে হবে।'

'ছেড়ে দিতে হবে? মারতে হবে না?' আশ্চর্য হয়ে যায় দ্বিতীয় ছায়ামূর্তি। লোকটা বলে কী?

'হ্যাঁ! ছেড়ে দিতে হবে। হেভি ইনজুরি চাই। বাট কোনোভাবেই যেন না মারা যায়... মাইন্ড ইউ!'

'তোমার হুকুম মানতে আমি বাধ্য নই। আমার সঙ্গে শাহজাদার কথা হয়েছে। আমি তার সঙ্গেই কথা বলব।'

'বেশ, তাই বলো।'

দ্বিতীয় ছায়ামূর্তি নিজের পকেট থেকে একটা খুদে ফোন বের করে, অভ্যস্ত হাতে আধো অন্ধকারেও একটা নম্বর ডায়াল করে। সঙ্গে সঙ্গেই একটা গোঁ গোঁ আওয়াজ আসতে থাকে কানে। চমকে ইতিউতি তাকায় সে। প্রথমেই ভাবে লোকটার হয়তো জ্ঞান ফিরছে। তারপরই সে বুঝতে পারে, আওয়াজটা ভাইব্রেটিং মোডে থাকা একটা মোবাইলের।

প্রথম জনের হাতে তখন পকেট থেকে বেরিয়ে আসা একটি মোবাইল যাতে কল আসছে। থেকে থেকে কেঁপে কেঁপে উঠছে মোবাইলটা। আর ডিসপ্লে স্ক্রিন থেকে ভেসে আসছে হালকা নীলাভ আলো।

হতভম্ব ভাবটা কাটতে বেশ কিছুক্ষণ সময় লাগল দ্বিতীয় জনের। কোনোমতে নিজেকে সামলে নিয়ে সে অস্ফুটে বলে উঠল, 'শাহ...'

কথা শেষ না করতে দিয়েই মৃদু মাথা নেড়ে প্রথম ছায়ামূর্তি খালি বলে উঠল, 'স্করপিওটা নিয়ে বেরিয়ে যাও। ডাম্প করে দেবে এমন কোথাও যাতে ট্রেস না করা যায় তোমাদের।'

'আপনার সঙ্গে কি একটা ছেলে দেব? ভালো ছেলে। কাজের। মুখ বন্ধ রাখতে পারে।'

'নাহ। আমি একাই যাব এখান থেকে। তোমাকে ফোন করলে, তবেই একে ডিসপোজ করবে। তার আগে নয়।' কথাটা বলতে বলতেই হাত বাড়াল লোকটা।

'সরি শাহজাদা!, ভুলেই যাচ্ছিলাম।' জিভ কেটে, তড়িঘড়ি কাঁধে ঝোলানো ব্যাগে হাত ঢোকায় দ্বিতীয় জন। ব্যাগের ভেতর থেকে হাতে উঠে আসে একটা মাঝারি সাইজের প্যাকেট। সেটা ছায়ামূর্তির বাড়ানো হাতের দিকে এগিয়ে দিতে দিতে সে যোগ করে, 'আই কার্ডস, স্পেশাল পাস, পাসপোর্ট— যা যা বলেছিলেন, সব আছে।'

‘অথেন্টিক তো?’

‘আমার বেস্ট লোককে দিয়ে করানো। আজ পর্যন্ত ঠকিনি।'

‘আজ পর্যন্ত এত বড় কাজও কি করিয়েছ?’

‘না, সেটা ঠিক।’ মাথা নীচু করে হালকা ভর্ৎসনা মেনে নেয় সে।

প্রথম জন দ্রুত হাতে প্যাকেট খুলে তার ভেতরকার জিনিসপত্র চেক করে নেয়। অন্ধকারে খুব খুঁটিয়ে চেক করা সম্ভব নয়। তবে যার ওপর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল সেও প্রফেশনাল। সেরকম ভরসা না থাকলে কাজের ভার দিত না সে।

ড্রাইভারটা হঠাৎ জ্ঞান ফিরে পেয়ে পালানোর চেষ্টা না করলে এত তাড়াতাড়ি মরত না। ফালতু ঝামেলা বাড়ল একটু হলেও। খেয়াল পড়তেই মাথা তুলে সে বলে, ‘ডেডবডিটা বাইরের ঝোপে ফেলে রেখো। কিপ ইট ক্লিন অফ ফিঙ্গারপ্রিন্টস।'

‘ভাই, এই চুতিয়াটার হাতের প্রিন্ট দিয়ে একটা ফাঁকা রিভলবার ফেলে রাখি বডির পাশে?

এত টেনশনেও এবারে একটু হাসি দেখা যায় মুকুটহীন শাহজাদার ঠোঁটে। ‘বড্ড বেশি ফিল্ম দেখছ মনে হচ্ছে আজকাল? পুলিশ কি শুধু প্রিন্টস নেবে? ব্যালিস্টিক রিপোর্ট চেক করবে না? ফাঁকা কার্তুজটা খুঁজবে না? ভাববে না যে গুলি করল সে হাতের ছাপওয়ালা পিস্তল ফেলে চলে গেল কেন? ভাববে না সে পিস্তল পেল কোথা থেকে এবং কবে? ইডিয়টের মতো বুদ্ধি নিয়ে কী করে সারভাইভ করবে? বেশি ভেব না। বড়ি যেমন আছে, তেমনটি— কেবল বাইরে ফেলে রেখে বেরিয়ে যাও।'

‘জি ভাইজান। আর এই আশ্রমের লোকগুলোর কী করব?’

এখন সব তালাবন্ধ পড়ে আছে তো?

‘হ্যাঁ। তিন জনই।’

‘তোমাদের কাউকে দেখেনি, তাই তো?’

‘না। শুধু এখানকার যে ছেলেটাকে দলে নিয়েছি, তাকে দেখেছে।'

‘গুড। তাহলে ওদের ছেড়ে দিও। অকারণ ভায়োলেন্স আমি পছন্দ করি না। চলো, আমি গেলাম। খুদা হাফিজ!’

এই আশ্রমের তিন পাশেই জলা আর জংলা এলাকা। বাউন্ডারি ওয়ালটিও নামেই সীমানা আগলাচ্ছে। বেশিরভাগ জায়গাতেই তা ভেঙে পড়েছে। যেখানে মোটামুটি গোটা রয়েছে— সেখানেও খুব বেশি হলে ফুট চারেক উঁচু। গভীরতর হতে চলা রাতের কুয়াশায় সেই তিন দিকেরই কোনো এক দিকে মিলিয়ে গেল ছায়া শরীর।

কিছুক্ষণ সেদিকে ঘোর লাগা চোখে তাকিয়ে থেকে দ্বিতীয় ছায়ামূর্তি ফোনটা আবার কানে তুলল, ‘কাহাঁ গ্যয়া বে, বেটিচো... ইসকো গাড়ি মে উঠায়েগা কৌন, ভোসড়িওয়ালে!'

ফোন রেখে লোকটি অভিজাতর শুয়ে থাকা শরীরের দু’ বগলের নীচে হাত গলিয়ে ছেঁচড়ে নিয়ে যেতে থাকল গেটের দিকে। যতটা এগিয়ে রাখা যায়।

একটু ডান দিক ঘেঁষে একটা পোড়ো ঘর। কেউ ব্যবহার করে বলে মনে হয় না। কোনো সময় বানানো শুরু হয়েছিল। হয়তো লোকজন ভেবেছিল আশ্রম কালে কালে বড় হবে। স্পষ্টতই তা হয়নি। গাঁথনি তুলে ছাদ ঢালাই অবধি করে রাখা আছে একটা ঘরের কঙ্কাল।

বেশ ভারী শরীরটা টেনে নিয়ে যাবার পরিশ্রমে আর শরীর ঘষটে নিয়ে যাওয়ার খসখসে আওয়াজে সে খেয়াল করল না আরও একটা অস্পষ্ট খসখসে আওয়াজ কয়েক মুহূর্তের জন্য ভেসে উঠেই মিলিয়ে গেল। ওই পোড়ো ঘরের দিকেই কোথাও।

২৬ জুলাই, ২০১৮, রাত / ধাড়সা, পঃ বঙ্গ, ভারত

একটা লাল-নীল আলো কোথাও জ্বলছে-নিভছে। নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে তার আলোয় সামনের ফুটপাথের অংশটুকু এক বার আলোকিত আর আবার এক বার অন্ধকার হয়ে উঠছে।

মোনালিসা একটা ঘোর লাগা চোখে তাকিয়ে ছিল সেদিকে। কতক্ষণ, সে খেয়াল তার নেই। মাঝে দু' বার সায়ন তাকে ভাঁড়ের চা হাতে ধরিয়ে দিয়ে গেছে। একবার কিছু খাবার জন্য পীড়াপীড়ি করছিল। মোনালিসা খেতে পারেনি কিছু। মাকে ফোন করে সায়নই খবর দিয়েছে যে তাদের ফিরতে দেরি হবে। আর এই পুরো সময়টা মোনালিসা থম মেরে বসে আছে একইভাবে।

ছোট থেকে মোনালিসাকে তার বাবা এমনভাবেই মানুষ করেছিলেন যে সে কখনো নিজেকে মেয়ে বলে আলাদা ভাবেনি। সে মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে এসেছে যে একটা ছেলে যা যা করতে পারে, সে একটা মেয়ে হয়েও তা-ই করতে পারে। সমাজে মেয়েদের ক্ষমতা সম্বন্ধে মানুষের মনে হাজার একখানা প্রেজুডিস সেসবের অধিকাংশই শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে আচরণের মধ্যে এমনভাবে গভীরে শিকড় গেড়ে বসেছে যে সেগুলোর যৌক্তিকতা, প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে অধিকাংশ মানুষই ভাবে না। মোনালিসা সারাজীবন ধরে এই ধরনের মানসিকতার বিরুদ্ধে লড়ে এসেছে। কখনো একমুহূর্তের জন্যেও তার নিজেকে দুর্বল মনে হয়নি।

যখন সে সাংবাদিকতায় এসে ক্রাইম বিটে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল, বন্ধুবান্ধব মহলে অনেকেই ট্যারা চোখে তাকিয়েছিল। এমনকী নিখিলও এমন কিছু কথা বলেছিল যাতে মোনালিসার মনে তাদের সম্পর্কের ভবিষ্যৎ নিয়েই তীব্র খটকা তৈরি হয়েছিল একটা। তাদের সেই বাচ্চাবেলার সম্পর্ক। কিন্তু নিখিলের কথার মধ্যে সেই গুমো গন্ধওয়ালা বস্তাপচা পিতৃতান্ত্রিক বিশ্বাসের ঝলক দেখে মোনালিসা আশঙ্কিত হয়েছিল। এতটাই, যে নিখিলকে বারণ করেছিল ফেসবুকে 'ইন এ রিলেশনশিপ' স্টেটাস দিতেও। যদিও তাকে আসল কারণটা বলেনি। গোপনীয়তা রাখার ভুজুং ভাজাং দিয়েছিল। নিজেকে সমান দেখার, সমান ভাবার গুরুত্ব তার কাছে এতটাই যে পুরোনো সম্পর্কের বাঁধন আলগা করতেও সে দ্বিধাবোধ করেনি।

কিন্তু আজকে যেন কেমন দুর্বল লাগছে। মোনালিসা বুঝতে পারছে নিজেকে সাহসী ভাবা আর প্রকৃত ভয়ের আবহে সেই সাহস দেখানো— দুটো সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার। এর আগে সে কখনো খুন হওয়া লাশ দেখেনি।

আজ এই ঘণ্টা দুয়েক আগে যখন সায়নের পায়ের কাছে পড়ে থাকা মৃতদেহটির দিকে তার প্রথম চোখ পড়ে, তখন মোনালিসা প্রথম বুঝতে পারে যে সে এই অভিজ্ঞতার জন্য একেবারেই প্রস্তুত নয়। তার পায়ের তলার মাটি যেন সমুদ্রের ঢেউয়ে সরে যাওয়া বালির মতো মনে হয়। হয়তো পড়েই যেত, কিন্তু মনের অবশিষ্ট জোরটুকু সম্বল করে কোনোরকমে সেই ঝোপঝাড় থেকে বেরিয়ে টলতে টলতে সে ফিরে আসে রাস্তায়। তারপর ওইভাবেই প্রায় একশো মিটার হেঁটে মূল রাস্তার মোড়ের কাছে এসে এই রোয়াকটাতে বসে পড়ে, যেখানে এখন সে বসে আছে। সায়ন পেছনে পেছনে আসতে আসতে উদ্বিগ্ন গলায় কীসব বলছিল। আওয়াজ কানে এলেও মোনালিসার মস্তিষ্ক সেই আওয়াজগুলোর মর্মোদ্ধার করতে সক্ষম ছিল না।

তখন থেকে যাবতীয় ঝক্কি সায়নই সামলেছে। লোকাল থানায় ফোন করেছে। বিজনদাকে ফোন করেছে। নিজের আর মোনালিসার বাড়িতে খবর দিয়েছে যতটা সম্ভব

রেখে-ঢেকে। লোকাল পুলিশ এবং তার পরে ক্রাইম ব্রাঞ্চের প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদের ধকলও সে একাই সামলেছে। এমনকী সময়ে সময়ে মোনালিসারও খেয়াল রেখেছে। তাকে জল, চা এগিয়ে দিয়েছে। মোনালিসা নিজে এমনই এক ঘোরের মধ্যে ছিল যে সে বদলে 'থ্যাংক ইউ'টুকুও বলে উঠতে পারেনি।

ইতিমধ্যে স্বয়ং পরীক্ষিৎ দাশগুপ্ত এসে হাজির। পরীক্ষিৎ যে সিএম-এর ওপর হামলার ইনভেস্টিগেশনের দায়িত্ব নিয়েছেন সেটা দেবদা রাত্রে প্রথম জানিয়েছিল। এইটুকু সময়ে কত কী ঘটে গেল। দেবদার খবর পাওয়া গেল না এখনও!!

কথাটা মাথায় আসতে এক ঝটকায় সংবিৎ ফিরে পেল মোনালিসা। দেবদীপ্তর খবর পাওয়া যায়নি এখনও। আর এদিকে, লাশ পাওয়া গেছে এমন একটা জায়গা থেকে যেখানে দেবদীপ্তকে শেষ বার আসতে দেখা গেছে। তাহলে কি...

তড়াক করে উঠে পড়ে সে। অনেকক্ষণ ড্যামসেল ইন ডিস্ট্রেস হয়ে বসে থেকেছে। আর সহ্য করা যাবে না।

অকুস্থলের দিকে কয়েক পা এগিয়ে যেতেই দেখতে পেল এক জায়গায় জটলা করে দাঁড়িয়ে আছেন পরীক্ষিৎ, বিজন আর সায়ন। তাকে এগিয়ে আসতে দেখে বিজনদাই প্রথম কথা বলে উঠলেন, 'এই যে মোনালিসা! এসো। এখন কেমন লাগছে?'

'আমি ঠিক আছি বিজনদা। আয়াম সো সরি! কীরকম একটা হয়ে গেল, মানে আসলে এইভাবে কোনোদিন চোখের সামনে কিছু দেখিনি তো!' একটু অস্বস্তির হাসি মুখে মেখে বলে মোনালিসা।

পরীক্ষিৎ এবার কথা বলে উঠলেন। হাত নেড়ে ব্যাপারটাকে হালকা করে দিয়ে বললেন, 'প্রথম বার সবার ওরকম হয়, ম্যাডাম। ওতে অত লজ্জা পাওয়ার কিছু ঘটেনি। আমি তো আমার লাইফের প্রথম মার্ডার দেখে বমি-টমি করে একশা করেছিলাম। আপনি বরং সে তুলনায় বেশ শক্ত মনের মানুষ।'

মোনালিসা এবারে ভালো করে তাকায় তার দিকে। গায়ের রং কালোর দিকে। শক্ত, চওড়া ধরনের গড়ন। মাঝারি হাইট। হালকা ভুঁড়ির আভাস দেখা যাচ্ছে ইউনিফর্মের তলায়। কাঠখোট্টা ধরনের মুখটা। ছড়ানো চৌকো চোয়াল আর ভাবলেশহীন এক জোড়া চোখ মুখটাকে একটা আপাত কাঠিন্য এনে দিয়েছে। নিতান্তই কেজো পুরুষের গঠন। বলে না দিলে আন্দাজ করা শক্ত যে এই মানুষটিকে ক্রাইম ব্রাঞ্চ মাথার মণির মতো দেখে। ভদ্রলোক ইতিমধ্যে দু' পা এগিয়ে মোনালিসার একদম সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। ওর দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'আমি পরীক্ষিৎ দাশগুপ্ত। ইনস্পেকটর, কলকাতা পুলিশ, ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্ট।'

'আমি আপনাকে চিনি স্যর!'

'সে কী! কী করে চিনলেন? আমার তো মনে পড়ে না আমাদের দেখা হয়েছে বলে।'

'না, দেখা সে অর্থে হয়নি। তবে ক্রাইম বিটে কাজ করা কোনো সাংবাদিক আপনাকে না চিনলে তো তার এই পেশায় আসাই উচিত নয়।'

'তাই নাকি? তা বিজনবাবু, আপনাদের সাংবাদিকতার কোর্সে আমার নামের চ্যাপ্টারটা কোন পেজে আছে?' মুখে আলতো হাসি নিয়েই বিজনের দিকে ফিরে শুধোলেন ইনস্পেকটর।

বিজনও তার রসিকতায় তাল মিলিয়ে বললেন, 'পেজ থ্রি, মিঃ দাশগুপ্ত! ফর আ চেঞ্জ, গল্ফগ্রিনের কোনো ফ্ল্যাটের ধ্যানতানাতাঙ পার্টির চেয়ে বেশি জরুরি খবর ছাপা হোক না হয় ওই কুখ্যাত পাতাটিতে।'

দুজনেই একসঙ্গে হো-হো করে হেসে উঠলেন। সায়ন আর মোনালিসা চুপ করেই থাকে। এটা বোধহয় আগের প্রজন্মের রসিকতা। তাই ওদের বিশেষ হাসি পায় না। তারপর হঠাৎ হাসি থামিয়েই ইনস্পেকটর দাশগুপ্ত বলে ওঠেন, 'মোনালিসা, তুমি এখানে কী জন্য এসেছিলে?'

প্রশ্নের আকস্মিকতায় একটু ঘাবড়ে গিয়ে মোনালিসা আমতা আমতা করে বিজনের দিকে তাকায়। বিজন তখন মুখ নীচু করে সিগারেটে আগুন দিচ্ছিলেন, তাই মোনালিসার চাউনি দেখতে পান না। কিন্তু পরীক্ষিৎ সোজা ওর দিকেই তাকিয়েছিলেন। তাই তাঁর নজর এড়ায় না। গম্ভীর গলায় তিনি বলেন, 'এখানে অন্য কারও থেকে তুমি হেল্প পাবে না মোনালিসা। একটা ক্রাইম সিনে তুমি আর তোমার সঙ্গী প্রথম পৌঁছেছ। স্টেটমেন্ট তোমাদেরই দিতে হবে। আর সেখানে কিছুই লুকোনো চলবে না। কেন এসেছ, কার কথায় ইত্যাদি ইত্যাদি।

ততক্ষণে বিজনের সিগারেট ধরানো শেষ। অল্প ধোঁয়া ছেড়ে তিনি ঠান্ডা গলায় বলেন, 'মিঃ দাশগুপ্ত কি আমার এমপ্লয়িকে জেরা করছেন?'

'স্টেটমেন্ট তো একটা নিতেই হবে বিজনবাবু। আশা করি আপনি একজন দায়িত্বশীল সাংবাদিক হিসেবে জানবেন, এর গুরুত্বের কথা।'

'অবশ্যই জানি এবং সায়ন আর মোনালিসা আপনার ডিপার্টমেন্টকে সবরকমভাবে কো-অপারেট করবে। কিন্তু স্টেটমেন্ট দেবার আগে আমাদের উকিলের উপস্থিতিটা জরুরি। নাহলে আপনার অফিসাররা এদের অনর্থক হেনস্থা করবে সোর্স জানতে চেয়ে। আপনি তো জানেন, ন্যাশনাল সিকিউরিটি ছাড়া অন্য কোনো বিষয়ে আমরা আমাদের সোর্সের কথা বলতে বাধ্য নই।'

একটা অস্বস্তিকর নীরবতা। দুই দুদে যুযুধান নিঃশব্দে একে অপরের চোখে চোখ রেখে মেপে নিল কয়েক মুহূর্ত। তারপর আবার হেসে উঠলেন পরীক্ষিৎ। পরিস্থিতি হালকা করার জন্য বললেন, 'ওকে, ওকে! মাই ব্যাড! মোনালিসা, সায়ন— তদন্তকারী অফিসার হিসেবে আমি তোমাদের হেল্প চাইছি। মুখ্যমন্ত্রীর ছেলে বাবাকে খুনের চেষ্টার দায়ে ফেরার। তার বাড়ি থেকে শেষ বার বেরোনোর সময় তার সঙ্গে ছিল তার এক জন বডিগার্ড আর তার বিশ্বস্ত ড্রাইভার। তাকে শেষ দেখতে পাওয়ার প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা পরে তাকে যেখানে দেখা গেছিল তার পাঁচ মাইলের মধ্যে পাওয়া গেল ড্রাইভারের লাশ। খোদ ছেলে এবং তার দেহরক্ষী— দুজনেই এখনও নিখোঁজ। আশা করি ঘটনার গুরুত্ব আপনাদের আর আলাদা করে বোঝাতে হবে না। তাই এই বিষয়ে যদি কোনোভাবে সাহায্য করতে পারেন, বলাই বাহুল্য, তা আমাদের তদন্তে অত্যন্ত হেল্পফুল হবে।'

মোনালিসা আর সায়ন দুজনেই আবার তাকায় বিজনের দিকে। বিজন একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে ওদের দিকে তাকিয়ে অল্প ঘাড় নাড়েন। যার অর্থ, এগিয়ে যাও, তবে সাবধানে।

নিজেদের মধ্যে চোখাচোখি করে মোনালিসাই প্রথম শুরু করে, 'আপনি কতটুকু জানেন, বললে সুবিধে হত স্যর!'

'আপাতত ধরে নিন, কিছুই জানি না। গোড়া থেকেই বলুন।'

'ওকে। বিজনদার থেকে অ্যাসাইনমেন্ট পেয়ে কাল রাত্রে দেবদীপ্তদার সঙ্গে আমি হাসপাতালে যাই। সেখানে দেবদীপ্তদা তার সোর্সের কাছে জানতে পারে যে মুখ্যমন্ত্রীর ছেলেকে সন্দেহ করা হচ্ছে। বাথরুমের মেঝেতে শ্যাম্পু ছড়িয়ে রেখে বাবাকে মারতে চেয়েছিল সে। আরও খবর পাওয়া যায় যে সিএম-এর ছেলে নাকি লেক ল্যান্ড কান্ট্রি ক্লাবে আছে।'

'পুলিশের সোর্স?'

'আমি ঠিক শিওর নই। আমি তাকে দেখিনি।'

'বেশ। বলে যান।'

'আমরা ওখান থেকে লেক ল্যান্ড কান্ট্রি ক্লাবে যাই আর জানতে পারি যে অভিজাত বেরিয়ে গেছে আমরা সেখানে পৌঁছোনোর আগেই। সঙ্গে তার ড্রাইভার আর বডিগার্ডই ছিল। অন্তত অন্য কেউ আছে সেরকম কথা আমরা শুনিনি।'

'গাড়ি?' 'স্করপিও। কালো।

'নাম্বার?'

চকিতে এক বার তাকিয়ে মোনালিসা এতক্ষণে একটা পালটা প্রশ্ন করে, ‘সেটা তো আপনাদের বেটার জানার কথা। আমরা তো গাড়িটা চোখেই দেখিনি।'

বিজনের মুখে মৃদু হাসি ফুটে ওঠে। সেটা মোনালিসার নজর এড়ায় না। এবং সেটা দেখে সে একটু জোর পায় মনে মনে। কিন্তু পরীক্ষিৎ দাশগুপ্তের মাথা খুব ঠান্ডা বলতে হবে। একটা হাঁটুর বয়েসি মেয়ের ট্যারা উত্তরেও মাথা গরম করলেন না। বললেন, ‘হ্যাঁ। আমরা জানি বই কী। বেশ, তুমি মানে আপনি বলতে থাকুন।'

‘আপনি আমায় স্বচ্ছন্দে তুমি তুমি করতে পারেন। আমি আপনার থেকে বয়েসে অনেক ছোট। মাঝে মধ্যেই ‘আপনি' আর ‘তুমি'-তে গুলিয়ে ফেলছেন। তুমিতেই স্টিক করে থাকুন।'

‘হেঁ-হেঁ! থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ। প্লিজ কন্টিনিউ

‘হ্যাঁ। লেক কান্ট্রি ক্লাবে দেখতে না পেয়ে আমরা অভিজাতর ট্র্যাকটা হারিয়েই ফেলেছিলাম। রাস্তায় এক জায়গায় চা খেতে দাঁড়াই। সেখানেই আবার কোইন্সিডেন্টালি এমন একজনের দেখা পাই, যে লালবাতি লাগানো একটা গাড়ি স্পট করেছে। তার ডিরেকশন মেনেই আমরা খুঁজতে খুঁজতে এখানে এসে পৌঁছোই। আমি আর দেবদীপ্তদা।’

‘এসবই কাল রাত্রে, তাই তো?’

‘কাল রাত্রি থেকেই শুরু। তবে খুঁজতে খুঁজতে এখানে যখন পৌঁছেছিলাম ততক্ষণে সকাল হয়ে গেছিল। আজ সকাল’

‘বেশ।'

‘এখানে এসে জানতে পারি, এখানকার একটি ছেলে, ওই ফুটবল-টুটবল খেলে—সে দেখেছে একটি ইউনিফর্ম পরা লোক ওই গাড়ির মাথা থেকে লালবাতি খুলে নিচ্ছে।'

‘ইন্টারেস্টিং।’

‘ইট ইনডিড ইজ। যাই হোক, দেবদা এর পরে আমাকে একপ্রকার জোর করেই বাড়ি পাঠিয়ে দেয়। বলে ফ্রেশ হয়ে সন্ধে বেলা আটটার সময় অফিসে মিট করতে। সন্ধে অবধি দেবদার কোনো খবর না পেয়ে আমি বিজনদার পরামর্শে সায়নকে নিয়ে এখানে আসি। আর এখানে এসে এলাকার আর একটি লোকাল দোকানদারের কাছ থেকে জানতে পারি যে আমি চলে যাবার পরে দেবদা এই গলিতেই ঢুকেছিল। এখানে কী একটা আশ্রম আছে, সেদিকেই এসেছিল। এসে দেখি...'

‘আশ্রম বলতে ওই চালাঘরটা?’ এবারের প্রশ্নটা পরীক্ষিৎ করেন সায়নকে। ‘হ্যাঁ স্যর! লোকাল পুলিশ তো অনেকক্ষণ আগেই ওখানে ঢুকেছে। আপনার লোকেরাও ঢুকল প্রায় আধ ঘণ্টা হয়ে গেল। তার প্রায় পরে পরেই তো আপনি এলেন।'

এক বার সামনের আধো অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে নিলেন পরীক্ষিৎ যেদিকে ওই আশ্রমটি। তারপর মোনালিসার দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘আমাদের ডিপার্টমেন্টে তোমাদের যে সোর্স আছে, সে যে তোমাকে গাড়ির নাম্বার দিয়েছিল, সেটা তো বললে না।”

‘সেটা আর কী কাজে লাগল...’ বলতে বলতেই বিস্ফারিত হয়ে যায় মোনালিসার চোখ।

পরীক্ষিতের মুখে এক ধরনের অনাবিল হাসি ফুটে ওঠে। ঠিক যেমন হাসি ফুটে ওঠে প্রতিপক্ষকে কিস্তিমাৎ দেওয়া বিজয়ী দাবাড়ুর মুখে। মোনালিসা মাথা নীচু করে বলে, ‘আপনি কী করে ওঁর কথা জানলেন?’

‘কেন? গল্পের বইতে পড়েছ না, যে পুলিশ বোকা হয়? তোমাদের ওই ফেলুদা, ব্যোমকেশ বা হোমস সবসময় তাদের ভুল ধরিয়ে দেয়। যাক গে, বেসিক্যালি তোমার সাধনবাবু আমার সামনে থেকেই ফোন করছিলেন। আর যদি তোমরা নোটিস করতে পারো যে ফোন নাম্বার আট ডিজিটের হয় না, তাহলে সেটুকু কি আর আমি নোটিস করব না?’

‘আচ্ছা, উনি কি, মানে ওঁর কি...

‘না, ভয় নেই। চাকরি যাবে না। তবে শো কজ তো করা হবেই। অনগোয়িং

ইনভেস্টিগেশনের ইনফর্মেশন কারও সঙ্গে শেয়ার করা ঠিক নয়।

‘শিট! আমার জন্য...

‘মোটেও না। তুমি জাস্ট কনফার্ম করেছ। আমরা তার আগে থেকেই জানতাম। ছেড়ে দাও। এই মুহূর্তে উনি প্রায়োরিটি নন। ওঁর কেসটা পরে। এখন বলো, এই ব্যাপারটা ছাড়া আর কিছু চেপে গেছ কি? এমন কিছু যা এই ব্যাপারে হেল্প করতে পারে বলে তোমার মনে হয়?

'না, সেরকম কিছু নেই।'

‘সায়ন?

সায়নও মাথা নেড়ে না বলে। ইতিমধ্যে একজন প্লেন ড্রেসের অফিসার এগিয়ে এসে প্রীক্ষিৎকে বলেন, 'স্যর, আশ্রমের লোকজনকে রাউন্ড-আপ করা হয়েছে। প্রাথমিক ইন্টারোগেশনে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। মোট চার জন আছে। দুটো ছেলে। একটা বুড়ি আর একটা অল্পবয়েসি মেয়ে। এরা সবাই একটু হাবাগোবা টাইপের মনে হচ্ছে। এদের কথামতো কোনো বাইরের লোকই কাল থেকে আসেনি এখানে।

"সার্চ করে কিছু পাওয়া গেল? ওই `না স্যার। এখনও অবধি না। কিছু ফুটমার্কস আছে। কিন্তু স্পষ্ট করে কিছু পাওয়া মুশকিল।'

‘হোয়াট অ্যাবাউট দ্য বডি?”

চত্বরে কোনো গাড়ির মার্ক?

ক্লিন প্রফেশনাল শট। নো আদার এক্সটারনাল উণ্ড! তবে মারা গেছে অন্যত্র। কারণ ডেডবড়ির আশেপাশে রক্ত কম। বড়ি এখানে টেনে এনে ফেল

হুমমম। টাইম অফ ডেথ?’

সার, নিশ্চিত করে তো বলা যাবে না। তবে ডাক্তার একনজরে যা বললেন, কম সে কম আট থেকে দশ ঘণ্টা আগে মারা গেছে। বড়ি শক্ত হয়ে গেছে একদম। রিগর মর্টিস!!”

“তার মানে দিনের বেলায়। তার মানে কোনো কভারড জায়গায় মারা হয়েছে। চান্সেস আর– ওই আশ্রমেরই কোথাও। উই নিড টু সার্চ এগেন! এক কাজ করো প্রতিম— গাড়ির নাম্বার, অভিজাতর ডেসক্রিপশন দিয়ে টোলগেটগুলোকে অ্যালার্ট করে দাও। আর লাস্ট বারো ঘণ্টার সিসিটিভি ফুটেজ

চেয়ে পাঠাও। উই নিড ইট কুইকলি। আর চলো, এবারে আমি যাই তোমাদের আশ্রমে।

বিজন এতক্ষণ চুপচাপ সিগারেট খেয়ে যাচ্ছিলেন। পরীক্ষিৎ আশ্রমের দিকে যাবার জন্য পা বাড়াতেই তিনি গলাখাঁকারি দিয়ে উঠলেন, ‘মিঃ দাশগুপ্ত, এবারে আমরা কি যেতে পারি?'

‘ও, হ্যাঁ অবশ্যই। আপনারা যান। সাবধানে যাবেন। যাবার আগে লোকাল পুলিশের কাছে আপনার দুই এমপ্লয়ির কনট্যাক্ট ডিটেলস একটু দিয়ে যাবেন প্লিজ। পারলে আপনারটাও।'

‘শিওর।’

বিজনের ইশারায় ওর পেছনে পেছনে হাঁটা লাগায় মোনালিসা আর সায়ন। পরীক্ষিৎ দাশগুপ্ত এগিয়ে যান আশ্রমের দিকে।

॥ দ্য ফার্স্ট ক্র্যাক ইন দ্য বার্লিন ওয়াল।।

২৬ জুলাই, ২০১৮, গভীর রাত/ধাড়সা, পঃ বঙ্গ, ভারত

ছেলে দুটো আর বুড়িটা কোনো কাজের নয়। এক কথা ঘ্যানঘ্যান করে যাচ্ছে, ‘আমরা কিছু দেখিনি’ আর ‘আমরা কিছু জানি না’। পরীক্ষিৎ জানেন এরা মিথ্যে কথা বলছে। কিন্তু এটাও জানেন যে এরা ভয়ে মিথ্যে কথা বলছে। কিছু দেখে বা শুনে থাকলেও, এই পরিবেশে ওদের মুখ খোলানো যাবে না।

কেবল এই অল্পবয়েসি মেয়েটাকে একটু অন্যরকম লাগছে। একটা সস্তা সালোয়ার পরে আছে মেয়েটা। মুখ নীচু করে বসে আছে ঘরের এককোণে। জায়গাটাকে যদিও ঘর বলা যায় না। অনেকটা নাটমন্দির টাইপের। যদিও বেশ ছোট। কিন্তু দেওয়াল নেই কোনো। মাথার ওপরে ঢালাই ছাদ আর আটটা পিলার ধরে রেখেছে ছাদটাকে। একধারে একটু উঁচু বেদির ওপর রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তি। ফুলে আর চন্দনে ঢাকা।

কয়েকটা প্লাস্টিকের চেয়ার কোথাও থেকে জোগাড় করে আনা হয়েছে। তারই একটাতে বসে আছেন এখন পরীক্ষিৎ। আর একটা চেয়ারে বসে আছেন ওই বৃদ্ধা। তিনটে চেয়ার খালি, পরীক্ষিতের মুখোমুখি। ছেলে দুটো ভয়েই বসেনি তাতে। হাতজোড় করে উবু হয়ে মাটিতেই বসে আছে। মেয়েটাকে দেখে যদিও মনে হয় না ভয় পেয়েছে। মাথা নীচু করে কোমরে জড়ানো ওড়নার খুঁট আঙুলে পাকাচ্ছে, একটা থামে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে।

প্রশ্ন এখনও পর্যন্ত যা করার সব পরীক্ষিতের অধস্তন অফিসাররাই করছিল। পরীক্ষিৎ একদৃষ্টে লক্ষ করছিলেন ওই মেয়েটাকে। এবারে চেয়ার থেকে উঠে তিনি আস্তে আস্তে এগিয়ে গেলেন মেয়েটার দিকে। এগিয়ে গিয়ে মেয়েটার একদম কাছাকাছি দাঁড়ালেন।

অভাবে বড় হওয়া মেয়ে, সেটা বোঝা যায়। রোগা চেহারা। কিন্তু মুখটা মিষ্টি। একটু লম্বাটে গড়নের মুখ। বড় বড় চোখ এবং তাতে একটা সহজ বুদ্ধির ছাপ।

পরীক্ষিৎ মেয়েটার দিকে একটুক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকতে থাকতেই মেয়েটা মুখ তুলে তাকাল তার দিকে। পূর্ণ দৃষ্টিতে। পরীক্ষিৎ প্রায় আড়াই দশক ধরে পুলিশের চাকরি করছেন। দেড় দশকেরও বেশি গোয়েন্দা বিভাগে। তিনি স্পষ্ট দেখলেন সে চোখে ভয় আছে। তবে সেই ভয় এই বাদবাকি কুতকুতে লোকগুলোর মতো পাতি পুলিশের ভয় বলে মনে হল না। মেয়েটা হঠাৎ পরীক্ষিতের দিক থেকে চোখ সরিয়ে আশেপাশে বুলিয়ে নিল চকিতে।

আধা মফস্সলে এত রাত্রে খুন এবং পুলিশ। চারিদিকে একটা মাঝারি মাপের মেলা বসে গেছে। পুলিশের লোকজন সাধারণ গ্রামবাসীদের নাটমন্দিরের চাতালের নীচে দাঁড় করিয়ে রেখেছে। তার বেশি দূরে সরানো অসম্ভব। পরীক্ষিতের মনে হল মেয়েটা যেন সেই জমায়েতের দিকে তাকিয়ে কিছু একটা খুঁজছে। কোনো একটা অবলম্বন। মেয়েটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতেই পরীক্ষিৎ প্রশ্ন করলেন, ‘এ কে?’

‘আজ্ঞে ও আমার বোনঝি হয়। আমার মায়ের সঙ্গে এসেছে এই বছর দুয়েক হল। এখেনেই আছে ও, তখন থেকে। ও খুব ভালো মেয়ে স্যার! ভারি ভালো কীর্তন গায়.....

‘এই চোপ। মেলা ফালতু না বকে, স্যার যতটুকু জিজ্ঞেস করছে ততটুকুরই জবাব দে।’ কেউ একজন ধমকে থামাল। পরীক্ষিৎ না ফিরেই বুঝলেন তাঁরই দলের কেউ। ভালোই হয়েছে। নাহলে আরও কত বকত কে জানে। তিনি আবার এক বার জিজ্ঞেস করলেন, ‘নাম কী?’ এবারের প্রশ্নটা বাতাসে ছুড়ে দেওয়া। মেয়েটা খুব শান্ত গলায় জবাব দিল, ‘বন্যা।’

আবার... আবার এক বার সে দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিল অল্প দূরে দাঁড়িয়ে থাকা ভিড়ের ওপর।

হঠাৎ পেছন ফিরে পরীক্ষিৎ বললেন, ‘লেটস প্যাক আপ বয়েজ! এই চার জনকেই নিয়ে চলো। স্টেটমেন্ট নিতে হবে।’

একটা সমবেত গুঞ্জন উঠল। লোক দুটির মধ্যে একজন যথারীতি হাউহাউ করে কেঁদে পরীক্ষিতের পায়ের ওপর উপুড় হয়ে পড়ার উপক্রম করল। তাকে এড়িয়ে নাটমন্দিরের নীচে নামতে নামতে পরীক্ষিৎ পেছন ফিরে এক ঝলক তাকালেন বন্যার দিকে। বন্যা স্বস্তি পেয়েছে। চোখ দেখে স্পষ্টই বোঝা যায়, সে স্বস্তি পেয়েছে!!

পরীক্ষিৎ ভুল আন্দাজ করেননি। মেয়েটা কিছু একটা জানে, যেটা সে এখানে বলতে চাইছে না!!

আশ্রমের উঠোন দিয়ে হেঁটে হেঁটে গেটের দিকে যাওয়া শুরু করামাত্র একজন কনস্টেবল হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এল, 'স্যার, স্যার! এটা এক বার দেখুন।'

সার্চপার্টির লোক। আশ্রমের ঘরগুলো সবই সার্চ করা হয়ে গেছিল। কাঠা তিনেক যে খোলা জমি সেখানে সার্চলাইট জ্বালিয়ে খোঁজাখুঁজি চলছিল এতক্ষণ। কিছু পাওয়া যাওয়ার আশা ছিল না। কিন্তু দেখা যাচ্ছে কিছু একটা পাওয়া গেছে। পরীক্ষিৎ পকেট থেকে গ্লাভস জোড়া বার করে পরলেন। তারপর সন্তর্পণে কনস্টেবলটির হাত থেকে নিলেন জিনিসটা।

একটা বেসিক মোবাইল ফোন। লাল রঙের, ছোট্ট। বন্ধ হয়ে আছে। সুইচ টিপে অন করতেই টুং টাং আওয়াজ তুলে অন হল মোবাইলটি। হাতে নিয়ে একটা বিস্ময়ের দীর্ঘশ্বাস বের করতে গিয়েও চেপে নিলেন পরীক্ষিৎ।

ফোনের ওয়ালপেপারে একটা খুবই খারাপ কোয়ালিটির ছবি। বাবা-ছেলের ছবি।

অল্পবয়েসি বাবা অখিলেশ রায় আর তার ছোট্ট ছেলে অভিজাত রায়!!

।। ষষ্ঠদশ অধ্যায় ।।
।। দ্য ট্র্যাপ রিভিলস ।।

।। ১৬.১ ।।
।।দ্য পাসড পন ।।

২৩ জুলাই, ২০১৮, সকাল বেলা / নিউ দিল্লী, ভারত

পাম্মি বেশ লম্বা। প্রায় পাঁচ ফুট এগারো ইঞ্চি। তাই ও কতটা মোটা সেটা কেউ বুঝতে পারে না চট করে। ও নিজে বেশ বুঝতে পারে যদিও। একটু জোরে কিছুটা ছোটা-হাঁটা করতে হলেই বেশ হাঁসফাঁস করে সে। বুটজুতোর ফিতে বাঁধতে গিয়ে পেটে ভালোমতো চাপ পড়ে, ইদানীং। অবিশ্যি পাম্মি বুটজুতো পরে খুব কম। খাকি থ্রি কোয়ার্টার প্যান্ট, ঢোলা টি-শার্ট আর পায়ে স্যান্ডেল— এতেই সে সারাদিন টোটো করে ঘুরে বেড়ায়।

পাম্মির পুরো নাম অবশ্যই পারমিন্দার সিং। কিন্তু যতটা নিশ্চিত হয়ে তার আসল নাম বলা যায়, ততটা নিশ্চিত হয়ে তার পেশা বলা যায় না। দিনের এবং রাতেরও বেশিরভাগ সময় তাকে দেখা যায় শহর দিল্লির রাস্তায় রাস্তায় নিজের স্কুটি চালিয়ে ঘুরে বেড়াতে। ফ্লাইওভারগুলোর নীচে যেখানে যেখানে অস্থায়ী তাঁবু বা ঝুপড়ি খাটিয়ে বসবাস করছে অন্যান্য প্রদেশ থেকে আসা সস্তার মজুররা, সেই সব এলাকার চায়ের দোকানে প্রায়ই ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকতে দেখা যায় পাম্মিকে। চারপাশে ভিনভিনে মাছির মতো আওয়াজ করতে থাকা একটা পাতলা ভিড়ও প্রায়ই চোখে পড়ে। বেশিরভাগই ওই ছোট দোকানদার, মজুর শ্রেণির লোক।

সবার হাতে থাকে নানা সাইজের সস্তার চাইনিজ মোবাইল আর খুচরো দশ-বিশ টাকার নোট। রহস্যের কিছু নেই। পাম্মি আসলে এই বিশেষ ক্রেতাদের 'ভিডিয়ো সাপ্লায়ার। বিশেষ ধরনের ভিডিয়ো অবশ্যই। এদের নেট কানেকশান নেই, থাকলেও 'ভালো মাল' কী করে নামাতে হয়, কোথা থেকে নামাতে হয় কেউই জানে না। তাই এদের ভরসা 'পাম্মিভাই'। কী করে যে সে এইভাবে রোজগারের রাস্তা খুঁজে পেল তা তার ঠিক করে মনেও পড়ে না আর। এখন কেবল জানে একটা কুড়ি মিনিটের বিদেশি ভিডিয়ো— কুড়ি টাকা আর দিশি এমএমএস হলে মিনিট পিছু দু' টাকা। এই রেটে সে সারা মাসে যা আয় করে, ট্যাক্স রিটার্ন জমা করলে আয়কর দপ্তরের চোখ কপালে উঠে যেত। -

এসব ছাড়াও পাম্মির একটা কাজ আছে। কাজটা সে প্রায় সাত-আট বছর ধরে করে আসছে। সত্যি বলতে কী কাজটার মাথামুণ্ডু সে কিছুই বোঝে না। সে শুধু জানে তার এই কাজের ওপর তার দেশ নির্ভর করে থাকে। তাকে গোয়েন্দাস্যার বলেছিলেন।

সে শুধু জানে 'দরিবা কালান'-এর এলগিন জুয়েলার্স, যার সামনে দিয়ে তার রোজ যাওয়া-আসা, সেখানে কখনো-সখনো একটা নতুন সাইনবোর্ড ঝোলে ক'দিনের জন্য। তাতে ভুল বানানে লেখা থাকে যে নতুন ডিজাইনের গয়না দোকানে অ্যাভেলেবল। আর তখনি একদিন তাকে গিয়ে মনসুখভাইয়ের থেকে ডেলিভারি নিতে হয়।

ডেলিভারিও তার সঙ্গে মানানসই। মনসুখভাইরা তিন পুরুষের কারবারি। অন্যের জিনিসে ছোঁকছোঁক করে নাক গলানোর ছ্যাবলা প্রবৃত্তি তাদের নেই। তাই কোনোদিনও খুলেও দেখেনি সেই বাক্স। অবশ্য খুলে দেখলেও বিশেষ লাভ কিছু হত না। দেখতে পেত মেমসাহেবদের ল্যাংটো ছবির পিকচার পোস্টকার্ড-ভরতি একটা বাক্স।

আজও স্কুটি নিয়ে জায়গাটা পেরোনোর সময় সে সাইনবোর্ডটা দেখতে পায়। কোনো তাড়াহুড়ো না করে সে স্কুটি সাইড করে দাঁড়ায় উলটো দিকের পানের দোকানের সামনে। একটা মিঠা পান বানাতে বলে সে এগিয়ে যায় এলগিন জুয়েলার্সের দিকে।

'কেয়া তো তু ফালতুকে নাঙ্গাওয়ালা ধান্দা করতা হ্যায়!'

রোজের মতোই আজও মনসুখভাই সেই একই অনুযোগ করে। পাম্মি কিছু বলে না।

একটু হেসে কার্ডবোর্ডের বাক্সটা তুলে নেয় কাউন্টার থেকে। তারপর বলে, ‘আম্মিজান কহতি থি কোই ধান্দা ছোটা নেহি হোতা...’

‘চুপ বে, শারুখকা নাজায়েজ আওলাদ!!’

মধ্যবয়স্ক মনসুখ আর যুবক পাম্মি একসঙ্গে হেসে ওঠে হো-হো করে। পাম্মি নিজের স্কুটির কাছে ফিরে আসে। পান মুখে পুরে পয়সা মেটায়, কাঁধে ঝোলানো ব্যাগে বাক্স চালান করে স্কুটি চালু করে।

মার্কেট এরিয়া থেকে বেরিয়ে চাঁদনি চৌক মার্গে পৌঁছোতেই, স্কুটি একপাশে করে আবার দাঁড়াল পাম্মি। অনেকদিন আগে পাওয়া নির্দেশ। কিন্তু এতগুলো বছর ধরে অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে করতে অভ্যেস হয়ে গেছে। বাক্সর গায়ে লেখা নম্বরটা দেখল ৭। বাক্স খুলে সাত নম্বর ছবিটা বের করল সে। কোনোই তফাত নেই। সেই একই ল্যাংটো বিদেশি মডেলের ছবি। পেছনে পোস্টকার্ডের মতো চিঠি লেখার জায়গা, ঠিকানা লেখার জায়গা। এই পোস্টকার্ডে করে কেউ কাউকে চিঠি পাঠায় কিনা খোদায় মালুম।

তবে এই নম্বর মেলানো বিশেষ বিশেষ পোস্টকার্ডে চিঠি লেখার জায়গায় ইংরেজি লেটার্স লেখা থাকে। হাবিজাবি। সেগুলো থেকে কোনো শব্দ, কোনো বাক্যই তৈরি হয় না। পাম্মি প্রথম দিকে চোখ বুলিয়ে দেখেছে। কিস্সু বোঝা যায়নি।

হিজিবিজি চিঠি লেখা সাত নম্বর ছবিটা আলাদা করে ব্যাগের একটা চেন দেওয়া খোপে ঢোকায় সে। বাক্সটা দুমড়ে-মুচড়ে, ছিঁড়ে কুটি কুটি করে ফেলে দেয় নর্দমায়। তারপর বাকি ছবিগুলো নিজের একটা খামে পুরে নেয়। এগুলো তার। যদিও আজকের ভিডিয়ো পর্নের যুগে ছবি খুব বেশি বিক্রি হয় না, কিন্তু একদম শূন্য হয়ে যায়নি চাহিদা। অল্প কিছু হলেও রোজগার হয়েই যায় তার।

এবারে এই আলাদা করে রাখা ছবি খামে ভরে যাবে তার সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত কাস্টমারের হাতে। কাল ভোর বেলা!

২০ জুলাই, ২০১৮, গভীর রাত / নিউ দিল্লী, ভারত

অরুণ সচদেভ কম্পিউটার জানেন না তা নয়। বরং অনেকের থেকে বেশিই জানেন। আর জানেন বলেই এটাও জানেন যে সত্যিকারের গোপন তথ্যের গোপনীয়তা কম্পিউটারে রক্ষা করাটা একটা রূপকথার গল্প যা বাস্তবে মোটেও সত্যি নয়। কম্পিউটারে রাখা যে কোনো তথ্যই চুরি করা যায়, উপযুক্ত সময়, অর্থ ও লোক থাকলে। আর যারা এসব চুরি করতে চায়, তাদের কাছে এই তিনটেরই কোনো কমতি নেই।

তাই এই ডিজিটাল যুগেও তথ্যের আদান-প্রদানের জন্য তিনি নির্ভর করেন অ্যানালগ মাধ্যমের ওপর। অবশ্য লোকের চোখের সামনে কিছু ডিজিটাল ইনফর্মেশন নিয়ে নাড়াচাড়া তো করতেই হয়। কিন্তু সেগুলো নেহাতই ধোঁকার টাটি।

তাঁদের ট্রেনিং-এর সময় শেখানো হয়েছিল ক্রিপ্টোগ্রাফি। পুরোনো দিনে এই গুপ্তচরবৃত্তির পেশায় অনেকরকমের কোড ব্যবহার করে তথ্যের আদানপ্রদান হত। তারই সবচেয়ে বেসিক ও প্রাচীন পদ্ধতিগুলোর মধ্যে একটা হল সাবস্টিটিউশন ক্রিপ্টোগ্রাফি। ধারণাটা খুব সাদামাটা। আর তাই এটা অরুণকে আকর্ষণ করেছিল।

ইংরেজি বর্ণমালার এক-একটি বর্ণকে অন্য যে কোনো একটি বর্ণ দিয়ে রিপ্লেস করে লেখা হয় গুপ্ত সংবাদ। আর কোন বর্ণকে কোন বর্ণ দিয়ে রিপ্লেস করা হয়েছে, সেটা জানা থাকলেই কেল্লা ফতে!

আসল মুনশিয়ানা এই তালা অর্থাৎ মূল মেসেজ আর তার চাবিকাঠি অর্থাৎ রিপ্লেসমেন্ট লিস্ট—এই দুটিকে যতটা সম্ভব আলাদা রাখার। সোর্স থেকে বেরিয়ে টার্গেটে পৌঁছোনোর আগে পর্যন্ত তারা যেন যতটা সম্ভব আলাদা থাকে, দূরে থাকে, অসম্পর্কিত থাকে।

সচদেভ নিজের অ্যাসেটের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য আজও এই মান্ধাতা আমলের পদ্ধতি অনুসরণ করেন। তাই র-এর ভেতরেও কারও বিন্দুমাত্র ধারণাও নেই অরুণের সোর্স বা অ্যাসেটের সম্বন্ধে।

ঘড়িতে একটা চুয়াল্লিশ বাজামাত্রই লাফিয়ে উঠলেন অরুণ। নিজের ছোট্ট শর্ট ওয়েভ ট্রানজিস্টরটি দ্রুত অভ্যস্ত হাতে টিউন করলেন একটি নির্দিষ্ট ফ্রিকোয়েন্সিতে। ১১২৬ মেগাহার্জ!

কী একটা গান চলছিল, বিদেশি ভাষার। ঘড়িতে একটা পঁয়তাল্লিশ বাজতেই হঠাৎ একটা অদ্ভুত স্ট্যাটিকের আওয়াজ শুরু হল। অনভ্যস্ত কানের লোকের মনে হবে রেডিয়োর সিগন্যাল আসতে সমস্যা হচ্ছে। কিন্তু অরুণ একটা নোটবুকে অভ্যস্ত হাতে লিখে চলেছেন, ‘ডট-ড্যাশ-ডট-ডট-ড্যাশ’!

অভিজ্ঞ কান মাত্রেই বুঝতে পারবে এই যে ঘ্যারঘ্যার করে একটা নয়েজ, একটা সিগন্যাল ডিস্টার্বেন্সের আওয়াজ— এর একটা প্যাটার্ন আছে। মর্স কোডের। বেশি না, মাত্র দশ-পনেরো সেকেন্ড। তারপর আবার সেই গান রিজিউম করল। পৃথিবীর অন্যান্য প্রান্তে যারা কান লাগিয়ে এই ফ্রিকোয়েন্সিতে অনুষ্ঠান শুনছিলেন, তারা এই কয়েক সেকেন্ডের ডিস্টার্বেন্স নিয়ে বেশি মাথা ঘামাবেনও না।

যাঁর মাথা ঘামানোর, তিনি ততক্ষণে রেডিয়ো বন্ধ করে হাতের খুদে নোটবুকের দিকে তাকিয়ে আছেন। চাবি পেয়ে গেছেন। এবার অপেক্ষা, তালার জন্য।

২৪ জুলাই, ২০১৮, সকাল বেলা / নিউ দিল্লী, ভারত

সামনে সাদা একটা টুকরো কাগজে লেখা কয়েকটা লাইন। পেন্সিলে। বিস্ফারিত চোখে সেদিকে তাকিয়ে আছেন অরুণ সচদেভ। নিজের চোখকেও বিশ্বাস করতে পারছেন না। দু' বার করে মিলিয়েছেন ডিকোডেড মেসেজের সঙ্গে এনকোডিংএর দুটো আলাদা অংশকে। মনে মনে ভেবেছেন নিশ্চয়ই কিছু ভুল হচ্ছে কোথাও। আসলে আশা করেছেন। কিন্তু নাহ! কোনো ভুল নেই। নিখুঁতভাবে ডিকোডেড, প্লেন ইংরেজিতে লেখা মেসেজটা সামনেই পড়ে আছে—

BHAIJAAN IS COMING TO HUNT PENGUINE. SALTANAT IS PROUD.

ভাইজান— খুব সম্ভবত কোনো অ্যাসেটের কোডনেম। সালতানাৎ হচ্ছে আইএসআই। অর্থাৎ আইএসআই-এর অপারেশন। এটা তো একরকম জানাই ছিল। যখন শেখরণস্যর আর মিঃ ম্যাথিউ অপারেশনের দায়িত্ব দিলেন, তখনই পরিষ্কার ছিল যে এই মাপের কোনো অপারেশনে প্রকাশ্যে যে সন্ত্রাসবাদী সংস্থারই নাম থাক, আইএসআই-এর ছাপ ছাড়া তা কখনোই হবে না। কিন্তু 'পেঙ্গুইন'? দ্রুত সে মোবাইল বার করে। প্রথমে একটা কোড, তারপর একটা ফোন নম্বর ডায়াল-ইন করে। সিকিওর লাইনে ফোন বাজতে শুরু করে শেখরণের। দু' বার ডায়াল হতেই ফোন তুললেন শেখরণ। ছুটির দিনের সকাল সাড়ে সাতটা। অথচ গলা সজাগ, সতর্ক, 'বলো অরুণ!'

'স্যর, উই নিড টু মিট নাও!'

'কী ব্যাপার অরুণ? এই মুহূর্তে তো আমার পক্ষে বেরোনো সম্ভব নয়।' 'আপনাকে বেরোতেই হবে স্যর! উই ক্যান নট টক অ্যাবাউট দিস ওভার ফোন।'

'বাট হোয়াই? দিস ইজ আ সিকিওর লাইন!'

এই চাপের মধ্যেও হালকা শব্দ করে হেসে ফেললেন অরুণ সচদেভ! বললেন, 'মাফ করবেন স্যর! এই লাইনটা ততটাই সেফ যতটা আপনি বিশ্বাস করতে চান। আর আমি একে একদমই বিশ্বাস করি না। আমাদের শহরের বেশ কিছু কলেজ ড্রপ-আউট নিতান্তই শখের হ্যাকারকে আমিই চিনি, যারা ফিফা খেলার ফাঁকে ফাঁকে টুক করে আপনার সিকিওরড লাইনে আড়ি পাততে পারে। সো, প্লিজ, আই বেগ অফ ইউ— লেট আস মিট অ্যাট দ্য অফিস!'

'হুমম। ওকে। টুয়েন্টি মিনিটস ফ্রম নাও। আর আমার কাছে কিন্তু আধ ঘণ্টা সময় থাকবে হাতে।'

'দ্যাট উইল বি সাফিশিয়েন্ট স্যর! আর একটা কথা— মিঃ ম্যাথিউকে না জানালেও চলবে স্যর। ইনফ্যাক্ট আপাতত ওঁকে না জানানোই ভালো।' 'বেশ!' একটু আশ্চর্যই শোনায় শেখরণের গলা।

অরুণ কথাটা বলার পর প্রায় দু' মিনিট কেটে গেছে। ঘরের ভেতরের বাতাস এখন ভারী। তাড়াহুড়োয় জানলার পাল্লা, পর্দা কিছুই খোলা হয়নি। ছুটির দিন; কোনো আর্দালিও নেই সেই কাজটা করে দেবার জন্য। তাই ঘরের ভেতর একটা বাসি গুমসোনো গন্ধ।

নীরবতার ভিড়ে অরুণের মন বেশি করে চলে যাচ্ছে দেওয়াল ঘড়িটার দিকে। একটা একঘেয়ে টিকটিক শব্দ যেন বলছে, যে উলটো গোনা শুরু। ফুরিয়ে আসছে সময়। ফুরিয়ে আসছে অরুণের অপেক্ষার ধৈর্য।

ঘরে ঢুকেই অপেক্ষমাণ শেখরণকে দেখে একটা টাইম বোমার মতো ফেটে পড়েছিলেন অরুণ, 'স্যর! প্লিজ রিলিভ মি ফ্রম দ্য ডিউটি! দিস ইজ বিগ! ভেরি বিগ! আনপ্রিসিডেন্টেড! আই... আই কান্ট হ্যান্ডল দিস!'

'কাম ডাউন অরুণ! কাম ডাউন! আগে বসো! কী হয়েছে, বলো?' স্বভাবসিদ্ধ শান্ত গলায় বলেন শেখরণ।

তড়িঘড়ি চেয়ার টেনে বসতে বসতেই খবরটি দিয়েছিলেন অরুণ, 'স্যর! ইটস নট আওয়ার, ইটস দেয়ার প্রাইম মিনিস্টার, হু ইজ গোয়িং টু বি অ্যাট্যাকড ইন আওয়ার সয়েল!'

শেখরণ কিছু না বলে শুধু পিঠ সোজা করে এগিয়ে এসে বসেছিলেন। কনুইয়ের ভর টেবিলের ওপর দিয়ে, ঝুঁকে পড়েছিলেন সামনের দিকে। অরুণ পকেট থেকে ডিকোডেড মেসেজের টুকরোটি বার করে মেলে ধরলেন শেখরণের সামনে। আনুপূর্বিক জানালেন তার হাতে এই মেসেজ আসার বৃত্তান্ত। অবশ্যই স্পেসিফিকস বাদ। সোর্সের নাম বলা যাবে না কোনোমতেই। শেখরণ তা নিয়ে আজ আর জোরাজুরিও করেননি। সমস্তটা বলার শেষে অরুণ বলেছিলেন, 'স্যর! এই খবর যদি ঠিক হয় এবং এই মিশন যদি সফল হয় তাহলে এই দুই দেশে আগুন জ্বলবে। আর তা নেভানোর ক্ষমতা কারও নেই। আপনি বুঝতে পারছেন, যদি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী আমাদের দেশের মাটিতে খুন হন, তার আন্তর্জাতিক প্রভাব কী দাঁড়াবে? আমি... আমি ভাবতেও চাইছি না সেই প্রভাবটা কী এবং কতখানি! আমি শুধু বলব স্যর— উই নিড আ ন্যাশনাল লেভেল ম্যানহান্ট অ্যান্ড উই নিড ইট টু স্টার্ট নাও!'

এতটা কথা একটানা বলতে পেরে একটু যেন শান্ত বোধ করেছিলেন অরুণ। কথা বলতে বলতে উত্তেজনায় কখন তিনি টেবিলে হাতের ভর দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন, তা তাঁর নিজেরও খেয়াল ছিল না। কথা শেষ করে ধপ করে চেয়ারে বসে পড়েছিলেন।

তারপর থেকেই একটি নাতিদীর্ঘ নীরবতা চলছে। টেবিলের ওপর ঝুঁকে বসে থাকা শেখরণের চোখ এখন সামনের চিরকুটটার দিকে নিবদ্ধ। দু' হাতে টিপে ধরে আছেন কপালের রগ। হঠাৎ দেখলে মনে হয় দাবার গ্র্যান্ডমাস্টার ধ্যানমগ্ন হয়ে বোর্ডের দিকে তাকিয়ে নিজের পরের চাল ভাবতে ব্যস্ত।

এইটুকু বিরতিই অস্থিরতা ফিরিয়ে আনতে শুরু করেছে অরুণের মধ্যে। অধৈর্য হয়ে গলাখাঁকারি দিয়ে শেখরণের ধ্যান ভাঙানোর উপক্রম করতেই শেখরণ চোখ তুলে তাকালেন। সেই চোখের দিকে তাকালে কিছুই বোঝা যায় না। শীতল, ভাষাহীন, ভাবলেশহীন সেই চোখ। হিসেবি গলায় শেখরণ বললেন, 'তুমি ঠিকই বলেছ অরুণ। আর লুকোছাপার প্রয়োজন নেই। ইট ক্যান বি আ নেশন ওয়াইড ম্যানহান্ট। তুমি একটা ফর্মাল রিপোর্ট লেখো, আজই। সাবমিট করো আমার কাছে, উইদ ইওর রেকমেন্ডেশন। আমি তোমাকে ডাইরেক্ট পিএমও-র আন্ডারে এই ইনভেস্টিগেশনের সর্বময় কর্তা হিসেবে অ্যাপয়েন্ট করছি।'

'আ... আ... আমি! না না, আমি কী বলছেন? কোভার্ট রিস্ক অ্যানালিসিস একরকম। আর সভারিন সয়েলে এইরকম হাই প্রোফাইল ম্যানহান্ট মাউন্ট করা - আমাদের অনেক এক্সপেরিয়েন্সড লোক রয়েছেন। আই অ্যাম জাস্ট এ ডেস্ক জকি। আমি এসব কীভাবে সামলাব?' থতোমতো খেয়ে যান অরুণ! কিন্তু শেখরণ মনস্থির করে ফেলেছেন।

'দেখো, এই মুহূর্তে তুমিই একটু এগিয়ে আছ। ইউ আর অলরেডি ডিপ ইনটু দিস। এখন নতুন কেউ এলে, তাকে হ্যান্ডওভার দিতেও উই উইল লুজ টাইম! মোরওভার— আমার মনে হয় তুমি যথেষ্ট সক্ষম এই কাজটা করতে। সামহাউ এই ক'দিনের তোমার কাজ দেখে, যেভাবে তুমি এই রিস্ক অ্যানালিসিস করেছ, যা ডিসিশন নিয়েছ তা দেখে আমার মনে হয়েছে ইউ ওয়্যার আন্ডার ইউটিলাইজড! সো, ইট হ্যাজ টু বি ইউ। নো ফারদার আর্গুমেন্ট অন দিস প্লিজ!' 'বাট স্যর!'

'প্লিজ অরুণ! এনাফ অফ ইওর বাটস এন্ড ইফস! তুমিই বললে আমাদের এক্ষুনি কাজ শুরু করতে হবে।' ধৈর্যহীন এবং উত্তপ্ত শোনায় শেখরণের গলা, এতক্ষণে, 'সো গেট দ্য ফাক আপ নাও অ্যান্ড স্টার্ট অন ইট।'

অরুণ চুপ করে যান। তারপর ধীরে ধীরে বলেন, 'ওকে। বাট আই নিড ফিউ থিংস!'

'নেম দেম!'

'পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর সফর কবে থেকে কবে অবধি?'

‘৩১ জুলাই থেকে ৫ আগস্ট!।'

‘শিট! মানে আর মাত্র সাত দিন! ওকে। আমার ডিটেলস ইটিনিরারি লাগবে ওই সফরের। পুরো গেস্ট লিস্ট। কোথায় কোথায় থাকবেন। সেখানকার সিকিউরিটি ডিটেলস, তাদের প্রত্যেকের ব্যাকগ্রাউন্ড চেকের ডিটেলস!’

‘কাল সকালে তোমার ডেস্কে থাকবে, বিফোর নাইন!’ ‘অ্যান্ড আই নিড জুরিসডিকশনাল সুপিরিয়রিটি!’

‘হোয়্যার?’

‘অল ওভার ইন্ডিয়া!!’

এক বারও থমকালেন না অরুণ। কাজ যদি তাঁকেই করতে হয়, তাহলে তাঁর শর্তেই করবেন। শেখরণও বিন্দুমাত্র ইতস্তত করলেন না।

‘কনসিডার ইট ডান! তুমি যে কোনো জায়গা থেকে যে কোনো ইনফর্মেশন চাইতে পারবে। কোথাও অসহযোগিতা পেলে, ইউ টেল মি! এনিথিং এলস?’ ‘অ্যাজ অফ নাও, নো!’

‘তাহলে আমার একটাই শর্ত। সেটা বলে নিই।'

‘শর্ত?’ অরুণ একটু আশ্চর্যই হয়ে যান। এটা যেন একটু এগেনস্ট দ্য রান অফ ইন্সিডেন্টস, হয়ে গেল। শেখরণের আবার কী শর্ত থাকতে পারে?

‘তুমি ম্যানহান্ট খুল্লামখুল্লা চালাতে পারো, ফর দিস ভাইজান অর হোয়াটেভার! কিন্তু আসল পারপাস যেন কেউ না জানে।'

‘তাহলে? লোকের মনে প্রশ্ন তো উঠবেই। তার কোনো অফিসিয়াল উত্তর না পেলেও, নিজের মনের মতো করে ভেবে নিতে কেউই পিছপা হবে না। রকমারি গুজব ছড়াবে। সেটা তো আরও বিপজ্জনক!’

‘ইন দ্যাট কেস, আওয়ার অফিসিয়াল আনসার ইজ আওয়ার অরিজিনাল প্রিমাইস! অর্থাৎ আমাদের পিএম-এর ওপর অ্যাসাসিনেশান অ্যাটেম্পু! ট্রুথ উইথ এ স্পিন!’

চেয়ার থেকে উঠতে উঠতেই শেষ কয়েকটা কথা বলেন শেখরণ!

‘ওকে। নো প্রবলেম!’ বলতে বলতে উঠে পড়েন অরুণ সচদেভও। তাঁকে দ্রুত কাজ শুরু করতে হবে। চোরাবালিতে যত দ্রুত কোনো শরীর ডুবে যায় তার চেয়েও দ্রুত এবং অনিবার্য গতিতে তিনি ডুবে যাচ্ছেন সিস্টেমের সেই জালে যাকে তিনি এতদিন এড়িয়ে এসেছেন।

প্রচণ্ড চিন্তাগ্রস্ত অবস্থায় অন্যমনস্ক অরুণ সচদেভ নীচে নেমে যখন গাড়ির দিকে এগোচ্ছিলেন, ঠিক তখনই শেখরণ নিজের ঘরে ফোন করছিলেন কাউকে, ‘হি হ্যাজ টেকেন দ্য বেট! সো ফার, ইওর প্ল্যান রকস! হোপ ইট সাকসিডস!!’ ‘ইট উইল! ইট মাস্ট!

ওপার থেকে এক প্রায় বৃদ্ধের গলায় সামান্য আত্মপ্রসাদের সুর শোনা যায় কি?

সপ্তদশ অধ্যায়
।। ফাইট ফর দ্য সেন্টার - হোয়াইট মুভস।।

।। ১৭.১।।
।।দ্য নোন ভেরিয়েবল।।

২৮ জুলাই, ২০১৮, সকাল বেলা / কলকাতা, ভারত

কোনো তারা-মার্কা নেই। তবু আবদুলের ম্যাগি পয়েন্টের ঠিকানা গুগল ম্যাপেও আছে।

মোটামুটি সমান্তরাল দুটো রাস্তা, বর্ধমান রোড আর জাজেস কোর্ট রোড। এই দুটোকে জুড়ছে যে আড়াআড়ি রাস্তাটি, তার কেতাবি নাম নিউ রোড। আর এই নিউ রোড যেখানে জাজেস কোর্ট রোডের সঙ্গে মিশছে, সেই মোড়ের মাথায় একটু বাঁ-হাতে এগোলেই আবদুলের ম্যাগি পয়েন্ট। জয়দীপ বেশিরভাগ দিনই ব্রেকফাস্ট এখানেই সারে। প্রায় মাস সাত-আট হল তার এই নতুন রুটিনের।

এক বছর আগেও জয়দীপ কুমারকে যারা চিনত, তাদের পক্ষেও ভাবা সম্ভব ছিল না যে আবদুল নামধারী কোনো লোকের দোকানে জয়দীপ খাবার খাবে। একগুঁয়ে, গোঁড়া, জাতপাত মেনে চলা সেই জয়দীপের এই এক বছরে বিপুল পরিবর্তন হয়েছে। চেহারা তার মোটের ওপর একইরকম আছে। মাঝারি হাইট, গাট্টাগোট্টা, থুতনিতে দাড়ি। মেজাজ এবং মুখও যে খুব বদলেছে তা নয়। তবে সে জাতপাতের উঁচু-নীচু বিচার আর করে না।

আবদুল বলে লোকটি যে কে, তা সে চেনে না। লুঙ্গি-শার্ট পরা যে মাঝবয়েসি কালো, রোগা লোকটা চা বানায় সে হতে পারে। আবার তার আর ওই ধুমসো গতরের বউটির ছেলের নামও আবদুল হতে পারে। জয়দীপ সে নিয়ে মাথাও ঘামায় না। সে শুধু জানে গাজর, বিনস, মটরশুঁটি, পেয়াঁজ দিয়ে বউটি যে ম্যাগি বানায় তা খেতে একঘর। আবার বললে, তাতে ডিমভাজা টুকরো টুকরো করে মিশিয়েও দেয়। তার জন্যে এক্সট্রা পয়সা অবিশ্যি!

এটা খেলে পেটটা বেশ অনেকক্ষণ ভরা থাকে। পরীক্ষিৎস্যরের টিমে কাজ করতে করতে সে বুঝেছে যে এই পাগল লোকের পাল্লায় পড়লে, অফিসে ঢুকে আর খাওয়ার সময় পাওয়া যাবে কিনা তার কোনো ঠিকঠিকানা থাকে না। প্রথম প্রথম দু-এক বার তার এরকম হয়েছে যে সারাদিনই চা ছাড়া কিছু জোটেনি। তাই সে দিন কয়েক পর থেকেই এই কায়দাটা নিয়েছে। অফিসে ঢোকার আগেই একটা ভারী ব্রেকফাস্ট করে ঢোকা। প্রায় সাত-আট মাস ধরে তার বাঁধা রুটিন— সে কাজের দিনই হোক বা ছুটির দিন— দোকানে ঢুকেই সে হাঁক দেয়, ‘ভাবি! ডবল ডিম, ডবল ম্যাগি!’

আজও সে একই নিয়মে চলছিল। বাইকটা স্ট্যান্ড করিয়ে রেখেই নিজের স্বভাবসিদ্ধ হাঁক পেড়ে থেবড়ে বসেছিল কাঠের বেঞ্চিতে। আর ঠিক তখনি ফোনটা বেজে উঠল। অফিসের যে ক’টা নম্বর থেকে ফোন আসতে পারে, সেগুলোর জন্য জয়দীপের আলাদা রিংটোন সেট করা আছে। যাতে বাইক চালানোর সময় রিং শুনে সে বুঝতে পারে, তক্ষুণি গাড়ি থামানোর দরকার আছে না নেই। এই রিংটোনটা অফিসের নম্বরের নয়। প্যান্টের পেছনের পকেট থেকে ফোনটা বের করে সে দেখল অচেনা নম্বর। ল্যান্ডলাইন মনে হচ্ছে। ফোনটা কানে তুলতে ওপাশ থেকে একটা গলা ভেসে এল, ‘কেমন আছেন জয়দীপবাবু?’ পরিশীলিত বাংলা উচ্চারণ! জয়দীপ নিজে বাঙালি না হলেও দীর্ঘদিন কলকাতায় কাজ করছে। খাস বাঙালি উচ্চারণ তার কানে ঠিকই ধরা পড়ে। কিন্তু গলাটা কার সেটা সে বুঝতে পারে না।

‘কে বলছেন?’ জিজ্ঞেস করে সে।

‘সেটা তো ইম্পর্ট্যান্ট নয়। ধরে নিন আপনার পুরোনো বন্ধু বলছি। বেদ ভিওয়ানিকে খুঁজে পেলেন? অভিজাত রায়কে?’

‘...দাদা, এই ন্যান, আপনার ডিম-ম্যাগি...’ আবদুলের মা বা আবদুলের বউ—যে-ই হোক, খ্যানখেনে গলা আর বড় স্টিলের ডিশ বাড়িয়ে ধরে। শশশশ... মুখে আঙুল দিয়ে ইশারায় তাকে চুপ করতে বলে জয়দীপ বেঞ্চি থেকে উঠে একটু পাশে সরে যায়। সতর্ক গলায় বলে, ‘কী দরকার, বলুন তো!’

‘দরকার আমার নয়! দরকার তো আপনাদের। তিন দিন হয়ে গেল, মুখ্যমন্ত্রীর ছেলে নিখোঁজ, তার ড্রাইভার খুন— এরপরও কী আপনারা একটুও এগোতে পেরেছেন?’

জয়দীপ দু’ সেকেন্ডের জন্য ফোনটা কান থেকে নামিয়ে নম্বরটা আবার দেখে। নাহ, চেনা নম্বর নয়, কলকাতার নম্বর বলেও মনে হচ্ছে না। চট করে ফোন কানে তুলেই সে বলে, ‘এগুলো সবই আমরা জানি। এসব বলার জন্যই ফোন করেছিস নাকি?'

‘আপনি থেকে একেবারে তুইতোকারি?’

‘আড়ালে থেকে যারা ভাট বকে তাদের সঙ্গে আমি এরকম করেই কথা বলি!’ এবার জয়দীপ গলা চড়ায়!

‘হুম! যাক গে, আপনার সঙ্গে বোঝাপড়া তো পরে। আপাতত একটু উপকার করেই দিই... ব্রহ্মপুর জায়গাটা চেনেন? ৬৩, ঋষি রাজ নারায়ণ রোডে একটা বাংলো বাড়ি আছে। নীলেন্দু চক্রবর্তীর বাড়ি। এক বার ঢুঁ মারুন না ওখানে।'

‘ওখানে কী আছে?'

‘সবই যদি আমি বলে দেব তাহলে আপনি মাইনে পাবেন কেন? যান, জিজ্ঞেস করুন বেদ ভিওয়ানি আর অভিজাত রায়ের কী সম্পর্ক!’

কথাটা শেষ করেই ফোনটা কেটে দিল ওপারের গলা। টু-টু করে একটা আওয়াজ। জয়দীপ ফোনটা পকেটে পুরে ফিরে তাকাল। ম্যাগির ডিশ নিয়ে তখনও বউটা দাঁড়িয়ে আছে। মাখো মাখো, ধোঁয়া ওঠা, ভাজা ডিমের বড় বড় টুকরো জেগে থাকা ম্যাগিটার দিকে তাকিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল জয়দীপ, মনে মনে। তারপর পকেট থেকে একটা পঞ্চাশ টাকার নোট বের করে এগিয়ে ধরে বলে, ‘এটা তুমি খেয়ে নাও দিদি, আমার এখন আর সময় হবে না।'

উত্তরের অপেক্ষা না করেই জয়দীপ প্রায় ছুটে গিয়ে বাইকে ওঠে। স্টার্ট দেয়। পরীক্ষিৎস্যর ওকে খুব একটা পছন্দ করেন না। নির্মাণ আর প্রতিম দুজনেই ওর আগে থেকে আছে স্যরের টিমে। স্বাভাবিকভাবেই ওরা বেশি প্রেফারেন্স পায়। দেখা যাক, আজকে ছকটা উলটে দেওয়া যায় কিনা।

।। ১৭.২ ।।
।। কমপ্লিকেটেড ক্যালকুলেশন্স ।।

২৮ জুলাই, ২০১৮, সন্ধে বেলা / কলকাতা, ভারত

'স্যর, ওই চার জনের কী করব?'

'খাওয়া-দাওয়া করাও। করিয়ে বসিয়ে রাখো। আমি আসছি।'

'ঠিক আছে স্যর!' স্যালুট ঠুকে ছেলেটি বেরিয়ে যাওয়ার মুহূর্তেই আর একটা কথা মনে পড়ে যায়।

'আর হ্যাঁ, শোনো নির্মাণ— ওই মেয়েটিকে আলাদা বসিয়ে রাখবে খাওয়া হয়ে গেলে। আর, একটু চোখে চোখে রেখো...

'শিওর স্যর!'

নির্মাণ ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই ঢোকে রতন, 'স্যার, এখানেই খাবার আনব? নাকি কোয়ার্টারে যাবেন?'

'কী রান্না করেছিস?'

'আলু-ফুলকপি ভাজা আর ডিমের ডালনা।'

'আঃ! জমে যাবে রে!! নিয়ে আয় এখানেই।' বাক্যের প্রথমার্ধের আতিশয্যে রতনের চোখ দুটো যেমন একটু আনন্দে জ্বলে উঠেছিল, তেমনি দ্রুত তা আবার নিভে যায়। অফিসঘরেই খাবে মানে সেই ছ্যাকরা-ব্যাকরা করে খাওয়া। অর্ধেক খাবার পড়ে ঠান্ডা হবে। সে এক বার চেষ্টা করে, 'এক বার চলুন না, নতুন ফুলকপি! বাড়ি গিয়ে আরাম করে গা ধুয়ে-টুয়ে তারপর না হয়...'

'জ্বালাস না, রতনা! যা বললাম, কর।' ততক্ষণে সামনের একটা কাগজে ডুবে যেতে যেতে অন্যমনস্ক গলায় জানান পরীক্ষিৎ! রতন বুঝে যায় আর চেষ্টা করে লাভ নেই। অগত্যা!

রতন বেরিয়ে গেলেও নিষ্কৃতি মেলে না পরীক্ষিতের।

ফোনটা বেজে ওঠে সঙ্গে সঙ্গে। স্ক্রিনে নামটা দেখে একটু ভ্রূ কুঁচকে যায়। জয়দীপ! ছেলেটা জয়েন করেছে এক বছরও পুরো হয়নি বোধহয়। যে অপারেশন থেকে এসেছে— সেই লেভেলের মনুমেন্টাল ব্যর্থতা পরীক্ষিৎ খুব কম দেখেছেন। তার পরেও আশ্চর্যজনকভাবে খুব ওপর লেভেল থেকে ফেভারেবল 'রেকো' নিয়ে এসেছিল জয়দীপ কুমার। অপছন্দভরেই তাকে তেতো ওষুধ গেলার মতো করে গিলেছিলেন পরীক্ষিৎ। কিন্তু গত প্রায় এক বছরে দেখেছেন, বুলডগের মতো লেগে থাকার ক্ষমতা ছেলেটার। ব্রাইট নয় খুব একটা। কিন্তু পারসিসটেন্ট। আর পরীক্ষিৎ জানেন, গল্পে-নাটকে-সিনেমায় যা দেখানো হয়, গোয়েন্দা ব্যাপারটা মোটেও সেরকম নয়। বেশিরভাগ সময়ই ইন্টেলিজেন্সের চেয়ে পারসিস্টেন্স বেশি জরুরি ও বেশি উপকারী গুণ। আর সেদিক দিয়ে একে টপকানোর মতো লোক পরীক্ষিতের টিমে আর কেউই নেই এই মুহূর্তে।

পরীক্ষিতের তিন ঘোড়া। প্রতিম ব্যস্ত বেদ ভিওয়ানি আর অভিজাত রায়ের ডিজিটাল ফুটপ্রিন্টস অ্যানালাইজ করতে। নির্মাণ ফলো-আপ করছে ধাড়সার কেসটা। অভিজাতর গাড়ির ড্রাইভার মারা যাওয়াটা কেসটাকে আরও গোলমেলে করে দিয়েছে। জয়দীপ গ্রাউন্ডে আছে। ওর নেটওয়ার্ক খুব ভালো। এই কলকাতার এমন এমন কোণে, এমন এমন স্তরে ওর ইনফর্মার ছড়িয়ে আছে, যেখানে পুলিশ মহলের কান সাধারণত পৌঁছোয় না। তাই ওর ওপর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে মাটিতে কান পেতে রাখতে। কোথাও কিছু আউট অফ দ্য অর্ডিনারি শুনতে পেলে, দেখতে পেলে বা জানতে পারলে— রিপোর্ট করতে।

কিন্তু যত ভালো নেটওয়ার্কই হোক, দায়িত্ব পেল কাল রাত্রে, আর আজকে দুপুরে ফোন করবে, এতটা পরীক্ষিৎ আশা করেননি। আর কোনো লিড না পেলে, কোনো সলিড গ্রাউন্ড না পেলে, পরীক্ষিৎকে ফোন করার মতো বোকামি ওর টিমের লোকজন করে না।

একটু আশ্চর্য হয়েই ফোনটা কানে তুললেন পরীক্ষিৎ, 'হ্যালো!'

'হ্যালো স্যর! আমি জয়দীপ বলছি।' সামান্য হাঁপাচ্ছে জয়দীপ। একটু উত্তেজিত।

'বলো।'

'স্যর, আই হ্যাভ গট সামথিং! শ্যাল আই কাম ওভার?'

'তুমি কি অভিজাত কোথায়, সে খবর পেয়েছ?'

'না, তা ঠিক না।' একটু আমতা আমতা করে জয়দীপ। 'তবে এমন একটা খবর পেয়েছি, যেটা ফোনে বলাটা ঠিক হবে কিনা বুঝতে পারছি না।'

'আপাতত ফোনেই বল।' জয়দীপ যতটা উত্তেজিত, ইচ্ছাকৃতভাবেই সমপরিমাণ নিরুত্তাপ গলায় মাখিয়ে রাখেন পরীক্ষিৎ। ছেলেটা একটু ইম্পালসিভ। কন্ট্রোলে রাখতে হয় মাঝে মাঝেই।

'ওকে স্যর। আসলে আমি এখন ব্রহ্মপুরে।'

'ব্রহ্মপুর! সে আবার কোথায়?'

'ওই বাঁশদ্রোণীর দিকে স্যর!'

'ওকে, তা ওখানে কেন?'

'একটা লিড পেয়ে এখানে অ্যাডভোকেট নীলেন্দু চক্রবর্তীর বাড়িতে এসেছিলাম।'

'সে আবার কে?'

'সে নয়, স্যর, তার ছেলে, অর্ঘ্য! অভিজাত রায়ের বন্ধু। সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু, একদম স্কুলের সময় থেকে এখনও অবধি।

'বেশ! তারপর?' এতক্ষণে একটু নড়েচড়ে বসেন পরীক্ষিৎ।

'তার থেকে যা খবর পাচ্ছি স্যর...' গলাটা একটু নামায় জয়দীপ, '... অভিজাত রায় ওয়াজ গে, অ্যান্ড... অ্যান্ড... বেদ ভিওয়ানি ওয়াজ হিজ পার্টনার!!' 'হোয়াট!!!'

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে গিয়ে চেয়ারটাকেই সশব্দে ফেলে দেন পরীক্ষিৎ। এই হচ্ছে জয়দীপ। কোনো ভূমিকা নেই। কোনো আবডাল নেই। কোনো পূর্বপ্রস্তুতি নেই। কোনো সফিস্টিকেশন নেই। যেই বলা হয়েছে ফোনেই বলতে, ওমনি বলেই দেবে, ঠিক সেই ভাষায়, যে ভাষায় সে ভেবেছে কথাগুলো।

চেয়ার পড়ার আওয়াজে ওপাশে জয়দীপও একটু ঘাবড়ে গেল। একটু ভয়ে ভয়েই বলল, 'স্যর!?'

ততক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়েছেন পরীক্ষিৎ। সংবৃত গলায় বললেন, 'তুমি যে কথাটা বললে, তার পক্ষে কোনো প্রমাণ আছে?'

'উইটনেস আছে স্যর! এদের এই ব্রহ্মপুরের বাংলোতেই পার্টি-মোচ্ছব হত বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে প্রায়শই।

'হুমম। ছেলেটাকে নিয়ে আসতে পারবে?'

'অ্যারেস্ট করব নাকি স্যর?'

'উফ, না না! অ্যারেস্ট করবে কী গ্রাউন্ডে? ওর বাবা উকিল বললে না? সিম্পলি রিকোয়েস্ট করো। বলো, ওর একটু হেল্প চাই। খুব বেশি হলে ঘণ্টা খানেক।'

'আর যদি আসতে না চায়, স্যর? ছেলেটা, ইয়ে, মানে, একটু ভয়ে আছে!' 'কেন? ভয় কীসের?' কথাটা বলেই পরীক্ষিতের মনে একটা সন্দেহ উঁকি দেয়, 'তুমি কি কিছু গণ্ডগোল পাকিয়েছ?'

'আরে ভীষণ ঢেঁটিয়া মাল স্যর! মুখটা এমন করে থাকবে যেন কিস্সু জানে না। কিন্তু আমার খবরও পাকা ছিল। তাই একটু চেপে ধরতেই...'

'হুম। বুঝেছি। ছড়িয়েছ।' স্পষ্টতই বিরক্ত হন পরীক্ষিৎ। এই কেস একেই সেনসিটিভ। তার ওপর এই ধরনের গণ্ডগোলের আঁচ পেলে মিডিয়া একদম ঝাঁপিয়ে পড়বে। ব্যাপারটাকে যত দ্রুত সম্ভব কনটেইন করতে হবে। জয়দীপের দ্বারা হবে না। গম্ভীর গলায় ফোনে তিনি বললেন, 'ছেলেটার সঙ্গে আমার কথা বলাও! যে ভাবে পারো!'

বিরক্তিতে ভুরু কুঁচকে, অল্প মাথা নাড়তে নাড়তে সবেমাত্র ফোনটা রেখেছেন কী রাখেননি, সঙ্গে সঙ্গে আবার একজন ঢুকল।

এবারে প্রতিম। হাতে একটা বড় ব্রাউন এনভেলপ!

হাল ছেড়ে চেয়ারে হেলান দিয়ে পরীক্ষিৎ বেশ তেতো গলায় বললেন, 'এবার কী? কেস সামারি লিখতে শেখাতে হবে নাকি গাড়ির তেল ভরার ভাউচারে সই?'

প্রতিম একটু থতোমতো খেয়ে গেলেও খুব অবাক হয় না। সে কম দিন কাজ করছে না। আর পরীক্ষিতের এই মেজাজের অর্থ সে বোঝে। স্যর নির্ঘাত একদিকে মন বসাতে চাইছেন আর কাজের চাপ তাঁকে অন্যদিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। সে একটু নীচু গলায় বলে, "কী হল স্যর? কোনো প্রবলেম? আমি কি কোনো কাজে লাগতে পারি?'

প্রতিমের ঠান্ডা মেজাজ দেখে নিজেকে অতি কষ্টে সংবরণ করেন পরীক্ষিৎ। এই ছেলেটি বুদ্ধিমান। ঠান্ডা মাথার। এর ওপর বৃথা চেঁচামেচি করে তো লাভ নেই। অল্প উত্তাপের রেশ তখন গলায় থেকে যায় যদিও, 'না থাক। সে পরে হবে। তুমি আগে বলো, কী বলতে এসেছ।'

'আপনি বলেছিলেন না, ওই অভিজাত রায় আর তার বডিগার্ডের সম্বন্ধে খবর সংগ্রহ করতে...'

'হ্যাঁ, তা সে রিপোর্ট তো পেয়েছিলাম গতকালকেই। বিশেষ কিছুই তো পেলাম না। যতসব বোরিং, ফালতু খবর। ওগুলো তো সিএম-এর অফিসে খোঁজখবর করলেই জানা যায়। নাহ, তোমার ওপর ভরসা আমার দিন দিন কমে যাচ্ছে, প্রতিম!'

গলায় আবার তাপ জমতে থাকে। প্রতিম তড়িঘড়ি বলে ওঠে, "ঠিকই বলেছেন স্যর। ওই রিপোর্টে কিছুই ছিল না। নিছক রুটিন রিপোর্ট সেটা। কিন্তু, আমরাই-বা কী করব স্যর? বোঝেনই তো! সিএম-এর ছেলে। কেউই নিরাপদ স্টেটমেন্টের বাইরে অফিসিয়ালি কিছু দিতে চায় না।'

'অফিসিয়ালি না দিতে চায়, আন-অফিসিয়ালি তো জোগাড় করা যেত, নাকি? তুমি কি পোলবা থানার হাবিলদার? এই সব ফালতু অজুহাত...'

'সরি স্যর!' পরীক্ষিতের কথা কেটেই প্রতিম বলে ওঠে, 'কিন্তু আজ, এই ঘণ্টা খানেক আগে আমাদের কাছে একটা লিড আসে।'

'লিড?' এই বারে একটু নড়েচড়ে বসেন পরীক্ষিৎ।

'হ্যাঁ স্যর। ঘণ্টা খানেক আগে একটা ফোন এসেছিল আমাদের অফিসের নম্বরে। একটা বিজ্ঞাপন দিয়েছিলাম না আমরা— যদি কারও কিছু জানা থাকে, কোনো কিছু চোখে পড়ে, রিগার্ডিং অভিজাত রায়, তাহলে আমাদের জানাতে সেখান থেকেই কেউ নম্বর পেয়ে থাকবে।'

'কেউ? মানে?"

'মানে, ইয়ে স্যর— আননোন কলার! ফোন করে শুধু বলল অভিজাত রায় ও তার বডিগার্ডের ব্যাপারে কিছু অজানা তথ্য তার কাছে আছে।'

অন্যমনস্কভাবে টেবিলে থাকা সিগারেটের প্যাকেটের দিকে হাত বাড়িয়ে সিগারেট বার করতে করতে পরীক্ষিৎ বললেন, 'বেশ! তো, সেই অজানা তথ্য জানানোর বদলে কলারকে কী দিতে হবে আমাদের?'

'সেসব কিছুই বলেনি স্যর! শুধু বলল এক ঘণ্টা পরে এই আলিপুর হেড পোস্ট অফিসের সামনে যে ডাকবাক্সটা আছে সেখানে খোঁজ করতে।'

'পোস্ট অফিস? ডাকবাক্স? তারপর?' সিগারেটের ধোঁয়ার আড়ালে নিজের মুখের ভাব লুকোনোর চেষ্টা করলেও পরীক্ষিতের গলায় চোরা উদ্‌বেগ আর আগ্রহ বেশ টের পাওয়া যায়।

'এই কিছুক্ষণ আগে হেমন্ত গিয়েছিল স্যর! আমাদের বিশেষ ভরসা ছিল না, কিছু পাব বলে। এরকম ক্র্যাঙ্ক কল তো কতই...'

'কী পাওয়া গেল?' কথা অসম্পূর্ণ রেখে মাঝপথেই জিজ্ঞেস করে ওঠেন পরীক্ষিৎ, 'পাওয়া গেল কি কিছু?'

বসের ব্যগ্রভাব দেখে প্রতিমও একটু আশ্চর্য হয়। যদিও সেটা তার আচরণে প্রকাশ পায় না। সে শান্ত গলাতেই উত্তর দেয়, 'হ্যাঁ স্যর, এই ছবিগুলো পাওয়া গেছে। আর এই দুটো ডকুমেন্টের জেরক্স!'

এনভেলপ থেকে বের করে সে ভেতরের জিনিসগুলো সামনের টেবিলে মেলে ধরতে থাকে। ততক্ষণে আধ-খাওয়া সিগারেটটা টেবিলে থাকা অ্যাশট্রেতে গুঁজে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন পরীক্ষিৎ। ভুলেই গেছেন তাঁর টেবিলে আসা সরকারি ফরমানটির কথা। ভুলেই গেছেন এই একটু আগেই মনের মধ্যে কীরকম দোটানা চলছিল। একদিকে হাতে এত হাই প্রোফাইল একটা কেস— অন্যদিকে ন্যাশনাল সিকিউরিটি!

কিন্তু ঠিক এই মুহূর্তে পরীক্ষিৎ রক্তের গন্ধ পাওয়া হাউন্ডের মতো। গন্ধ খুবই সামান্য হতে পারে। কিন্তু পুরো মন, সমগ্র চেতনা জুড়ে শুধু এই লিডটা জানার আগ্রহ।

ছবিগুলো এক এক করে তুলে নিয়ে দেখতে থাকেন। বিদেশের কোনো শহরের ছবি। পরীক্ষিৎকে ডিস্টার্ব করবে না বলেই প্রতিম এই মুহূর্তে একদম চুপ করে গেছে। জায়গাটা কোথায়, জিজ্ঞেস করার জন্য চোখ তুলে তাকাতে যাওয়ার আগেই একটা সেলফি চোখে পড়ল। পেছনে সেই বিশ্ববিখ্যাত টাওয়ার— বুর্জ খলিফা! দুবাই!!

অভিজাত বছর খানেক আগে দুবাই গেছিল এটা জানা। সিএম কিছু একটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল মিট-এ গেছিলেন। আর সেই সময় ছেলেকে নিয়েই গেছিলেন। এটুকু স্বজনপোষণ ঠিকই আছে। কিন্তু সব ক'টি ছবিতেই সঙ্গের ছেলেটি ভ্রু কুঁচকে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট।

বেদ ভিওয়ানি! অভিজাত রায়ের নিখোঁজ বডিগার্ড। দেহরক্ষীর সঙ্গে এত অবাধ মেলামেশা? মনে প্রশ্নটা আসতে না আসতেই যেন থট রিড করেই প্রতিম বলে ওঠে, 'এক বার এই ডকুমেন্টসগুলো দেখুন স্যর! একটা ক্রেডিট কার্ডের ট্রানজ্যাকশন রিসিট আর অন্যটা একটা মোটেলের গেস্ট ডেটা! স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে অভিজাত অন্তত একটা রাত্তির তার সরকারিভাবে অ্যালটেড হোটেলের রুমে কাটায়নি। কাটিয়েছিল এই মোটেলে। পার্সোনাল কার্ড ব্যবহার করেছিল।'

চেয়ারে বসতে বসতে চিন্তাচ্ছন্ন গলায় পরীক্ষিৎ বললেন, 'এর থেকে তোমার কী ধারণা?'

'স্যর, আই থিংক অভিজাত ওয়াজ অনটু সামথিং! মে বি কোনো এসকর্ট সার্ভিস ইত্যাদি নিয়েছিল। অ্যান্ড দিস গাই, হিজ বডিগার্ড— হি নিউ দিস।'

মুচকি হাসেন পরীক্ষিৎ। তারপর বলেন, 'অ্যান্ড হাউ ডাজ দ্যাট হেল্প আস?'

'নট শিওর স্যর!'

'আচ্ছা, আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড চেকের সময় আমরা বেদ ভিওয়ানির সম্বন্ধে কী জানতে পেরেছিলাম?

'নাথিং স্পেশাল স্যর! ইউজুয়াল সার্ভিসম্যান! ভালো কেরিয়ার। বয়স পঁচিশ। হরিয়ানার ছেলে। লং টার্ম আছে এই অ্যাসাইনমেন্টে।' 'বিয়ে-থা?'

'না স্যর! বাবা মারা গেছে। দুই বোনের বিয়ে হয়ে গেছে। বাড়িতে শুধুই বিধবা মা!'

'কোনো প্রেম-টেম?'

পরীক্ষিৎ কোনদিক থেকে এগোচ্ছেন ধরতে না পেরে একটু খেই হারানো গলায় প্রতিম বলে, 'সেরকম কিছু পাওয়া তো যায়নি স্যর! বাট, উই ডিডন্ট লুক ফর ইট আইদার! শ্যাল উই?'

'হ্যাঁ। চেক করো। আর হ্যাঁ, সেইসঙ্গে এটাও চেক করো, বেদের অ্যাসাইনমেন্ট এখানে এতদিন এক্সটেন্ড হয়েছে কার রিকোয়েস্টে!' 'শিওর স্যর! এক্ষুনি শুরু করছি।'

বলেও প্রতিম বেরিয়ে যায় না ঘর থেকে। একটু ইতস্তত করতে থাকে। পরীক্ষিৎ

একদৃষ্টিতে ছবিগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে সেটা বুঝতে পেরে মুখ তুলে তাকান, ‘কিছু বলবে?’

‘হ্যাঁ স্যর— মানে, আপনার অ্যাঙ্গেলটা ঠিক...’

পরীক্ষিৎ একটা ছবি এগিয়ে দেন প্রতিমের দিকে। অভিজাত এবং বেদ দাঁড়িয়ে আছে কোনো একটা শপিং মলের সামনে। প্রতিম ফোটোটায় চোখ বুলোয়। পরীক্ষিৎ বলে ওঠেন, ‘আই হ্যাভ মাই রিজনস টু বিলিভ— দ্যাট অভিজাত অ্যান্ড বেদ ওয়্যার পার্টনারস!!’

‘এক্সকিউজ মি স্যর!!’

প্রতিম এতটাই আশ্চর্য হয়ে যায় যে তার মুখ দিয়ে এর চেয়ে বেশি আর কিছুই বেরোয় না। পরীক্ষিৎ তার দিকে তাকিয়ে বলেন, ‘ইউ হার্ড মি প্রতিম! আমি ভুল হতেই পারি। কিন্তু দুজন অনাত্মীয় প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষকে আমি হাত ধরাধরি করে হাঁটতে বা ছবি তুলতে দেখি না খুব একটা। নাও প্লিজ গো অ্যান্ড ট্রাই টু প্রুভ মি রাইট অর রং, আইদার ওয়ে!'

প্রতিম টেবিল থেকে সব ক’টি ছবি ও ডকুমেন্ট গুছিয়ে এনভেলাপে ভরে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার উপক্রম করে। পরীক্ষিৎ তাকে তখন আর এক বার বলেন, ‘জয়দীপ যদি এসে গিয়ে থাকে, তাকে এক বার আমার কাছে পাঠিয়ে দাও তো।’

‘এই ব্যাপারেই স্যর?’ প্রতিম দাঁড়িয়ে, পেছন ফিরে প্রশ্নটা করে।

‘নাহ, সামথিং এলস!'

‘ওকে স্যর, এক্ষুনি পাঠাচ্ছি।'

২৮ জুলাই, ২০১৮, রাত্রি বেলা / কলকাতা, ভারত

কম্পাউন্ডের এই পশ্চিম দিকটা একটু নির্জন। এদিকের বিল্ডিংটা পুরোনো। বিপজ্জনকভাবে পোড়োও বটে। এখন এখানে কেউই বসে না। চার বছর আগে বাজেট মিটিং-এ পাশ হয়ে গেছিল এই বিল্ডিং ভেঙে নতুন স্টেট অব দ্য আর্ট মনিটরিং অ্যান্ড কমিউনিকেশনস সেন্টার বানানোর। কিন্তু সরকারি ব্যাপারস্যাপার! বাজেট পাশ হওয়া আর সে টাকা ট্রেজারি থেকে এসে প্রকৃতপক্ষে কাজ শুরু হওয়ার মধ্যে তফাত রয়েছে।

এই সবে মাপামাপির কাজ শুরু হয়েছে। আরও মাস ছয়েক তো লাগবেই কাজ শুরু হতে, পুরোদমে। তবে একবার কমপ্লিট হয়ে গেলে রাজ্য প্রশাসনের, বিশেষত আইন-শৃঙ্খলার ব্যাপারটায় একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসবে।

পরিকল্পনা আছে, হাওড়া-কলকাতা তো বটেই, বর্ধমান, দুর্গাপুর, কল্যাণী ইত্যাদি টায়ার টু শহর; শ্রীরামপুর, হলদিয়া, চুঁচুড়া, আসানসোল এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ জেলাশহর, সদর শহর; এমনকী রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ গ্রাম পঞ্চায়েতেও লাগানো হবে প্রচুর সংখ্যক ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা। রাস্তাঘাট, পার্ক, ট্র্যাফিক সিগন্যাল, মন্দির, মসজিদ, খেলার মাঠ— এক এক করে সমস্ত বর্গ ইঞ্চিকে আনার চেষ্টা করা হবে এই নজরদারির আওতায়। সেই সব লাইভ ফিড নিয়ে, বিশ্লেষণ করে, সমস্যা শুরু হবার আগেই প্রিভেন্টিভ মেজার নেওয়া হবে। অন্তত পরিকল্পনা সেরকমই।

তবে সেসবের এখনও দেরি আছে। গোটা রাজ্যবাসীকে এই নজরদারির আওতায় আনার আগে, তাদের হাঁটা-চলা, প্রেম-বিরহ, ঝগড়া-ঝাঁটি— সমস্ত একেবারে নিজস্ব অভিজ্ঞতাগুলি রাষ্ট্রের ক্ষমতাকুটিল চোখের সামনে হুবহু মেলে ধরার আগে, পরীক্ষিৎ এইটুকু নির্জনতা উপভোগ করে নিতে চান শেষ কয়েক দিন। আজকের ডিনারটা জম্পেশ হয়েছে। ধনেপাতা কুচো ছড়িয়ে এই ডিমের ডালনাটা রতন খুব ভালো রাঁধে। তেল-ঝাল একদম মাপমতন। সঙ্গে অসময়ের ফুলকপি ভাজা। জমে গেছিল ব্যাপারটা। নিজের চেম্বারের লাগোয়া একটা ছোট্ট ঘর আছে। সেখানেই খেয়ে-দেয়ে হাত-মুখ ধুয়ে পায়ে পায়ে এই জায়গাটায় এসে দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট ধরিয়েছিলেন পরীক্ষিৎ।

এই আধো নির্জনতায় সারাদিনের ক্যাকোফোনি থেকে দূরে দাঁড়িয়ে একটু ভাবতে চান তিনি। এ তাঁর অনেকদিনের অভ্যেস। একাধিক জটিল সমস্যা যখনই তাঁকে জর্জরিত করেছে, তিনি সেসবের থেকে একটু দূরে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন। সমস্যার কেন্দ্রে থেকে ভালো বোঝা যায় না তার গতি। বোঝা যায় না তার জটিল নকশায় কোন তন্তু জড়িয়ে রয়েছে অন্য কোন তন্তুর সঙ্গে। তাই কখনো কখনো ঈগলের মতো উঁচু থেকে একটা তীক্ষ্ণ নৈর্ব্যক্তিক পর্যবেক্ষণ লাগে। আর সেই জন্যই এই একলা সময়টুকু দরকার হয় পরীক্ষিতের। এই সময় তিনি নিজেই নিজের সঙ্গে প্রশ্নোত্তরের খেলা খেলতে থাকেন!

অভিজাত বা তার বডিগার্ডের এখনও কোনো খবর নেই। রাজ্যের সমস্ত থানা, সমস্ত টোলগেট, সমস্ত পেট্রোলিং টিমের কাছে খবর গেছে। যদি এই রাজ্যেই থেকে থাকে তাহলে কখনো-না-কখনো, কারও-না-কারও নজরে পড়বেই। কিন্তু সেটা কবে? সিএম-এর ছেলে। যতই সে প্রাইম সাসপেক্ট হোক তার নিজের বাবাকেই মারার চক্রান্তে, আপাতত তাকে খুঁজে বার করাটাই প্রাথমিক লক্ষ্য! আর সত্যি কথা বলতে কী, সিএম-এর ওই 'অ্যাটেম্প্ট টু মার্ডার'-এর গল্প তার নিজেরই হজম হয় না। বাতিকগ্রস্ত লোক, এমনিই পা পিছলে পড়ে গিয়ে চোট পেয়েছে নির্ঘাত। যে ছেলে বাবার সঙ্গে এক ছাদের তলায় কাটায়, তার কাছে আরও অনেক সহজ সহজ উপায় আছে নিজের বাপকে মারার; যদি অবশ্য তার একান্ত প্রয়োজন হয়।

তবে মার্ডার অর নো মার্ডার, অভিজাত রায় যে নিখোঁজ এবং সেই ঘটনার যে প্রায় সত্তর ঘণ্টা হতে চলল সেটা তো সত্যিই। চাপ বাড়ছে ক্রমশ। ড্রাইভারের ডেডবডি খুঁজে পাওয়ায় জটিলতা বেড়েছে বই কমেনি। খেতে বসার আগেও কমিশনার-সাহেবকে ফোনে আশ্বস্ত করতে হয়েছে যে খুব শিগ্গিরই, ঘণ্টা ছয়েকের মধ্যেই কিছু পজিটিভ নিউজ দেওয়া যাবে। পরীক্ষিৎ জানেন, ডাহা ঢপ মেরেছেন। এ কী ডিটারজেন্ট সাবান বেচা নাকি যে সময় বেঁধে বলে দেওয়া যাবে এর মধ্যে এত প্যাকেট বিক্রি হবেই!! এতদিন এই পেশায় থেকে পরীক্ষিৎ জানেন, লোকজনের টেন্সড স্নায়ুকে সাময়িক শান্তি দিতে এরকম স্তোকবাক্য মাঝে মাঝে শোনাতে হয়। খুঁজে পেলে তো খুবই ভালো; না পেলে একই স্তোকবাক্য আবার রিপিট করবেন।

কিন্তু অদ্ভুতভাবে পরীক্ষিতের মন বার বার বিক্ষিপ্ত হয়ে চলে আসছিল এই অভিজাত আর তার বডিগার্ডের ব্যাপারটায়। জয়দীপকে কে ফোনে খবর দিল? প্রতিমকেই-বা কে ফোন করল? দুটো নম্বরই লোকাল নয়। সাধারণ পদ্ধতিতে ট্রেসেবলও নয়। সেই চেষ্টা ইতিমধ্যেই করা হয়ে গেছে। কোনো ফল দেয়নি।

এই জমানায় কে মেল আইডি ইত্যাদি ছেড়ে ডাকবাক্সে ছবি পাঠায়? সাধারণের চেয়ে একটু বেশিই বুদ্ধিমান লোকটা। পরীক্ষিতের মতোই সেও জানে কম্পিউটারের সুরক্ষা সবচেয়ে জনপ্রিয় আধুনিক রূপকথাগুলোর একটা। সিকিউরিটি যতই কড়া হোক, হ্যাক করা মোটেও হাতি-ঘোড়া ব্যাপার নয়। তাই এই লো-টেক পদ্ধতি। কিন্তু নিজের পরিচয় গোপন রাখতে এত বুদ্ধি খরচা করাইবা কেন? নিজেকে প্রোটেক্ট করার জন্য? তাহলে কি সিএম-এর কাছের কেউ?

ভাবতে ভাবতেই চকিতে মনে পড়ে পরীক্ষিতের—আচ্ছা, যেখানে ওই লেটার বক্সটা আছে, ওখানে তো একটা ট্র্যাফিক সিগন্যাল আছে। তার মানে তো সিসিটিভি। ফুটেজ পাওয়া যাবে না? প্রতিমকে এই কথাটাও মনে করাতে হবে।

অভিজাতর ড্রাইভারের ডেডবডি গেছে ফরেনসিকে। এখানকার ল্যাবের লোকজনের বাহাত্তর মাসে বছর হয়। তাদেরকেও একটু ফোন করে হুড়কো দিতে হবে।

আর এই সব কিছুর মধ্যে কিনা ওই চিঠিটা? খোদ পিএমও-র নোট। এখন খড়ের গাদায় ছুঁচ খুঁজে বেড়াও, কর্তাদের মর্জিতে।

জয়দীপ যে লিডটা এনেছে সেটাও খুবই ইম্পর্ট্যান্ট। প্রতিমের পাওয়া প্রমাণ, জয়দীপের পাওয়া উইটনেস— দুটোই কোনো আননোন কলারের সৌজন্যে। বোঝা যাচ্ছে এই কলার কোনো কারণে চাইছে পুলিশ এই সম্পর্কের কথাটা নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করুক। কিন্তু কে এ? কেন সাহায্য করছে?

ভাবতে ভাবতে দু’ নম্বর সিগারেটটাও প্রায় শেষ করে এনেছেন পরীক্ষিৎ, ঠিক সেই মুহূর্তে তাঁর চটকা ভাঙল।

‘স্যর, দে আর রেডি নাও!’

নির্মাণ... নির্মাণ ডাকছে। হু আর রেডি? ওহ শিট! ওই চারটে লোক। ভাবনার অতলান্ত গভীরতা থেকে বাস্তবের মাটিতে ফিরে আসতে দু-একটা ঢেউয়ের ঝটকা লাগে। সংবিৎ ফিরে পেতেই পরীক্ষিৎ সিগারেটের বাকি অংশটা মাটিতে ফেলে পায়ে পিষে দেন। নির্মাণের দিকে তাকিয়েই বলেন, ‘মেয়েটাকে আলাদা রেখেছ তো?’

‘হ্যাঁ স্যর। আগে ওর সঙ্গেই কথা বলবেন?’ ‘ইয়েস! চলো।’

২৮ জুলাই, ২০১৮, রাত্রি বেলা / কলকাতা, ভারত

'ঠিক শুনেছিস? শাহজাদা বলেছিল, নামটা? অন্য কিছু বলেনি?'

মেয়েটা মাথা নীচু করেই থাকে। কিন্তু ঘাড় নাড়াটা আত্মবিশ্বাসী। এবারে সে মুখটা অল্প তুলে বলে, 'আমি লোকটাকে বলতে শুনেছি যে সে শুধু শাহজাদার সঙ্গেই কথা বলতে চায়।'

'আর কিছু?'

'সবই তো বললাম আপনাকে এতক্ষণ!'

'আরেক বার জিজ্ঞেস করছি, তাই আবার বলবি।' সামান্য গলা চড়ান পরীক্ষিৎ।

বন্যা বলে মেয়েটি ঘাড় অল্প বেঁকিয়ে জেদি টিয়াপাখির মতো বসে থাকে। পরীক্ষিৎ একটু চমকেই গেছেন, মেয়েটা যা বলেছে তাতে। ওই আশ্রমের জমায়েতের মধ্যে তিনি ঠিকই পড়েছিলেন মেয়েটার চোখ। সে কিছু দেখেছে এবং কিছু বলতে চায়। কিন্তু ওই ভিড়ের মধ্যে ভয় পাচ্ছে। কিন্তু যা বলতে চায় তা যে এরকম হেঁয়ালি- তা কে জানত? আরও কথা বের করতে হবে এর পেট থেকে। অনেকসময় দেখেছেন, যাকে ইন্টারোগেট করা হচ্ছে তার কোনো ধারণাই থাকে না সে কী কী তথ্য জানে, তা সম্বন্ধে। অভিজ্ঞ ইন্টারোগেটররা সেই ধরনের তথ্যও বের করে আনতে পারে প্রশ্ন করার কুশলতায়। - এর ওপর গলা চড়িয়ে লাভ হবে না আন্দাজ করেই প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই গলা এক পর্দা নামিয়ে পরীক্ষিৎ আবার প্রশ্ন করেন, 'ক'জনকে দেখেছিস, বললি?'

'দেখতে পাইনি ভালো করে। অন্ধকার তো। খালি গলার আওয়াজ শুনেছি। তিন জনের। তার মধ্যে এক জন নেশা করেছিল আর খুব খারাপ কথা বলছিল। 'হুমম! আর?'

'অন্য দুজন ইংরেজি আর বাংলা মিশিয়ে কথা বলছিল। তখনই এক জন আরেক জনকে বলে সে শুধু শাহজাদার কথা শুনবে।'

'তুই শিওর, ও শাহজাদা বলেছিল। অন্য কিছু নয়? মানে ধর, ভাইজান বা এই টাইপের?'

'ভাইজান!' এই শব্দবন্ধটা মেয়েটা আগের বার শোনেনি। এবারে পরীক্ষিতের মুখে শুনেই সে কী একটা ভাবতে শুরু করল। ভাবতে ভাবতেই অল্প অন্যমনস্ক গলাতেই সে বলল, 'এক বার বোধহয় বলল— ওই যে লোকটা শাহজাদার ছাড়া কারও কথা শুনবে না বলেছিল, সে-ই এক বার যেন বলল, ভাইজান! মানে ডাকল অন্য লোকটাকে। তখন তো মনে হয়েছিল ওই মুসলমানরা যেমন ভাইকে ভাইজান বলে, সেরকমই। এই আপনি এখন জিজ্ঞেস করলেন, তাই মনে পড়ল। না হলে মনেই পড়ত না।'

পরীক্ষিৎ একদৃষ্টিতে মেয়েটার দিকে তাকিয়েছিলেন। বন্যার চোখের চাউনিতে কোনো অস্পষ্টতা নেই। স্মৃতি খুঁড়ে ঘটনাগুলো বলার মধ্যে কোনো জড়তা নেই। মনে হচ্ছে এ যা বলছে সত্যি কথাই বলছে। আর তাই যদি হয়, তাহলে পরীক্ষিৎকে এখনই এক জায়গায় ফোন করতে হবে।

চেয়ার থেকে সটান উঠে দাঁড়াল সে। নির্মাণ তো ঘরে ছিলই। ইন্টারোগেশনের ফাঁকে কখন প্রতিমও ঢুকেছে এই ঘরেই। দুজনকে দু' পাশে নিয়ে বেরোতে বেরোতে পরীক্ষিৎ বলতে শুরু করলেন, 'প্রতিম, আননোন কলার ট্রেস করেছিলে?'

'অলরেডি ডান স্যর, নো লাক। ব্যাঙ্গালোরের একটা সুইচ-বোর্ডের নাম্বার। কম্পিউটারের মাধ্যমে কলটা করা হয়েছিল। আইপি ট্র্যাক করার চেষ্টা করা যায়, বাট অনেক টাইম যাবে। শ্যাল উই ডু ইট?'

'ইয়েস। ট্র্যাক করার চেষ্টা করো। আউটসাইড হেল্প যদি লাগে, নাও। বাই দ্য ওয়ে, আরও কিছু বলার আছে তোমাকে।'

'বলুন স্যর!'

'ফরেনসিক আর পোস্ট-মর্টেমের খবর নাও, তড়িৎ শিটের! নিড ইট ইয়েস্টারডে!! ওঁর বাড়িতে খবর দেওয়া হয়েছে?'

'হ্যাঁ স্যর। পোস্ট-মর্টেম কমপ্লিট। সামারি রিপোর্ট আপনার টেবিলে আছে। নাথিং দ্যাট উই অলরেডি ডোন্ট নো! গানশট উন্ড একটাই, সেটাই ফ্যাটাল! মোস্ট প্রোবাবলি নাইন এমএম...'

শুনেই একটু ভুরু কুঁচকে যায় পরীক্ষিতের। নাইন এমএম আর্মি ইস্যু সার্ভিস রিভলবার! তাহলে কি বেদ ভিওয়ানি... চিন্তাসূত্রে ছেদ পড়ল কারণ প্রতিম তখনও বলে চলেছে, '...ব্যালিস্টিক রিপোর্ট এলে কনফার্ম বোঝা যাবে। আশা করছি কালকে চলে আসবে।'

'হুম। মিনহোয়াইল আর এক বার করে থানাগুলোতে খোঁজ নাও, কিছু পাওয়া গেল কিনা... উই হ্যাভ টু গিভ সাম নিউজ অ্যাবাউট অভিজাত রায় বাই দ্য মর্নিং!'

'শিওর স্যর!'

'অ্যান্ড কিপ মি পোস্টেড!'

'শিওর স্যর!'

কথা বলতে বলতে পরীক্ষিৎ এসে বসে পড়েছেন তাঁর চেয়ারটিতে। এবারে তিনি নির্মাণের দিকে ফিরলেন, 'এই চার জনকে ছেড়ে দাও।'

'আর কাউকে কিছু জিজ্ঞাসা করবেন না?'

'নাহ! মেয়েটাকে আমার ডাইরেক্ট নাম্বারটা দিয়ে দাও, মোবাইলের। বলে দাও, কিছু মনে পড়লে, কোনো কিছু মনে পড়লে, তা সে যতই ছোটখাটো ব্যাপার হোক— ও যেন আমাকে সরাসরি ফোন করে।'

'ওকে স্যর।'

নির্মাণ বেরোতে বেরোতেই আবার প্রতিম এসে ঢোকে। এবারে দৌড়ে। হাঁপাচ্ছেও সে একটু একটু, 'স্যর! নিশ্চিন্দা থানার হাইওয়ে পেট্রোল টিম কল করেছিল।'

'নিশ্চিন্দা! সেটা কোথায়?'

'হাওড়া, বালি। বাট, দ্যাটস নট ইম্পর্ট্যান্ট স্যর! দে... দে সেড অভিজাত এবং অভিজাতর বডিগার্ডকে খুঁজে পাওয়া গেছে!!

'হোয়াট!?'

ছিটকে উঠে পড়েন পরীক্ষিৎ। দরজা দিয়ে বেরোতে বেরোতেই তিনি প্রতিমের কথা শুনতে থাকেন, 'ওরা দুজনকেই এস. এস. কে. এম.-এ নিয়ে আসছে!'

'গুড! লেটস মুভ!'

প্রতিম দ্রুত পায়ে এগিয়ে যায় গাড়ি বের করার বন্দোবস্ত করতে। পরীক্ষিৎ এই ফাঁকটুকু কাজে লাগান। ফোনে একটি নম্বর ডায়াল করে কানে ফোন চেপে ধরেন।

দু-তিনটে রিং-এর পরেই ওপাশে একটি গম্ভীর গলা ফোন ধরে, 'অরুণ সচদেভ স্পিকিং!'

'স্যর, দিস ইজ পরীক্ষিৎ। কলকাতা পুলিশ, ক্রাইম ব্রাঞ্চ!!'

'দিস ইজ রিগার্ডিং?' জিজ্ঞাসু স্বরের জবাবে, ছোট একটা দম নিয়ে পরীক্ষিৎ উত্তর দেন, 'দিস ইজ রিগার্ডিং ভাইজান, স্যর! উই হ্যাভ গট এ লিড!!'

অষ্টাদশ অধ্যায়

।। ফাইট ফর দ্য সেন্টার— ব্ল্যাক মুভস।।

।। ১৮.১।।

।। দ্য আনপ্রোটেক্টেড ডায়াগোনাল।।

২৬ জুলাই, ২০১৮, দুপুর বেলা / কলকাতা, ভারত

'হি ইজ বিয়িং ফলোড! শ্যাল আই বি অববিয়াস টু?'

'কে ফলো করছে?'

'পুলিশের লোক। বারুইপুর থানারই। তবে অফ ডিউটি মনে হয়। অফিসকে কনট্যাক্ট করতে তো দেখিনি এখনও।

'ইজ হি শার্প?'

'আই উড সে সো! ইয়া! হি ইজ গুড!'

'বেটার দ্যান ইউ?' হালকা একটা হাসির সঙ্গে প্রৌঢ়ের রসিকতা ভেসে আসে!

'ওয়েল, লেট মি পুট ইট ইন দিস ওয়ে— উই ডোন্ট প্লে দ্য সেম গেম!!' এপাশের ছেলেটির মুখেও মৃদু হাসি খেলে যায়। সে হাসিতে অহংকার নয়, মিশে আছে একটা অনুচ্চারিত আত্মবিশ্বাস! হাসিটা মিলিয়ে যাবার আগেই গলা ভেসে আসে, 'ওকে। এখনই অববিয়াস হওয়ার দরকার নেই। কনট্যাক্ট এস্টাব্লিশ করার জন্য একটু সাবধানতা নাও। যদি খুব প্রকাশ্য হয়ে পড়ে, আর লোকটি যদি তোমার কথামতো শার্প হয়, তাহলে সন্দেহ করতে পারে। উই ডোন্ট ওয়ান্ট দ্যাট! ডু উই?'

'কুল! উইল কল ব্যাক ইন অ্যানাদার টুয়েন্টি ফোর আওয়ার্স!'

সদ্য পলেস্তারা লাগানো পাকা দেওয়াল। গত দু' দিনের বৃষ্টিতে সিমেন্ট ভিজে কেমন একটা ছায়া ছায়া ভাব তাতে। ছাদের প্যারাপেট থেকে রং করা শুরু হয়েছে। সেখানে সাদা রং ঝকঝকে। পুরো জিনিসটা দেখতে ঠিক যেন চকোলেট কেকের ওপর সাদা ক্রিমের আস্তরণের মতো।

মসজিদের ছাদের দিকে দেখতে দেখতে শামসুদ্দিনের মনে পড়ল, তার বউটা, ফাতিমা— চকোলেট কেক খেতে খুব ভালোবাসে। তাদের ছা-পোষা সংসারে রোজ যে কেক আসত তা নয়, তবে ওই সিনেমা-টিনেমা দেখতে গেলে দুজনেই মলের ভেতরের কেক-পেস্ট্রির দোকান থেকে পেস্ট্রি কিনে খেত। ফাতিমা যেভাবে প্লেটে লেগে থাকা চকোলেটের শেষ ছোঁয়াটুকুও আঙুলে তুলে নিয়ে চেটে চেটে খেত, তা দেখে মায়া না হয়ে উপায় নেই। শামসুদ্দিন প্রায়ই আরও একটা পেস্ট্রি কিনে দিত ফাতিমাকে। আদুরে বিড়ালের মতো বরের দিকে তাকিয়ে সেটুকুও একইরকম যত্নে খেয়ে নিত বউটা। ভারী পরিশ্রমী, লক্ষ্মীমন্ত মেয়ে ছিল ফাতিমা!!

কবে যে আবার তার সঙ্গে দেখা হবে!! বুক ঠেলে আসা দীর্ঘশ্বাসটা বুকের ভেতরেই রেখে হাতঘড়িটা দেখে শামসুদ্দিন। যে সময় তার এখানে দাঁড়ানোর কথা, তা পেরিয়ে গেছে প্রায় আধ ঘণ্টা হতে চলল। তাহলে কি কেউ আসবে না? তাহলে কি শামসুদ্দিন ভুল দেখল? নাহ, তা তো সম্ভব নয়। বিগত ছ-সাত বছর ধরে এটা শামসুদ্দিনের রুটিন কাজ। রোজ খবরের কাগজের থার্ড পেজে বিজ্ঞাপনের নির্দিষ্ট একটি কলাম খুঁটিয়ে পড়া।

প্রায় দু' সপ্তাহ আগের কথা। বারুইপুর থানায় বসে কাগজ পড়তে পড়তেই তার চোখে পড়েছিল, সেই কলামে বেরিয়েছে সেই বহু প্রতীক্ষিত বিজ্ঞাপন, 'অসুস্থ ভাইজানের থেকে আর দূরে থেকো না। প্লিজ যত তাড়াতাড়ি পারো দেখা করে যাও এসে। এবারে ঈদের চাঁদ একসঙ্গে দেখে যাও।' সঙ্গে দেওয়া ছিল একটা ফোন নম্বর!

অভ্রান্ত চিহ্ন। এই মেসেজ অন্য কারও থেকে আসতেই পারে না। তিনটে বাক্য। প্রথম বাক্যে সাতটা শব্দ। পরেরটায় গুণে গুণে আটটা। আর শেষে ছ'টা। ৭, ৮, ৬!

বিসমিল্লাহ্! এই চিহ্ন ভুল হতেই পারে না। এই আহ্বানের জন্যেই তো এই দীর্ঘ প্রতীক্ষা!!

তাহলে? তাহলে দেরি কেন? সেদিন ফোনে তো এইখানেই দাঁড়াতে বলা হয়েছিল। বলা হয়েছিল সব চিহ্ন মুছে ফেলে আসতে। কেউ যেন কোনোভাবে তার হদিশ না পায়, কাজ শেষ করার আগে। তা চিহ্ন মুছে দিয়ে এসেছে বই কী শামসুদ্দিন! কিন্তু যে জন্য এত কিছু...

অন্যমনস্ক হয়ে ভাবছিল শামসুদ্দিন। একটা ছেলে লিফলেট বিলি করছিল। এসে তার হাতেও একটা গুঁজে দিয়ে চলে গেল। শামসুদ্দিন একটু চমকে উঠতেই দেখল, চলে যাওয়ার পথে ছেলেটা ফিসফিস করে বলছে, 'মসজিদে ঢুকে যান।'

চমক কাটিয়ে কিছু বলার আগেই শামসুদ্দিন দেখল ছেলেটা বেশ অনেকটা এগিয়ে গেছে লিফলেট বিলি করতে করতে। একটু অবাক হয়ে চারপাশে তাকিয়ে দেখল শামসুদ্দিন। বিশেষ করে নজরে পড়ার মতো কিছুই নেই। একটু দোনামনা করল সে। যাবে নাকি যাবে না? মুহূর্তের মধ্যেই সে তার সিদ্ধান্তহীনতার ভাব ঝেড়ে ফেলল। যে পথে সে বেরিয়েছে, সে পথে আর দ্বিধা চলে না।

মসজিদে ঢুকেই মূল বিল্ডিং-এর সামনে ডান দিকে একটা সাদা রঙের, জাফরি কাটা দেওয়ালের গায়ে সারি সারি হাত-মুখ ধোয়ার বেসিন। সঙ্গে ট্যাপকল। নামাজের আগে হাত-মুখ-নাক-চোখ-কান ধুয়ে ফেলার নিয়ম। তার জন্যই এই ব্যবস্থা। বেসিনগুলোতে ভিড় দেখে শামসুদ্দিনের খেয়াল হল 'অসর'এর নামাজের সময় হয়ে এসেছে। মৌলালি ব্যবসায়ী প্রধান এলাকা। দোকানে দোকানে বসে থাকা মানুষগুলোর সকালের দিকে নামাজ পড়ার সময় হয়ে ওঠে না সবসময়। আবার সন্ধের দিকগুলোও খদ্দেরদের ভিড় থাকে। এই দুপুরের দিকটাতেই একটু ফাঁকা। তাই এই সময় বেশি ভিড় হয়। ইতস্তত করতে করতে শামসুদ্দিনও একটা বেসিনের সামনে কয়েক জনের পরে গিয়ে লাইনে দাঁড়ায়।

বেসিনের সামনে পৌঁছে মুখে জল দেওয়ার জন্য সামনে ঝুঁকতেই হঠাৎ একটা গলার আওয়াজ পেল সে, 'পেছন দিকের চবুতরায় চলে আসুন।'

বাংলায় নয়, চোস্ত উর্দুতে কথা বলল লোকটা। শামসুদ্দিন চট করে মুখটা তুলেই দেখল বাঁ-দিকে একটা মাঝারি হাইটের লোক পাশের বেসিনে মুখ ধোয়া শেষ করে এগিয়ে যাচ্ছে মসজিদের পাশ কাটিয়ে উঠোন দিয়ে, পেছন দিকে। পেছন থেকে লোকটার মুখ দেখা যায় না।

শামসুদ্দিন বিনা বাক্যব্যয়ে পিছু নিল লোকটার। পেছন দিকের উঠোনে ভিড় একটু কম। নামাজের আগে-পরে লোকজন এখানে বসে দু-একটা কথা বলে, একটু গল্পগাছা করে। অনেক এতিম, দুঃখী মানুষ রাত্রে শুয়েও থাকে এদিকটায়। তাদের পোঁটলাপত্তর, প্লাস্টিকের ব্যাগ কোথাও কোথাও জড়ো হয়ে আছে, সিঁড়ির কোণে কোণে। লোকটার পিছু পিছু এসে একটু দ্রুত পা চালিয়ে তার কাছে পৌঁছে যায় শামসুদ্দিন। আশ্চর্য— লোকটা কিন্তু থামেও না, পিছুও ফেরে না! ঠিক যখন সে লোকটার পিঠে টোকা মেরে ডাকতে যাবে— তখনি পেছন থেকে তার পিঠে পড়ল টোকা।

চকিতে ফিরেই শামসুদ্দিন দেখে একটা রোগা-ঢ্যাঙা লোক। থুতনিতে ক'দিনের ছাগুলে দাড়ি। ঢলঢলে একটা পাঠান স্যুট পরনে। পানের রসের ছোপ লাগা দাঁত বার করে হেসে সে চোস্ত উর্দুতে বলে, 'আর একটু হলেই চিঠি তো ভুল ঠিকানায় পাঠাচ্ছিলেন জনাব!'

শামসুদ্দিন থতোমতো খেয়ে যায়। তারপর বলে ওঠে, 'আপনি কে?'

লোকটা এদিক-ওদিক দেখে একটু ঘন হয়ে আসে, 'আমাকে ভাইজান পাঠিয়েছেন।'

শামসুদ্দিনের সন্দেহ যায় না। সে এক বার ফের তাকিয়ে দেখে সেই লোকটির দিকে, যার পিছু নিয়ে সে আসছিল, একটু আগেই। সে লোক ওরকমই ভ্রূক্ষেপহীন, ততক্ষণে পেছন দিকের গেটের কাছে। বেরিয়ে যাওয়ার পথে। এই লোকটার গলা, উর্দু উচ্চারণ থেকে এটুকু স্পষ্ট, মুখ ধোয়ার সময় এরই গলা শুনেছিল শামসুদ্দিন। কিন্তু এ সত্যিই ভাইজানের লোক কিনা, সেটা বোঝার কী উপায়?

একটু পিছিয়ে এসে সে বলে, ‘কে ভাইজান? আমি ওরকম কাউকে চিনি না।'

লোকটা ওর দিকে তাকায়। তারপর মৃদু হেসে বলে, ‘সহি বাত! এই নিন, ভাইজানের হাতের লেখা ফরমান!’

এই জিনিসটা যে দরকার লাগবে লোকটা তা জানত। অদৃশ্যে থাকা সেই ক্ষুরধার প্রৌঢ় জানত। মাঝে মাঝে অবাক হয়ে যেতে হয় ভেবে, যে ঠিক দাবাড়ুদের মতোই এতগুলো মুভ এগিয়ে ভাবা কীভাবে সম্ভব?

যেদিন সে আবদুল রিহান কুরেশির সঙ্গে দেখা করেছিল, জেলের মধ্যে, সেদিনই সে এই মেসেজটার বন্দোবস্ত করে রেখেছিল।

কাগজটার দিকে এক ঝলক তাকায় শামসুদ্দিন। এ হাতের লেখা তার বিলক্ষণ চেনা। অবশেষে সে একটু আশ্বস্ত হয়। সহজভাবে আদাব জানিয়ে বলে, ‘আমি শাম...’

‘কোনো নাম দরকার নেই জনাব। আমরা গুমনামিই ঠিক আছি।' ‘বেশ। আমাকে কী করতে হবে?’

‘আমাদের এক জায়গায় যেতে হবে। আমি একা গেলেই হত। ভাইজানের নির্দেশ—আপনাকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার। টিকিটও আপনাকেই কাটতে বলেছেন। শিয়ালদা যান, দুজনের টিকিট কাটুন, ট্রেনের। থ্রি-টায়ার স্লিপার। এই নিন টাকা আর মোবাইল ফোন। আপনার ফোনটা আমায় দিন। ওটা নষ্ট করে ফেলতে হবে।'

শামসুদ্দিন যন্ত্রবৎ লোকটির কথামতো কাজ করে যায়। হাতে হাজার পাঁচেক টাকা আর একটা ফিচার ফোন নিয়ে বলে, ‘কিন্তু, কোথায় যাবার টিকিট?’ ‘গান ক্যাপিটাল অফ ইন্ডিয়া! মুঙ্গের!!’

২৭ জুলাই, ২০১৮, দুপুর বেলা / কলকাতা, ভারত

শামসুদ্দিন যখন হাওড়া স্টেশনের টিকিট কাউন্টারে দাঁড়িয়ে হাওড়া-জামালপুর তৎকাল কোটার টিকিট খুঁজছিল, ঠিক সেই সময় একটা চকোলেট কালারের স্কুটি পাটুলি দমকল অফিসকে বাঁ-দিকে আর সত্যজিৎ রায় পার্ককে ডান দিকে রেখে এগোচ্ছিল বৈষ্ণবঘাটা-পাটুলি টাউনশিপ রোড বরাবর।

কিছুটা গিয়ে স্কুটিটা ডান দিকে বেঁকল। তার বাঁ-দিকে তখন ঝিল। একটু এগিয়েই একটি ছোট্ট পুল। পুল পেরোলেই ওপারে রেলের এলাকা শুরু। রাস্তার ধারে ধারে কোথাও কংক্রিটের তৈরি শিল্লারের ডাঁই। কোথাও ঝুপড়ি চাজলখাবারের দোকান। সেখানে ভাঁড়ের চা আর আলুর দম-পাঁউরুটির টিফিনের লোভে ভিড় জমিয়েছে মাথায় শক্ত প্লাস্টিকের হেলমেট পরা লেবারের দল। আর তাদের উচ্ছিষ্টের লোভে ভিড় জমিয়েছে ডুমো ডুমো মাছি।

রাস্তার ধারে বেশ কিছুটা জায়গায় বেশ ভালোরকমই ঝোপঝাড়-জঙ্গল। খালি খালি। এখনও মানুষের অবাধ্য ভিড় সেই জায়গাগুলোকে জবরদখল করে নেয়নি। একটেরে একটা ঝুপড়ি দোকানের গা ঘেঁষে দাঁড়াল স্কুটিটা। যে লোকটি নেমে এল, তার পরনে ওই লেবারদের মতোই পোশাক। মাথায় হেলমেটটা একইসঙ্গে স্কুটি চালানোর আবার সাইটের কাজের— দু' জায়গাতেই কাজে লাগানো হয়। দোকানে ঢুকে সে অনির্দিষ্ট কারও দিকে তাকিয়ে হেসে, হাত নাড়ল একটু। তারপর একটা ফাঁকা টেবিলে একটা চেয়ার নিয়ে বসে পড়ল।

ঝুপড়ি হলেও দোকানটার ভেতরে জায়গা অনেকটা। বাঁশের বেড়া দিয়ে রান্নার অংশ আর খাবার অংশ আলাদা করা। রান্নার অংশে সামনের দিকে আর পাশের দিকে সাজিয়ে রাখা শোকেস আবার পার্টিশন বা প্রাইভেসির কাজও করছে। একদিকে ছোট্ট ফাঁক রাখা আসা-যাওয়া করার জন্য। খদ্দের ও দোকানি, উভয়পক্ষই পারস্পরিক বোঝাপড়ায় মেনে চলে, ওখানে একটি দরজা আছে; অদৃশ্য... কিন্তু আছে! খাবার অংশে ছ'টা প্লাস্টিকের টেবিল আর তাদের ঘিরে চারটে করে চেয়ার। নামেই শুধু চায়ের দোকান। চা-বিস্কুট ছাড়াও জলখাবারের কচুরি, আলুর দম, ডিমটোস্ট, ঘুগনি-পাঁউরুটি— দুপুরে ভাত, ডিমের ঝোল বা মাছের ঝোল, আবার বিকেলে মশলা মুড়ি ইত্যাদি পাওয়া যায়। ম্যাগি তো আছেই। সব মিলিয়ে এই গোটা কয়েক ঝুপড়িই হচ্ছে রেলের এই অংশে চলা কর্মযজ্ঞে ময়দানবের পোষা ভূতের মতো খেটে চলা লোকগুলোর সম্বল। খাওয়া-দাওয়া, একটু-আধটু চায়ের ব্রেক, সিগারেট-বিড়ি-খোশগল্প— সবই এই ঝুপড়িগুলোকে ঘিরেই। লেবার টাইপের লোকটা চারপাশে এক বার চোখ বুলোতে বুলোতেই দোকানের বারো-তেরো বছরের চটপটে ছেলেটা এসে হাজির। লোকটা এখানে

লাস্ট তিন-চার দিন ধরেই আসছে। তাই সে জানে, ছেলেটার নাম সুজল। ছেলেটাও জানে লোকটা কী অর্ডার করবে। তাই সে এসেই, গলায় কেজো ব্যস্ততা ফুটিয়ে বলল, 'সেই একই তো স্যার? ডিম-টোস্ট, লাল-চা আর দশের গোল্ডফ্লেক?'

'হ্যাঁ। পারলে চায়ে একটু লেবু মেরে দিস তো'

'লেবু-চা ছ' টাকা স্যার!'

'বাব্বা, দু' ফোঁটা লেবু দিবি, তার জন্য একটা গোটা টাকা?'

ছেলেটা কোনো কথা বলে না। বলার দরকারও নেই। দোকানে আরও দু-তিন জন ঢুকল। এদিক-ওদিক তাকিয়ে বসার জায়গা খুঁজছে। ব্যাটারা এই টেবিলেই না ভিড় জমায়!

ব্যাজার মুখে একটু আড়চোখে তাদের দিকে তাকিয়ে লোকটা আবার বলে, 'বেশ, তাই নিয়ে আয়। আর আজকে একবাটি ঘুগনিও দিস!'

ছেলেটা মাথা নেড়ে চলে যায়। সদ্য দোকানে ঢোকা লোকগুলো এগিয়ে আসে খাবার জায়গার দিকে। এদেরও পরনে ইউনিফর্ম। যদিও ইউনিফর্মটা একটু অন্যরকম। টেবিলে বসতে বসতেই তাদের মধ্যে আলোচনা চলতে থাকে জোর গলায়, 'যাই বলো স্বপনদা, বাজি তুমি মেরেই এনেছ। এটা গুরু, যতই বলো, একটা হাই-ফাই চান্স!'

'আরে ধুর বাল! প্রেস্টিজ ভাঙিয়ে কি চন্দ্রমুখী আলু কেনা যাবে দু' কেজি? কার চাই অমন ছেঁদো প্রেস্টিজ? একটা পয়সা তো এক্সট্রা ঠেকাবে না। এমনকী ওই সম্মানের নাম করে ইনক্রিমেন্টের কথাটাও বেমালুম গেঁড়িয়ে দেবে এরা। কম দিন তো দেখছি না।'

'তা বটে।' এতক্ষণে স্বপনের মুখোমুখি বসে পড়া তৃতীয় জন বলে। ওরা ঠিক লেবারটির পেছনের টেবিলেই জাঁকিয়ে বসেছে। 'তোমার এটা তিন নম্বর ডেপুটেশন মেট্রোতে, তাই না?'

'তিন নয়, চার, চার। কম বছর চাকরি হল রে বাবলু! এই সামনের নভেম্বরে তিপ্পান্ন বছর বয়স হয়ে যাবে। আঠাশে জয়েন করেছি। কোয়ার্টার সেঞ্চুরি ধরে ট্রেনই চালিয়ে যাচ্ছি প্রায়!'

'আচ্ছা, স্বপনদা, তোমাদের চাকরির প্রথম দিকে এরকম কড়াকড়ি ছিল?' প্রশ্নটা সেই প্রথম জনই আবার করে।

'কড়াকড়ি বলতে?' পালটা জিজ্ঞেস করে বাবলু, 'এই সব পরীক্ষা-টরীক্ষা বলছিস?'

'হ্যাঁ! মানে এই সব নানারকমের হুজ্জত...'

'ওঃ! নানা রকমের হুজ্জত,' একটু ভেঙিয়েই কথাটা বলেন স্বপনদা। 'সাধে কি তোমায় তোমার বাপ-মা ভোলানাথ নাম দিয়েছিল, ভোলাবাবু!' অল্পবয়েসি ছেলেটার থুতনি ধরে নেড়ে দিয়ে রসিক স্বপনদা বলতে থাকেন, 'সেন্ট্রালের চাকরি, আর তাতে ঝামেলা থাকবে না? এ কি বাওয়া তোমার রাজ্য সরকার পেয়েছ যে দুটো মেলা অর্গানাইজ করলেই প্রোমোশন?'

অর্ডার দেওয়া, খাওয়া, হাসি-ঠাট্টার ফাঁকে ফাঁকে চলতে থাকে তাদের আড্ডা। নিজেদের আড্ডায় মশগুল তিন মোটরম্যান খেয়ালও করে না পাশের টেবিলে একা একা বসে খেতে থাকা লেবারটা একমনে তাদের কথা শুনছে। খেতে খেতেই এক ফাঁকে ভোলা বলে ছেলেটি জিজ্ঞেস করে, "আচ্ছা, বাবলুদা, তুমি কতদিন এএলপি ছিলে?'

'বারো বছর!'

'বাব্বা, বারো বছর ধরে শুধু শান্টিং ডিউটি করে গেছ?'

'শুধু কি শান্টিং ডিউটি? মাঝে মাঝে ব্যাক-আপ হিসেবে থাকতাম। স্পেশাল ট্রেন, গণ্ডগোলের দিন, রাতের দিকে— মানে অনেক রাতে চালিয়েছি বার দুয়েক। তবে, ওই সবই সাত-আট বছর বাদে।

'হ্যাঁ, সবারই ওইরকম টাইম লাগে।' স্বপন চায়ে ভেজা ঠোঁট হাতের তেলোয় মুছে বলে।

'কই, তোমার তো লাগেনি।' ফুট কাটে ভোলা। বাবলু যোগ দেয়, 'স্বপনদার কথাই আলাদা! মোটরম্যানদের সচিন তেন্ডুলকর! চার চার বার মেট্রো রেলে দু' বছরের মেয়াদ। ইস্টার্ন রেলের মনে হয় রেকর্ড তোমার— ছ' বছরের মাথায় এএলপি থেকে প্যাসেঞ্জার ট্রেন। তাই না?'

'আঃ! ছাড় না।' একটু আত্মপ্রসাদের হাসির সঙ্গে মৌরি মিশিয়ে মুখে ফেলে স্বপনদা, মোটরম্যানদের সচিন তেন্ডুলকর!! কিন্তু বাবলু ছাড়ে না, 'ছাড় মানে? আচ্ছা, ডিপার্টমেন্ট তোমার সঙ্গে আমাদের কেন পাঠাল বলো তো? বালের নাকি কম্পিটিশন! বলে কোনোদিন চড়লামই না ডিএমসি-তে। আর এই বান্টু - ভোলা, শালা এর তো এখনও পোঁদের ফুল ঝরেনি। আমাদের পাঠানো আর না পাঠানো তো একই।'

'উহুঁ! এক নয় বাবলুদা!' বিজ্ঞের মতো মাথা নাড়ে ভোলা বলে অল্পবয়েসি ছেলেটি। ততক্ষণে ওরা উঠে পড়েছে টেবিল ছেড়ে, 'ডিপার্টমেন্ট চায় এটা স্বপনদাই করুক, কিন্তু

একটা নিয়ম তো আছে, তাই না?'

কথা বলতে বলতে তারা এগোচ্ছিল। ততক্ষণে পাশের টেবিলে লেবারটিরও খাওয়া শেষ। সেও ওই একই সময়ে বেরোতে যায়। পেছন থেকে আসা এদের দলটাকে দেখতে না পেয়ে বেরোতে গিয়ে স্বপনের সঙ্গেই হালকা ধাক্কা লাগে তার। লেবারটা সঙ্গে সঙ্গে সরে গিয়ে, 'সরি স্যার, সরি স্যার,' করতে থাকে।

স্বপন একটু হেসে তাকে হাত তুলে আশ্বস্ত করতে করতে আর কথা বলতে বলতে এগিয়ে যায়। তখনও বাবলুর কথা শোনা যাচ্ছে, 'মাইরি, মেট্রোর এই সব ভজঘট যন্ত্র কী করে তুমি বোঝো মাইরি...'

ওরা তিন জনে বেশ কিছুটা এগিয়ে যেতেই হঠাৎ পেছনে কারও দৌড়ে আসার শব্দ শোনা যায়। পেছন ফিরে ওরা দেখে ওই লেবার ক্লাসের লোকটি দৌড়ে আসছে। কাছে এসে সে বলে, 'স্যার, এটা বোধহয় আপনাদের কারও পকেট থেকে পড়ে গেসল!'

তার বাড়ানো হাতে স্বপনের আই কার্ড। স্বপন সঙ্গে সঙ্গে সেটা হাতে নিয়ে বলে, "থ্যাংক ইউ ভাই, থ্যাংক ইউ! এটা আজ হারালে পোঁদে হাম্পু দিয়ে দিত কোম্পানি!'

লেবারটি দেঁতো হেসে দাঁড়িয়ে থাকে, হেঁ-হেঁ করতে করতে। বুঝতে পেরে স্বপন পকেটে হাত ঢোকায়। একটা কুড়ি টাকার নোট বের করে ওর হাতে দিতেই সে আবার দোকানের দিকে ছুট লাগায়।

সেদিকে তাকিয়ে চুক চুক করে মুখে আওয়াজ করে স্বপন বলে ওঠে, 'ফালতু কুড়িটা টাকা পোঁদ-মারি-কল হয়ে গেল!'

'ধুর! তুমি না!! দুটো দেশের প্রধানমন্ত্রীর সামনে ট্রেন চালাবে, তাতেও তোমার কিপটেপনা যাচ্ছে না।' বলতে বলতে স্বপনের সঙ্গেই আবার হাঁটা লাগায় বাবলু আর ভোলা।

ওই দিকেই নিউ গড়িয়া কারশেড— কলকাতা মেট্রোর!!

উনবিংশ অধ্যায়
।।দ্য ডিসকভারড চেক।।

।।১৯.১।।
।।দ্য রিকয়েলিং।।

৩০ জুলাই, ২০১৮, সকাল বেলা / মুঙ্গের, বিহার, ভারত

‘সত্য কা যিসকে হৃদয় মে প্যার হো
এক পথ, বলি কে লিয়ে তৈয়ার হো
ফুঁক দে সোচে বিনা সংসার কো
তোড় দে মাঝধার যা পট্‌ওয়ার কো!’

‘এটা কার লেখা কবিতা মাস্টারবাবু? আপনার নাকি?’

পেছন থেকে আওয়াজটা শুনে চমকে তাকায় শামসুদ্দিন। চায়ের অপেক্ষা করতে করতে সে একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেছিল। চায়ের দোকানটা স্টেশন লাগোয়া বাজারের একপ্রান্তে। ইটের দেওয়াল। পুরোনো টিন আর টালি মিশিয়ে ছাদ। একধারে উনুন, গনগনে আঁচ। পশ্চিম বাংলার মতো এদিকে সব চায়ের দোকানে এখনও গ্যাস স্টোভ বা তোলা উনুন চালু হয়নি। সেই, পুরোনো মাটিলেপা উনুন, উঁচু বেদি করে। সেই আঁচে বসানো পুড়তে পুড়তে কালো হয়ে যাওয়া সসপ্যান।

রোদে পুড়ে ঝামা হয়ে যাওয়া বাদামি চামড়ায় সাদা এলোঝেলো দাড়ি, সাদা চুল, শিরা বের করা হাত... আটপৌরে ভারতবর্ষের চেহারা। এমন কিছু নেই যা লোকের আগ্রহ জাগিয়ে রাখবে। চায়ের অর্ডার দেওয়ার পর তাই শামসুদ্দিন এক-পা দু-পা করে সরে এসে দাঁড়িয়েছিল।

পেছনে রাস্তা। সামনে ফাঁকা জমি। রুক্ষ। মাঝে মাঝে খাপছাড়া কিছু ঘরবাড়ি এদিক-ওদিক মাথা তুলেছে। একটু দূরে ইটভাঁটির মতো কিছু একটা দেখা যাচ্ছে। ইতিউতি চরে বেড়াচ্ছে গরু-মোষ! এ দৃশ্যও কিছু নতুন নয়। এদেশের যে কোনো আধা-শহরের দৃশ্যের সঙ্গে খুব পার্থক্য নেই। তবে, বাজারের হট্টগোল বেশ কিছুটা ছাড়িয়ে এসে এই দোকানটা। তাই নির্জনতার একটা ছলনা লেগে আছে এর চারপাশে।

ভোম মেরে সেই নির্জনতায় ডুবেছিল শামসুদ্দিন। হঠাৎই তার মনের মধ্যে ঘাই মেরে উঠেছিল অতি প্রিয় একটি কবিতার কয়েকটি পংক্তি। এখন বুঝতে পারছে, নিজের অজান্তে একটু জোরেই উচ্চারণ করে ফেলেছিল সে লাইনগুলো। সেটাই কানে গেছে তার সঙ্গীর।

লোকটার হাত থেকে চায়ের ভাঁড় নিতে নিতে শামসুদ্দিন একটু লজ্জা লজ্জা মুখ করে বলে, ‘কী যে বলেন? এই কবিতা আমি লিখব? এ তো এখানকারই একজন বিখ্যাত কবির লেখা।’

‘এখানকার মানে? বিহারের?’

‘বিহারের তো বটেই। খোদ এই জায়গার, মুঙ্গেরের! রামধারী সিংহ দিনকর!’

‘বাহ! আপনার তার মানে কবিতা-টবিতা লেখার বেশ চর্চা আছে, তাই না?’

সশব্দে ভাঁড়ের চায়ে চুমুক দিয়ে শামসুদ্দিন শুধু মুচকি হাসে। এ কথার কোনো জবাব না দিলেও চলে। তার সঙ্গী যে জবাবের প্রত্যাশায় উন্মুখ হয়ে আছে, তাও নয়। তারা যে কাজে এসেছে, কবিতার চর্চা তার থেকে বহু বহু দূরে, সম্পূর্ণ উলটো মেরুতে হয়।

চা শেষ। সে এবারে সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে বলে, ‘যাওয়া যাক?’ ‘চলুন।’

অদ্ভুত এই লোকটা। আগের দিন যখন প্রথম বার একে দেখেছিল শামসুদ্দিন, তখন দেখে মনে হয়েছিল লোকটা লম্বাটে রোগা। থুতনিতে ছাগুলে দাড়ি ছিল লোকটার। পরনের জামাকাপড়ও ঢলঢলে, কোনো ছিরিছাঁদ ছাড়াই। সেই ছবিটাই শামসুদ্দিনের মাথায় গেঁথে

ছিল। লোকটা মুঙ্গেরে যাওয়ার টিকিট কাটতে বলেছিল।

তার কথামতো হাওড়া স্টেশনে পৌঁছে টিকিট কাটতে গেছিল শামসুদ্দিন। মুঙ্গের সে আগেও গেছে। একাধিক বার গেছে। দলের কাজেই গেছে দায়িত্ব নিয়ে। যদিও সেসব বহুকাল আগের কথা। কিন্তু আইএম-এর পূর্ব ভারতের কোনো সদস্যই তার মতো মুঙ্গের বিষয়ে অভিজ্ঞ নয়।

হাওড়া থেকে মুঙ্গের সরাসরি কোনো ট্রেন নেই। জামালপুর হয়ে যেতে হয়। সে জামালপুর এক্সপ্রেসেরই টিকিট কেটেছিল। দু' দিন পরের। তারপর ঘর বুক করেছিল হাওড়ার কাছেই 'হোটেল অশোকা'য়। লোকটা ফোন করেছিল রাত্রের দিকে।

'টিকিট কাটলেন?'

'হ্যাঁ। জামালপুর এক্সপ্রেস। পরশু। ওখানে নেমে লোকাল ধরে নেব।' 'সে আপনিই ভালো জানবেন। কিন্তু পরশু কেন? হাতে কিন্তু বেশিদিন নেই।'

'পরশুর আগে রিজার্ভেশন কোনোভাবেই পাওয়া যাচ্ছিল না। এটাও ভেতর থেকে ম্যানেজ করিয়ে পেতে হয়েছে।'

'ওকে, ওকে! একদিক দিয়ে ভালোই হয়েছে পরশু টিকিট হয়ে। কালকের কাজটা আপনিই সামলে দিতে পারবেন।'

'কালকে কী কাজ?'

'ওই এয়ারপোর্টের এক নম্বর গেটের কাছে গিয়ে একটা চাবি কালেক্ট করতে হবে।'

পুরো ব্যাপারটা বুঝে নিয়ে ফোন রেখে দিয়েছিল শামসুদ্দিন। পরের দিন জায়গামতো গিয়ে চাবি কালেক্ট করে নিয়ে আসতে কোনো সমস্যা হয়নি।

সমস্যা হল পরের দিন। ট্রেনের নির্দিষ্ট টাইমে শামসুদ্দিন পায়চারি করে যাচ্ছিল প্ল্যাটফর্মে। ন'টা পঁয়ত্রিশে গাড়ি ছাড়ার কথা। সাড়ে ন'টা অবধি যখন লোকটার কোনো পাত্তা নেই, তখন সে বাধ্য হয়ে ফোন করে আগের নম্বরে। ওদিকে রিং হওয়ার আগেই সামনের হুইলার্সের স্টল থেকে একটা গাঁট্টাগোট্টা চেহারার ছেলে ফিরে দাঁড়িয়ে সোজাসুজি ওর দিকেই আসতে থাকে। জিনসের প্যান্ট আর টাইট ফিটিং হাফ শার্ট পরা একটা লম্বা-চওড়া ছেলে। জেল মাখা চুল পেছন দিকে ফেরানো। নিখুঁত দাড়ি-গোঁফ কামানো মুখ। ছেলেটাকে যে তার আগে কস্মিনকালেও দেখেনি, সেটা শামসুদ্দিন হলফ করে বলতে পারত। কিন্তু ওর হাঁটার মধ্যে, দ্রুত এগিয়ে আসার মধ্যে এমন একটা কিছু ছিল, যেটা শামসুদ্দিনকে সচকিত করে তুলেছিল।

প্রায় গা ঘেঁষে ট্রেনের কম্পার্টমেন্টের দরজার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে ছেলেটা চাপা গলায় বলে গেছিল, 'ট্রেন ছেড়ে দেবে যে মাস্টারমশাই!

চমকে উঠে শামসুদ্দিন খেয়াল করেছিল ছেলেটার গলাটা হুবহু মৌলালি মসজিদে দেখা হওয়া ওই লোকটার মতোই। ছবির মতো সঙ্গে সঙ্গে এটাও মনে পড়ে গেছিল যে এই হাঁটাটাও সে সেদিনই খেয়াল করেছিল। যখন লোকটা দ্রুত চলে গেল তাকে মসজিদের চত্বরে দাঁড় করিয়ে রেখে। একটু হতভম্ব অবস্থাতেই ট্রেনে উঠে পড়ে শামসুদ্দিন। ইচ্ছে করেই সে এসি টু-টায়ার কেটেছে। দামি কামরায় সিকিউরিটি বেশি থাকে বটে, তবে তারা কেউই প্যাসেঞ্জারদের চট করে সন্দেহের চোখে দেখে না।

এ জিনিস কোনো ট্রেনিং-এ কোনো পুলিশ বা সৈনিককে শেখানো হয় না। কিন্তু এই দেশের সমাজ খুব স্বাভাবিক নিয়মে সন্দেহের চোখ বরাবর গরিবের দিকেই রাখতে শিখিয়েছে।

ট্রেনেও তারা প্রথম দিকে চুপচাপ ছিল। একটা সাইড লোয়ার আর সাইড আপারের জোড়া পেয়েছে ওরা। জানলার ধারে দুজনে মুখোমুখি বসে রইল চুপচাপ। টিটি এসে ঘুরে গেল কিছুক্ষণ পরেই। প্রায় আধ ঘণ্টা পর, ট্রেন তখন বর্ধমানের রাস্তায় অর্ধেক এগিয়ে গেছে, শামসুদ্দিনই প্রথম কথা বলে ওঠে, 'আপনাকে তো আমি প্রথমটায় চিনতেই পারিনি।'

'সেরকমই চেষ্টা ছিল।' মুচকি হেসে বলে লোকটা।

'আপনার নামটা কিন্তু আগের দিন জানতে পারিনি। আপনি বলেছিলেন নাম জানার দরকার নেই। কিন্তু এখন তো আমরা হামসফর! আমার নাম শামসুদ্দিন! আপনি?' হাত বাড়িয়ে দেয় শামসুদ্দিন। লোকটা হাত মেলায় তার সঙ্গে। শামসুদ্দিনের মনে হয়, যেন একটু অনিচ্ছার সঙ্গেই। সে বলে, 'আমি জব্বার!' শামসুদ্দিনের মুখে আলো ফুটে ওঠে।

'আপনিই জব্বার? আমার কী সৌভাগ্য!'

'কেন? কেন?'

'আপনার কিস্সা তো লোকের মুখে মুখে ঘুরে বেড়ায়।'

'আচ্ছা! কিন্তু সে তো বেশ বিপজ্জনক ব্যাপার! আমরা খুব বেশি বিখ্যাত হলে তো কাজের ক্ষতি!'

'হেঁ-হেঁ, তা যা বলেছেন!'

টুকটাক কথায় কথায় এগিয়ে যাচ্ছিল পরিচয়। হু-হু করে জামালপুরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল ট্রেন। শামসুদ্দিনের মনে অজস্র প্রশ্ন। কীসের মিশন, ওর কী দায়িত্ব ইত্যাদি। কথায় কথায় সে সেসব জানার চেষ্টা করছিল বটে, তবে জব্বার ভেঙে বলেনি বিশেষ কিছুই। শুধু বলেছিল বড় কাজ— এত বড় কাজ ওরা এখনও অবধি করেনি।

শামসুদ্দিন বুঝতে পারল ওর সঙ্গী অল্প কথার মানুষ। কিন্তু তাতে ওর উৎসাহে ভাটা পড়েনি। ইন্ডিয়ান মুজাহিদিনের প্রবাদপ্রতিম স্নাইপার-কিলার জব্বারের সঙ্গে একই মিশনে সে। আর কী চাই?

রাস্তার বেশিরভাগটা তারা বকবক করেই কাটিয়েছে। মানে, শামসুদ্দিন বকবক করেছে আর তার সঙ্গী হুঁ-হাঁ দিয়ে সাড়া দিয়ে গেছে। অবশেষে সাহেবগঞ্জ পেরোনোর পরেও শামসুদ্দিনের কথা থামার কোনো লক্ষণ না দেখে বাধ্য হয়েই জব্বার তুড়ি মেরে, হাই তুলে, গা মুচড়ে উঠে পড়েছে। বলতে বাধ্য হয়েছে, 'আমি তাহলে ওপরের বার্থে শুয়ে পড়ি, মাস্টারবাবু?'

অনর্গল চলতে থাকা একটা স্রোতকে এক হ্যাঁচকা টানে থামিয়ে দিতেই, শামসুদ্দিন প্রথমটায় কেমন একটু থতিয়ে গিয়ে বেকুবের মতো হেসে ফেলেছিল। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে 'বটেই তো, ঠিক ঠিক' ইত্যাকার কথা বলতে বলতে সেও চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়েছিল।

জামালপুর এক্সপ্রেস খুব একটা লেট করেনি। সকাল সাড়ে সাতটায় জামালপুর জংশনে পৌঁছোনোর কথা। আড়মোড়া ভাঙতে ভাঙতে শামসুদ্দিন ও জব্বার যখন স্টেশনে নামল তখন স্টেশনের ডিজিটাল ক্লক সময় দেখাচ্ছে আটটা দশ!

মুঙ্গেরের স্টেশনটা নতুন। জামালপুর থেকে সারাদিনে গোটা পাঁচেক ট্রেন যায় মুঙ্গেরে। পনেরো-কুড়ি মিনিটের ট্রেন যাত্রা। বাসেও যাওয়া যায়। কিন্তু জব্বার আর শামসুদ্দিন ট্রেনে যাওয়াই মনস্থ করল। কিছু খেয়ে নিতে হবে। সোয়া ন'টায় ট্রেন। তার আগে ফ্রেশ হয়ে খেয়ে-দেয়ে নেওয়া যাবে।

ট্রেন থেকে নেমে পায়ে পায়ে হেঁটে তারা স্টেশন চত্বর পেরিয়ে এসে থেমেছে এই চায়ের দোকানে।

এখান থেকেই শুরু হচ্ছে শামসুদ্দিনের কাজ। জব্বার এই এলাকায় নতুন, প্রথম বার। শামসুদ্দিনের দায়িত্ব ওকে 'ভাতিজা'-র কাছে নিয়ে যাওয়ার।

ভাতিজা— মুঙ্গেরের শুধু নয়, তামাম ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্টের বেআইনি অস্ত্রের বেতাজ বাদশা। না, ভাতিজা কোনো বেআইনি অস্ত্র কারখানার মালিক নয়। সেসব কলকারখানায় তৈরি অস্ত্র বেচে কোটিপতি হয়েছে এরকম লোক অনেক আছে মুঙ্গেরে। দেশের এই গান ক্যাপিটাল দেশি ওয়ান শটার থেকে শুরু করে আধুনিকতম একে ৪৭ বা একে ৫৬ সব কিছুরই জোগান দেয়। আইনসম্মত ও বেআইনি— দুভাবেই। ব্রিটিশ-অধীন ভারতবর্ষে বেআইনি অস্ত্রের ব্যবসার এত রমরমা ছিল না। তখন প্রধান সড়কের দু' পাশে গমগম করত আইনসম্মত বন্দুকের দোকান। পাকানো গোঁফ চুমরে দোকানের মালিকরা

ঠাটে বসে থাকতেন।

ভারত স্বাধীন হওয়ার পর থেকে স্বাধীন দেশের সরকার ক্রমশ বৈধ বন্দুকের লাইসেন্স দেওয়ার নিয়মকানুন কড়া করেছে। গতানুগতিক আমলাতন্ত্র লাইসেন্স পাওয়ার গতিকে করে তুলেছে অসম্ভব শ্লথ। অতএব ফলস্বরূপ বেআইনি অস্ত্রের খদ্দের আর চাহিদা হু-হু করে বেড়েছে। ধীরে ধীরে একটা সমান্তরাল শিল্পই হয়ে উঠেছে তা।

তবে ভাতিজা কোনো অ্যাসেম্বলি লাইন চালায় না। সে আর্টিস্ট। আর সে প্রকৃত শিল্পীর মতোই খ্যাতি বা উৎপাদনের প্রাচুর্য— দুয়ের কোনোটাতেই বিশ্বাস করে না। বিগত পঞ্চাশ বছরে পৃথিবীর পূর্ব গোলার্ধে স্নাইপারের হাতে হত্যাকাণ্ড যতগুলো ঘটেছে, তার অর্ধেকের বেশিই হয়েছে এই রহস্যময় ছায়ামানুষের তৈরি বন্দুকে। এঁর কাছে সব বন্দুকই পছন্দ ও চাহিদামতো তৈরি করা। ফরমায়েশি!

এঁর প্রকৃত পরিচয় কেউ জানে না। যারা জানে, তারা কাউকেই বলে না, কারণ তাতে তাদেরই ক্ষতি। কোথায় থাকেন? উত্তরে শুধু জানা যায় মুঙ্গের। দেখা করার উপায়? মুঙ্গের স্টেশনে নেমে হাঁটা পথে পাঁচ-সাত মিনিটের দূরত্বে বাংলা কালীমন্দির। সেখানে গিয়ে পুজো দিতে হয়, আর পূজারীকে বলতে হয়, 'চাচা কা খবর লায়ে হ্যায়! 9

তারপর অপেক্ষা। কখনো এক ঘণ্টা, কখনো দু' ঘণ্টা, কখনো একদিন পুরো। কতক্ষণ, কোনো ঠিক নেই। সেই সময় কোনো অদৃশ্য ইন্টেলিজেন্স নেটওয়ার্ক ভেরিফাই করে আগন্তুকের পরিচয়। যদি তাতে সন্তুষ্ট হওয়া যায়, তাহলে একজন পথপ্রদর্শক পাওয়া যায় ভাতিজার কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্য। আর যদি খোঁজখবরে সন্দেহজনক কিছু পাওয়া যায়?

বিহারে খুন-জখম এমন কিছু উল্লেখযোগ্য ঘটনা নয়। খবরের কাগজের ভেতর দিকের পাঁচ নম্বর পাতার দু' নম্বর কলামে হয়তো কোনো অজ্ঞাতপরিচয় লাশের বিবরণ পাওয়া যায়।

শামসুদ্দিন এর আগে মুঙ্গেরে এলেও, ভাতিজার কাছে কখনো যায়নি। দরকার পড়েনি। এবারে পড়েছে।

চা খেয়ে হাঁটতে হাঁটতে দুজনে যখন বাংলা কালীমন্দিরে এসে পৌঁছোল, পূজারী ততক্ষণে সকালের পুজো শেষ করে বেরিয়ে যাওয়ার তোড়জোড় করছে। ছোট্ট মন্দিরের গেটে চাবি লাগাচ্ছে সে।

শামসুদ্দিন এগিয়ে গিয়ে পূর্বনির্ধারিত কথাটি বলতেই, পুরোহিত এক বার ঘুরে তাকালেন জব্বারের দিকে। বেশ কিছুক্ষণ তাকে একদৃষ্টে দেখে, হাত দিয়ে বেদি বাঁধানো গাছতলার দিকে ইঙ্গিত করে দিয়েই তিনি চলে গেলেন সে জায়গা থেকে।

৩০ জুলাই, ২০১৮, সকাল বেলা / বারুইপুর, পঃ বঙ্গ, ভারত

যখন শামসুদ্দিন ও জব্বার মুঙ্গেরের বাংলা কালীমন্দিরে নিঃশব্দে অপেক্ষা করছিল ভাতিজার সবুজ সিগন্যালের, তখন সেখান থেকে বহু বহু মাইল দূরে, বারুইপুর পুলিশ স্টেশন ছিল প্রচণ্ড সশব্দ!

'কী ভেবেছটা কী তুমি? এটা কি ইশকুল চালাচ্ছি? তুমি কি টিচার? গরমের ছুটি পড়ে গেছে নাকি? অ্যাঁ?'

প্রদীপবাবু রাজেশের ওপর চোটপাট করেই চলেছেন এবং সেটা গোটা থানার সামনে। এতটাই রেগে গেছেন যে কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞান নেই, যে সাব-অর্ডিনেটদের সামনে এইভাবে একজন অফিসারকে চোটপাট করা ঠিক শিষ্টতাসম্মত নয়। রাজেশ যদিও চুপ করেই আছে। প্রায় দশ মিনিট ধরে এই সব চলছে। মাঝে এক বার শমিত বলতে এসেছিল, 'স্যর, ছেড়ে দিন না— ম্যানেজ তো হয়ে গেছে। আর ও তো এসেও গেছে এবারে।'

তাতে লাভ কিছু হয়নি। উলটে প্রদীপবাবু আরও ফুঁসে উঠেছেন, 'তো? এসে গেছে তো? আমার মাথা কিনে নিয়েছে? কী আস্পর্ধা! তিন দিন বাদে একজন নয়, দুজন প্রধানমন্ত্রী আসছেন রাজ্য সফরে। আর আমার থানার অফিসার লাস্ট দু' সপ্তাহ ধরে কখনো অর্ধেক দিন, কখনো পুরো পুরো দিন গায়েব! আই... আই উইল সাসপেন্ড ইউ! আই উইল শোকজ ইউ... ভেবো না পার পেয়ে যাবে!!

রাগে লাল হয়ে প্রদীপ গোস্বামী দুমদাম করতে করতে নিজের ঘরে ঢুকলেন। দড়াম করে দরজা খুলল এবং ক্যাঁচকোঁচ শব্দে কিছুক্ষণ দুলতে থাকল।

রাজেশ এতক্ষণ মুখ নীচু করে দাঁড়িয়েছিল। এরকম ধাতানি খাওয়ার পর সাধারণত লোকজন বাইরে চা-সিগারেট খেতে যায়, নিজের ভেতরের উষ্মাটা প্রকাশ করতে। কিন্তু তটস্থ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা সব সহকর্মীদের অবাক করে দিয়ে রাজেশ দ্রুত পায়ে ঢুকে গেল প্রদীপবাবুর চেম্বারেই।

প্রদীপবাবু তখনও চেয়ারে ঠিক করে বসতে পারেননি। ইতিমধ্যেই রাজেশকে পেছন পেছন ঢুকতে দেখে তিনিও কম আশ্চর্য হলেন না। মনে মনে তিনি এই ছেলেটিকে বেশ স্নেহ করেন। ছেলেটির মধ্যে একটা সহজাত বুদ্ধি আছে। গভীরভাবে দেখার চোখ আছে। কিন্তু প্রদীপবাবু নিজেকে স্মরণ করালেন যে তিনি এর ওপর এখনও ঘোরতর রেগে আছেন। অতএব নরম ভাব দেখালে চলবে না। একটু গলাখাঁকারি দিয়ে তাঁর উষ্মার ভাবটা ধরে রেখেই তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'কী ব্যাপার?'

'স্যর, আপনার সঙ্গে একটা জরুরি ব্যাপারে কথা বলার আছে।'

'এই মুহূর্তে পিএম আর পাকিস্তানের পিএম-এর সফর ছাড়া আমার কাছে আর কোনো জরুরি ব্যাপার নেই।'

'আমি স্যর— আপনার পাঁচটা মিনিট নেব। তার পরে যদি আপনার মনে হয় ব্যাপারটা আনইম্পর্ট্যান্ট— তাহলে আমি এটা ছেড়ে দেব। প্লিজ স্যর, পাঁচটা মিনিট!'

ভুরু কুঁচকে একটু তাকিয়ে থাকেন প্রদীপবাবু। ছেলেটা বরাবরই খুবই আর্নেস্ট! কিন্তু এতটা ব্যগ্রতা আগে দেখেননি কোনো ব্যাপারে। কী ভেবে, বলেন, 'বেশ, বলো, কী বলতে চাও।' ,

'থ্যাংক ইউ স্যর, থ্যাংক ইউ!' খুশি হয়ে চট করে সামনের চেয়ারটা টেনে নিয়ে, অনুমতির তোয়াক্কা না করেই বসে পড়ে বলে রাজেশ। তারপর বলে, 'স্যর, আপনার মনে আছে, ওই যেদিন ওই ইল্লিগ্যাল আর্মসের গ্রুপটাকে বাজার থেকে ধরলাম আমরা— ওই যে, সঙ্গে একজন মাস্টারমশাইও ছিল...'

'হ্যাঁ, কেন থাকবে না— আরে— ও তো সেই লোকটা, কী যেন নাম... ভুলে যাচ্ছি— বেচারা সত্যি সত্যি চটি কিনতে গিয়ে ফেঁসে গেছিল... তারপর আবার প্রতিম চড় মেরে ফেলল ওকে— তার কথাই বলছ তো?'

'হ্যাঁ স্যর, ওরই কথা বলছি। আপনার মনে আছে নিশ্চয়ই, যে আমি বলেছিলাম আমার একটু খটকা লাগছে... আর আপনি, মানে, ইয়ে...' 'পাত্তা দিইনি, তাই তো?'

'না, মানে, তা ঠিক নয়। আপনি বলেছিলেন, অফিসিয়ালি কিছু করা যাবে না।'

'হুম! তো?'

'তো, আমি এই ক'দিন ওরই পেছনে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম স্যর!!'

'কী বেশ নাম ছিল লোকটার...'

'শামসুদ্দিন আলম, স্যর!'

'হ্যাঁ, তা, তুমি সেই থেকে দু' সপ্তাহ ধরে ওই ইশকুলমাস্টার, শামসুদ্দিন আলমের পেছন পেছন ঘুরে গেলে? প্রেমে পড়েছ নাকি তার?'

এতক্ষণ গলার স্বর ঠিকঠাক ছিল। আবার তা তির্যক হয়েছে প্রদীপবাবুর। রাজেশ সামান্য ঢোঁক গিলে বলে, 'তা নয় স্যর! ভেবেছিলাম, একটু দেখেই ছেড়ে দেব। আপনি নিশ্চয়ই ঠিকই বলছেন। অত ভাবার মতো কিছু নেই। কিন্তু তারপর থেকে এমন এমন সব ব্যাপার ঘটতে থাকল...'

'কীরকম?' গলা থেকে সন্দেহের সব ক'টা দানা মুছে গিয়ে তখনও মসৃণ হয়নি সে স্বর!

'শুরু থেকেই বলি স্যর। একজন ছা-পোষা মানুষ, নিরীহ ইশকুলমাস্টার— হঠাৎ একটা ভুল বোঝাবুঝিতে গ্রেফতার হয়ে থানায় আটক রইল চার-পাঁচ ঘণ্টা। তারপর ছাড়া পেয়ে সে প্রথমেই কী করবে?'

'কী করবে?' প্রদীপের গলায় এখনও তেমন ঔৎসুক্য নেই। তবে আগের মতো তা ব্যঙ্গাত্মকও শোনাচ্ছে না।

'আপনিই বলুন না স্যর?'

'আমি হলে বাড়িতে ফোন করে আগে খবর দিতাম, যে আমি আসছি। নাহলে বাড়ির লোকজন চিন্তা করবে আবার!'

'কারেক্ট স্যর! একদম ঠিক বলেছেন।' সোল্লাসে বলে ওঠে রাজেশ, 'আমিও তাই করতাম। কিন্তু ইনি কী করলেন? সোজা গেলেন একটি ফোনের বুথে! ফোন করতে!!'

'বুঝলাম না। ঠিকই তো আছে— সমস্যাটা কোথায়? আমরাও ফোন করতাম— এও ফোন করতেই গেছে!' সত্যিই হতভম্ব শোনায় প্রদীপবাবুর গলা। 'আহ স্যর, ভাবুন— এর কাছে তো মোবাইল ফোন ছিল!'

'ছিল নাকি?' সামান্য নড়ে বসেন প্রদীপ।

'আলবাত ছিল।' টেবিলটা চাপড়াতে গিয়েও কোনোক্রমে নিজেকে সামলে নেয় রাজেশ। 'আমি নিজে লোকটাকে বেরোনোর সময় মনে করিয়ে দিয়েছিলাম ফোনটা নেওয়ার কথা। ও নিয়েওছিল।'

'হুমম। তাহলে কাকে ফোন করতে গেল?' 'একটা ল্যান্ডলাইন নম্বরে স্যর!' 'বলে যাও!'

'আমি খানিকটা দূরত্ব রাখছিলাম। আর তা ছাড়া ও বুথের ভেতরে কাচের ঘর থেকে ফোন করছিল, তাই কী কথা হচ্ছিল আমি শুনতে পাইনি। তবে বেশ খানিকক্ষণ কথা হয়েছে। প্রায় সাত-আট মিনিট। তারপর থেকে বেরিয়ে এই স্কুলটিচার যা যা কাজ করেছে, সেগুলো মোটেই একটা মফস্সলের— মফস্সল ছাড়ুন দুনিয়ার কোনো টিচার করে কিনা আমার জানা নেই।'

'শুনছি...' প্রদীপের তখন অখণ্ড মনোযোগ। রাজেশ বলে চলে, 'লোকটা তারপর থেকে এই গতকাল পর্যন্ত দশ-বারো দিনে ধীরে ধীরে এখানে সমস্ত কিছু গুটিয়ে এনেছে।

ব্যাঙ্ক থেকে চার বারে তুলেছে নিজের প্রায় সব জমানো টাকা। আমি একটু আড়ালে আমার এক বন্ধুকে ম্যানেজ করে খবর নিয়েছি— টাকার পরিমাণ নেহাত মন্দ নয়, প্রায় লাখ চার-পাঁচ টাকা। ইশকুলে রেজিগনেশন দিয়েছে। খাসমল্লিক কাজিপাড়ার স্কুলটার কমিটির সেক্রেটারি স্যর বেশ ভালো লোক। দুটো গোল্ডফ্লেক খেয়েই বলে দিল নিজে থেকেই— এত ভালো টিচার, বিয়ে-থা হয়ে গেছে, সরকারি চাকরি—এরকম কেউ হুট করে ছেড়ে দেয় নাকি?'

'কারণ কী দেখিয়েছিল?'

'স্পষ্ট কিছুই বলেনি। কেবল বলেছিল দেশের বাড়িতে চলে যাবে। এখানে আর ভালো লাগছে না।'

'হুম। তারপর?'

'লাস্ট চার দিন স্যর বাড়ি থেকেও প্রায় বেরোনো বন্ধ করে দিয়েছিল। লোকটার বউ নার্সের চাকরি করে—তাকেও বিশেষ বেরোতে দেখিনি।'

'কী করে শিওর হচ্ছ? তুমি কি চব্বিশ ঘণ্টা নজর রেখেছিলে? নাওয়াখাওয়া করোনি?'

'আমি শিওর স্যর! আসলে, ইয়ে— আমার কয়েকটা চ্যাংড়া হেল্পিং হ্যান্ড আছে। একটু মালের...' বলে ফেলেই জিভ কাটে রাজেশ, 'সরি স্যর, মানে ওই একটু হাতখরচ দিলে ওরাও অনেকটা হেল্প করে। ওদেরও একটু একটু কাজে লাগিয়েছি।'

'এসব কিন্তু ক্লেম পাবে না, আগেই বলে রাখছি।' 'না, না স্যর, ওসব চাই না...' তাড়াতাড়ি বলে ওঠে রাজেশ। 'বেশ। বলে যাও। দু' দিন বাড়ি থেকে বেরোয়নি, তারপর?' 'দু' দিন নয় স্যর, চার দিন!' 'বেশ। চার দিন। তারপর?'

'ঠিক চার দিন আগে, অর্থাৎ গত সোমবার ভোররাতে আমি নিজেই ছিলাম নজরদারিতে। হঠাৎই দেখলাম মাস্টার, মানে ওই শামসুদ্দিন— বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল। কাঁধে ব্যাগ। ফার্স্ট ট্রেন ধরল। আমিও গেলাম পিছু পিছু। এখানকার ছেলেগুলোকে বাড়িটার ওপর নজর রাখতে বলে গেলাম। ওর বউ ভেতরে আছে কিনা, থাকলে সেও বেরোচ্ছে কিনা— এগুলো জানার জন্য। শিয়ালদা গেলাম লোকটার পিছু পিছু...'

'দাঁড়াও, দাঁড়াও! ওর বউ তো ওর সঙ্গে যায়নি।'

'না স্যর!'

'আর তুমি রাউন্ড দ্য ক্লক নজর রাখছিলে! তাহলে তো ওর ওয়াইফের বাড়ির ভেতরেই থাকার কথা।'

রাজেশকে এই প্রথম একটু লজ্জিত দেখায়। মাথা চুলকে সে বলে, 'আসলে স্যর, ওই দিন ভোররাতে আমার থাকার কথা ছিল না। যে ছেলেটি ছিল, সে গাঁজা খেয়ে একদম আউট হয়ে গেছিল। আমি এমনিই একবার খবর নিতে গিয়ে দেখতে পাই। তারপরই তাকে বাড়ি পাঠিয়ে, নিজে থেকে যাই।'

'হুম। তারপর? শিয়ালদা গিয়ে কী দেখলে?'

'এবারে আরও একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটল স্যর!'

'কীরকম?'

'লোকটা প্রায় পাঁচ-ছ' ঘণ্টা এদিক-সেদিক ঘুরল। বোঝাই যাচ্ছিল কোনো কারণ নেই... বা আসলে গভীর কারণ। আপনি তো জানেনই স্যর, কেউ ফলো করলে তাকে ট্রেস করার জন্য এই সব ট্রিক নেওয়া হয়।'

'তার মানে লোকটা তোমাকে পিক করে ফেলেছিল?'

'মনে হয়, না, স্যর। সেটা করলে এর পরের কাজগুলো ও করত না।'

'কী কাজ?'

'বলছি স্যর। এবারেই তো আসল খেলা শুরু! শামসুদ্দিন এর পরে মৌলালির মোড়ে প্রায় পঁয়ত্রিশ-চল্লিশ মিনিট অপেক্ষা করেছিল স্যর! স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল কারও জন্য অপেক্ষা

করছে। ঘন ঘন ঘড়ি দেখছিল। রাস্তার লোকেদের দিকে ইতিউতি চাইছিল।'

'তুমি কোথায় ছিলে?

'আমি তো বাসের জন্য 'ওকে!' অপেক্ষা করছিলাম স্যর, উলটো দিকের ফুটপাথে।'

'তো, কী হল, কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর, মানে বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর ও চট করে মৌলালি মসজিদে ঢুকে পড়ল। আমি শিওর স্যর, ওখানে ও অন্য কারও সঙ্গে দেখা করতে ঢুকেছিল।'

'বেশ। বাই দ্য ওয়ে, তোমার কিন্তু প্রায় সাড়ে চার মিনিট ওভার। গল্পটা ইন্টারেস্টিং, কিন্তু আর্জেন্ট কেন, সেটা এখনও বুঝিনি।

রাজেশ ভেবেছিল সে প্রদীপবাবুকে পটিয়ে ফেলেছে। কিন্তু তার বস যে এমনিই পুলিশে চুল পাকাননি সেটা এখন বোঝা গেল। সত্যিই সে এখনও পর্যন্ত অ্যাকশনেবল ইন্টেলিজেন্স কিছুই বলেনি। অবশ্য, সে হাতের তাস বাঁচিয়ে খেলছিল। কিন্তু সে বুঝতে পারল, যে আর দেরি করা যাবে না। তাই সে ছোট করল তার গল্পের পরিসর, 'ওকে স্যর। আর বিস্তারিত বলব না। এবার আপনাকে সামারি করে আমার ফাইন্ডিংস বলি। এক, শামসুদ্দিন আলমের কোনো অস্থাবর সম্পত্তি আর এখানে, মানে বারুইপুরে নেই। অ্যাকাউন্টের সব টাকা তুলে নিয়েছে। চাকরি ছেড়ে দিয়েছে। তার বউয়ের এখনও পর্যন্ত কোনো খবর নেই। কেন? দুই, শামসুদ্দিন কারও সঙ্গে সেদিন মৌলালি মসজিদে মিট করেছিল। তারপর সেখান থেকে বেরিয়ে হাওড়ায় যায়, আর দু' দিন বাদের টিকিট কাটে, জামালপুর এক্সপ্রেসের। কেন? এই দুটো প্রশ্ন আমাকে তাড়া করে বেড়াচ্ছিল। ফাঁক দেখছিলাম, কিন্তু কোনো থিয়োরি খাড়া করতে পারছিলাম না। আজকে সকালের আগে অবধি।

'আজকে সকালে কী ঘটল?'

'আমার দুটো অফিসিয়াল এনকোয়ারির উত্তর এল স্যর।'

প্রদীপ চুপ করে থাকেন। রাজেশ আবার বলতে শুরু করে, 'আমি শামসুদ্দিনের গ্রামের বাড়ি, চাখুন্দির লোকাল থানায় খবর নিয়েছিলাম। তারা কনফার্মড খবর দিয়েছে, আজ থেকে ছ' বছর আগে, আগুন লেগে শামসুদ্দিনের বাড়িঘর সব পুড়ে যায়। সঙ্গে পুড়ে মারা যায় দুজন। শামসুদ্দিন আলম ও তার মা।'

'হোয়াট?' এবারে সপাটে সোজা হয়ে বসেন প্রদীপবাবু, 'এভিডেন্স?'

'ডেথ সার্টিফিকেটের কপি। অ্যাক্সিডেন্টাল ডেথ বলেই পোস্ট-মর্টেম হয়েছিল। যদিও অনেকটাই পুড়ে গেছিল দুজনের বড়িই, কিন্তু পিএম রিপোর্ট অনুযায়ী আর পুলিশের রিপোর্ট অনুযায়ী দুজনেরই পজিটিভ আইডেন্টিফিকেশন করেছিল গ্রামবাসীরা।

'তাহলে... তাহলে... এই লোকটা কে? একটা ফ্রড? অন্যের নামের চাকরি, করে গেল এদ্দিন?'

'নট সো ফাস্ট স্যর। এখানেই আসছে আমার দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর।' একটু নাটকীয় পজ নিতে যায় রাজেশ, কিন্তু প্রদীপবাবুর চোখের দিকে তাকিয়ে ঠিক ভরসা পায় না। 'আমি নিশাকরবাবুকে বলেছিলাম শামসুদ্দিন আলমের ফিঙ্গারপ্রিন্ট নিয়ে একটু ডেটাবেসে সার্চ করতে। খুব একটা আশা ছিল না। তবে... যাইহোক... বাই দ্য স্ট্রোক অফ লাক— উই গট আ ম্যাচ!'

'অ্যান্ড?'

'হি ইজ আ নোন ইন্ডিয়ান মুজাহিদিন অ্যাসেট ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল। ডিপ কভার অ্যাসেট, বাট, অলওয়েজ হ্যাড এ ফাইল অন হিম। নো ফোটো, ওনলি ফিঙ্গারপ্রিন্টস!'

'শিট! তার মানে একজন আইএম-এর ডিপ কভার অ্যাসেট— হ্যাজ বিন অ্যাক্টিভেটেড? আর এই মুহূর্তে তার কোনো ট্রেস নেই?'

'লুকস লাইক, দ্যাটস দ্য কেস স্যর!'

'কোথাকার টিকিট কেটেছে বললে?'

'জামালপুর স্যর! সেটাই বুঝতে পারছি না...' রাজেশের কথার মাঝখানেই প্রদীপ নিজের ফোনে খুটখাট করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। রাজেশ থামতে, হাতের ইশারায় তাকে বলে যেতে বলেন।

'...জামালপুর কেন? ওখানে কী? অ্যাকশন তো এখন এখানে, ওয়েস্ট বেঙ্গলে, কলকাতায়! তাই না? যদিও আমি ভেবেই রেখেছি, আপনাকে বলেই জামালপুর থানায় ইনফর্ম করাতে হবে কোনোভাবে।'

'নট জামালপুর! নট জামালপুর রাজেশ!'

'বাট, স্যর, আমি ওকে নিজে জামালপুর এক্সপ্রেসে উঠতে দেখে এসেছি, নিজের চোখে।"

উত্তেজনায় ছিটকে নিজের চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়েন প্রদীপবাবু, 'হি ইজ গোয়িং টু মুঙ্গের! জামালপুর থেকেই যেতে হয় সেখানে। ডাইরেক্ট ট্রেন নেই।' 'মুঙ্গের! শিট! শিট!!'

এবারে রাজেশের চমকানোর পালা।

।। বিংশ অধ্যায় ।।
।। অ্যাটাক অন দ্য ফ্ল্যাঙ্ক, অ্যাডভান্টেজ ব্ল্যাক ।।

৩০ জুলাই, দুপুর বেলা / মুঙ্গের, বিহার, ভারত

বাংলা কালীমন্দির থেকে সাত কিলোমিটার দূরে মির্জাপুর-বারদা! গঙ্গার ধারে এব ছোট্ট জনপদ। এমনিতে বাসে বা ভাড়ার ট্যাক্সিতে এলে খুব বড়জোর কুড়ি-বাইশ মিনিট সময় লাগে।

শামসুদ্দিন আর জব্বারের লেগেছে প্রায় ঘণ্টা চারেক। তার মধ্যে সাড়ে তিন ঘণ্টা খরচ হয়েছে ওই কালীমন্দিরের সামনে বসে আর তার উলটো দিকে একটা হোটেলে খাবার-দাবার খেয়ে। অপেক্ষা করে থাকতে হতে পারে জানা সত্ত্বেও শামসুদ্দিন অধৈর্য হয়ে পড়ছিল। একটানা বসে থাকতে না পেরে মাঝে মাঝেই উঠে পায়চারি করছিল সে। কোনো বিষয়ে জানা আর নিজে সেটা অনুভব করার মধ্যে বিস্তর ফারাক সেটা তার বুঝতে অসুবিধে হচ্ছিল না আর।

একইসঙ্গে সে আশ্চর্য হচ্ছিল জব্বারকে দেখে। ঠিক যেন পাথরের মতো নিশ্চল, নিস্পন্দ! মাঝে মাঝে মনে হতে পারে হয়তো ঘুমিয়েই পড়েছে কিংবা মারাই গেছে। কিন্তু ওই নিশ্চল বসে থাকার ভঙ্গির মধ্যে এমন কিছু একটাও ছিল যা দেখে আঁচ পাওয়া যাবে, যেন টান টান ছিলায় পিঠ ঠেকিয়ে অপেক্ষা করছে কোনো তীক্ষ্ণ তির। সামান্য আন্দোলনে, সামান্যতম কম্পনে সে বিদ্যুতের মতো লক্ষ্যের দিকে ছুটে যেতে পারে।

জব্বার স্নাইপার! জব্বার শিকারি! ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন একজন স্নাইপারকে অপেক্ষা করতে হয় তার 'ঈগলস নেস্ট'-এ। শিকারের জন্য। প্রায় সবসময়ই সেই অপেক্ষা হয় শত্রুপক্ষের ডেরার কাছাকাছি, কখনো শত্রুদেশের ভেতর, ধরা পড়ার ঝুঁকি, মারা যাওয়ার ঝুঁকি নিয়ে। সে তুলনায় এই সকালের রোদ্দুর ঝকঝকে মুঙ্গেরের ব্যস্ত রাস্তায় তো কোনো স্ট্রেসই নেই। তাই জব্বারের অসুবিধে হওয়ার কথা নয়। তখন হয়ওনি।

কিন্তু এখন হচ্ছে... কেন?

যখন প্রায় তিন ঘণ্টা অপেক্ষা করার পর মন্দিরের পুরোহিত ফিরে এসেছিলেন সঙ্গে একটা ছেলেকে নিয়ে— যখন সেই লুঙ্গি পরা চ্যাংড়া ছোকরা, গুটখা-ভরা মুখ নিয়ে মুচকি হেসে থাবড়ে থাবড়ে জব্বার আর শামসুদ্দিনের সারা শরীর পরীক্ষা করেছিল কোনো গোপন লুকোনো অস্ত্র বা ক্যামেরা বা অন্য কোনো ট্র্যাকিং ডিভাইস আছে কিনা— যখন লজঝড়ে বাসে এক শহর-ভরতি লোকজন, চড়া গন্ধের গুটখার নিঃশ্বাস, ঝাঁকা-ভরতি মুরগির সঙ্গে সহবাস করতে করতে তারা মির্জাপুরের দিকে যাচ্ছিল, তখনও জব্বারের কোনো অসুবিধে হয়নি।

কিন্তু এখন হচ্ছে। কেন?

লাস্ট কুড়ি মিনিট তারা এই চায়ের দোকানে বসে আছে। যে ছেলেটি ওদের কালীমন্দির থেকে এই অবধি নিয়ে এসেছে, সে এখানেই ওদের বসিয়ে রেখে কোথায় উধাও হয়েছে। বেলা বেড়েছে এতক্ষণে। চড়চড়ে রোদ্দুরে মির্জাপুরের শান-বাঁধানো চকচকে রাস্তা ঝলসে যাচ্ছে। রাস্তার পাশে পাশেই অযত্নে লকলকিয়ে বেড়ে ওঠা ঘেসো জমি। সেই জমিতেই এদিক-ওদিক চরে বেড়াচ্ছে কিছু ঘোড়া। বেওয়ারিশ না মালিক আছে, বোঝা যায় না। প্রায় কেউই লাগাম দেওয়া নয়। ঘেসো জমির পাশ দিয়ে চওড়া খাল। খালের জলে প্লাস্টিকের প্যাকেট, ব্যবহৃত কন্ডোম, বাসি ফুলের মালা, কচুরিপানা— ভেসে চলেছে। মিশবে গিয়ে সেই পুণ্যতোয়া গঙ্গায়!

প্রথম দিকে কিছুক্ষণ সেই সব দিকে অলস দৃষ্টি মেলে বসেছিল জব্বার। দোকানের সামনে একটা বাইক এসে দাঁড়াল। দুজন স্থানীয় ছেলে নামল সেখান থেকে। গড়পড়তা চ্যাংড়া ছোঁড়াদের মতো দেখতে নয়। চোখে সানগ্লাস। পরনে জিন্সপ্যান্ট আর ঢোলা শার্ট।

দোকানিকে হেঁকে দুটো চা দিতে বলে তারা ঢুকে গেল দোকানের ভেতরে।

হঠাৎ করেই জব্বারের ঘাড়ের পেছন দিকে কেমন যেন একটা শিরশিরানি ভাব। ঘাড়ের লোমগুলো যেন খাড়া হয়ে উঠল। দীর্ঘ... দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় জব্বার জানে এটা আসন্ন কোনো বিপদের ইঙ্গিত। অঘোষিত, অতর্কিত বিপদের সঙ্গে ঘর করতে করতে তার মতো মানুষদের মধ্যে এই সেন্সটা তৈরি হয়ে গেছে। এতক্ষণ অলস শিথিল হয়ে থাকা ইন্দ্রিয়গুলি চোখের পলকে টান টান হয়ে গেল। যেন তাকে বলল কিছু একটা ঘটতে চলেছে। সে অচঞ্চল অথচ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চারপাশে চোখ বোলাল এক বার। আড়মোড়া ভাঙার ছলে, যে বেঞ্চিতে বসেছিল সেখান থেকে উঠে ঘুরে ঘুরে চারপাশ দেখে নিল। কোনো তাড়াহুড়ো নেই। দেখতে দেখতেই সে টের পেল, দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরানো লোক দুটোর মধ্যে সামান্য, খুব সামান্য চঞ্চলতা। সাধারণ মানুষের চোখে ধরাও পড়বে না। কিন্তু জব্বার স্পষ্ট দেখতে পেল, সে উঠে দাঁড়ানোমাত্র ওদের মধ্যে একজনের হাত সামান্য উঠল কোমরের দিকে, উঠেই থেমে গেল। দ্বিতীয় জনেরও শরীর টান টান হল কয়েক মুহূর্তের জন্য। সামলাতে সময় নিল না তারা। যখনই দেখল জব্বার আড়মোড়া ভাঙছে, প্রথম জনের হাত নেমে গেল নিঃশব্দে, অন্য জনের শরীরও শিথিল হল আগের মতোই।

ততক্ষণে জব্বার দুটো জিনিস বুঝে গেছে। দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা লোকগুলো পাড়ার গুন্ডা নয়। তারা পেশাদার! আর এখনও তাদের সময় হয়নি আক্রমণ করার। কিছু একটার জন্য তারা অপেক্ষা করছে। কিন্তু কী? রিইনফোর্সমেন্ট?

পায়ে পায়ে সে এগিয়ে গেল দোকানের সামনে দাঁড়ানো লোক দুটির দিকে। তাদের মাঝখান দিয়ে শরীরটা গলিয়ে সে দোকানদারকে বলল, 'দুটো গোল্ডফ্লেক দিন তো, পাঁচ টাকার!'

দোকানদার নিঃশব্দে পয়সা নিয়ে, তাকে সিগারেট দিয়ে নিজের ঘেরা জায়গাটুকু থেকে বেরিয়ে আসে। একটু কি সন্ত্রস্ত? জব্বারের অন্তত তাই মনে হয়। তড়বড় করে দোকানিটা বলে, 'আমি দু' মিনিটের মধ্যে আসছি সাব! ডিম ফুরিয়ে গেছে। ওই সামনের বাজারটা থেকে কিনে নিয়েই আসছি।'

বলেই কথা না বাড়িয়ে সে রাস্তায় নামে। চোখ দিয়ে তাকে অনুসরণ করতে করতেই জব্বার দেখতে পায় একটা হাতে-ঠেলা ভ্যানগাড়িতে প্লাস্টিকের খেলনা নিয়ে একটা লোক ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে। তার সঙ্গে আরও একটা লোক কীসব কথাবার্তা বলতে বলতে আসছে। জব্বারের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলল যা হবার তা এবারেই হবে। দোকান খালি করে দিয়েছে দোকানদার। রি-ইনফোর্সমেন্টও হাজির। আর যার চোখেই ধুলো দিক, এরা জব্বারের চোখে লুকিয়ে থাকতে পারেনি। ভ্যান ঠেলা খেলনাওয়ালার পায়ে স্নিকারটা একটু বাড়াবাড়ি।

ইতিমধ্যে মোটামুটি একটা প্ল্যান তার ছকা হয়ে গেছে। সে শামসুদ্দিনের দিকে একটা সিগারেট বাড়িয়ে ধরে ইচ্ছে করেই হিন্দিতে বলল, 'বাইরে বড্ড রোদ! আসুন, ভেতরে ছায়ায় বসে সিগারেটটা আরাম করে খাই।'

প্রতিপক্ষের চার জনও এতক্ষণ নিঃশব্দে জরিপ করছিল এই লোকটিকে। দেখে মনে হয়েছিল এও চূড়ান্ত পেশাদার। হয়তো কিছুটা আন্দাজ করতেও পেরেছে—এমনটাই তারা ভেবেছিল। আর সেই অনুযায়ী প্রতিরোধের জন্য তারা তৈরিও ছিল। ইতিমধ্যেই কাছাকাছি দুজন তৈরি— এদের কেউ লুকোনো অস্ত্র বার করতে গেলে সেই চেষ্টাটা আটকানোর জন্য। তারা ডিফেন্ডার! আর দূরের দুজন অ্যাটাকার! শট টু কিল!! মেরে ফেলতে হবে এমনটাই নির্দেশ ভাতিজার। আর এই সব কাজে সে সামান্য ভুলচুকও বরদাস্ত করে না। তার সম্ভাবনাও নেই। কিন্তু এই লোকটা এটা কী করছে? এইরকম অ্যাম্বুশ অ্যাটাকের মুখোমুখি

হয়ে কেউ বদ্ধ জায়গায় নিজেকে আটকে ফেললে সেটা তো আত্মহত্যার শামিল। তারা মনে মনে একটু আশ্চর্যই হল। লোকটা তাহলে নেহাতই অনপড়!!

আশ্চর্য হল শামসুদ্দিনও। সে সিগারেট খায় না। কাল সন্ধে বেলা ট্রেনে হাবিজাবি

বকবক করার ফাঁকে সে এটাও বলেছিল জব্বারকে। আবারও সেটা মনে করাতে গিয়েও সে জব্বারের দিকে তাকিয়ে তার চোখে কী যেন একটা দেখতে পেল। ঠিক ইশারা নয়। তবে এক অর্থে ইশারাই। সেই চোখ যেন ওকে বলছে চুপচাপ যা বলা হচ্ছে, তা করে যেতে।

কিছুই বুঝতে না পেরে, অনভ্যস্ত হাত বাড়িয়ে সিগারেটটা নিতে নিতেই সে শুনতে পেল, জব্বার তাকেই উদ্দেশ করে বলছে, 'আগুনটা বোধহয় দোকানের ভেতরে। আসুন। এখানেই বসি!'

দোকানের ভেতরটা ছায়া ছায়া। অপ্রশস্ত, আয়তাকার। একদিকে একটা কাঠ ও কাচের শোকেস— যার তাকে তাকে বিস্কুটের বয়াম, কেক, চিপসের প্যাকেট, বিড়ি, সিগারেট, দেশলাই আর গুটখার প্যাকেটের সম্ভার! কিন্তু জব্বার সেদিকে ফিরেও তাকাল না।

ভেতরে ঢুকতে ঢুকতেই সে টের পেয়েছে রাস্তার ওধারে দাঁড়িয়ে থাকা খেলনাওয়ালা ও তার সঙ্গী ভ্যান ছেড়ে ফাঁকায় এসে দাঁড়িয়েছে। দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা দুজনও ততক্ষণে তৈরি!! এবারে তারা একটু হলেও বুঝতে পেরেছে, দোকানের ভেতরে থাকাকালীন জব্বারের যেমন পালিয়ে বাঁচার সম্ভাবনা কম, তেমনি তাদের অ্যাটাক করাটাও একটু সমস্যার! ক্লিয়ার ভিজিবিলিটি নেই, অবস্ট্যাকলসও প্রচুর। বেশি নয়, জব্বারের আন্দাজমতো যদি তারা পেশাদারই হয়, তাহলে হয়তো কয়েক সেকেন্ড থমকাবে। ওই কয়েক সেকেন্ডই সম্বল জব্বারের। যা করার, ওই কয়েক সেকেন্ডেই করতে হবে! এক হ্যাঁচকায় শামসুদ্দিনকে টেনে পেছনের দেওয়ালের দিকে ঠেলে দিল সে।

শামসুদ্দিনের মুখ থেকে কোনো কথা বেরোনোর আগেই জব্বার ঢুকে পড়েছে দোকানদারের নির্দিষ্ট জায়গায়। একটু এদিক-ওদিক তাকাতেই দেশলাই আর একটা ন্যাকড়া — মোছামুছি করার। তেলচিটে! জিনিস দুটো হাতে নিয়েই সে ঝাঁপিয়ে পড়ে মেঝেতে পেছনের দেওয়াল লক্ষ করে। ততক্ষণে বাতাসে শিস কেটে একটা ধাতব টুকরো সশব্দে ছুটে এসেছে। দেওয়ালে ঝুলতে থাকা একটা বাল্ব ভেঙে চুরমার হল সশব্দে। ঠিক এক সেকেন্ড আগে ওইখানে দাঁড়িয়ে ছিল জব্বার।

এতক্ষণে সংবিৎ ফিরেছে শামসুদ্দিনের। গুলি চলতেই সে সন্ত্রস্ত চোখে দেখল মাটিতে প্রায় শুয়ে থাকা জব্বারের শরীরটা বেজির মতো ক্ষিপ্রতায় ওই অবস্থাতেই এগিয়ে গেল পেছনের দেওয়ালের দিকে দাঁড় করিয়ে রাখা দুটো গ্যাস সিলিন্ডারের দিকে। অসম্ভব দ্রুততায় একটা সিলিন্ডারের মুখে সে জড়িয়ে ফেলল নোংরা ন্যাকড়াটা।

পেছনে দোকানের দরজার কাছে ততক্ষণে দ্রুত এগিয়ে এসেছে চার জোড়া পায়ের শব্দ। শামসুদ্দিন কোণঠাসা ইঁদুরের মতো ছটফটিয়ে উঠতে উঠতেই দেখল তার সঙ্গী ততক্ষণে দেশলাই জ্বালিয়ে আগুন ধরাচ্ছে সিলিন্ডারের মুখে জড়ানো ন্যাকড়ায়। স্টোভের কেরোসিন উপচে পড়লে কী ঢালতে গিয়ে ফানেলের মুখ বেয়ে গড়িয়ে পড়ে গেলে সেসবও মোছা হত হাতের কাছে থাকা এই ন্যাকড়ায়! সিগারেট নেওয়ার সময়ই জব্বার খেয়াল করেছিল! দপ করে তা জ্বলে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে। ভয়ার্ত গলায় শামসুদ্দিন চিৎকার করতে যাওয়ার আগেই জব্বার আরেকটা অবিশ্বাস্য কাণ্ড করল। এক লহমায় আসুরিক শক্তিতে সেই জ্বলন্ত ন্যাকড়াসমেত সিলিন্ডারকে মাটি থেকে একটু তুলে অনেকটা শটপাট ছোড়ার ভঙ্গিতে ছুড়ে দিল দরজার দিকে।

কিছুটা শূন্যে থেকে দমাস করে আছড়ে মাটিতে পড়ল সিলিন্ডারটা। মুখে জড়ানো ন্যাকড়ায় ধু-ধু করে জ্বলতে থাকা আগুন নিয়ে সেটা গড়গড় করে গড়িয়ে ধেয়ে গেল দোকানের দরজার দিকে।

আক্রমণাত্মকভাবে এগিয়ে আসা পায়ের শব্দ হঠাৎ করে থমকে গেল। আবার একটু দ্বিধা! কয়েক পা পিছিয়ে যাবার শব্দ!

কিন্তু শামসুদ্দিনের তখন সেসব ভাবার সময় কোথায়? ঝড়ের মুখে পড়া শুকনো কুটোর মতো সে যেন উড়ে গেল। তার এক হাত ধরে সজোরে টান দিয়ে জব্বার ততক্ষণে

ঝাঁপ মেরেছে। কী করে কে জানে সে খেয়াল করেছিল একটা পলকা টিনের দরজা। ঝাঁপিয়ে পড়া শক্তিশালী কাঁধের চাপে মুহূর্তের মধ্যে ফ্রেম থেকে খুলে একপাশে ঝুলে পড়ল সেই দুর্বল দরজা।

এক অদ্ভুত কায়দায় শামসুদ্দিনকে জড়িয়ে ধরে বাইরের জমিতে যখন জব্বার পড়ল, শামসুদ্দিনের শরীরে বিন্দুমাত্র আঘাতও লাগল না। ধাক্কা সামলাতে কিছুটা গড়িয়ে গিয়ে স্থির হয়েই জব্বার চকিতে নিজেকে আলাদা করে নিল।

তার কাছে একটা মুহূর্তও বাড়তি নেই নষ্ট করার মতো। দোকানে ঢুকে পড়ে সে কয়েক সেকেন্ড গেইন করেছিল। আর গ্যাস সিলিন্ডারের মুখে আগুন দিয়ে ছোড়াটা প্রায় পুরোটাই ধোঁকা। লোকগুলি যদি অতটাই পেশাদার হয়ে থাকে যতটা সে আন্দাজ করছে, তাহলে তাদের এতক্ষণে খেয়াল পড়েছে, যে একটা সিলড সিলিন্ডার এইভাবে কখনোই বার্স্ট করে না। আর সেটা বুঝে যাওয়ার পরে চার-পাঁচ সেকেন্ডের মধ্যেই তার অ্যাডভান্টেজ সে খুইয়ে বসবে। সুতরাং হাতে ওই কয়েক সেকেন্ডই! তার মধ্যেই...

চিতাবাঘের তাড়া খাওয়া হরিণের দ্রুততায় ও শিকারি বিড়ালের মতো নিঃশব্দে দৌড়োতে শুরু করল জব্বার। তারা এখন দোকানটার পেছন দিকে। একটা মজে যাওয়া ডোবার পাড়ে, ঝোপঝাড়ের মধ্যে এসে পড়েছিল দরজা ভেঙে। স্তূপীকৃত জঞ্জালের মধ্যে। সেখান থেকে তড়িঘড়ি উঠে পড়াটা সহজ নয়। পায়ের তলায় শক্ত মাটি পাওয়াই বেশ সময়সাপেক্ষ। তবে জব্বারের তাতে কোনো সমস্যা হয়নি। হওয়ার কথাও নয়। প্রথমে কিছুটা সোজা, তার পরে বাঁ-দিকে তারপর আবার বাঁ-দিকে ঘুরলে দোকানের সামনে পৌঁছোনো যাবে। সব মিলিয়ে ফুট চল্লিশেক দূরত্ব।

কিন্তু জব্বার সেদিকে গেল না। ডোবা আর উলটো দিকের খালের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করছে একটা বড় পাইপ। তীব্র গতিতে দৌড়োতে দৌড়োতে ডান দিকে ঝুঁকে দু’ হাতে বড় কংক্রিটের পাইপের গা ধরে মসৃণভাবে ঠিক একটা টিকটিকির মতো সে মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে গেল পাইপের ভেতর। আধা-শুকনো নালাটা। প্রবল বর্ষার সময় মজে যাওয়া ডোবা যাতে ছাপিয়ে না যায়, তার জন্যই এই ব্যবস্থা করা, সেটা বোঝা যায়। এখনও বর্ষা নামেনি সেইভাবে। স্বাভাবিকভাবেই জল প্রায় নেই। একটা প্রমাণ সাইজের মানুষ হামাগুড়ি দিয়ে যেতে পারে কোনোক্রমে— এটুকুই জায়গা নালার ভেতরে।

ভুল বলা হল। কোনোক্রমে নয়। অনায়াসে। অবিশ্বাস্য দ্রুততায়! অন্তত জব্বারের যাওয়া দেখে মনে হল আজন্ম সে এই নালার ভেতর দিয়ে এইভাবেই হামাগুড়ি দিয়ে চলেছে। মুহূর্তের মধ্যে অপর প্রান্তে পৌঁছে সে একটু থমকাল। অদ্ভুতভাবে শরীরটা বাঁকিয়ে খালের পাড়ের সামান্য ওপরে চোখ তুলে সে দেখে নিল ওই চার জনের পজিশন।

প্রাথমিক ধন্দ কাটিয়ে উঠেছে তারা। একটা অর্ধবৃত্ত বানিয়ে আস্তে আস্তে দোকানের চারপাশে রিংটা টাইট করে আনছে। চার জনেরই হাতের অটোমেটিক ততক্ষণে ফায়ার রেডি। কাল্পনিক সেই বৃত্তের কেন্দ্রে, দোকানের পেছনে কোনো অদেখা ঝোপে শামসুদ্দিন তখনও নিজেকে সামলে ওঠার চেষ্টা করছে। তবে, নিজেদের পেছন দিকটা এতটা অরক্ষিত রাখা দেখে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, এরা এই নালাটার অস্তিত্ব এবং তার গুরুত্ব সম্বন্ধে তলিয়ে ভাবেনি।। মনে মনে হাসল জব্বার।

প্রফেশনাল বটে, তবে ছেলেমানুষ প্রফেশনাল। ট্রেনিং-এ খামতি আছে। ট্রেনিং-এ খামতি রেখে ফিল্ডে নেমে পড়ার একটাই পরিণতি... মৃত্যু!!

সাক্ষাৎ মৃত্যুদূতের মতোই পালকের মতো হালকা পায়ে ছোট্ট একটা লাফ দিয়ে রাস্তায় উঠে এল জব্বার। সবচেয়ে কাছের জনের সঙ্গে তার দূরত্ব ফুট আষ্টেক। লোকটা কিছু একটা টের পেয়ে ঘাড় ঘোরায়!

বড্ড দেরি! ভীষণ দেরি! চোখ জব্বারকে দেখতে পায় ঠিকই, তবে সিগন্যাল মাথায় পৌঁছোনোর আগেই জব্বার পৌঁছে যায় তার কাছে। বাঁ-হাতের ঝাঁকুনিতে লোকটার ঘাড় সামনের দিকে টেনে আনে সে এক ঝটকায় এবং একই মোশনে ডান হাঁটু সপাটে বসে যায়

কণ্ঠার হাড়ের ওপর। খট করে একটা আওয়াজ এবং লোকটার প্রাণহীন দেহ নেতিয়ে পড়ে যেতে থাকে।

ওয়ান ডাউন, থ্রি টু গো!

কিন্তু পড়ে যেতে দিলে হবে না। জব্বার জানে তার আক্রমণের সারপ্রাইজ এলিমেন্ট শেষ। বাকি তিন জন ততক্ষণে টের পেয়েছে। এবারে নতুন রণকৌশল! সংজ্ঞাহীন দেহটি ঢালের মতো সামনে তুলে ধরে সে। এরই ফাঁকে মৃত লোকটির ফায়ার রেডি অটোমেটিকটা তার হাতে চলে এসেছে। একজন তার পাশের দিকে, বাকি দুজন সামনে।

চোখের পলক পড়ার আগে তার হাতের অটোমেটিক বাঁ-দিকে ঘুরে গর্জে ওঠে, এক বার-দু' বার। প্রথমে হাঁটুর মালাইচাকি, পরেরটা গলায়!

টু ডাউন! টু মোর টু গো!

সেদিকে তাকিয়ে সময় নষ্ট করা যাবে না। সামনের দিকে কোনাকুনি লোকটার পাঠানো একটা বুলেট ততক্ষণে এসে গেঁথে গেছে সামনে ঢালের মতো ধরে থাকা মৃতদেহের পাঁজর ঘেঁষে। তার হলকা ছুঁয়ে গেছে জব্বারের চামড়াও। জব্বার সেদিকে রিভলবার তাক করল। একই কায়দা— দুটো ফায়ার, শর্ট বার্স্টে — প্রথমটা নি-ক্যাপ, পরেরটা গলায়!

থ্রি ডাউন, ওয়ান টু গো!

বাট হোয়্যার ইজ হি? বিদ্যুৎগতিতে চারপাশে নজর চালায় জব্বার— এক লহমার জন্য নজরে আসে লোকটির শরীর। দোকানের ডান পাশে অদৃশ্য হয়ে গেল আভাস মাত্র দিয়ে। জব্বারের মন কু গাইল!

বাতাসে ভর দিয়ে শিকার ধরতে এগোনো ঈগলের মতো সে এগিয়ে গেল। এতক্ষণ সে শিকার ছিল। এবার সে শিকারি!

দোকানের ডান পাশের দেওয়ালের আড়ালটা চোখের সামনে থেকে সরতেই ছবিটা পরিষ্কার হল জব্বারের সামনে। সে যা আশঙ্কা করছিল সেটাই সত্যি হয়েছে।

শামসুদ্দিনের দুটো হাত সামনের দিকে সোজা বাড়ানো। আর তার সামান্য পেছনে, মাথা থেকে দু' ইঞ্চি দূরে অটোমেটিক পিস্তলের ঝকঝকে নলটা তাক করে পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছে চতুর্থ আততায়ী।

প্রফেশনাল!

মনে মনে একটু তারিফ করল জব্বার। সিনেমায় যেভাবে দেখায়, আষ্টেপৃষ্ঠে কাউকে জাপটে ধরে মাথায় বন্দুক ধরে রাখা হয়... ভুল। এভাবে নিজের নড়াচড়াতেও প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়, আর শারীরিকভাবে কাছাকাছি থাকায়, যাকে গান পয়েন্টে রাখা হচ্ছে তার দ্বারাও আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থেকেই যায়। কেউ কেউ আবার একটু পড়াশোনা করে সিনেমা বানায়। তাদের সিনেমায় হিরো গান পয়েন্টে ভিলেনকে হাত মাথার পেছনে বা ওপরে তুলিয়ে রাখে।

হাস্যকর! কোনো সুস্থ বুদ্ধির মানুষ চাইবে না তার হোস্টেজের হাত তার নিজের শরীরের কাছাকাছি থাক।

এইভাবে রাখতে বলবে— সামনের দিকে যতটা পারে স্ট্রেচ করে। নিজে থাকবে ফুট দুয়েক পেছনে। যথেষ্ট জায়গা থাকবে দুজনের মধ্যে, যাতে সামনের লোকের কোনো অতর্কিত নড়াচড়ার প্রতিক্রিয়ায় যথেষ্ট সময় পাওয়া যায় সাবধান হওয়ার।

প্রফেশনাল! আবারও এক বার মনে মনেই ঘাড় নাড়ল জব্বার... প্রশংসার। তার সতর্ক দৃষ্টি এক বারও সামনের দুজনের দিক থেকে সরেনি বা বলা ভালো, এক বারও পিস্তলধারী লোকটির চোখ থেকে সরেনি! জোরালো টর্চের শক্তিশালী আলোর রেখা যেমন অন্ধকারকে ফুঁড়ে দেয়, ঠিক তেমনি তার চোখ জোড়া সমস্ত অস্পষ্টতা ফুঁড়ে লোকটির চোখ দুটোর দিকে তাকিয়ে ছিল! একদৃষ্টে! জব্বারের একটা অ্যাডভান্টেজ আছে। একটাই...

যেখান দিয়ে শামসুদ্দিন ও তার আক্রমণকারী পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছিল সেই জায়গাটা আগাছা ও হালকা ঝোপঝাড়ে ভরা ঘেসো জমি। আর পাঁচ-ছ' পা এগিয়ে এলেই

তারা রাস্তায় উঠে আসবে। তার আগেই সুযোগ দরকার একটা... তার আগেই...

কম্যান্ডোদের ট্রেনিং-এর অন্যতম মূল উদ্দেশ্য নিজেদের ইন্দ্রিয়ের ওপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ আনা শেখানো। মুহূর্তের এদিক-ওদিক কখনো কখনো জীবনমৃত্যুর পার্থক্য ডেকে আনতে পারে।

আফশোস! শামসুদ্দিনের মাথায় পিস্তল তাক করে থাকা লোকটিকে সম্ভবত এর আগে সেটা কেউ শেখায়নি।

আফশোস!! এখন অনেক দেরি হয়ে গেছে!!!

ঘেসো জমিতেই কোথাও পড়েছিল কারও ফেলে যাওয়া একটা প্লাস্টিকের প্যাকেট। হাঁটতে হাঁটতে লোকটির পায়ে সেটি জড়িয়ে যেতেই দু-এক মুহূর্তের জন্য তার মনঃসংযোগ ব্যাহত হল। পায়ে কী আটকেছে দেখার জন্য চোখের মণি এক লহমার জন্য সরল। তার সতর্ক পেশাদার মন তাকে সঙ্গে সঙ্গেই সতর্ক করল এবং তার মনোযোগ ফিরিয়ে আনল যথাস্থানে। কিন্তু ততক্ষণে যা হবার, হয়ে গেছে।

শিকারি ঈগলের চোখ নিয়ে তার প্রতিটি নড়াচড়া মেপে যাচ্ছিল জব্বার। একমুহূর্তের অসতর্কতাই তার জন্য যথেষ্ট। দুটি পরিচ্ছন্ন, নিষ্কম্প শট! একটাই পার্থক্য— এবারে একটা হাঁটুতে আর অন্যটা ডান কাঁধে। প্রবল যন্ত্রণায় কুঁকড়ে গিয়ে শরীরটা গড়িয়ে পড়ল রাস্তার ওপরে।

শামসুদ্দিন ছিটকে সরে গিয়ে দাঁড়াল একটু দূরে। তার চোখের বিস্ফারিত ভাব তখন চূড়ান্ত! পুরো ব্যাপারটা তার চোখের সামনে মাত্র পনেরো-কুড়ি সেকেন্ডের মধ্যে এমনভাবে ঘটে গেল, যে সে নিজের চোখে না দেখলে এটা সিনেমার গল্প বলেই ধরে নিত। তার মনের মধ্যে কোনো প্রশ্ন নেই, কোনো বিস্ময় নেই, কোনো বোধ নেই। এক ভাষাহীন অভিব্যক্তি তার মাথার ভেতরটা যেন কুয়াশার মতো আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

জব্বারের কাজ তখনও শেষ হয়নি। দ্রুত পায়ে সে হেঁটে গেছে মাটিতে পড়ে থাকা শরীরটির দিকে। যন্ত্রণা ঢেউ খেলে খেলে যাচ্ছে তখন সেই শক্তিশালী শরীরের প্রতিটি তন্তুর ভেতর দিয়ে। পায়ের ঠোকরে তার হাতের থেকে অল্প দূরে পড়ে থাকা পিস্তলটা শামসুদ্দিনের দিকে এগিয়ে দিল জব্বার। যদিও ওটা হাতে তুলে নেওয়া এই মুহূর্তে লোকটার পক্ষে আর সম্ভব নয়, কিন্তু সতর্কতার কোনো শেষ নেই। জব্বারের চোখের ইশারায় শামসুদ্দিন বোবার মতো তুলে নিল অস্ত্রটি। আর জব্বার নিজে এক হাতের হ্যাঁচকা টানে জ্যাকেটের কলার ধরে আহত লোকটিকে তুলে দাঁড় করাল।

ঝাঁকুনির চোটে লোকটার মুখ দিয়ে একটা অস্ফুট কাতরোক্তি বেরিয়ে এল। সেদিকে বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করে জব্বার তাকে জিজ্ঞেস করল, 'তেরা বাপ কিধার হ্যায় বে, মাদারচোদ!'

লোকটা তখন যন্ত্রণায় অসাড়। কোনোমতে জিভ নাড়িয়ে কী একটা বলতে গেল। খুব সম্ভবত কোনো গালি দিতে গেল। সঙ্গে সঙ্গে আর একটা ঝাঁকুনি। যন্ত্রণা অসহ্য হওয়াতেই অনেকটা প্রতিবর্ত ক্রিয়ার মতোই লোকটির অক্ষত বাঁ-হাতটি উঠে দিক্‌নির্দেশ করল।

এই রাস্তা দিয়ে কয়েক শো মিটার এগিয়ে গেলেই বেশ কয়েকটা বাড়ি। এখান থেকে দেখা যাচ্ছে। জখম লোকটিকে সামনে ঠেলে দিয়ে আবার শামসুদ্দিনের দিকে ইশারা করেই পেছনে পেছনে চলতে শুরু করল জব্বার।

শামসুদ্দিন নিঃশব্দে পাশে পাশে চলতে শুরু করল। কিছুক্ষণ চুপচাপ চলার পর সে মুখ তুলে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি যদি মিস করতেন? লোকটা যদি আমায় গুলি করে দিত?'

তার দিকে একটা ঠান্ডা চাউনি ছুড়ে, গলায় একটু শ্লেষ মিশিয়ে তার সঙ্গীটি বলল, 'আপনি মরতে ভয় পান নাকি?'

আবার দুজনেই চুপচাপ। শামসুদ্দিনের মনে পড়ছিল তার বারুইপুরের স্কুল। কী অদ্ভুত! কীভাবে অন্যের জীবন কাটাতে কাটাতে একসময় তা নিজের জীবন বলে মনে হতে

শুরু করে...

জব্বার মনে মনে কী ভাবছে বাইরে থেকে বোঝা যায় না, শোনা যায় না। গেলে, শোনা যেত, সে বলছে, ‘হাউ ডাজ ইট ম্যাটার, ইভেন ইফ ইউ ডায়েড!’

একবিংশ অধ্যায়
।। দ্য গ্যামবিট অ্যাকসেপ্টেড ।।

২৯ জুলাই, ২০১৮, সকাল বেলা / নিউ দিল্লী, ভারত

'তা বলে তোমাকে কলকাতায় কেন যেতে হবে?'

'আহ! কী মুশকিল! বস চাইলে যেতে হবে না? কীসব ছাতার মাথা সেমিনার আছে। ট্রেনিং আছে। প্রোমোশনের জন্য সেটা ম্যান্ডেটরি!'

'তুমি আবার কবে থেকে প্রোমোশনের জন্য এত ব্যাকুল হলে? আমি তো জানতাম তোমার অত অ্যাম্বিশন নেই...'

গজগজ করতে করতে বারান্দার টবের গাছে জল দিতে থাকেন মৃণাল! অরুণ জানেন সব কথার জবাব দিতে নেই। সেটাই বুদ্ধিমানের কাজ। তাই তিনিও মুখ বুঝে জুতোর ফিতে বাঁধায় মনঃসংযোগ করলেন। কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকেই মৃণাল আবার শুরু করলেন, 'তুমি কি একাই যাবে?' ,

'বললাম না, বস যাবে।'

'বস, মানে নীতিন?'

প্রমাদ গুনলেন অরুণ। মৃণাল যথেষ্ট বুদ্ধিমতী। সে কিছু একটা আন্দাজ করেছে। নাহলে সচরাচর সে অরুণের কাজের বিষয় নিয়ে এত আগ্রহ দেখায় না। আর লুকোছাপা খুব একটা করা যাবে না। একটু রেখে-ঢেকে সত্যি কথাটাই বলতে হবে। কী জানি, আবার যদি নীতিনের স্ত্রীকে ফোন করে বসে! পার্টিটার্টিতে মাঝেমধ্যে যাওয়ার সুবাদে কিছু অফিসারের স্ত্রীদের নিজেদের মধ্যে ভালোই সদ্ভাব।

একটু গলাখাঁকারি দিয়ে অরুণ বলেন, 'ইয়ে, মানে— নীতিন না। এখন আমার বস অন্য একজন।'

'কে?'

'তুমি চিনবে না।'

'অ! তা এর পরে আর প্রশ্ন করলেও কি তুমি সত্যি জবাব দিতে পারবে, নাকি এবারে বানিয়ে গল্প বলতে হবে?

অরুণ এতক্ষণে মৃণালের চোখের দিকে ভালো করে তাকান। দুষ্টুমির ঝিলিক সেখানে স্পষ্ট! কী শয়তান মেয়ে! এতক্ষণ ধরে স্রেফ মজা করে তাকে প্রশ্ন করে করে জ্বালাতন করে গেল। আর তিনি কিনা ভেবে ভেবে সারা হচ্ছেন, যে মৃণালের হঠাৎ হলটা কী? নাহ! এই দুষ্টুমির জন্য মেয়েটাকে শাস্তি দিতেই হবে...

পরের কয়েক মুহূর্তের জন্য টবের গাছ, তার চিকন সবুজ পাতা, জানলার পর্দার ভাঁজ বা ঘড়ির কাঁটা— সবাই মুখ ফিরিয়ে নিল। এ সময় দেখতে নেই। এ সময়ে ভাগ বসাতে নেই। দস্যিপনা শেষ করামাত্র মৃণাল আবার ঝিকমিকিয়ে বলে উঠলেন, 'ইশ! তুমি জুতো পরেই ঢুকে পড়লে? ছি ছি!'

চোখে-মুখে লজ্জার রাঙাভাব কাটাতেই একটু বেশি রাগ ফুটিয়ে তুলতে গিয়ে তিনি আবার হেসে উঠলেন। অরুণও হাসতে হাসতে হাত নেড়ে দরজার দিকে পা বাড়ালেন।

'চলো, বাই মৃণাল! উইল বি ব্যাক উইদিন আ উইক!'

'অ্যাজ ইফ আই কেয়ার!'

মুচকি হেসে মৃণাল পেছন পেছন এসে দরজা ধরে দাঁড়ান! অরুণ বেশ জোরেই পা চালিয়ে সিঁড়ির দিকে এগোন। প্রিন্সিপাল সেক্রেটারিকে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করিয়ে রাখা উচিত নয়। শেখরণের সঙ্গে দেখা করে তার পরেই এয়ারপোর্টে যাবেন তিনি। ফ্লাইট আজকেই বিকেলে। সময় নষ্ট করার কোনো সময় নেই আর।

পার্কিং-এ পৌঁছে গাড়িতে ঢুকতে যাওয়ার মুখেই কলটা এল তাঁর কাছে। কলকাতা

থেকে পরীক্ষিৎ কল করেছে। ভাইজান সম্বন্ধে লিডটা এরই দেওয়া। আর সেই জন্যই কলকাতা যাওয়ার প্ল্যান অরুণের। ছেলেটি ইন্টারেস্টিং। অরুণের এই দু' দিনের অল্প কথাবার্তাতেই বেশ বুদ্ধিমান মনে হয়েছে ছেলেটিকে। বাঁধাধরা গতানুগতিক ছকে চলা মন হয়ে যায়নি এখনও।

ফোনটা ধরে অরুণ গাড়িতে বসতে বসতে বলেন, 'হ্যালো!'

'হাই স্যর! পরীক্ষিৎ বলছি।'

'হ্যাঁ, বলুন।'

'স্যর, আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করার ছিল...'

'কী কথা, বলুন!'

'আচ্ছা, এই যে একটা অ্যালিয়াস দিয়েছেন, ভাইজান— এটার ব্যাপারে আপনার সোর্স অফ ইনফর্মেশন কতটা নিশ্চিত?

'কেন বলুন তো?' একটু আশ্চর্যই শোনায় অরুণের গলা।

'না, মানে দু-একটা ব্যাপারে কনফিউশন হচ্ছে। আমাদের এখানে যে দুজন এই ব্যাপারে মুখ খুলেছে, তাদের সঙ্গে কথা বলে আমার যেটা মনে হচ্ছে আসলে নামটা হয়তো অন্য কিছু! হয়তো ভাইজান বলে ডাকা হয় এই লোকটিকে।

'কেন এরকম মনে হচ্ছে?'

'সেটা স্যর, আপনাকে মুখোমুখিই বলব। আপনি কবে আসছেন?'

'আজই। ও হ্যাঁ, শুনুন, আমি কে, সেটা খুব বেশি লোক না জানাই ভালো। সমস্যা তৈরি করার লোক তো কম নেই। জুরিসডিকশন নিয়ে প্রশ্ন করে ইনভেস্টিগেশনটাই আটকে দেবে হয়তো।

'ও নিয়ে আপনি ভাববেন না স্যর! আই উইল ম্যানেজ ইট। আপনার ফ্লাইট ক'টায় ল্যান্ড করবে কলকাতায়?'

'সাড়ে পাঁচটা। বিকেল'

'ওক্কে। আমি থাকব এয়ারপোর্টে।

'থ্যাংকস, বাই!'

'বাই... ও, ভালো কথা স্যর, একটা কথা বলতে ভুলেই যাচ্ছিলাম... বারুইপুর থানা থেকেও একটা খবর এসেছে। দে থিংক দে গট আ মুজাহিদিন লিংক!!'

৩০ জুলাই, ২০১৮, বিকেল বেলা

'কবে থেকে নিজের খদ্দেরদের নিজেই মারতে লেগেছিস?'

যে লোকটা প্রশ্ন করছিল তার রোগা-পাতলা চেহারা। গালে দাড়ি। পরনে সাধারণ প্যান্ট-শার্ট। হিন্দি শুনলে বোঝা যায়, হিন্দি এর মাতৃভাষা নয়। ভাতিজার বয়স হয়েছে। চোখেও সে একটু একটু কম দেখে আজকাল। চশমা পরেও লাভ হচ্ছে না। তা বলে এত কম দেখে না, যে এই লোকটাকে দেখে ভয় পাবে।

দোকান থেকে সরে এসে সে দরজার কাছে দাঁড়িয়েই অপেক্ষা করছিল তার লোকেদের ফিরে আসার। ফিরে এল। কিন্তু একজন। তাও জখম হয়ে। ভাতিজা যদিও ভয় পাওয়ার কোনো কারণ দেখেনি। কেন জানি না, এই সামনের লোকটাকে দেখে তার একটুও ভয় লাগছে না।

যে চেয়ারে তাকে প্রায় ঠেলেই বসিয়েছে দাড়িওয়ালা লোকটা, সেটা বেশ নড়বড়ে। নিজের বাড়িরই চেয়ার। ওই, সারাচ্ছি সারাচ্ছি করে সারানো হয়নি, আর কী। খুব সন্তর্পণে নড়বড়ে চেয়ারেই যতটা সম্ভব আরামে পা তুলে বসতে বসতে সে বলল, 'কী চাই সোজাসুজি বল। যদি ভাবিস, চারটে লোককে মেরে তুই আমাকে ভয় দেখাবি, গাণ্ডু, তাহলে বলব তুই এখনও চুতিয়াই আছিস!'

একটা কোণঠাসা হওয়া লোক যে খুব ঠান্ডা গলায় এরকম পালটা হুমকি দিতে পারে

তা শামসুদ্দিনের জানা ছিল না। সে ডিপ কভার অ্যাসেট। ফিল্ডওয়ার্ক তার এক্সপার্টাইজ নয়। সে একটু থতোমতো খেয়ে গেল। তারপর কোনোমতে সামলে নিয়ে বলল, ‘আমরা তো শুধু আর্মস কিনতে এসেছিলাম। লং রেঞ্জ স্নাইপার রাইফেল। আমাদের পেছনে গুন্ডা লাগালি কেন? আমরা তো তোর পোষা লোকদের বলেওছিলাম কী জন্য এসেছি! তাহলে?’

‘ওই জন্যই তোদের মারাটা দরকার হয়ে পড়ছিল বুরবক।' উত্তর দিতে দিতেই চোরা চোখে এক বার অন্য জনের দিকে দেখে নিল ভাতিজা।

এই দ্বিতীয় লোকটার ব্যাপারটা আলাদা। যত বার এর দিকে চোখ পড়েছে, ভাতিজার শিরদাঁড়া দিয়ে একটা হিমেল স্রোত বয়ে গেছে। হ্যাঁ, এই এলাকার প্রতিটা বাড়ির প্রতিটা সদস্য যার কথায় হাসতে হাসতে মরতে পারে, যাদের প্রত্যেকে ঠিক এই মুহূর্তে বিভিন্ন দূরত্বে তৈরি হচ্ছে হাতে মারণাস্ত্র নিয়ে, যার অনেকগুলোই তার নিজের হাতেই তৈরি, সেই ভাতিজারও ভয়ে গা শিরশির করছিল লোকটাকে দেখে।

কী যেন একটা ব্যাপার আছে এই লোকটার মধ্যে। অথচ যা হম্বিতম্বি, ঠেলাঠেলি সব ওই ফচকে মতো ছোঁড়াটাই করছে। এ পুরো চুপচাপ। প্রায় পাঁচ মিনিট হয়ে গেল, একটাও কথা না বলে খালি ওর দিকে চেয়ে আছে একদৃষ্টিতে! সেই চোখে কোনো ভাষা নেই। ভয়, রাগ, হতাশা, জেদ— কিচ্ছু না। আর সেই ভাষাহীন চাউনির দিকে তাকালেই অস্বস্তি হচ্ছে ভাতিজার। তার পেশায় যাদের নিয়ে কাজ, তারা সবাই আইনের গণ্ডির বেশ কিছুটা বাইরে দিয়ে যাওয়া-আসা করা লোক। অনেকরকম লোকই দেখেছে সে তার দীর্ঘ পেশাদার জীবনে। কিন্তু খুব কম লোকেরই এইরকম কাচের মতো চাউনি থাকে। যাদের থাকে, ভাতিজা জানে, তাদের সঙ্গে পাঙ্গা নেওয়া যায় না। সেটা বিপজ্জনক। এমনকী তার পক্ষেও।

তবু সে টের পেতে দিতে চায় না তার ভয়ের কথা। তাই সে জোর করেই নিজের মুখে একটা তাচ্ছিল্যের হাসি ফুটিয়ে বলে, ‘চার লোগোঁকো মারকে বহুত বড়া কাম কর লিয়া কা মাদারচোদ! কা সমঝতে কা হো আপনে আপ কো? এখানে ঢুকতে পেরেছিস, আমার ইচ্ছে বলে। কী মনে হয়? এখান থেকে বেঁচে ফিরতে পারবি?’

ধীরে, বেশ ধীরে এগিয়ে আসে অন্য জন। এগোতে এগোতে এক হাতে ফের তুলে নেয় মাটিতে উপুড় হয়ে পড়ে থাকা লোকটার জামার কলার। একটা সাজোয়ান লোককে মাটির ওপর দিয়ে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে নিয়ে আসে, কিন্তু মুখের একটা পেশিও একটুও ভাঁজ হয় না তার। এগোতে এগোতে একদম চেয়ারের সামনে এসে বাঁ-হাতে ধরে থাকা কলারটা ছেড়ে দেয়।

অর্ধ-অচৈতন্য শরীরটা মুখ থুবড়ে পড়ে শানের মেঝেটাতে। লোকটা সেদিকে ভ্রূক্ষেপ মাত্র করে না। সে তখন একদৃষ্টে চেয়ে আছে ভাতিজার দিকে। ভাতিজার ঘোলাটে দুনিয়াদার চোখ জোড়াও কেমন যেন সম্মোহিতের মতো সেদিকেই তাকিয়ে। একদম চোখ না সরিয়েই লোকটা একটু নড়ল বলে মনে হল ভাতিজার। সে তখন চেষ্টা করেও চোখ সরিয়ে দেখতে পারছে না কেন। কেউ যেন আঠা দিয়ে তার চোখ জোড়া এক জায়গায় আটকে দিয়েছে। দু-এক সেকেন্ডের উৎকণ্ঠ প্রতীক্ষা।

তারপর মড়মড় করে একটা আওয়াজ। একদম কাছ থেকে। আর সেই অচৈতন্য শরীর, যা থেকে থেকে কেঁপে উঠছিল, এবং শুধু সেইটুকুতেই বোঝা যাচ্ছিল যে প্রাণ এখনও রয়েছে তার মধ্যে— সেই শরীর ফাটিয়ে একটা মর্মন্তুদ আওয়াজ বেরিয়ে এল। মৃত্যুপথযাত্রী জন্তুর আর্তনাদ যেন। মানুষের বলে ভুল হবার জো নেই। হিম হয়ে দেখতে থাকল ভাতিজা— এই লোকটার চোখে-মুখে এখনও কোনো অভিব্যক্তি নেই। সম্পূর্ণ পাথরের মতো। এরকম ভাবলেশহীন মুখে-চোখে কেউ একটা লোকের হাত এত নিষ্ঠুরতার সঙ্গে ভেঙে দিতে পারে, সেটা নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস হওয়া কঠিন।

অতি কষ্টে নিজের চোখ নামিয়ে, শুকিয়ে যাওয়া ঠোঁট দুটোকে এক বার জিভ দিয়ে চেটে ভিজিয়ে নিল ভাতিজা। লোকটা ততক্ষণে ওর কানের কাছে মুখ নামিয়ে নিয়ে এসেছে। খুব শান্ত গলায় প্রায় ফিসফিস করে সে বলে উঠল, 'তুই কি বেঁচে থাকতে পারবি?

কী যে হল, দীর্ঘদিনের পোড়-খাওয়া ভাতিজাও এই স্নায়ুর চাপ নিতে পারল না। লোকটা যদি ওকে মারত, তাহলে হয়তো ওর এত ভয় করত না। আঘাত পাওয়ার পরেই মানুষের আঘাতের ব্যাপারে ভয় কমে যায়। যতক্ষণ সেটা নিজের ওপর না হয়ে চোখের সামনে অন্যের ওপর হয়, ততক্ষণ মন উন্মাদের মতো যন্ত্রণার অভিঘাত কল্পনা করতে থাকে আর ভয় বাড়তে থাকে। হাউমাউ করে কেঁদে উঠল এতক্ষণ ঢেঁটিয়া হয়ে থাকা গান কিং!

'আরে কা কর রাহা হ্যায় ভোসড়িকে! হাথ তোড় দেগা তো বন্দুক ক্যায়সে বানায়েঙ্গে হাম! হামরা কা কসুর? দো দিন কে অন্দর আগর কোই দুসরা বান্দা আয়ে লম্বা নিশানে কা বন্দুক খরিদনে, তো হাম সোচেঙ্গে কে নাহি— কে উ পুলিস-উলিস হ্যায়?'

সোজা হয়ে দাঁড়ায় লোকটা। এতক্ষণে তার চোখে কোনো ভাষা দেখতে পায় ভাতিজা। তাহলে বোধহয় তাকে মারবে না। লোকটা সেই একই বরফজমানো গলায় প্রশ্ন করে, 'কী বলছিস, খুলে বল!'

২৯ জুলাই, ২০১৮, বিকেল বেলা / কলকাতা, ভারত

'কথা বলতে পারবে না মানে?'

'ডাক্তারবাবু যা বলেছেন, তাই তো আপনাদের বলছি।'

'কিন্তু যা বলছেন তার মাথামুণ্ডু তো বিশেষ বোঝা যাচ্ছে না। ওষুধ দিয়ে কোমায় পাঠানো হয়েছে মানে? সেই কোমা কাটবেই-বা কতক্ষণে?' পরীক্ষিতের গলা উত্তরোত্তর চড়তেই থাকে। পাশে কখন নিঃশব্দে একটি কনস্টেবল এসে দাঁড়িয়েছে, তাঁর সেই দিকে তখন খেয়ালও নেই। কনস্টেবল ছেলেটি নিরুপায় হয়ে একবার মিনমিন করে বলতে যায়, 'স্যার...'

'এখন নয় রতন...' একটু কড়া গলাতে তার দিকে না তাকিয়েই তাকে নিরস্ত করেন পরীক্ষিৎ। ফাঁক পেয়ে সামনে দাঁড়িয়ে আমতা আমতা করতে থাকা আরএমও-টি ততক্ষণে নিজেকে গুছিয়ে নিয়েছে। সে বলে ওঠে, 'আমার কথা যখন বুঝতেই পারছেন না, তখন স্যর, মানে ডাক্তার ছেত্রী আসা পর্যন্ত ওয়েট করা ছাড়া আর কীই-বা করার আছে?'

'আর আপনার স্যর কখন আসবেন?' দাঁতে দাঁত চেপে নিজের ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে হচ্ছে পরীক্ষিৎকে। হাতে একদম সময় নেই। এয়ারপোর্টে যাওয়ার ছিল। সে সময় পেরিয়ে গেছে অন্তত ঘণ্টা খানেক আগে। মিঃ সচদেভ তাকে কতটা অভদ্র ভাববেন? গাড়ি যদিও পাঠিয়ে দিয়েছেন তিনি। তাও...

'স্যরের আসার সময় হয়ে গেছে। যে কোনো মোমেন্টে এসে পড়বেন। আপনি একটু ওই ওয়ার্ডের সামনেটায় ওয়েট করুন! ভেতরে ভিড় হলে আমাদের কাজে অসুবিধে হচ্ছে।'

স্পষ্ট অপমান! একটা ক্রাইম ব্রাঞ্চের অফিসারকে এমনভাবে সরিয়ে দিচ্ছে যেন রাস্তার লোক। কিন্তু এই মুহূর্তে এসব হজম করে নেওয়া ছাড়া পরীক্ষিতের কাছে কোনো উপায় নেই।

তিনি রাগে গরগর করতে করতে ওয়ার্ডের বাইরে গিয়ে দাঁড়ালেন। বাইরে একটা সিকিউরিটি গার্ড একটা টুলে বসেছিল। তাকে দেখে শশব্যস্ত হয়ে উঠে টুলটা ছেড়ে দিতে চাইল। পরীক্ষিৎ হাত নেড়ে তাকে বসতে বলে দেওয়ালে হেলান দিলেন।

রতনের কথা তিনি ভুলেই গেছিলেন। রতন কিন্তু ভোলেনি। সেও পেছনে পেছনে ওয়ার্ড থেকে বেরিয়ে এসে ছায়ার মতো ঠিক স্যারের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। পরীক্ষিৎকে একটু চমকে দিয়েই সে প্রায় কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ফিসফিস করে বলে, 'ওই কাগজের অফিসের মেয়েছেলেটা দেখা করতে চাইছে স্যার! কী বলব?'

'আহ! রতন, কত্ত বার বলতে হবে তোকে, যে মেয়েছেলে না, মেয়ে, মহিলা, লেডি, ম্যাডাম, যা খুশি বল— মেয়েছেলে বললে এই বার বাটাম দেব! যা, নিয়ে আয় তাকে, এখানে! একটু... ইয়ে... করে নিয়ে আসবি, গাধার মতো সামনের গেট দিয়ে নিয়ে আসিস

না যেন।

স্তিমিত হয়ে আসার আগেই পরীক্ষিতের মেজাজ আবার চিড়বিড়িয়ে ওঠে। আসল রাগটা এই ফালতু ঝামেলার ওপর। সেটা একটু বেশিমাত্রায় গিয়ে পড়ে রতনের ওপর।

যদিও পরীক্ষিতের মনে হল, ভালো করে ভেবে দেখলে এই সমস্ত গণ্ডগোল হারামজাদা জয়দীপের জন্য। ব্যাটার এমন গোলমেলে কাজের পদ্ধতি, যে কিছুনা-কিছু একটা ঝামেলা পাকাবেই। নাহক সময় নষ্ট হল। নীলেন্দু চক্কোত্তির ছেলেকে এমন ভয় দেখিয়েছিল যে সে ছেলে হেঁচকি তুলে তুলে একেবারে অজ্ঞান! কেলেঙ্কারিয়াস কাণ্ড একেবারে।

অভিজাত আর তার দেহরক্ষীকে আহত ও অচৈতন্য অবস্থায় এস. এস. কে. এম.-এ নিয়ে আসা হয়েছিল। পরীক্ষিৎ যতক্ষণে সেখানে পৌঁছেছিলেন তাঁর দলবল নিয়ে, ততক্ষণে ছ-সাত জন ডাক্তারের একটা টিম হামলে পড়েছে অভিজাতর ওপর। সরকারি হসপিটালে সুযোগসুবিধে নেই, ইনফ্রাস্ট্রাকচার নেই বলে যারা টিভি চ্যানেলে গ্রাম্ভারি মুখে বাইট দেয়—তাদের এক বার দৃশ্যটা দেখালে তারা বুঝতে পারত সব তালা খোলারই একটা নির্দিষ্ট চাবি থাকে। সরকারি গয়ংগচ্ছতার মধ্যে তৎপরতা আনতে লাগে রাজনৈতিক চাপ!!

কোথা থেকে খবর পেয়ে মিডিয়াও এসে ভিড় জমিয়েছে হসপিটাল চত্বরে। ঢুকতে ঢুকতে পরীক্ষিতের এক ঝলকের জন্য মনে হল বিজনবাবুর কাগজের ওই মহিলা রিপোর্টারটিকে যেন দেখা গেল একবার। সেও বোধহয় ওর দিকে তাকিয়ে পরিচিতের হাসি হাসতে চেয়েছিল। কিন্তু পরীক্ষিৎ চোয়াল শক্ত করে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। এই সব পেছনপাকা রিপোর্টার তাদের কাজ যে কতটা শক্ত করে দেয়, কে বোঝাবে। ইতিমধ্যেই এর সিনিয়র নিখোঁজ। তাতেও যদি এই সব মেয়েদের শিক্ষা হয় একটুও! পুলিশের তো আর কাজ নেই। গরু খুঁজে বেড়াও দিন-রাত্তির!

ওয়ার্ডে ঢুকে প্রথমটায় পরীক্ষিও চমকে গেছিলেন। ইতিমধ্যেই একটা সেকশন আলাদা করে পুরো খালি করে দেওয়া হয়েছে। সেখানে দুটো মাত্রই বেড। একটিতে অভিজাত ও অন্যটিতে বেদ ভিওয়ানি! দুজনের কারোরই তখনও জ্ঞান ফেরেনি। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় এক দঙ্গল নার্স আর ডাক্তারকে দেখা যাচ্ছে এক বার এদিক আর এক বার ওদিক ছুটে বেড়াতে।

পরীক্ষিৎ এক বার একজন দৌড়তে থাকা নার্সকে কোনোমতে পাকড়াও করে জিজ্ঞেস করতে পেরেছিলেন যে পুলিশ কখন একটু কথা বলতে পারবে! নার্স বিস্ফারিত চোখে তার দিকে তাকিয়ে বলেছিল, 'পাগল হয়েছেন?'

'সেটা কি ম্যান্ডেটরি? মানে হতেই হবে?' একটা বেখাপ্পা রসিকতা। আসলে মেয়েদের ম্যানেজ করে কাজ আদায় করে নেওয়ার কায়দা পরীক্ষিতের জানা ছিল না। কোথায় যেন পড়েছিলেন যে মেয়েরা রসবোধ পছন্দ করে। কিন্তু হসপিটালের ইমার্জেন্সি ওয়ার্ড যে সেই রসবোধ দেখানোর প্রকৃষ্ট জায়গা নয়, সেটা সেই বইতে লেখা ছিল না। অগত্যা নার্সের চোখ আরও বিস্ফারিত হল। কোনোক্রমে সে শুধু বলতে পেরেছিল, 'চব্বিশ ঘণ্টা কাটার আগে তো কিছুই বলতে পারছি না।'

পরীক্ষিৎ দমে গেছিলেন। পায়ে পায়ে হেঁটে ওয়ার্ডের পেছনের ব্যালকনি মতো জায়গাটায় এসেছিলেন যখন, তখন তিনি বেশ অন্যমনস্ক। তাই এককোণে দাঁড়িয়ে থাকা ছায়ামূর্তিটার দিকে তাঁর নজর পড়েনি। ব্যালকনির এককোণে দাঁড়িয়ে এই নির্জন অন্ধকারের সুযোগে একটা সিগারেট ধরাতে গিয়েই তাঁর খেয়াল হয় কে যেন তাঁর দিকে এগিয়ে আসছে।

আধো অন্ধকারে পুরোপুরি সতর্ক হওয়ার আগেই ছায়ামূর্তি প্রায় তাঁর কাছাকাছি এসে পড়ে। তারপরই একটু মৃদু গলায় ডেকে ওঠে, 'স্যর, থোড়া রায়তা ফ্যায়েল গ্যায়া!'

চকিতে উৎকণ্ঠিত হয়ে ওঠা পরীক্ষিৎ সঙ্গে সঙ্গেই চিনতে পারেনজয়দীপ। তিনি জিজ্ঞেস করেন, "কী হল আবার?'

'আরে ওই ছেলেটার কথা বলেছিলাম না স্যর— ওই যে অর্ঘ্য, সিএম-এর ছেলের বন্ধু...'

'হ্যাঁ, কী হল তার? আমি তো তোমাকে বলেছিলাম আমার সঙ্গে কথা বলিয়ে দিতে!' যদিও হম্বিতম্বি করে উঠলেন পরীক্ষিৎ, কিন্তু তাঁর এতক্ষণ এই কথাটা মাথাতেই ছিল না হাজাররকম ঝামেলায়।

'সেটাই তো স্যর চেষ্টা করেছিলাম। বাট... বাট হি কোল্যাপ্সড়! ইন প্যানিক, প্যানিক স্যর! আমি তো ওকে, মাইরি বলছি স্যর, টাচও করিনি!' 'হোয়াট? কোল্যাপ্সড মিনস?'

জয়দীপ আর কোনো কথা ভেবে না পেয়ে আমতা আমতা করতে থাকে। তারপর অতি কষ্টে কুঁতিয়ে কুঁতিয়ে যোগ করে, 'ওর বাপটা স্যর হেব্বি খচ্চর! মিডিয়াকে জড়িয়ে নিয়েছে স্যর! কালকে খবরটা বেরোলে...'

পরীক্ষিতের শুধু চোখ দুটো বড় বড় হয়ে যায়। রাগে, বিরক্তিতে তাঁর মুখে বেশ কিছুক্ষণ কথা জোগায় না। একটা অস্বস্তিকর নীরবতার মধ্যে জয়দীপ ইতস্তত করছিল। সে জানত একটা তদন্ত চলাকালীন এই ধরনের ঘটনা কতটা অসুবিধের সৃষ্টি করে। কিন্তু ততক্ষণে ঢিল হাত থেকে বেরিয়ে গেছে। নিজে আর সামলাতে পারবে না জেনেই সে বাধ্য হয়ে পরীক্ষিতের কাছে এসে সব কনফেস করছে সেটাও পরীক্ষিৎ বুঝতে পেরেছিলেন। নাহলে এরা সব ক'টা ছেলে যথেষ্ট কাজের হলেও, অ্যাটিটিউডের দিক থেকে বেশ ঠ্যাঁটা! আধ মিনিট মতো নিয়েছিলেন পরীক্ষিৎ নিজেকে শান্ত করতে। তারপর খুব ঠান্ডা, স্বাভাবিক গলাতেই জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'কাদের জানিয়েছে?'

'ওই যে স্যর বিজন মুখার্জীর কাগজ... সত্যবার্তা না কী নাম...'

একটা অস্ফুট দীর্ঘশ্বাস ফেলে ফোনটা হাতে তুলে নিয়েছিলেন পরীক্ষিত। ফেভার ট্রেড করতে হবে। এই খবরটা সত্যিই মিডিয়ায় বেরোতে পারে না।

বিজন রাজি হয়ে গেছিলেন সঙ্গে সঙ্গেই। একটাই শর্ত। কিছু একটা গণ্ডগোল পাকাচ্ছে, তার দুদে সাংবাদিকের নাকে তিনি সেই গন্ধ পেয়েছিলেন। তাঁদের এক্সক্লুসিভ দিতে হবে। সত্যি কথা বলতে কী, পরীক্ষিৎ একটু আশ্চর্যই হয়েছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন বিজন হয়তো ওর নিখোঁজ সাংবাদিক ছেলেটিকে খোঁজার ব্যাপারে বেশি জোর দেবেন। যাইহোক, শর্তে রাজি হওয়া ছাড়া সেই মুহূর্তে পরীক্ষিতের কাছে কোনো উপায় ছিল না।

বিজন জয়দীপের খবরটা চেপে গিয়েছিলেন। আর বিন্দুমাত্র সময় নষ্ট না করে নিজের পাওনাগণ্ডা বুঝে নিতে পরের দিন, অর্থাৎ আজই পাঠিয়ে দিয়েছেন এই মেয়েটাকে। কীসব বোরখা-টোরখা পরিয়ে ঢুকিয়েছে রতন। কোত্থেকে পেল এসব কে জানে! তবে রতনের অসাধ্য কিছু নেই।

মেয়েটিকে এক বার আপাদমস্তক দেখে নিয়ে পরীক্ষিৎ এক বার রতনের দিকে ফিরে বলেন, 'কী রে? অন্য কেউ বুঝতে পারেনি তো?'

'না স্যার! দুটো নার্সদিদিকে ম্যানেজ করে ঢুকিয়ে নিয়েছি। ওদেরই একজনের বোরখা!

'হুম। গুড!' বলে পরীক্ষিৎ ফেরেন মোনালিসার দিকে, 'বলুন ম্যাডাম, কী করতে পারি, আপনার জন্য?'

'অভিজাত রায়ের কী কন্ডিশন স্যর?'

'কোমায় আছে। ওর বডিগার্ডও।

'কোমা? কী ধরনের ইনজুরি?'

'এক্সটার্নাল ইনজুরি তেমন কিছু না। মাইনর কাটস অ্যান্ড ব্রুজেস! আনফরচুনেটলি আমরা এখনও ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করে উঠতে পারিনি। তাই ডিটেলস জানি না, মোনালিসা! তাঁর জন্যই অপেক্ষা করছি। যেটুকু জানলাম, মেডিক্যালি ইনডিউসড কোমা!'

'মেডিক্যালি ইনডিউসড? স্ট্রেঞ্জ!'

'হোয়াই ডু ইউ সে সো?

'আপনার মনে হচ্ছে না, সমস্ত ব্যাপারটাই স্ট্রেঞ্জ?'

'সেটা এখন থাক। আগে শুনি আপনার কেন মনে হচ্ছে পুরোটাই স্ট্রেঞ্জ?' 'দেখুন স্যর, আপনার অফিসার, মিঃ কুমার যে লিডটি ফলো করছিলেন...' পরীক্ষিৎকে একটু সতর্ক হয়ে উঠতে দেখেই মোনালিসাও দ্রুত চারপাশে চোখ বোলায়। ওয়ার্ডের ডাক্তার-নার্সরা নিজেদের মতো করে ব্যস্তসমস্ত পায়ে ওয়ার্ডে যাওয়া-আসা করছে। প্রাথমিক চাঞ্চল্য ও উদ্বেগের চব্বিশ ঘণ্টা কেটে যাওয়ায় সিকিউরিটি কিছুটা শিথিল।

তবু প্রচুর লোক। পরীক্ষিৎ তাকে ইশারা করে পাশের করিডোরটা দেখান। বাঁ-দিকে করিডোর বরাবর একটু গেলেই পেছন দিকের সেই ব্যালকনি। একটা টিউব জ্বলছে সেখানে, মলিন। একগাদা প্যাকিং বাক্স, সম্ভবত এক্সপায়ার হয়ে যাওয়া বা ব্যবহৃত ইনজেকশনের অ্যাম্পুল, ওষুধের ফয়েল, ব্যান্ডেজ ও তুলোর প্যাকেট ভরতি... একদিকটা পুরো জুড়ে রেখেছে। এখানেই, এই অপ্রত্যাশিত নির্জনতায় দাঁড়িয়েই কালকে জয়দীপের কাছে দুঃসংবাদ শুনেছিলেন পরীক্ষিৎ। তারই ফলে আজকে এই মেয়েটাকে এত এন্টারটেইন করতে হচ্ছে।

তবে মেয়েটার একটা গুণ আছে। অকাজের কথায় সময় নষ্ট করে না।

যেখানে সে বাধা পেয়েছিল, ফাঁকা জায়গায় পৌঁছেই সেখান থেকেই আবার কথার খেই ধরে, 'স্যর, দুটো লিড একসঙ্গে করলে কী দেখছি আমরা? অভিজাত রায় আর তার গে পার্টনার এবং বডিগার্ড সম্ভবত সিএম-কে মারার চেষ্টা করল এবং ফেরার হল। পালানোর সময় খুন করে গেল ড্রাইভারকে। কিন্তু কেন? মানে দেখুন— একজন ব্ল্যাক ক্যাট কম্যান্ডো যদি আমার কো-কনস্পিরেটর হয়, তাহলে আমি কি আমার শত্রুকে বাথরুমে আছাড় খাইয়ে মারতে চাইব? আর মারতে চাইবই-বা কেন?'

'মে বি বিকজ, সিএম ওদের এই সম্পর্ক মেনে নিতেন না।'

'ওকে। বাট, স্টিল— তার জন্য কেউ একটা রাজ্যের সিএমকে খুন করার রিস্ক নেয়? তাও আবার ওই অদ্ভুত উপায়ে?'

পরীক্ষিতের মনে কৌতূহল জাগছে। মেয়েটার বুদ্ধি আছে। কিন্তু মুখে কিছু বুঝতে না দিয়ে সে শুধু কাঁধ ঝাঁকায়! দেখাই যাক না, কতটা কী এগোতে পারে, মেয়েটা। মোনালিসা কথার ঝোঁকে বলেই চলে, 'তারপর ধরুন, খুনের চেষ্টা করে পালালই যদি, তাহলে ফিরে এল কেন? ওঁদের দুজনকে ইনজিওর করল কে বা কারা? কেন?'

'গুড পয়েন্টস মোনালিসা! বাট, দেন, আপনার থিয়োরিটা কী? হোয়াট মাইট হ্যাভ হ্যাপেনড?'

'জানি না স্যর! তবে মনে হচ্ছে এই খুনের চেষ্টা ব্যাপারটা ইজ পিওর ফিগমেন্ট অফ ইম্যাজিনেশন ফ্রম সিএম...

'ওয়েল, আমরা সেটা অ্যাজিউম করে নিতে পারি না, ক্যান উই?' মুখে একটা বাঁকা হাসি ঝুলিয়ে রেখেই পরীক্ষিৎ কথাটা বলেন। ফলে তার আসল মানেটা বুঝে নিতে মোনালিসার অসুবিধে হয় না। সেও পালটা হেসে বলে, 'আর এদের ব্যাপারটা সত্যিই ধোঁয়াশা! আমি জানি না, হোয়াট ইজ গোয়িং অন! আই হোপ, আপনি আমাকে বলতে পারবেন, গাইড করতে পারবেন!'

পরীক্ষিতের অভিব্যক্তিহীন মুখ দেখে মনে হতে পারত যে তিনি হয়তো অন্যমনস্ক। তিনি হয়তো মোনালিসার কথা শুনছেন না। কিন্তু সেটা যে ভুল তা বোঝা গেল এবারে। একটা সিগারেট ঠোঁটে ঝুলিয়ে দেশলাই জ্বালতে জ্বালতে পরীক্ষিৎ একটু হেসে বলে উঠলেন, 'ও ডিয়ার, মোনালিসা! আই অ্যাম নট হিয়ার টু গাইড ইউ! আই অ্যাম জাস্ট সেভিং মাই ফাকিং অ্যাস বাই টলারেটিং ইউ...' মোনালিসা একটা জোর ধাক্কা খেল। আপাত অমায়িকতার আড়াল থেকে একজন মানুষ এরকম হাসতে হাসতে অবলীলায় এই ধরনের রূঢ় কথা বলতে পারে, সেটা ওর কল্পনায় ছিল না দিন কয়েক আগে পর্যন্ত। কিন্তু দেবদীপ্তর সঙ্গে কাটানো কয়েক ঘণ্টার ইনিশিয়েশন ওকে সামলে দিল। নড়ে গেলেও নক আউট হল

না ও। মুখে জোর করে হাসি ফুটিয়ে বলল, ‘সো ইউ আর, স্যর!’ বলে মুখে একটা আফশোসের চুক চুক আওয়াজ করল।

পরীক্ষিৎ চোখ কুঁচকে তাকালেন তার দিকে। পালটা কামড় দিতে শিখেছে এরই মধ্যে। কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন তিনি, কিন্তু তাঁর কথা বাধা পেল বুটের আওয়াজে। দ্রুত আওয়াজ। কেউ দৌড়ে এদিকেই আসছে। মুহূর্ত খানেকের মধ্যেই দেখা গেল তাকে। নির্মাণ!

পরীক্ষিতের সমস্ত স্নায়ু সজাগ হয়ে উঠল। নির্মাণ কাছে এসেই বলল, ‘ইওর ফোন ইজ আনরিচেবল স্যর!’

‘তাই? যাক গে! কিছু পাওয়া গেছে?'

‘হ্যাঁ স্যর। আমরা মোবাইলটা থেকে লাস্ট নাম্বার যেটা ডায়াল করা হয়েছিল, সেটা ট্রেস করেছি।'

‘অ্যান্ড?’

‘স্মল টাইম গুন্ডা স্যর! উলটোডাঙার দিকে থাকে। নাম শিবু। সবাই হ্যান্ডেল শিবু বলে চেনে...’ ততক্ষণে দুজনেই আবার হনহন করে চলতে শুরু করেছেন। তাদের পেছন পেছন প্রায় দৌড়ে তাল মিলিয়ে চলেছে জিন্স আর বোরখা বিজড়িত মোনালিসা। পেছন ফিরে ছুটন্ত মোনালিসার দিকে এক বার তাকিয়েই নির্মাণ বলে, “ইয়ে, স্যর, অফিসে নিয়ে যাইনি। এই এখানেই আউটপোস্টে বসিয়ে রেখেছি।'

‘ইজ ইট ক্রাউডেড?’

‘নো স্যর! নোবডি নোটিসড। আর আউটপোস্টের সব্বাইকে আমরা এখানে পাঠিয়ে দিয়েছি টু কন্ট্রোল মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক!’

‘গুড! প্রতিম আর জয়দীপ কোথায়?’

‘প্রতিম ওখানেই আছে স্যর। আর জয়দীপ...’ কথাটা শেষ না করেই হাত উলটোয় নির্মাণ। অর্থাৎ সে জানে না। দাঁতে দাঁত চেপে বিরক্ত হয়ে পরীক্ষিৎ বলেন, ‘ইনকরিজিবল!’

তারপরই ওঁর খেয়াল পড়ে নির্মাণ কেমন যেন ইতস্তত করছে। মেন ব্লক থেকে বেরিয়ে তারা তখন হেঁটে চলেছেন আউটপোস্টের দিকে। মোনালিসা তখনও চুপচাপ তাদের ফলো করে চলেছে। হয়তো নির্মাণ ওর সামনে বলতে চাইছে না।

‘একটা কিছু গণ্ডগোল হচ্ছে স্যর! উই মে হ্যাভ এ প্রবলেম!’

‘কী গণ্ডগোল? হোয়াট হ্যাপেনড?’

‘যে লোকটার থেকে আর্মস নিতে এসেছিলাম তার নাম ভাতিজা। মুঙ্গেরের...’

‘মির্জাপুর-বারদায় বাড়ি, তাই তো?’

‘আপনি জানেন?’ এপাশের লোকটিকে চমৎকৃত শোনায়।

‘জানাটাই আমার পেশা। ভাতিজা আজকের লোক নয়। তুমি বলো, যা বলছিলে।' ওদিকের গলায় কোনো অভিব্যক্তি ফোটে না।

‘হ্যাঁ, যা বলছিলাম। শামসুদ্দিনই আমাদের এখানে নিয়ে এসেছে। হি হ্যাড হিজ লিংকস! কিন্তু এখানে এসে আমরা অ্যামবুশড হই। ফোর আর্মড গাইজ অ্যাট্যাকড আস রাইট আউটসাইড দ্য ভিলেজ!'

কেন একটু পজ নিল সে জানে না। বোধহয় ওদিক থেকে কোনো সাড়া আশা করছিল। এলও, ‘ওকে। গো অন!

‘উই ম্যানেজ্‌ড টু থোয়ার্ট দ্যাট আর তার পরে ওই ভাতিজা বলে স্কাউণ্ড্রেলটাকেও অ্যাপ্রিহেন্ড করি।'

‘ক্যাজুয়াল্টিজ?’

‘থ্রি ডেড, ওয়ান— ওয়েল, উইল ডাই উইদিন দ্য আওয়ার!’

‘ভাতিজা?’

‘কমপ্লিটলি আনহার্মড স্যর!’

'দেন? সমস্যা কোথায়?'

'সমস্যা এই, যে আমি যখন ওই লোকটাকে, মানে ওই ভাতিজা বলে লোকটাকে জিজ্ঞেস করি যে সে আমাদের মারতে চাইল কেন, সেখানে কথায় কথায় সে জানায়, সিমিলার স্পেসিফিকেশনের লং রেঞ্জ রাইফেল সে দু'দিন আগেই অন্য একটা গ্রুপকে দিয়েছে।'

কয়েক মুহূর্তের এক আশ্চর্য নিস্তব্ধতা। তারপর এদিক থেকে আর্য আবার শুরু করে, 'স্যর! ইউ দেয়ার?'

'হ্যাঁ, বলো।'

'এটা কী ব্যাপার স্যর? আমার অজান্তে কী প্যারালাল কিছু অপারেশনস চলছে, আপনার? আই ডোন্ট মাইন্ড অ্যান্ড ইউ নিড নট টেল মি— কিন্তু যদি আমি আমার নেক্সট স্টেপসের ব্যাপারেই অন্ধকার থাকি, যদি প্ল্যানটাই না জানি, হাউ অ্যাম আই স্যাপোজ্ড টু অপারেট অপ্টিমালি?'

'ডোন্ট ইউ ওরি আর্য! তোমাকে না জানিয়ে কোনো ফিল্ড অপারেশন হবে না। হয়ওনি। দিস ক্যুড বি আ কো-ইন্সিডেন্স অলসো, রাইট?'

'নো স্যর, দিস ক্যুড নট বি! আমি ডিটেলসে জেনেছি। এর ঠিক আগেই যে রাইফেলটা বানিয়ে দিয়েছে ভাতিজা, সেটা ম্যাকমিলান ট্যাক-৫০-র একটা কাস্টমাইজড ভার্সন! সঙ্গে ম্যাগাজিন, সেটাও হাইলি কাস্টমাইজড .৩৩৮ লাপুয়া-ম্যাগনাম!'

'ডাম্ব ইট ডাউন ফর মি, প্লিজ, আর্য!'

'সরি স্যর! মোদ্দা কথা, যে রাইফেল আর যে বুলেট ভাতিজা বানিয়ে দিয়েছে দ্যাট সেম কম্বিনেশন— ওয়ার্ল্ডের টপ তিনটে কনফার্মড স্নাইপার শটের একটা হয়েছিল এই কম্বিনেশনে।'

'ডু ইউ হ্যাভ টাইম?'

'তা, আরও মিনিট দুয়েক কথা বলতেই পারি।

'দেন, প্লিজ টেল মি মোর!'

'আপনি আলেকজান্ডার মিখাইলোভিচ-এর নাম শুনেছেন নিশ্চয়ই?'

'হুম। ওই ইউক্রেনের সেপারেটিস্ট লিডার, তাই তো?'

'হ্যাঁ, নিজেকে দোনেৎস্ক পিপলস রিপাবলিকের চিফ বলত। ওয়ান অফ দ্য মোস্ট হাইলি গার্ডেড সেপারেটিস্ট লিডার। একইসঙ্গে রাশিয়া আর আমেরিকার বিরুদ্ধে যাওয়া, আবার ইউক্রেনের থেকে আলাদা হওয়ার চেষ্টা—হি ম্যানেজ্ড টু মেক অলমোস্ট এভরিবডি হিজ এনিমি! সো, হাইলি গার্ডেড তো থাকতেই হবে।'

'ওকে, দেন?'

'প্রায় আড়াই কিলোমিটার দূর থেকে গুলি করে মারা হয়েছিল তাকে। তাও, যখন সে নিজের বাড়ির সেফটিতে লাইব্রেরির ভেতর বসেছিল। গুলি কাচের মোটা জানলা ভেদ করে মাথায় হিট করেছিল।'

'ফাক! হু দ্য হেল ডিড দ্যাট?'

'কেউ জানে না স্যর! কেউ ধরাও পড়েনি এখনও।'

'সে তো অফিসিয়ালি! তোমরা আন-অফিসিয়ালি কিছু শোনোনি? কোনো গুজব, কোনো কিছু?

'একটা খুবই হালকা গুজব ছড়িয়ে আছে, সামওয়ান ফ্রম পাকিস্তান, গভর্নমেন্ট না, প্রফেশনাল ফ্রিল্যান্সার- -ডিড ইট। শোনা যায় কেউই নাকি তাকে কোনোদিন দেখেনি। অথচ কথা ঘোরে, ৯৯-এ আর্মেনিয়া, ২০05 আর ২০০৬এ চেচনিয়া— শেষ পনেরো-কুড়ি বছরের যত আনকনফার্মড লং ডিসট্যান্স কিল সবই নাকি এর করা। আইএসআই-এর কোনো একজন লোক নাকি তার -

কনট্যাক্ট পয়েন্ট। বাট শোনা যায়, হি ইজ এ লোন উলফ!'

'ব্যাড! দিস ইজ ব্যাড! এনি নেম? এনি ফেস?'

'এগেন, নট কনফার্মড স্যর। সার্কিটে লোকজন এর কথা বলতে হলে প্রিন্স বা শাহজাদা বলে ডাকে।'

ছেলেটা ভারি রোগাভোগা। দেখলে গুন্ডা বলে মনেই হয় না। একটা খয়েরি ঢোলা ফুলপ্যান্ট আর একটা সিন্থেটিকের টি-শার্ট পরনে। কালো, কণ্ঠার হাড় পর্যন্ত বেরিয়ে আছে। দু' হাতের দড়ির মতো শিরাগুলো পাকিয়ে পাকিয়ে আছে। এক পায়ে হাওয়াই চটি। বোধহয় যখন তুলে আনা হয়েছে তখন এক পায়েই চটি পরার সময় পেয়েছে।

চেয়ারে বসে থাকার ধরনটা খুব গুটিয়ে-সুটিয়ে। যত দেখছেন পরীক্ষিত, মেলাতে পারছেন না কিছুতেই। নাহ, একে গুন্ডা বলে মনে হচ্ছে না। অন্তত এমন লেভেলের গুন্ডা নয় যার সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর বা তার ছেলের কোনো লিংক থাকবে। অবশ্য এই পুলিশি জীবনে এতরকম নতুন অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে হয়, যে মানুষের চরিত্রের কোনো বিকৃতি বা বৈশিষ্ট্যই আর আশ্চর্য করে না।

বেশি না ভেবেই তিনি ঘরে ঢুকে সপাটে একটা থাপ্পড় কষালেন ছেলেটার গালে। আশেপাশের সব্বাই চমকে গেল। ছেলেটা আকস্মিক আঘাতে চেয়ারসমেত ছিটকে মেঝেতে পড়ে গেছে। প্রতিম প্রতিবর্ত ক্রিয়ায় হাত এগিয়ে দিল ছেলেটার দিকে। তাকে ইশারা করে থামতে বলে, মেঝেতে পড়ে থাকা ছেলেটার সামনে উবু হয়ে বসলেন পরীক্ষিৎ। নিরুত্তাপ গলা। খুব স্বাভাবিকভাবেই জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'সিএম-এর ছেলেকে কেন ফোন করেছিলি, শিবু?'

'ফালতু বিলা করছেন কেন স্যার, বলেছি তো, আমি ফোন করিনি!' ছেলেটার গলাটাও বেশ টেঁটিয়া। ঠাস করে আর একটা থাপ্পড়! চওড়া পুলিশি পাঞ্জার সে থাপ্পড়ে যে কোনো সাধারণ মানুষের পুরো দুনিয়া নড়ে যেত অন্তত কয়েক সেকেন্ডের জন্য। ছেলেটা গা থেকে সেটা অবলীলায় ঝেড়ে ফেলল বলে মনে হল পরীক্ষিতের। চট করে উঠে আধ-বসা হয়ে বসেও পড়েছে মেঝেতে। মুহূর্তে পরীক্ষিতের পূর্বের ধারণা ভেঙে যায়। এ পোড়-খাওয়া মাল।

শিবু আরও একটু ঘষটে সরে গেল দেওয়ালের দিকে। সেদিকে দেখে, পরীক্ষিৎ ধরন পালটালেন চট করে।

উবু হওয়া অবস্থা থেকে উঠে পড়ে হাতটা বাড়িয়ে দিল শিবুর দিকে। মুখে বলল, 'আয়, চেয়ারে উঠে বস।'

শিবু একমুহূর্ত ভেবেই তারপর পরীক্ষিতের বাড়ানো হাতটা ধরে উঠে পড়ে এগিয়ে এসে চেয়ারটায় বসে। পরীক্ষিৎ উলটো দিকে মুখোমুখি একটা চেয়ার টেনে বসতে বসতে এবারে জিজ্ঞেস করেন, 'বেশ, তুই করিসনি ফোন। তোর কথা বিশ্বাস করলাম। কে ফোন করেছিল বল?'

'চিনি না স্যার! আমার এলাকার লোক নয়, নিঘ্যাত!'

'আবার? দেখ বাপু, তুই ভালো ছেলে। যা একটু দুষ্টুমি করিস, সে তোর থানার বড়বাবু বুঝবে, আমার মাথাব্যথা নেই

'কই আর বড়বাবু বুঝছে স্যার? ছ' বছর ধরে মানলি দিয়ে আসচি! অচথ আপনারা যখুন তুলে নিয়ে এলেন, তাপ্পর থেকে কেলিয়েই চলেচেন! একখানাও ফোন তো এল না তার থেন!'

এই টেনশনের টানাটানির মধ্যেও হেসে ফেলেন পরীক্ষিৎ। তারপর নিজের অসম্পূর্ণ কথার খেই ধরে আবার বললেন, 'আচ্ছা, তোকে আর ক্যালানো হবে না। তোর বড়বাবুকেও আমি সমঝে দেব 'খন। কিন্তু এবার তো তুই একটু কিছু বল...'

'কী বলব? আপনারা তো কিছু ব্রিফ করচেন না!'

'ওরে বাবা, আবার ইঞ্জিরি?! বেশ, তুই বল। আমি 'ব্রিফ' করব 'খন!' পরীক্ষিতের হালকা চালের কথায় শিবুর মুখেও একচিলতে হাসি দেখা যায়। সে গুটিশুটি অবস্থা থেকে একটু ছড়িয়ে, সোজা হয়ে বসে। তারপর বলে, 'দেখুন স্যার, কে ফোন করেছিল আমি জানি না। সত্যি বলতে কী, আজকাল পার্টি কে, সেটা নিয়ে অত মাথা ঘামাই না। ওই, থানায় মাসকাবারি ছিল তো— তাই একটু ডেয়ারিং এসে গেসল! তা, এ বা...' একটা নিরীহ খারাপ কথা বলতে গিয়েও আটকে যায় শিবু। সামলে নিয়ে আবার শুরু করে, 'এ মালটা যদিও শুরুতেই পাশাভাইয়ের নাম বলেছিল স্যার!' পরীক্ষিৎ সঙ্গে সঙ্গে মাঝপথেই তাকে থামিয়ে পালটা প্রশ্ন করেন, 'পাশাভাই কে?'

'সে কী স্যার? আপনি পাশাভাইকে চেনেন না? সল্টলেক থেকে শোভাবাজার— এক জনেরই তো নামে ফাটে!'

শোনামাত্র পরীক্ষিৎ চকিতে সামনেই দাঁড়িয়ে থাকা প্রতিমের দিকে তাকালেন। প্রতিমও সঙ্গে সঙ্গে ইশারা বুঝে পকেট থেকে মোবাইল বার করে একপাশে সরে যায়।

শিবুর কথা চলতে থাকে, 'তা, পাশাভাইয়ের নাম শুনে আমার আর কোনো পবলেন ছিল না। আর কাজও তেমন কিছু না। একটা গাড়ি আর একটা ডাইভার দিতে হবে। আর একটা গাড়ি হাপিস করে দিতে হবে। এসব ছুটকো কাজ। পাশাভাই এখন আমাকে গ্যাজুয়েট করে দিয়েছে। অন্য কাজ করি। কিন্তু এই ব্যাপারটা অন্য ছিল। পাশাভাই আগেই ফোনে বলে রেখেছিল— দেখিস লেড়কা, শাহজাদা বলে একজন ফোন করবে। আমার নাম নেবে। কাজটা ঠিক করে করে দিস, বাচ্চা!'

'কী নাম বললি?' প্রকাশ করতে না চাইলেও চাপা উত্তেজনার একটা ছটফটানি পরীক্ষিতের মধ্যে জেগে ওঠে।

'কার? বললাম তো, পাশাভাই...' 'না, অন্যটা!'

ভুরু কুঁচকে একটু তাকাল শিবু। পিটপিটিয়ে চেয়ে একটু বোঝার চেষ্টা করল ব্যাপারটা। এতক্ষণ যে মেজাজে জিজ্ঞাসাবাদ হচ্ছিল এবারেরটা তার থেকে অনেকটাই আলাদা। শিবু উঁচু দরের ক্রিমিনাল না হলেও পুলিশ-ঘাঁটা মাল। সে এই চিহ্ন চেনে। বুঝতে পারছে সে নিজের অজান্তে কোনো বড় খবর দিয়ে দিয়েছে। প্রশ্নের উত্তর তাকে দিতেই হবে। এই হারামি কুত্তাগুলোকে সে খুব ভালো করেই চেনে। সে যদি ট্যান্ডাইম্যান্ডাই করে তাহলে এই মিষ্টি মিষ্টি কথা বলা অফিসার যে তার গাঁড়ে রুল ঢোকাতে দু' বার ভাববে না, তাও সে জানে। তবু একটু নেড়েচেড়ে দেখে নেওয়া ভালো যদি এর বদলে কিছু পাওয়া যায়। নিদেন, একটু তাড়াতাড়ি ছাড়া পাওয়া গেলেও লাভ। তাই সে সামান্য নখরা করে বলল, 'অন্য কোনটা স্যার?

তার কথার জবাব না দিয়ে পরীক্ষিৎ এবারে ঘুরে তাকালেন ঘরের এককোণে একটা ফোল্ডিং চেয়ারে চুপচাপ বসে থাকা মেয়েটির দিকে। তারপর ঠান্ডা গলায় তাকে বললেন, 'মোনালিসা, তোমাকে এবারে চলে যেতে হবে। এক্ষুনি!

এই হঠাৎ সিদ্ধান্তে মোনালিসা একটু চমকেই গেল। তাকে বিজনদা বলেছিলেন যে, পারমিশন পাওয়া গেছে পুরো ইনভেস্টিগেশনটা এক্সক্লুসিভলি কভার করার। পরীক্ষিতের সঙ্গে থেকে। এতক্ষণ চলছিলও ঠিকঠাক। ওর মনে হচ্ছিল পরীক্ষিতের মনে ওর সম্বন্ধে যে প্রাথমিক তুচ্ছতাচ্ছিল্যভাব— সেটা একটু একটু করে কেটে যাচ্ছে। কিন্তু হঠাৎ পুরো উলটো ব্যাপারটা ঘটায় সে একটু অপ্রস্তুত হয়ে গেল। আমতা আমতা করে বলল, 'বাট স্যর, বিজনদা তো বললেন...'

পরীক্ষিতের চোয়াল শক্ত হল। কিন্তু তার গলা চড়ল না। সে ঠান্ডাভাবেই বলল, 'শোনো মোনালিসা— বিজনবাবু ঠিক করে দেবেন না আমার ডিপার্টমেন্ট কীভাবে চলবে। ওঁকে বোলো, আমি মনে করেছি আর তোমার এখানে থাকাটা উচিত নয়। সেটাই যথেষ্ট। উনি কালকে বেলার দিকে আমাকে ফোন করতে পারেন। আমি তখনই বলে দেব তোমার আর আসার দরকার পড়বে কিনা।'

সেই গলার স্বরে আর বলার ভঙ্গিমায় কিছু একটা ছিল, যাতে মোনালিসার মনে হল একে আর ঘাঁটানো ঠিক হবে না।

পায়ে পায়ে আউটপোস্টটা থেকে বেরোতেই সে দেখে মূর্তিমান সায়ন সামনেই দাঁড়িয়ে একটা কনস্টেবলের সঙ্গে খৈনি না কী ডলতে ডলতে দাঁত কেলিয়ে হাসছে। ওকে দেখে সায়ন চোখের ইশারা করে মেন গেটের দিকে যেতে বলল।

প্রায় পাঁচ মিনিট পরে সায়ন যখন ওর কাছে এসে পৌঁছোল তখন মোনালিসার প্রথম যে কথাটা মুখে এল, তার সঙ্গে ওদের কাজের কোনো সম্পর্কই নেই। তবু মোনালিসা প্রথম সেই কথাটাই কেন জিজ্ঞাসা করল সেও জানে না।

'তুই খৈনি খাস? ছিঃ!

'ধুর বাল! খৈনি খাই না। তবে কিনা, রতনদা একটা জম্পেশ খবর শোনাল। ভাবলাম তোর স্টোরির কাজে লেগে যেতে পারে। তাই, ওই—যে ফুলে যে দেবতা সন্তুষ্ট.........'

'কী খবর?' বাইকে উঠে বসতে বসতে মোনালিসা ক্যাজুয়ালিই জিজ্ঞেস করল। বিশেষ ঔৎসুক্য দেখাল না।

'দিল্লি থেকে কে একজন বড় অফিসার আসছেন তোর পরীক্ষিৎবাবুর সঙ্গে দেখা করার জন্য।'

'তাই? হোয়াট ফর?'

অন্যমনস্ক মোনালিসার গলায় তাতেও কোনো ঔৎসুক্য ফুটল না। সাম চান্সেস আর মেন্ট টু বি মিস্ড!

বাড়ির সামনে এসে যখন কলিং বেল বাজাচ্ছে মোনালিসা, তখন সায়ন বোধহয় পেছন থেকে কী একটা বলল। গুড নাইট বা ওই জাতীয় কিছু। মোনালিসার কানে শব্দটা এলেও মাথায় ঢুকল না। সে সাড়াও দিল না।

সায়ন একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে বাইকে স্টার্ট দিল। সে কিছু মনে করেনি। সারা রাস্তা বাইক চালাতে চালাতে সে বকবক করলেও, জানে, আসলে এই মেয়েটা কিচ্ছু শোনেনি। কেন, তা সে জানে না। ওই ক্রাইম ব্রাঞ্চের পরীক্ষিৎবাবুর কাছে

লুকিয়ে দেখা করতে যাওয়ার সময় থেকেই মোনালিসা একা।

সায়ন কিছুক্ষণ এদিক-ওদিকের ছবি তুলে মেন গেটের কাছে ঘোরাঘুরি করছিল। বেশ খানিকক্ষণ পরে তার হঠাৎই চোখে পড়ে পরীক্ষিৎ ও আরও একজন অফিসারের সঙ্গে মোনালিসা ঢুকছে হসপিটাল চত্বরে থাকা পুলিশ আউটপোস্টটায়!

তারপর যে সেই সেখান থেকে বেরোল, এক ওই খৈনি খাওয়া নিয়ে সায়নকে মুখ ঝামটা দেওয়া ছাড়া তার আর কোনো মনোযোগই ছিল না আশেপাশে কী হচ্ছে তা দেখার।

সায়ন মুচকি হেসে নিজের মনেই এক বার মাথা নেড়ে বাইকে স্টার্ট দিল।

মোনালিসা ঘরে ঢুকতেই সুমিতা দেবী তার ওপর একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়লেন, 'ভেবেছটা কী? বলি, ভেবেছটা কী? বাবা নেই, একা মায়ের হাড়-মাস ভাজা ভাজা করে খাবে? অ্যাঁ? সাপের পাঁচ পা দেখেছ? যা ইচ্ছে তাই করে বেড়াবে? আমি বেঁচে থাকতে ওসব হবে না বলে দিলাম। আমাকে চিতায় তুলে দাও, দিয়ে তারপর চার হাত-পা তুলে যা খুশি করো। এই বলে দিলাম, এবারে তোমার চাকরি করা বন্ধ আর আমি এই সামনের অঘ্রাণেই তোমার বিয়ে দেব। কোনো কথা শুনব না, হ্যাঁ!'

মায়ের এই হঠাৎ গর্জনে মোনালিসা রীতিমতো চমকে গেল। এতক্ষণের যে একটা অন্যমনস্কতার চাদর, সেটা ছিঁড়ে সে এক ধাক্কায় যেন বাস্তব জগতে ফিরে এল। সেই ধাক্কা সামলাতে সামলাতে সে একটু হতভম্ব সুরে বলল, 'কী হয়েছেটা কী? এরকম চেঁচাচ্ছ কেন?'

'চেঁচাব না? বলি, ক'টা বাজে, সে খেয়াল আছে?'

মোনালিসা ঘড়ির দিকে তাকাল। ইশ! পৌনে বারোটা। তাই বুড়ি দুশ্চিন্তা করছিল। কিন্তু এরকম লেট তো ওর আগেও হয়েছে। তাহলে? জিজ্ঞেস করতেই প্রায় মারমুখী হয়ে তেড়ে আসেন সুমিতা দেবী।

'তা, ছব্বার ফোনটা রয়েছে কী করতে? একটা ফোন করে দেওয়া যায় না? বুড়ি মা-টা যে বাড়িতে একা রয়েছে, সে মরল না বাঁচল, সেটা জানারও ইচ্ছে করে না? না, তাই-বা করবে কেন? যাতে সে জ্বালায়, সেই ভয়ে একেবারে ফোন বন্ধ করে কাজ করা হচ্ছে। ভারি তো দেশোদ্ধারের কাজ!!'

সুমিতা দেবীর ফোঁসফোঁসানি কমতেই চায় না। কিন্তু ফিল্টার থেকে গ্লাসে জল ভরে খেতে খেতেই মোনালিসার কানে গেছে একটা কথা। সে জল খাওয়া মাঝপথেই থামিয়ে বলে, 'ফোন অফ? আমার?'

'তা নয়তো কী? সুনন্দাকে দিয়ে চার বার ফোন করিয়েছি পর পর। তা, যত বার করি, তত বারই ফোন বন্ধ!'

মায়ের কথা শুনতে শুনতেই পকেট থেকে তড়িঘড়ি ফোনটা বার করে মোনালিসা। অস্ফুটে বলে ওঠে, 'এ মা, কখন বন্ধ হয়ে গেছে খেয়ালই করিনি। কিন্তু চার্জ তো ছিল...'

বলতে বলতেই সুইচ টিপে সে ফোন অন করে। করে মায়ের দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বলে, 'সরি মা! একদম বুঝতেই পারিনি'

বলতে বলতেই 'টুং' করে একটা নোটিফিকেশন। হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ ঢুকল। মোনালিসা মাঝপথেই কথা থামিয়ে এক বার চোখ রাখল মোবাইলের স্ক্রিনে। আঙুলের ছোঁয়ায় হোয়াটসঅ্যাপ খুলতেই স্ক্রিনে তার চোখ স্থির হয়ে গেল। এক বার দ্রুত চোখের মণি জোড়া স্ক্রিনের এদিক-ওদিক ঘুরেই স্থির হয়ে গেল এক জায়গায়। এবারে তার গলায় একটা চাপা আর্তনাদ, 'মাই গড!'

তড়িঘড়ি সে একটা নাম্বার ডায়াল করার চেষ্টা করে। বন্ধ!! শিট! আবার এক বার, এবারে অন্য আরেকটা নম্বর। এবারে রিং হচ্ছে। দু' বার রিং হতেই ওপাশ থেকে কেউ একজন ফোনটা ধরে। গম্ভীর গলা, তবে কমবয়েসি! পরীক্ষিৎ নন। কথা শোনা যায়, 'ইনস্পেকটর নির্মাণ ধাড়া স্পিকিং! হু ইজ দিস?'

'স্যর, দিস ইজ মোনালিসা। ফ্রম দৈনিক সত্যবার্তা!

'হ্যাঁ, বলুন। স্যর কিন্তু এখন খুব জরুরি কাজে...'

'স্যর, আই হ্যাভ সামথিং ফর হিম। এটা সত্যিই খুব খুউব আর্জেন্ট! প্লিজ, প্লিজ, ওঁকে এক বার ফোনটা দিন, প্লিজ, আই বেগ অফ ইউ!'

ওপাশে এক-দু' সেকেন্ডের নীরবতা। তারপর অন্য আরেকটা গলা। কেজো, কেঠো! পরীক্ষিত।

'বলুন মোনালিসা, নাও হোয়াট?'

'স্যর, আই হ্যাভ এ লিড হুইচ সেজ দ্য বডিগার্ড নিডস টু বি লুকড অ্যাট...'

'হোয়াট? ইউ মিন বেদ ভিওয়ানি?'

'এই কনটেক্সটে আর কে হতে পারে স্যর?'

'মোনালিসা, ইউ নো ইওর অ্যালিগেশন ইজ ওয়াইল্ড, সো ওয়াইল্ড— এটা বিশ্বাস করতে গেলে আমাকে আপনার সোর্সের নাম জানতেই হবে! সরি, নাহলে...'

অধৈর্য মোনালিসা তাঁকে মাঝপথে থামিয়ে বলে, 'ইটজ মাই সিনিয়র স্যর! ইটজ ফ্রম দেবদীপ্ত!'

দ্বাবিংশ অধ্যায়
।। পিসেস ফলিং ইন প্লেসেস।।

২৯ জুলাই, ২০১৮, বিকেল বেলা / ধাড়সা, পঃ বঙ্গ, ভারত

যখন মণিদাদা কলকাতায় যায়, তখন কানি এখানে মাছ ধরতে আসে। একটা গাছের ডালের আগায় একটা উলের সুতো বাঁধা। সেটাই কানির ছিপ। আর আশ্রমের পেছনে যে অ্যাত্ত বড় জলা-জাঙাল, সেটাই ওর পুকুর। ঘন আঠার মতো পেঁকো কালো জল আর হাঁটু অবধি লম্বা ঘাসের ঘনবসতিতে মাছ থাকার কথা নয়। নেইও। তবে তাতে কানির বয়েসিদের কোনো সমস্যা হয় না।

এই বয়সে নেই-রাজ্যেও সোনার সিংহাসনের ওপর ঝালর দেওয়া রেশমি গদিতে বসেন রাজা। সাদা ধপধপে হাওদা চড়ে ঐরাবতের মাথায়। গোলাপজলের ঝারি নিয়ে দু' পাশে এসে দাঁড়ায় দেবকন্যারা। পায়ের তলায় শিউলি, কৃষ্ণচূড়া আর দুব্বোঘাস একইসঙ্গে লুটোপুটি খায়। পক্ষীরাজের পিঠে চেপে শনশন হাওয়ার দিকে ছুটে যাওয়া যায় আলোর ধারালো বর্শা হাতে তুলে নিয়ে।

তা, এই নিকষ কালো জলে, ঘেসো জঙ্গলের ফাঁকে ফাঁকে যে বুড়বুড়ি কাটে

মাঝে মাঝে, সেটা মহারুই বা বোয়ালের ঘাই মারা ভেবে নিতে কী আর অসুবিধে? কানির তো কিছু অসুবিধে হয় না। সে দিব্যি একা একা ঘণ্টা তিন-চার এখানেই কাটিয়ে দিতে পারে। তার বাপ এই সময় বাড়ি থাকে না। ফলে খাবার দেবারও কেউ থাকে না। খিদে ভুলতে কানি তার স্বপ্নের মেহফিলখানা সাজিয়ে বসে। মনে মনে এঁকে নেয় দীঘল পুষ্করিণী আর তার পাড়ের দীর্ঘ তালবনের ছায়া। একা শিকারি অখণ্ড ধৈর্যে বসে থাকে মাছের টোপ গেলার অপেক্ষায়। সেয়ানা মাছ মাঝে মাঝে বুড়বুড়ি কেটে ঘুরে যায় টোপের আশেপাশে। শিকারি ধৈর্য হারায় না। ফাতনার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ঝিম ধরে আসে তার খিদেয় অবসন্ন শরীরে। আবার গা ঝেড়ে টান হয়ে নেয় সে। একটা বড় কাতলা সে ধরবেই। তারপর আঁশ ছাড়িয়ে, কেটেকুটে নুন-হলুদ মাখিয়ে জারাতে দেবে কিছুক্ষণ। জনতা স্টোভে কালোজিরে আর বেগুন দিয়ে কাতলা মাছের ঝোল আর ভাত ফোটাবে। পেট ভরে খাবে। খিদেওয়ালা মানুষের সমস্ত স্বপ্নে ভাত ঢুকে পড়ে শেষমেশ।

আজ কানি একলা নয়। বকিদিদিও আছে সঙ্গে। মণিদাদা হচ্ছে বকিদিদির আশিক! এই শব্দটা কানি সদ্য শিখেছে রাজুর কাছে। রাজু ওর নতুন বন্ধু। শিবেন জ্যাঠার ছেলে। যেদিন যেদিন মণিদাদা থাকে না, রাজু আর ভোম-মারা দুপুরে বাজারের আশেপাশের গলিতে গলিতে ঘুরে বেড়ায়। এরকম ঘুরতে ঘুরতেই একদিন নবশক্তি ক্লাবের পাশের পরিত্যক্ত ইটের পাঁজার আড়ালে তারা বকিদি আর মণিদাকে দেখে ফেলেছিল। মণিদা বকিদির জামার ভেতর হাত ঢুকিয়ে খামচাচ্ছিল। কানি দেখে প্রথমটায় অবাক হয়ে গেসল! এমনটা তো মণিদা করে না। সে তো কাউকে মারে না। তাহলে? বেশি না ভেবেই সে বকিদিকে বাঁচানোর জন্য হুড়মুড়িয়ে এগিয়ে যেতে যাচ্ছিল। রাজু তাকে আটকে ফেলে। টেনে দূরে নিয়ে গিয়ে বুঝিয়েছিল যে ছেলে-মেয়েরা বড় হয়ে গেলে আর একে অপরের 'আশিক' হলে ওইরকমভাবেই আদর করে। তারপর আরও বড় হলে বিয়ে করে ফেলে এক জন অন্য জনকে।

সেই থেকে বকিদিদিকে কানির আরু আরু ভালো লাগে। মণিদাদার বউ হবে আর তার বউদিদি। ভাবতেই হাসি পেয়ে যায়। হি-হি করে নিজের মনেই হেসে ওঠে সে।

'অ্যাই খেপু ছেলে, হাসছিস কেন পাগলের মতো?'

চটকা ভেঙে যায় কানির। মাতৃ আশ্রম ছাড়িয়ে জলার পাড় ধরে ধরে বেশ খানিকটা চলে এসেছে তারা। এখানে চারপাশ ঝুপ্পুস নিরালা। এইখানে মাছ ধরতে বসাই যায়। ঢালু পাড়ের মধ্যেই একটা জায়গায় সে ধপ করে বসে পড়ে, হঠাৎ। আর বসামাত্রই ভয় পেয়ে

ছিটকে উঠে পড়ে। কী যেন একটা নরম নরম ঠেকল পেছনে। সাপ নয়তো? এই সময় চিতিবোড়া সাপগুলো ব্যাং ধরতে বেরোয় আর খেয়েদেয়ে পেট ডাবা করে রোদে শুয়ে থাকে। সেরকম কিছু নাকি?

কানির ধড়ফড় করে সরে আসা দেখে বকিও সজাগ হল। কানিকে বসতে দেখে সেও বসে পড়েছিল পাশেই একটা কেটে নিয়ে যাওয়া খেজুর গাছের গুঁড়ির ওপর। সেখান থেকে ধড়মড়িয়ে উঠতে উঠতেই সে জিজ্ঞেস করল, 'কী রে কানি? কী হল? কিছু কামড়াল নাকি?'

'পায়ে কী ঠেকল গো বকিদিদি!'

'কই, কী ঠেকল? দেখি?' বলতে বলতে বকিও কানির পাশেই চলে আসে। ক্যাটকেটে হলুদ রঙের একটা বেঢপ স্তূপ উঁকি মারছে ঝোপঝাড়ের ফাঁকে। প্রথমটায় চট করে বুঝতে অসুবিধে হলেও খুব একটা বেশি সময় লাগে না বুঝতে ওটা কারও একজনের শরীর। বকির বুদ্ধিশুদ্ধি আছে। সে জানে এই সবে হাত-ফাত দিতে নেই। দিলেই পুলিশের হাজার হুজ্জতি। একেই দিন কয়েক আগেই একটা খুন হয়ে গেছে ওই মাতৃ আশ্রমের সামনে। বকি চট করে কানিকে পেছনে ঠেলে দেয়। চোখ পাকিয়ে বলে, 'তুই দূরে যা একটু। একদম এদিকে আসবি না।' -

বলে সে একটু ঝুঁকে ওপর থেকেই দেখতে থাকে খুঁটিয়ে— লোকটা বেঁচে আছে নাকি?

লাল কলারের হলুদ টি-শার্ট। নীল জিন্সের পায়ের গোছের কাছে ইলাস্টিক দেওয়া। উপুড় হয়ে থাকা মুখটা দেখা যায় না। তবে ঘাড়ের কাছের চামড়া আর বাঁ-হাতের কনুই থেকে কবজি অবধি দেখা যাচ্ছে। লোকটা বেশ ফর্সা, বোঝা যায়। একটু ঠাহর করতেই বকি দেখতে পেল হাতের আঙুলের ফাঁকে, চুলের সিঁথির ফাঁকে, কানের গহ্বরের ভেতরের থেকে বেরিয়ে আসতে থাকা পিঁপড়ের সারি। মারা গেছে লোকটা। কী করা উচিত সেটা ভাবতে পারার আগেই বকির পেছন থেকে ডাক ভেসে এল কানির, 'দিদি!'

গলাতে একটু কৌতূহল আর মজা। কিন্তু নার্ভাস হয়ে পড়া বকির কানে সেটাই ভয় পেয়ে যাওয়া গলা মনে হল। সে চকিতে পেছন ফিরে দেখে কানি ওর দিকেই তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। হাতে একটা মোবাইল ফোন। বেশ বড়সড়।

'কোত্থেকে পেলি ওটা?' বলতে বলতেই বকি প্রায় ছুটে ওর কাছে চলে আসে। চামড়ার মোটা, দামি খাপের মধ্যে ভরা যন্ত্রটা। বোঝাই যাচ্ছে ঝোপের মধ্যেই পড়েছিল। ঠিক সেখানে যেখানে একটু আগে বকি বসেছিল।

কানির হাত থেকে ফোনটা নিয়ে সে ঢাকনা খুলে দেখে মোবাইলটা বন্ধ। নাহক দিন দুয়েক তো পড়ে আছেই এই বাদায়। এতক্ষণে বারোটা বেজে গেছে হয়তো। বকি হাতড়ে হাতড়ে মোবাইলের পাশের সুইচগুলো খুঁজে পায়। মণি মাঝে মাঝে এরকম একটা ফোন নিয়ে আসে। সেটা নেড়ে-ঘেঁটে দেখেছে বকি। একটু একটু জানে এর রকমসকম। ছোট্টমতো সুইচটা টিপে কিছুক্ষণ ধরে থাকতেই ফোনটা অন হল। মিষ্টি জলতরঙ্গের আওয়াজে চারপাশের নিঝুম পড়ন্ত দুপুর মুহূর্তে সচকিত হয়ে উঠল।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই টুং-টাং-ডিং— রকমারি আওয়াজ ঠিকরে বেরোতে লাগল মোবাইলটা থেকে। দীর্ঘক্ষণ পরে নেট অন হওয়ায় পেন্ডিং মেসেজগুলো ঝাঁপিয়ে পড়েছে একসঙ্গে, আগুনের দিকে ধেয়ে যাওয়া বাদলাপোকার মতো। ঘাবড়ে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে আবার সুইচ টিপে ফোনটা বন্ধ করে দিল বকি। শুকনো গলা একটা ঢোক গিলে ভিজিয়ে নিয়ে সে কানির হাত ধরে টান মারল, 'চ'!'

'চলো দিদি, কোথায় যাব?

'মণিকে খুঁজতে। থানায় যেতে হবে।'

৩০ জুলাই, ২০১৮, সকাল বেলা / কলকাতা, ভারত

এক বার, দু' বার, তিন বার— পর পর তিন বার। অ্যাকসেস স্লটে তিন বার কার্ড ঢুকিয়ে সোয়াইপ করার পরেও তিন বারই লাল আলো জ্বলে ট্যাঁ-ট্যাঁ করে আওয়াজে পিলে চমকে দিল।

এই সব ধাঁচা আগে ছিল না। স্বপনবাবু মনে মনে বিরক্ত হলেন। নতুন এই ডিএমসি রেকগুলো খুবই আধুনিক। বিদেশি প্রযুক্তিতে তৈরি। মোটরম্যান প্যানেল, সিকিউরিটি সিস্টেম, অ্যাকসেস প্যানেল সবই নতুন ধরনের। আগে এত ভজঘট ব্যাপার-স্যাপার ছিল না। পাতি একটা হাতল ধরে ঘোরালেই খুলে যেত ড্রাইভারের কেবিনের দরজা।

কিন্তু সম্প্রতি মেট্রো রেলে ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনার সংখ্যা, দেশ জুড়ে সন্ত্রাসবাদী আক্রমণের বিরুদ্ধে সরকারের নেওয়া সতর্কতা—এই সব কিছুর কথা মাথায় রেখে মেট্রো রেলের নতুন রেকগুলিতেও আধুনিক সুরক্ষা ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। মোটরম্যান, গার্ড, মেকানিক, সিকিউরিটি পার্সোনেল— সব ধরনের মানুষ যারা অফিসিয়ালি একটি মেট্রো রেকের বিভিন্ন অংশে ঘুরে বেড়াতে পারেন, তাঁদের দেওয়া হয়েছে বিভিন্ন লেভেলের সিকিউরিটি ক্লিয়ারেন্স। সেই ক্লিয়ারেন্সের সঙ্গে মানানসই বিভিন্ন ম্যাগনেটিক স্ট্রিপ কোডেড অ্যাকসেস কার্ড— যাতে কার্ডধারী মানুষটির ছবি ছাড়াও তার বায়োমেট্রিক রেকর্ডও জমা থাকবে।

স্বপনবাবুও আগের দিনই পেয়ে গেছিলেন তাঁর কার্ড। আজকে সকাল ন'টায় এসে আবার রিপোর্ট করতে হয়েছে। সেকেন্ড ট্রায়াল রান আজকে। কিছু ভলান্টিয়ার নিয়ে মোটরম্যান আর গার্ড রেকটি চালাবেন নিউ গড়িয়ার কবি সুভাষ স্টেশন থেকে পাঁচ কিলোমিটার দূরত্বে রুবি ক্রসিং-এর কাছে হেমন্ত মুখার্জী মেট্রো স্টেশন অবধি।

কিন্তু শুরুতেই বিপত্তি। অফিসে হাজিরা দিয়ে তিনি রেকটি এক বার দেখে নিতে এসেছেন আর এসেই দেখছেন এই অবস্থা। তাঁর অ্যাকসেস কার্ড কাজ করছে না।

একটু বেকুবের মতো এদিক-ওদিক তাকিয়ে তিনি ফের অফিসের ঘরটার দিকে পা বাড়ালেন।

যে ছেলেটির কাছে সব কাগজপত্র জমা দিতে হয়েছিল, তার নাম হিমাংশু। সেই সব কম্পিউটারে লোড করানোর দায়িত্বে ছিল। হাসিখুশি ছেলে। স্বপনবাবুর চেয়ে বয়সে একটু ছোটই হবে নিশ্চিত। তাকে গিয়ে বলতেই সে একগাল হেসে বলল, 'কোথায় রেখেছিলেন? বাড়িতে রেডিয়ো-টেডিয়ো আছে নাকি?"

'হ্যাঁ, তা আছে। কিন্তু, কেন বলো তো? রেডিয়ো তো সবার ঘরে থাকে। ওই আমিই একটু খবর-টবর শুনি।'

'কার্ডটা কি সেখানেই রেখেছিলেন?'

'নাহ! আমার ফোলিও ব্যাগেরখাপে ছিল। থাকলেই-বা কী হত?'

'অনেকসময় ডিম্যাগ হয়ে... এই চিন্ময়, দেখো তো, এই স্বপনবাবুর কার্ডটা...'

একটি অল্পবয়েসি ছেলে কাছেই একটা প্লাই দিয়ে ঘেরা চৌকোনা কিউবিকলে বসে ছিল। চোখে চশমা, পাতলা চেহারা। বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশ হবে খুব বেশি হলে। টুক করে নিজের চেয়ার থেকে উঠে এসে সে হিমাংশুর হাত থেকে কার্ডটা নিতে নিতে জিজ্ঞেস করল, 'কী প্রবলেম হয়েছে স্যর?'

'জানি না। আগের দিন তো সব চেক-টেক করেই নিয়েছিলাম, তখন ঠিকঠাক কাজ করছিল। আজকে সোয়াইপ করতে গিয়ে দেখি লাল আলো জ্বলছে আর ট্যাঁ-ট্যাঁ করে আওয়াজ করছে।'

'ওকে স্যর, আমি চেক করে নিচ্ছি এক বার। আপনি ততক্ষণ এই ফর্মটা একটু ফিল-আপ করে দিন, প্লিজ!'

'এটা কীসের?' একটু চিন্তিত শোনায় স্বপনবাবুকে। আজীবন সাবধানী মানুষ। প্রথম জীবনে চাকরি পাওয়ার পরেই তাঁর জামাইবাবু তাঁকে বলেছিলেন— সরকারি চাকরিতে ঢুকছ

— মাথায় রাখবে, শতং বদ, মা লিখ। কিছু লেখার আগে লক্ষ বার ভাববে এবং তার পরে সেটা লিখবে না। এই প্রিন্সিপাল স্বপনবাবু অক্ষরে অক্ষরে মেনে এসেছেন। কোনো ডেপুটেশন, কোনো আবেদন, কোনো গণ-স্বাক্ষর— কোথাও নিজের দাবিদাওয়া বা কর্মকাণ্ড নিয়ে কিছু লিখতে তাঁর বরাবরের প্রবল অনীহা। অফিসিয়াল নিয়মের চাপাচাপিতে একান্ত বাধ্য না হলে এসব কিছুই তাঁকে দিয়ে করানো যায়নি কোনোদিনই।

তাঁর গলার সুরেই হিমাংশু চট করে সেটা বুঝে যায়। সে একটি ঝারি মাপের স্থানীয় সফটওয়্যার কোম্পানির ম্যানেজার। তাদের কোম্পানি কনট্র্যাক্ট পেয়েছে এই যাবতীয় নতুন সিস্টেমের সাপোর্ট দেওয়ার। তাদের কনট্র্যাকচুয়াল কাজ। এই সব পার্মানেন্ট চাকুরেদের ফিডব্যাকের ওপরই নির্ভর করবে কতদিন সেই কনট্র্যাক্ট বজায় থাকে। সুতরাং সে চটজলদি আসরে নেমে পড়ল স্বপনবাবুর উদ্বেগ প্রশমিত করতে।

'ও তেমন কিছু না স্যর। এমনি, ফর্মালিটি। আপনি জাস্ট সইটা করে দিন। বাকিটা আমরা ফিল-আপ করে নেব। কী, ঠিক আছে তো, চিন্ময়?'

'অ্যাঁ? মানে, হ্যাঁ, ঠিক আছে স্যর...'

স্বপনবাবু তবু সামনে রাখা ফর্মে চোখ বোলান। কিছু প্রশ্ন আছে— হ্যাঁ, না ইত্যাদিতে জবাব দিতে হবে। এক জায়গায় এসে ওঁর চোখ আটকে যায়। নীচের ডিক্লারেশনে একটি পয়েন্টে লেখা আছে, 'আমার জ্ঞানত এই কার্ড আমি বা অন্য কোনো ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক ছাড়া অন্য কারও হাতে যায়নি।'

কী একটা বলি বলি করেও স্বপনবাবু কিছু বললেন না। দরকার কী বাবা? ওই কুড়ি সেকেন্ডের একটা ছোট্ট ব্যাপারের জন্য এরা হয়তো কুড়ি দিন ঘোরাবে। মাঝখান থেকে সুযোগটাই হয়তো হাতছাড়া হয়ে যাবে, কোনো কারণ ছাড়াই। আর সত্যিই তো আর স্বপনবাবুর হাতছাড়া হয়নি জিনিসটা। কয়েক মুহূর্তের জন্য পকেট থেকে পড়ে গেছিল। একজন কুড়িয়ে পেয়ে দিয়ে গেছে। ব্যস!

গিন্নি ঠিকই বলে— সব কথা সব জায়গায় বলতে নেই। চুপচাপ তিনি ফর্মের নীচের নির্দিষ্ট জায়গাটিতে সই করে দিলেন। চিন্ময় বলে ছেলেটি তাকে একটি কার্ড দিয়ে বলল, 'স্যর, এটা একটা টেম্পোরারি কার্ড। আপনি আপাতত এটা নিয়ে কাজ করুন। আজকের ট্রায়ালের পরে, যাওয়ার আগে আপনার কার্ডটা পেয়ে যাবেন।'

'থ্যাংক ইউ!'

একগাল হেসে খুশি মনে স্বপনবাবু বেরিয়ে এলেন এবং দ্রুত হাঁটা লাগলেন দাঁড়িয়ে থাকা ঝাঁ-চকচকে রেকটির দিকে।

অফিসের ভেতরে কয়েক মিনিট পরে চিন্ময়ের গলায় একটি অস্ফুট আওয়াজ শোনা গেল। কী বলল তা পরিষ্কার বোঝা গেল না। তারপর সে গলা পরিষ্কার করে নিয়ে ডাকল, 'ইয়ে, হিমাংশুদা— এক বার এদিকে আসবে?' -

'কেন রে? কী হল আবার?'

'বলছি, এই কার্ডটা করাপ্ট হয়ইনি।'

'মানে?'

'দিস ইজ কমপ্লিটলি ব্ল্যাঙ্ক। সিমস লাইক, উই নেভার পুট এনি ডেটা ইন ইট!'

'সে কী রে? কই দেখি!' চেয়ার ছেড়ে ধড়মড় করে চিন্ময়ের সিটের কাছে উঠে আসে হিমাংশু। কম্পিউটার স্ক্রিনের দিকে একটু তাকিয়ে দেখেই বলে, "ইশ! সেদিন অঙ্কিতা ছিল। মনে হয় কিছু গণ্ডগোল করে থাকবে। তুই ফ্রেশ-ফিড করে দে।"

'বাট হি...' চিন্ময়ের কথা শেষ হওয়ার আগেই হিমাংশু তাকে বাধা দিয়ে বলে, 'প্লিজ চিন্ময়! এই প্রজেক্টটা খুব ভাইটাল। এই সব ছোটখাটো জিনিস নিয়ে ফ্ল্যাগ রেইজ করিস না প্লিজ! গেট ইট ডান!'

চিন্ময় চুপ করে গেল। হিমাংশু পরে জানতে পারবে যে চিন্ময় তাকে বলতে চাইছিল যে অঙ্কিতা কার্ডে ডেটা ফিড করতে ভুল করতে পারে না, কারণ সেই দিন এই কার্ড যথারীতি

ব্যবহার করেছেন স্বপনবাবু এবং কোনো সমস্যা ছাড়াই ব্যবহার করেছেন।

তার পরে কোনো কারণে সেই কার্ডের সব ডেটা মুছে গেছে... অথবা তাতে কোনোদিন কোনো ডেটাই ছিল না!

২ আগস্ট, ২০১৮, গভীর রাত / নিউ দিল্লী, ভারত

'ইউ নো, ইউ আর পুটিং মি ইন এ স্পট, রাইট?'

'আই উডন্ট হ্যাভ, ইফ আই হ্যাড অ্যানাদার ওয়ে, শেখরণ!' 'বাট দিস ক্যুড বি প্রবলেম্যাটিক!'

'নট মোর দ্যান দিস।'

রেস কোর্স রোডের নতুন নাম হয়েছে লোক কল্যাণ মার্গ। সেইসঙ্গে দেশের প্রধান মানুষটির ঠিকানা বদলে গেছে। এঁর পূর্বসূরী পছন্দ করতেন এবং বসবাস করতেন ৩, রেসকোর্স রোড বাংলোটিতে। এখন যিনি এই বাংলোর অধিষ্ঠাতা তিনি অবিশ্যি বসবাসের জন্য পছন্দ করেন ৫ নম্বর বাংলোটি। ছিমছাম বাংলোর চারপাশে ম্যানিকিওর করা বাগান। তার মাঝখান দিয়ে সোজা সিঁথি কেটে একটা রাস্তা গিয়ে মিশেছে বাংলোর লাগোয়া বারান্দায়। এই একটি বারান্দা চক্রাকারে বেড় দিয়ে ঘুরেছে গোটা বাংলোর চারপাশে।

এখন রাত্রি সাড়ে দশটা। বাইরে গোটা শহর ধীরে ধীরে রাতের বিছানায় চাদরের নীচে ঢেকে নিচ্ছে নিজের সারাদিনের যুদ্ধক্লান্ত শরীরের ক্ষত। কিন্তু এই বাংলোয় এসে তা মনে হওয়ার উপায় নেই। মানুষটি অকৃতদার। তাই অন্য প্রধানমন্ত্রীদের মতো তার কাজের জায়গা আর বাসস্থান পুরোপুরি আলাদা নয়।

বরং সেরকম গুরুত্বপূর্ণ সময়ে দুটোই মিলেমিশে যায়। এই বেশ রাতেও পুরো জায়গাটিই উজ্জ্বল অথচ নরম আলোয় আলোকিত। মাঝে মাঝেই ব্যস্তসমস্ত গম্ভীর মুখের লোকজনকে দেখা যাচ্ছে এদিক থেকে ওদিক হেঁটে যেতে, হাতে ফাইলপত্র নিয়ে।

কিন্তু তারা কেউই দুই আগন্তুককে দেখতে পাচ্ছে না। পাওয়ার কথাও নয়। তারা যে রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলেছে সেটা একটা আন্ডারগ্রাউন্ড টানেল। টানেলটি প্রায় দেড় কিলোমিটার লম্বা এবং সোজা গিয়ে মিশেছে সফদরজং বিমানবন্দরে। ২০১০ সালে এই টানেল তৈরি চালু হয় আর শেষ হয় ২০১৪ সালে। এখনকার বাসিন্দাই প্রথম ব্যক্তি যিনি এটি ব্যবহার করেন। এই টানেলটি প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনের সঙ্গে শুধু বিমানবন্দরেরই সংযোগ স্থাপন করে না, বাকি বাংলোগুলিকেও জুড়ে রাখে। স্পেশাল প্রোটেকশন গ্রুপের কম্যান্ডো ছাড়া সারা দেশে মাত্র তিন জনের সাংবিধানিক অধিকার রয়েছে এই টানেল ব্যবহার করার। প্রধানমন্ত্রী নিজে, রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রীর প্রধান উপদেষ্টা!

আজ চতুর্থ জন সেই অধিকার পেল। যদিও এই ঘটনা কোনোদিনই কেউ জানতে পারবে না। যেমন কেউ জানতে পারবে না আজকে রাত্রি দশটার পরে মিঃ সাখাওয়াত নামের কোনো ভিজিটর প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে এসেছিল। কারণ তার নাম বা সই কোনো রেজিস্টারে নেই। প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত প্রধান উপদেষ্টা যদি চায়, অনেক অসম্ভব দরজা খুলে যায় এই দেশে, এখনও!

হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎই থেমে গিয়ে লাল দেওয়ালের গায়ে একটি ছোট্ট সবুজ দরজায় টোকা দিলেন শেখরণ। দরজা খুলে গেল। একজন সশস্ত্র রক্ষী তাঁদের তল্লাশি নেওয়ার পর ঢুকিয়ে নিল একটি অপ্রশস্ত ঘরে। ঘরটি সম্পূর্ণ নিরাভরণ। শুধু তিনটি চেয়ার মাত্র রাখা ঘরের মাঝখানে। শেখরণ এক বার রক্ষীটিকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'সোয়েপ্ট ক্লিন?'

'ইয়েস স্যর।'

'ওকে। লেট মি ব্রিং হিম নাও! রাকেশ— মেক ইওরসেল্ফ কমফোর্টেবল! ইউ আর ইন দ্য সেফেস্ট প্লেস ইন দিস কান্ট্রি।' বলেই অন্যদিকের একটি দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন শেখরণ। তার চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে রাকেশ সাখাওয়াত অস্ফুটে বললেন, 'আই ডাউট দ্যাট! আই সিরিয়াসলি ডু!'

বেশি নয়। মাত্র কয়েক মিনিট। তার পরেই আবার খুলে গেল সেই দরজা। এবারে কুর্তা আর চুস্ত-পাজামা পরা যে মানুষটি প্রথমে ঘরে ঢুকলেন, টিভির বাইরে সাখাওয়াতের সঙ্গে তাঁর তৃতীয় সাক্ষাৎ। কিন্তু প্রথম দু' বারের চেয়ে এবারে মানুষটাকে অনেক অন্যরকম দেখতে লাগছে।

প্রথম বার যখন এঁর সঙ্গে দেখা হয় সাখাওয়াতের, তখন সদ্য গুলিতে প্রাণ দিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বিরূপাক্ষ দত্ত। তার কয়েক মাস আগেই নির্বাচিত হয়ে স্বপ্নের সওদাগরের মতো জাতীয় রাজনীতিতে আবির্ভূত হয়েছিলেন এই মধ্য পঞ্চাশের প্রৌঢ়! দ্বিতীয় বার যখন দেখা হয় মাস খানেক আগে, ততদিনে নিজের সিংহাসনে থিতু হয়ে বসেছেন ভালো দিনের স্বপ্ন দেখানো সওদাগর। প্রাথমিক সামান্য যেটুকু জড়তা ও দ্বিধাবোধ প্রথম বার ছিল, সেটুকু ঢেকে গেছিল আত্মবিশ্বাস আর সাফল্যের দীপ্তিতে।

কিন্তু এই তৃতীয় বার সাখাওয়াতের নজর এড়াল না একটি বিশেষ পরিবর্তন। চাপা দৃঢ় চোয়াল, রিমলেস চশমার পেছনে এক জোড়া অভিব্যক্তিহীন চোখ আর ঠোঁটে একটি যান্ত্রিক হাসি এই মুখে যোগ করেছে একটি ধাতব কেজো নিষ্ঠুরতা। গত বারে এই মুখে যে সৌহার্দ্য দেখা গেছিল, এবারে তা অনুপস্থিত।

কোনোরকম অভিবাদন না করেই তিনি এসে বসলেন তাঁর জন্য নির্দিষ্ট চেয়ারটিতে। একটু অস্বস্তি নিয়েই দাঁড়িয়ে রইলেন সাখাওয়াত। শেখরণ ঠিক ছায়ার মতোই দাঁড়িয়ে থাকলেন তাঁর বসের চেয়ারের পাশটিতে। এক বার তাঁর দিকে চেয়ে চেয়ারে বসা মানুষটি সাখাওয়াতের উদ্দেশে বলে উঠলেন, 'বলুন রাকেশবাবু। শুনলাম আপনি কিছু সমস্যায় পড়েছেন!'

'হ্যাঁ স্যর!'

'আর সেটা এতই সঙ্গীন, যে শেখরণ-সাবকে না বলে, আজকের তারিখের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক নৈশভোজের আসর থেকে আমাকেই ডেকে আনতে হল?'

তীব্র শ্লেষটুকু সাখাওয়াতের কান এড়াল না। তিনি আরও একটু কুঁকড়ে গেলেন। কিন্তু এখন তিনি মরিয়া! আগের বারের ভুল তিনি করতে পারেন না। ইটস টু বিগ এ চান্স টু টেক! তাই একটু সময় নিয়ে সাহস জুটিয়ে বললেন, 'স্যর, আমার মনে হয়েছে এই ব্যাপারটা আপনার শোনা দরকার এবং সেটা শোনানোর সময় আমার সামনে থাকাটা দরকার। এতে শেখরণকে বিশ্বাস বা অবিশ্বাসের কোনো প্রশ্নই উঠছে না। আমি জানি, আমাকে এখানে আনতে গিয়ে হি হ্যাড টু গো থ্রু লস অফ ট্রাবলস, বাট, আই থিংক ইট ওয়াজ ওয়ার্থ ইট!'

'বেশ। বলুন, কী বলার ছিল। তবে, তাড়াতাড়ি করুন। আমি খানসাহেবকে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করিয়ে রাখতে পারি না। সেটা ভদ্রতা নয়।'

'স্যর, আপনাদের কলকাতা যাওয়ার প্ল্যান ক্যানসেল করতে হবে। দ্য লাইফ থ্রেট ইজ রিয়েল আর আরও ভয়ানক ব্যাপার হল উই ডু নট ইভেন নো হুজ লাইফ...'

এত হঠাৎ, প্রায় বোমা ফেলার মতো করেই কোনো পূর্বপ্রস্তুতি, কোনো ভণিতা বা গৌরচন্দ্রিকা ছাড়াই সাখাওয়াত কথাটা বললেন যে এক ধাক্কায় শেখরণ এবং পিএম চুপ করে গেলেন। প্রায় আধ মিনিটের নীরবতার পরে প্রথম মুখ খুললেন পিএম নিজেই, 'জারা খুলকে বাতাইয়ে...'

'শিওর স্যর। আমার অন-গ্রাউন্ড অপারেটিভের মুখে ফার্স্ট হ্যান্ড খবর। অ্যাজ পার প্ল্যানেই আমরা এগোচ্ছিলাম। সবই ঠিকঠাক ছিল। ট্রেল ক্রিয়েট করার জন্য, ইনভেস্টিগেশনের সময় যাতে পুরো ঘটনা পরম্পরাটি বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়, তার জন্যই দরকার ছিল আন্ডারগ্রাউন্ড মার্কেট থেকে ওয়েপন সংগ্রহ করা। উই অপটেড ফর দ্য মোস্ট সফিস্টিকেটেড স্নাইপার রাইফেল উইথ এক্সট্রিমলি স্পেশাল কাস্টমাইজেশন! এই ব্যাপারটা আমার অপারেটিভই ডিসাইড করেছে। ইন্ডিয়াতে ব্ল্যাক মার্কেটে এই জিনিস বিক্রি করতে বা বানাতে পারে এরকম একজনই আছে। তার কাছেই যাওয়া হয়েছিল। বাট সেখান থেকে কনফার্মড নিউজ পাওয়া গেছে যে আমাদের লোক পৌঁছোনোর মাত্র কয়েক দিন আগেই

আরও একটি গ্রুপ গেছিল একদম একই ধরনের স্নাইপার রাইফেলের ফরমায়েশ নিয়ে।'

'সো? দিস ক্যুড বি জাস্ট আ কো-ইন্সিডেন্স!' এবারে শেখরণের গলা পাওয়া গেল।

'ক্যুড বি, বাট মোস্ট লাইকলি, ইট ইজ নট!'

সাখাওয়াত নিজের মোবাইলটা পকেট থেকে বের করে বোতাম টিপে একটা কিছু চালিয়ে সামনের একটি খালি চেয়ারে নামিয়ে রাখলেন। সস্তা চাইনিজ স্মার্ট ফোনের জোরালো আওয়াজে ঘর ভরে গেল। শোনা গেল আর্য তনভীরের গলা, 'নো স্যর, দিস ক্যুড নট বি! আমি ডিটেলসে জেনেছি। এর ঠিক আগেই যে রাইফেলটা বানিয়ে দিয়েছে ভাতিজা, সেটা ম্যাকমিলান ট্যাক-৫০-র একটা কাস্টমাইজড ভার্সন! সঙ্গে ম্যাগাজিন, সেটাও হাইলি কাস্টমাইজড .৩৩৮ লাপুয়া-ম্যাগনাম!' 'ডাম্ব ইট ডাউন ফর মি, প্লিজ, আর্য!'

'ব্যাড! দিস ইজ ব্যাড! এনি নেম? এনি ফেস?'

'এগেন, নট কনফার্মড স্যর। সার্কিটে লোকজন এর কথা বলতে হলে প্রিন্স বা শাহজাদা বলে ডাকে।'

প্রায় পাঁচ-ছ' মিনিটের কথোপকথনটা শেষ হলে মোবাইলটা পকেটে ভরে নিলেন সাখাওয়াত। তারপর সামান্য বিরতি দিয়ে বললেন, 'এই জন্যেই দেখা করতে চেয়েছিলাম স্যর!'

বাইরে কোথাও গুড়গুড় করে মেঘ ডেকে উঠল। বৃষ্টি নামবে খুব শিগ্‌গিরই। মেঘ জমেছে ঘরে উপস্থিত মানুষগুলির মুখেও। ফোঁটা ফোঁটা ঘাম জমছে শেখরণের কপালে। পিএম হঠাৎ পাশে ঝুঁকে শেখরণকে ইশারায় ডেকে নিলেন কাছে। শেখরণ একটু ঝুঁকে এলেন চেয়ারের দিকে। অল্প দু-একটা কথা।

সেই সময়টুকু সাখাওয়াত ভদ্রতাবশত মনোনিবেশ করলেন নিজের ফোনের স্ক্রিনে। পিএম-এর গলাখাঁকারি শুনে সচকিত হয়ে সাখাওয়াত তাকালেন তাঁর দিকে। চশমার আড়ালের বরফশীতল চাউনি মেলে ধরে তিনি খুব ধীরে ধীরে কেটে কেটে বললেন, 'এই মুহূর্তে কোনো কিছুই ক্যানসেল করা যাবে না রাকেশবাবু। আশা করি আপনি বুঝতে পারছেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর এই সফর আমাদের দুই দেশের সম্পর্কের এবং দীর্ঘস্থায়ী শান্তি প্রক্রিয়ার জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ। গোটা বিশ্ব তাকিয়ে আছে এদিকে। আই ক্যান নট ব্যাক আউট। শেখরণ সাব আছেন, আপনি আছেন— আপনারা হলেন সিজনড ক্যাম্পেনার! ডু সামথিং টু মেক ইট গো অ্যাওয়ে! আই ডোন্ট কেয়ার হাউ! আপনি শেখরণের সঙ্গে কথা বলে ঠিক করে নিতে পারেন কী করবেন আর কীভাবে করবেন। বাট, কাল সন্ধে বেলা আমি আর পাকিস্তানের প্রাইম মিনিস্টার— আমরা কলকাতায় যাচ্ছি। উই উইল কন্টিনিউ অ্যাজ প্ল্যানড! ইউ মেক ইট সেফ এগেন অ্যান্ড ব্রিং দ্য প্ল্যান ব্যাক অন ট্র্যাক!'

সাখাওয়াতের জবাবের অপেক্ষা না করেই মুখে সেই হাসিটি ঝুলিয়ে তিনি পা বাড়ালেন দরজার দিকে। সাখাওয়াত মরিয়া হয়ে এক বার বলে উঠলেন, 'বাট স্যর, ইটস আ বিগ, বিগ রিস্ক!'

বেরিয়ে যেতে গিয়েও থমকে দাঁড়ালেন ভারত-প্রধান। পেছন ফিরে বললেন, 'মিঃ সাখাওয়াত, আমি ঝুঁকি ভালোবাসি। ব্যর্থতা নয়।'

অপসৃয়মাণ শরীরটির দিকে খোলা দরজা দিয়ে দেখতে দেখতে সাখাওয়াত নিজেকে শক্ত করার চেষ্টা করছিলেন। সময় এসেছে নিজের ইতিহাস মুছে ফেলার। সময় তাকে আবার দাঁড় করিয়ে দিয়েছে এমন এক সন্ধিক্ষণে যেখানে সর্বস্ব বাজি রাখতে হবে সাফল্যের জন্য। এবারে আর ব্যর্থ হওয়া চলবে না। ফেলিওর ইজ নট অ্যান অপশন!

শেখরণ তখন আবছা গলায় বলে চলেছেন, 'বুঝতেই পারছ, পিএম-এর অ্যাপ্রুভাল রেটিং পয়েন্ট এখন বেশ কম। মাস তিনেক পরেই ইলেকশন। রিইলেক্টেড হতে গেলে এটাকে সাকসেসফুল করতেই হবে রাকেশ। অল ডিপেন্ডস অন ইউ!'

সাখাওয়াত সটান ঘুরে দাঁড়ালেন তাঁর দিকে, 'কয়েকটা কাজ করতে হবে শেখরণ, ইফ আই হ্যাভ টু হ্যান্ডল দিস।' 'জাস্ট নেম দেম!'

‘অরুণ সচদেভকে বলো যে সময়ে সময়ে উনি ডাইরেক্ট পিএমও থেকে ইন্সট্রাকশন পেলেও পেতে পারেন। সেটা যেন বিনা প্রশ্নে মেনে নেওয়া হয়। আমার একটা ডাইরেক্ট লাইনও লাগবে উইদ হিম। আনট্রেসেবল।'

‘কনসিডার ইট ডান’

‘উনি এখন কলকাতায়, তাই না?’

‘ইয়েস।’

‘আই নিড টু গো দেয়ার, টু!’

‘কালকের টিকিট বুক করিয়ে দিচ্ছি।'

‘না। আই নিড টু গো নাও! রাইট নাও...’

ঝকঝকে ইস্পাতের মতো এক জোড়া চোখের মণি ঝিকিয়ে উঠল। শেখরণ একটু বিস্মিত চোখে সেদিকে তাকিয়ে বললেন, ‘ওকে, গিভ মি টুয়েন্টি মিনিটস!’ কুড়ি মিনিট নয়, চল্লিশ মিনিট লাগল। লগবুক এন্ট্রি এড়াতে একটু বাড়তি সময় ব্যয় হল। ভারতের প্রধানমন্ত্রী আর রাষ্ট্রপতি এখন যে হেলিকপ্টারে চড়েন তা হল রাশিয়ান এমআই ১৭, ভি ৫৮। এর আগের যে মডেল অর্থাৎ এমআই ৮, তা পুরোনো হয়ে যাওয়ায়, নিরাপত্তাজনিত কারণে বাতিল করা হয়েছে।

বাতিল করা হলেও একশো কোটি টাকা দামের কাস্টমাইজড হেলিকপ্টার কেউ রাতারাতি স্ক্র্যাপ করে দেয় না। সেরকমই একটি পুরোনো চপার চল্লিশ মিনিট বাদে সফদরজং থেকে উড়ান দিল, প্রায় নিঃশব্দে। ওয়াচ টাওয়ারের লোকজন এবং অফিসিয়াল লগবুক জানল সেই রাত্রে কোনো চপার ওড়েনি এয়ারবেস থেকে।

প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টা লাগল কলকাতা পৌঁছোতে। যখন কলকাতা বিমানবন্দরের এক প্রত্যন্ত কোণে ল্যান্ড করছে সেই চপার— তখন ভোর তিনটে। সারা শহর ঘুমে আচ্ছন্ন। বিমানবন্দরের কর্মীরা বেশিরভাগই কিছু জানল না। সবাই জানল সরকারের কোনো এক উচ্চপদস্থ অফিসার এসেছেন দিল্লি থেকে।

আসাটাই স্বাভাবিক। আর একটা রাত পোহালে ভারত আর পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী একসঙ্গে আসবেন কলকাতা পরিদর্শনে!

গ্রাউন্ড স্টাফরা শশব্যস্ত হল দৃষ্টিসীমার থেকে দূরে থাকতে। অকারণ ঝামেলায় জড়াতে কেই-বা চায়? ব্যস্ত ছিল বলেই এমনকী সবচে’ কাছে থাকা গ্রাউন্ডস্টাফ ছেলেটিও শুনতে পেল না। প্রৌঢ় অফিসারটি একদম হেলিকপ্টারের গায়ে সেঁটে দাঁড়িয়ে থাকা একটা কালো স্করপিওতে উঠতে উঠতে ফোনে কাউকে বলছেন, ‘হোয়্যার আর ইউ, রাইট নাও?’

‘আমি কলকাতায় স্যর। পৌঁছে গেছি।' ‘হোয়্যার ইজ শামসুদ্দিন?'

‘মুঙ্গেরে। ডেড!!’

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়
।। দ্য কাউন্টার অ্যাটাক ।।

২৯ জুলাই, ২০১৮, দুপুর বেলা / করাচী, পাকিস্তান

ইফতিকার যেন পুড়ে পুড়ে যাচ্ছে। শাদিশুদা আওরতের শরীরের ভাপ ভাট্টির আগুনের মতো। হলকা দিয়ে ওঠে। দুটি নগ্ন শরীরের তাপে ঘরের আবহাওয়াও লবণাক্ত, উষ্ণ, আর্দ্র! নিঃশব্দ ঘরে, এই নিঝুম দুপুরে শুধুই চাপা গোঙানির, রমণের ও শীৎকারের শব্দ। দু' পায়ের বেড়ে ইফতিকারকে চেপে ধরে মুখ দিয়ে অবোধ্য কিছু জান্তব উচ্চারণ করে যাচ্ছে নাজনিন! তার দেবভোগ্য শরীরের ভেতর ডুবে ইফতিকার। তার অতীত নেই, ভবিষ্যৎও নেই। যেন আছে শুধু এই অসহ্য সুখের বর্তমান।

হঠাৎ কর্কশ শব্দ করে বেজে ওঠে মোবাইল। ইফতিকারের! মুহূর্তের জন্য থামে দুটি ছন্দোবদ্ধভাবে আন্দোলিত হতে থাকা শরীর। কিন্তু এই তুঙ্গ মুহূর্তে বিচ্ছিন্ন হতে চায় না তারা। মোবাইল বেজে বেজে থেমে যায়।

আবার... আবার... আবার...

দ্রুত হতে থাকে ছন্দ। নিঃশ্বাস ঘন থেকে ঘনতর হয়। কেঁপে কেঁপে উঠতে উঠতে একসময় দুটি শরীর প্রায় একইসঙ্গে স্থির হয়। আর ঠিক সেই মুহূর্তে পঞ্চম বারের জন্য বেজে ওঠে ইফতিকারের ফোন।

তৃপ্তির ক্লান্তি মাখা শরীরটা টেনে তুলে নগ্ন অবস্থাতেই বিছানা থেকে নেমে হেঁটে টেবিলের কাছে যায় সে। অচেনা নম্বর। সে সাড়া দেয়, 'হ্যালো?'

'জনাব, মতিহার বোল রাহা হুঁ— থানভি মসজিদকে পাসওয়ালে মর্গ সে! আচ্ছি খবর হ্যায়!'

ঘোর কেটে সঙ্গে সঙ্গে বাস্তবের মাটিতে নেমে আসে ইফতিকার। চানেসার হল্টে পাওয়া লাশের পকেটে যে আইকার্ড পাওয়া গেছিল, ন্যাশনাল পপুলেশন রেজিস্টারের ডেটাবেসে সংরক্ষিত সেই ব্যক্তির আঙুলের ছাপের সঙ্গে লাশের আঙুলের ছাপ মেলেনি। একটারও না। একটুও না। ইফতিকারের সন্দেহ ছিলই, যে মিলবে না। তাই সে মতিহারকে একটা কাজ দিয়েছিল।

মাহমুদাবাদ থানার কাছাকাছি তিনটে মর্গ। ইদহি মর্গ, আব্বাসি শাহিদ হসপিটালের মর্গ আর থানভি মসজিদের লাগোয়া মর্গ। এর মধ্যে প্রথম দুটি আকারে বড় এবং এই দুটিই প্রধানত সরকারি কাজে ব্যবহার হয়। তৃতীয়টি মর্গ কম, ডেডবডি প্রিজার্ভেশন বেশি হয়। যেসব মানুষের আত্মীয়পরিজন দূরে থাকে, ইন্তেকালের পর এসে পৌঁছোতে দেরি হয়, তাদের জন্য ওই ব্যবস্থা। তবে ইফতিকার মতিহারকে তিনটে মর্গেই খোঁজ নিতে বলেছিল। বেশি কিছু না। শুধু এইটুকু জানতে চাওয়া যে কোনো বেওয়ারিশ লাশ কেউ নিয়ে গেছে কিনা। নিয়ে গেলে, কে নিয়ে গেছে, সেটার যদি পাত্তা পাওয়া যায় তো খুবই ভালো।

আগের দু' দিন প্রধান দুটি মর্গে ঘুরেছে মতিহার। ব্যর্থ হয়েছে বলা বাহুল্য। সরকারি জায়গায় কড়াকড়ি বেশি। নিয়ম মানার নয়, নিয়ম মানার ভান করার। সেখান থেকে খবর বার করা খুব শক্ত। দু' বার ব্যর্থ হওয়ার পর আজকে তেমন আশা ছিল না কারোরই। না মতিহারের, না ইফতিকারের। সুখের বিষয় এই মর্গটা অন্যগুলোর চেয়ে অনেক কাছাকাছি। পাঁচ কিলোমিটারের মধ্যে। তাই বেশি গাঁইগুঁই না করে মতিহার একটু বেলাবেলি বেরিয়ে গেছিল।

এখন মনে হচ্ছে তার যাওয়াটা হয়তো বেকার হয়নি।

'বলো মতিহার!'

'স্যার, প্রায় সপ্তাহ দু-তিন আগে এখানে একটা বেওয়ারিশ লাশ জমা পড়ে। গুলি খাওয়া। লাশের শরীরে কোনো কাগজপত্র ছিল না। অন্য কোনো এক্সটার্নাল ইনজুরিও ছিল

না। এখানকার লোকে বলছে বুখারির গ্যাং-এর লোক। নাম-ধাম বলতে পারছে না।'

'ওকে। তারপর?' অধৈর্য হয়ে পড়ে ইফতিকার ভেতরে ভেতরে।

'লাশ এখানে কে দিয়ে গেছিল কোনো এন্ট্রি নেই। তবে দু' দিন পরেই একটা লোক এসে নিজেকে ভাঞ্জা পরিচয় দিয়ে লাশ নিয়ে যায়, দাফন করবে বলে। লাশের পরনের জামাকাপড় আমাদের ডেসক্রিপশনের সঙ্গে মিলছে না।

তবে লম্বাই-চৌড়াই মিলছে।'

'কবে নিয়ে গেছিল বললে?

'১৫ জুলাই, স্যার!'

'হুম, তার মানে আমরা যেদিন লাশের খবর পেলাম স্টেশন থেকে, তার ঠিক দু' দিন আগে। কে নিয়ে গেছিল?'

'একটা নাম পাচ্ছি স্যার, কিন্তু জানি না, আসল কিনা।'

'যে নাম-ঠিকানা-নাম্বার পাচ্ছ, আমাকে মেসেজ করে দাও। আর পনেরো মিনিটের মধ্যে পুলিশ স্টেশনে এসো। সঙ্গে মর্গ থেকে ওই লোকটাকে তুলে নিয়ে এসো যে একে দেখেছে।'

'ওকে স্যার।'

'আর মতিহার, একটা কথা...'

'জি স্যার?'

'গুড জব!'

ফোনটা ডিসকানেক্ট করে বিছানায় আধশোয়া হয়ে থাকা নাজনিনের দিকে তাকায় ইফতিকার। একটু আগে যে স্তন দুটি দেখে কামনায় রক্তিম হয়ে উঠছিল সে, ঘামে চকচকে সেই আধো-অবনতা দলিত যুগলকে দেখে কেমন একটা বিতৃষ্ণা এল। বমি পেল ইফতিকারের। সে চোখ সরিয়ে নিজের পোশাক পরতে পরতে বলল, 'ভাবি, যদি ভাইয়া কোনোদিন জানতে পারে?'

'সে তখন দেখা যাবে 'খন!' আদুরে জড়ানো গলায় বলল নাজনিন। অর্গ্যাজমের পরের ক্লান্তির রেশ এখনও তার শরীর থেকে যায়নি। 'আর তুমি পুলিশওয়ালা হয়ে সামান্য একটা ব্যবসাদারকে এত ভয় পাও?'

'দিলদারভাই সামান্য ব্যবসাদার? হাসালে আমাকে।' চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে সত্যিই হেসে ফেলে ইফতিকার।

'তা, এখন চললে কোথায়, ইনস্পেকটর সাব?'

'ওই বেওয়ারিশ লাশটার একটা খোঁজ হয়তো পাওয়া গেছে। দেখি, কদ্দূর কী হয়!'

, 'কোথায় খোঁজ পেলে?' সামান্য, খুব সামান্য কৌতূহলী ছোঁয়া যেন লেগে আছে সেই সতর্ক গলায়। ইফতিকার যদিও খেয়াল করে না।

'মতিহারকে পাঠিয়েছিলাম থানভি মসজিদের কাছের মর্গটায়। ওই ফোন করেছিল। চলি ভাবি, পরে দেখা হবে।'

অন্যমনস্ক আর তাড়ায় থাকার ফলে ইফতিকার এখনও খেয়াল করল না। এক বার পেছন ফিরলেই সে দেখতে পেত নাজনিনের গোলাপি ভরাট মুখ থেকে সমস্ত রক্ত যেন নেমে গেছে। শরীরে বিছানার চাদর জড়িয়েই সে দ্রুত হাতে বিছানার পাশের টেবিল থেকে নিজের ফোন তুলে নেয় হাতে। একটা ফোন করতে হবে।

ময়লা হয়ে যাওয়া কর্কশ দেওয়ালগুলো এগিয়ে আসতে আসতে সরীসৃপের মতো রাস্তাটির গলা চেপে ধরেছে যেন। সেই মৃত্যুপাশ থেকে বেরোনোর জন্য এঁকেবেঁকে অনেক চেষ্টা করেছে এই রাস্তা। কিন্তু কোথাও কোনো আলো নেই। কোথাও কোনো মুক্তি নেই।

রাস্তার দু' পাশে জমা হয়ে আছে স্তূপ জঞ্জাল। খোলা, কাঁচা নর্দমায় থকথকে কালো দুর্গন্ধযুক্ত জল। তারই পাশে ইট সাজিয়ে উইকেট করে ক্রিকেট খেলে যাচ্ছে গলির ছেলেপুলেরা। অপ্রশস্ত রাস্তা দিয়েই দামি বাইক দাবড়ে ঘুরছে যেসব অল্পবয়েসি ছেলে-

ছোকরা, চোখ বুজে বলে দেওয়া যায় তাদের বেশিরভাগের রোজগারের উৎস চরসের ব্যবসা।

এই গলিগুলোয় ঘুরতে একদম ভালো লাগে না ইফতিকারের। কিন্তু মাহমুদাবাদ পুলিশ স্টেশনে চাকরি করব আর চানেসার গোঠের গলিতে ঘুরে বেড়াব না, এটা অনেকটা, পাকিস্তানের ক্রিকেট টিমের ক্যাপ্টেন হব অথচ আমার নামে খড়ের পুতুল জ্বলবে না বা আমার বাড়িতে ঢিল পড়বে না— এই টাইপের দাবি।

আজও যেমন আধ ঘণ্টা হয়ে গেল ঘুরে বেড়াচ্ছে ইফতিকার। জুনের চড়া রোদ্দুর জ্বালিয়ে দিচ্ছে ওর ইউনিফর্মের তলায় থাকা চামড়াকে। একটু আগেই সেই চামড়ায় পেলব আঙুল বোলাচ্ছিল কেউ। আর এখন? কোনো এক শুয়ারের বাচ্চা খালিদ বাকিশকে খুঁজে যাচ্ছে সে।

সোর্স বলেছে খালিদকে এই চত্বরেই পাওয়া যাবে। গলির মুখে সামনের বাড়িটায় নাকি ঢুকেছে। তারই উলটো দিকের পানের দোকানে দাঁড়িয়ে পান খাচ্ছে ইফতিকার। প্লেন ড্রেসে। বাড়িটা একটা কোঠি। কবুতরের খোপের মতো ছোট ছোট ঘরে অসংখ্য বিভিন্ন বয়সের মেয়ে তাদের দেহের পসরা সাজায়। সন্ধে থেকে আলো আর ইন্ডিয়ান হিন্দি ছবির গানে এই জায়গা ঝলমল করে। এখন এই বিকেল বেলা, তাদের তৈরি হওয়ার সময়। ধীরে ধীরে আড়মোড়া ভাঙছে এই পাড়া। আর ঠিক সেইটুকু শিথিলতার সুযোগ নিয়ে ছ' জন প্লেন ড্রেসের পুলিশ ঢুকেছে এই বাড়িতে।

গর্তে ঢুকে থাকা ইঁদুরকে বের করার অনেক উপায় আছে। একটা হল, বাকি সমস্ত বেরোনোর রাস্তা বন্ধ করে একটা রাস্তা খোলা রাখা এবং তার পরে গর্তে আগুন জ্বালিয়ে ফেলে দেওয়া। রাস্তা বন্ধ করা হয়ে গেছে। আগুন জ্বালানোও চলছে নিশ্চয়ই ভেতরে। কখনো এ জানলায়, কখনো ও জানলায় ভয়ার্ত, প্যানিকড তীক্ষ্ণ মেয়েলি গলার চিৎকারে দিব্যি টের পাওয়া যাচ্ছে কখন কোন ঘরে পুলিশের তল্লাশি চলছে। আর এই সবের মধ্যে একটু অধৈর্য অনেকটা উত্তেজিত ইফতিকার পান চিবোতে চিবোতে নজর রাখছে একমাত্র খোলা পথে, যেখান দিয়ে ইঁদুর পালাতে পারে।

গলির ঠিক মুখে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে মর্গের কেরানিটিকে। কথা হয়ে আছে। যে রুমালটা দিয়ে সে মুখ চাপা দিয়ে আছে, লোকটিকে চিনতে পারলেই সেই রুমালটিই সে মুখ থেকে নামাবে।

অন্যমনস্কতার ভান করে সেই লোকটির দিকে নজর রাখতে রাখতে ইফতিকারের হঠাৎ খেয়াল হল তার জোর পেচ্ছাপ পেয়েছে। পানের দোকানের চাচাকে বাথরুম কোথায় জিজ্ঞেস করতে, জর্দা-খয়েরের কালো ছোপ ধরা ক্ষয়াটে দাঁত বের করে হেসে সে পেছনের নর্দমা দেখিয়ে দিল।

সেদিকে পা বাড়াতে যেতেই চোখের কোনা দিয়ে ইফতিকার দেখল লোকটা রুমালটা সামান্য নামিয়েছে মুখ থেকে। পুরোটা নামায়নি এখনও। কী ব্যাপার? নিশ্চিত নয় নাকি? একইরকম দেখতে কাউকে দেখেছে? এক বার দেখে এতদিন পরে আবার চিনতে পারা বেশ শক্ত! ভুরু কুঁচকে গেল ইফতিকারের।

বেশি না। মাত্র দু-এক সেকেন্ডের মামলা। তারপরই লোকটির মুখ থেকে পুরোপুরি নেমে এল রুমাল। আর ততক্ষণ টান টান হয়ে অপেক্ষা করতে থাকা ইফতিকার স্প্রিন্টারের মতো ছিটকে বেরোল পানের দোকান থেকে।

ছেলেটাকে দেখতে পেয়েছে সে। জিন্স আর হালকা নীল টি-শার্ট পরা। গলি থেকে বেরিয়ে দ্রুত পায়ে হাঁটছে ইফতিকার যেদিকে দাঁড়িয়েছিল ঠিক তার উলটো দিকে। প্রথমটায় সে কিছুক্ষণ বুঝতে পারেনি। ইফতিকারের পায়ে স্নিকার। দৌড়োলেও খুব একটা আওয়াজ হয় না। কিন্তু সে ছেলেটার থেকে যখন মাত্র কয়েক পা দূরে, তখন খুব সম্ভবত ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ে কিছু একটা অনুভব করে ছেলেটা এক ঝলক পেছনে ফিরল। তেড়ে আসতে থাকা

ইফতিকারকে দেখেই সেও চট করে দৌড়োতে শুরু করল। আর করামাত্রই বোঝা গেল, বয়েস কম হওয়ার জন্যই হোক বা যে কোনো অন্য কারণে— ছেলেটি ইফতিকারের চেয়ে অনেক বেশি ফিট ও দ্রুতগতির।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সে ব্যবধান বাড়িয়ে ফেলল। সিনেমা বা টিভিতে যা-ই দেখাক, বাস্তব পরিস্থিতিতে যে কোনো চেজে যে পালায় তার একটা সুবিধা সবসময় থাকে। প্রতিটা মোড়, প্রতিটা বাঁকে একমাত্র সে-ই নিশ্চিত জানে সে কোনদিকে বাঁকবে। যে তাড়া করছে তাকে নির্ভর করতে হয় পলায়নরতর ওপর। ফলে আগে থেকে তার নিজের শরীর এবং গতি প্রস্তুত করার সময় থাকে না।

এইটুকু সুবিধে একজন ক্ষিপ্র আর ফিট লোকের কাছে কতখানি, সেটা এই চেজে মাত্র এক মিনিটের মাথায় বুঝতে শুরু করল ইফতিকার। ছেলেটি তার চেয়ে অনেক ভালো করে এই গলি-খুঁজি চেনে। এরই মধ্যে সে দূরত্ব বাড়িয়ে প্রায় ফিট পঞ্চাশ-ষাট দূরে দৌড়োচ্ছে। ইফতিকার পিস্তল বার করতে চায় না। চানেসার গোঠের গলিতে প্লেন ড্রেসের অচেনা লোকের গুলি ছোড়া হচ্ছে সবচেয়ে সহজে আত্মহত্যার একশো উপায়ের একটা। নালা-নর্দমা ডিঙিয়ে, উলটো দিক থেকে আসা অপ্রস্তুত সাইকেল আরোহী বা বাইক আরোহীদের ধাক্কা দিয়ে বা এড়িয়ে গিয়ে সে কোনোমতে ছেলেটাকে চোখের আড়াল হতে দিচ্ছিল না। আর মনে মনে আশা করছিল তার সঙ্গে আসা লোকগুলোর অন্তত এক জনের মাথাতেও বুদ্ধি আসবে মেন রোডের দিকে যাওয়ার।

দৌড়ের চোটে কোনদিকে যাচ্ছে সেটা অত খেয়াল রাখতে পারছিল না ইফতিকার, কিন্তু গাড়ি, মানুষজন, দোকানপাটের মিলিত ক্যাকোফোনি তাকে ইঙ্গিত দিচ্ছিল যে দ্রুত তারা এগিয়ে যাচ্ছে জামশেদ রোডের দিকেই। এক বার মেন রোডে পড়ে গেলে ছেলেটা ভিড়ে মিশে যাবে। আর ধরা যাবে না। গতি বাড়াল ইফতিকার। ছেলেটাও বোধহয় একটু হাঁপিয়ে উঠেছে।

দূরত্ব ধীরে ধীরে কমতে থাকল। সেইসঙ্গে স্পষ্ট হয়ে উঠছে গলির মাথায় মেন রোডও। চল্লিশ ফুট... তিরিশ ফুট... আর মাত্র ফুট বিশেক দূরত্ব যখন, তখনি ঘটল সেই অভাবনীয় ঘটনা। একটা বাইক কোথা থেকে হুড়মুড়িয়ে এসে ব্রেক কষল ছেলেটির সামনে। ধাক্কা খেতে খেতে ছেলেটি কোনোরকমে সামলে নিল। ধাক্কার কথা কল্পনা করে আঁতকে উঠে একটু থমকে গেল ইফতিকার। আর ঠিক সেই সেকেন্ডের ভগ্নাংশে বাইকের পেছনে বসা লোকটির হাতে উঠে এল একটি সাইলেন্সার দেওয়া পিস্তল। জনবহুল রাস্তায় কোনো তীব্র আওয়াজ হল না। মৃদু 'থাড' শব্দ করল একটিমাত্র বার। ক্লোজ রেঞ্জ থেকে গুলি। সম্ভবত সফ্ট নোজড বুলেট। কারণ ইফতিকার নিজের বিস্ফারিত চোখের সামনে ছেলেটার মাথা তরমুজের মতো ফেটে চৌচির হয়ে যেতে দেখল।

প্রাথমিক ধাক্কাটা কাটাতে যে কয়েক সেকেন্ড নিল ইফতিকার, তার মধ্যেই বাইক হাওয়া। কোনোমতে বাইকের নম্বরটা মনে মনে নোট করে নিতে পারল ইফতিকার। হাঁটুতে হাত রেখে বেশ কিছুক্ষণ সে হাঁপাল প্রথমে। ততক্ষণে ডেডবড়ির চারপাশে ধীরে ধীরে রাস্তার লোক জমা হতে শুরু করেছে। ইফতিকার অল্প খোঁড়াতে খোঁড়াতে সেখানে গিয়ে নিজের পকেট থেকে আইকার্ড দেখিয়ে তাদের সরিয়ে দিল বেশ কিছুটা। ততক্ষণে তার টিমের বাকিরাও এক এক করে আসতে শুরু করেছে।

ইফতিকার প্রথমেই তাদের একজনকে বাইকের নম্বরটা দিয়ে বলল ওয়াকিটকিতে ট্র্যাফিক সার্জেন্টদের ইনফর্ম করতে। কেউ যেন দেখতে পেলেই আটকায় এবং মাহমুদাবাদ থানায় নিয়ে আসে। তারপর ইফতিকার হাঁটু মুড়ে বসল মৃত ছেলেটির শরীরের পাশে। মাথাটা ছরকুটে গেছে পুরো। সেদিকে তাকিয়ে এক বার মুখে চুক চুক আওয়াজ করে ছেলেটার প্যান্টের বাঁ-পকেটে হাত ঢোকায় সে।

কন্ডোমের প্যাকেট, একটা ছোট্ট পুরিয়া, খুব সম্ভবত চরস আর একটা ফোল্ডিং নাইফ। এবারে ডান পকেট। একটা ছোট্ট চামড়ার পার্স। এক তাড়া ভিজিটিং কার্ড আর কিছু

খুচরো পয়সা ছাড়া কিছু নজরে পড়ে না। পয়সাগুলো সরিয়ে রেখে কার্ডগুলো এক এক করে দেখতে থাকে ইফতিকার। যত দেখতে থাকে, তত তার ভ্রূ কুঁচকোতে থাকে আর চোখ উজ্জ্বল হতে শুরু করে। প্রায় এক ডজন কার্ড। দুটো পেট্রোল পাম্পের, একটা রেস্টুরেন্টের, একটা একটি নিউজ চ্যানেলের...

মনে মনে কিছু একটা বিড়বিড় করে ওঠে ইফতিকার। কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল আক্রাম। আক্রাম মোরাদাবাদি! সে জিজ্ঞেস করল, “কিছু বললেন জনাব?' 'নাহ! কিছু না। জায়গাটা কর্ডন করে দাও। একজনকে এখানে ডিউটিতে রাখো আর ফরেনসিক আর অ্যাম্বুলেন্সে খবর পাঠাও।'

'বাইকটার ব্যাপারে এক বার ফলো-আপ করব জনাব, কিছু পাওয়া গেল কিনা? এখনও বেশি দূরে যেতে পারার কথা নয়।'

'দরকার নেই। মুঝে লাগতা হ্যায় কে মুঝে পতা হ্যায়, ইসকে পিছে কিসকা হাথ হ্যায়!'

'কে জনাব?'

'বলব পরে। তোমরা এদিকটা সামলাও, আমি আসছি। মতিহার— বাইকের চাবি দাও।'

একটু দূরে দাঁড়িয়ে থাকা মতিহার অনিচ্ছাসত্ত্বেও বাইকের চাবি হাতে নিয়ে এগিয়ে আসে।

৩ আগস্ট, ২০১৮, সকাল বেলা / নিউটাউন, কলকাতা, ভারত

'ক্যান ইউ প্লিজ গিভ মি মাই কি?'

দেবরাজ একমনে মাথা নীচু করে কাজ করছিল। আজ তার ঢুকতে লেট হয়ে গেছে। অবশ্য তার দোষ নয়। আগামীকাল বিশ্ব বাংলা গেটে উপস্থিত থাকবেন পাকিস্তান আর ভারতের প্রধানমন্ত্রী এবং এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী।

সেই উপলক্ষ্যে সিকিউরিটির প্রচুর কড়াকড়ি আজকে থেকেই। মেটাল ডিটেক্টর, গাড়ি চেকিং, স্নিফার ডগ, এসপিজি কম্যান্ডো— একদম ছয়লাপ হয়ে গেছে জায়গাটা। প্রায় প্রত্যেক গাড়িকেই দাঁড় করিয়ে চেক করা হচ্ছে। তার ফলে ট্র্যাফিক খুবই স্লো। কিন্তু সেসব অজুহাত কেউ শুনবে না। 'দ্য স্টাডস'-এর ম্যানেজমেন্ট পাংচুয়ালিটির ব্যাপারে খুব কড়া।

তার শিফট শুরু সকাল আটটা থেকে। তিন তারা এই হোটেলে সকালের দিকটায় যদিও রিসেপশনে ব্যস্ততা একটু কম থাকে, তাহলেও সময়ে ঢুকতেই হবে আগের শিফটের লোককে রিলিজ দিতে। সে ঢুকেছে আটটা দশে। মাত্র দশ মিনিট লেট। তাতেও অনিন্দিতা বেরিয়ে যাওয়ার সময় জানিয়ে গেছে নিখিলদা নাকি দু' বার খোঁজ করেছে। নিখিলদা গেস্ট সার্ভিস ম্যানেজার। ফ্রন্ট অফিস ডিপার্টমেন্টের মেজবাবু বলা যেতে পারে। আর দেবরাজ ছ' মাস আগে জয়েন করা ফ্রন্ট ডেস্ক অ্যাসোসিয়েট। এই মাসেই তার প্রোবেশন পিরিয়ড শেষ হবে। নিখিলদার একটা রিপোর্টে ম্যানেজার ওর চাকরিটি বেমালুম কাঁচি করে দিতে পারে।

তাই একটু ভয়ে ভয়েই সে এসেই, বাথরুমে ফ্রেশ হতেও যায়নি। জামার ভেতর ঘামে ভেজা ল্যাতপেতে স্যান্ডো গেঞ্জি, কপাল, ঘাড়, বগল আর কোমরের খাঁজে বিনবিনে ঘামের উপস্থিতি, তলপেটে চাপ— সব কিছু উপেক্ষা করেই সে বসে পড়েছিল সকালের পেপারওয়ার্কগুলো সামলাতে। ঘাড় গুঁজে কাজ করতে করতে পাশে দাঁড়িয়ে কম্পিউটারে ইমেল ইত্যাদি অনলাইন কমিউনিকেশন সামলাতে থাকা রঞ্জনকেও কেজো 'গুড মর্নিং' ছাড়া কিছু বলে উঠতে পারেনি। একমনে কাজ করছিল, আর ঠিক সেই সময়ই একটা গলার আওয়াজ তাকে একটু চমকেই দিল, 'ক্যান ইউ প্লিজ গিভ মি মাই কি?'

সাধারণত শুক্রবার সকালে গেস্ট চেক ইন-এর চাইতে চেক আউটই বেশি হয় এই হোটেলে। আইটি পাড়ার হোটেল। সারা সপ্তাহ বিভিন্ন অফিসে বাইরে থেকে উড়ে আসা

লোকজন সপ্তাহান্তের এই দিন বেরিয়ে যান বাড়ির মুখে। এটি উলটো!

চোখ তুলে দেবরাজ সামনে তাকায়।

কাঁচা-পাকা চুল, নিখুঁত কামানো গাল, চোখে ফুল-রিম চশমা, পরনে স্যুট - হুইলচেয়ারে আসীন এক প্রৌঢ়। বয়স আন্দাজ পঞ্চান্ন। দেবরাজ শশব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়ায়।

'শিওর স্যর। আই থ্রিজিউম ইউ আর অলরেডি চেকড ইন! ইওর রুম নাম্বার প্লিজ!'

'ওয়ান ফোর ও এইট!'

'ওকে! জাস্ট গিভ মি এ মিনিট স্যর...'

মুখ নামিয়ে খুটখাট করে কম্পিউটারের কিছু বোতাম টিপে সে গেস্ট-রেকর্ড বার করে। প্রথমে নাম দেখে।

'ইউ আর রাজকুমার দেব, রাইট স্যর?'

'তাই তো জানি!' মৃদু হেসে পরিষ্কার বাংলায় বলেন ভদ্রলোক।

'ও, আপনি বাঙালি, গ্রেট স্যর!'

চেক ইন করেছেন ভোর বেলা সাড়ে পাঁচটায়। আড়চোখে এক বার ভদ্রলোকের সিস্টেমে থাকা ফটো আইডির ছবির সঙ্গে ভদ্রলোকের মুখটা মিলিয়ে নেয় দেবরাজ। ভারি শক্ত কাজ। ছবিটা স্পষ্টত বেশ পুরোনো। যে ছবিটি আছে সেটি অন্তত বছর আট-দশ আগেকার। মুখের আদল একই আছে যদিও। কিন্তু এখন সিকিউরিটির বেশ কড়াকড়ি। বিশেষ করে এই এরিয়াতে। পুরোপুরি নিশ্চিত না হয়ে দেবরাজ গেস্টের হাতে চাবি দিতেও পারে না। সে আবার নম্রভাবেই জিজ্ঞাসা করে, 'স্যর, আপনি কি চাবি রিসেপশনে রেখে গেছিলেন?'

'হ্যাঁ, এই তো, চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ মিনিট আগে। তখন আপনি ছিলেন না।' 'ওকে স্যর। স্যর, আপনার কোনো একটা আইডি লাগবে। প্রেফারেবলি যেটা চেক ইন করার সময় দিয়েছিলেন।'

'ওহ! কেন?'

'না, আসলে আপনার আইডি-র ছবিটা খুব একটা স্পষ্ট আসেনি আমাদের সিস্টেমে। তাই... চাবি দেওয়ার আগে... বুঝতেই পারছেন স্যর, সিকিউরিটির ব্যাপার...' হালকা হেসে ক্রমশ গম্ভীর হতে থাকা পরিবেশকে সহজ করার চেষ্টা করে দেবরাজ।

'না, একদমই কিন্তু বুঝতে পারছি না। আমার ঘরের চাবি নেব, তার জন্যে কত বার আমাকে প্রমাণ দাখিল করতে হবে? আপনাদের সিস্টেমে যদি ছবি ঠিক করে না স্টোর হয়, সেটা কি আমার দায়িত্ব?'

গলা চড়তে থাকে রাজকুমারবাবুর। সচকিত হয়ে রঞ্জন এক বার জিজ্ঞেস করল ইশারায়, কী ব্যাপার। তাকে আশ্বস্ত করে দেবরাজ ঠান্ডা গলাতেই আবার বলে, 'স্যর, আপনার যে কোনো একটা আইডি পেলেই ব্যাপারটা মিটে যায়...' তার কথা শেষ করতে না দিয়েই আবার ভদ্রলোক বলে ওঠেন, 'আমার কাছে আইডি নেই। আমি এই সামনের স্টোরে কিছু পার্সোনাল টয়লেট্রিজ কিনতে গেসলাম। এইটুকু সময়ের জন্য কে আবার নিজের আইডি নিয়ে নামে, বলুন তো? এই প্রশ্নটা তিনি এবার রঞ্জনের দিকে তাকিয়ে ছুড়লেন।

রঞ্জন একটু অপ্রস্তুতে পড়ে যায়। দেবরাজ মাথা ঠান্ডা রেখেই তবু বলার চেষ্টা করে, 'বুঝতে পারছি, কিন্তু স্যর, আমাদের হোটেলের পলিসি...'

হঠাৎই দেবরাজের পিঠে পেছন থেকে আলতো হাত পড়ে কারও। পেছন ফিরে দেখে, নিখিলদা! চেঁচামেচি শুনে উঠে এসেছেন নিজের অফিস থেকে। মোলায়েম হেসে জিজ্ঞেস করলেন, "কী প্রবলেম, দেব?'

দেবরাজ ছোট করে সমস্যাটার কথা জানায়। নিখিল সব শুনে, সিস্টেমের ছবিটা খুঁটিয়ে দেখে তারপর বলেন, 'এক বার অনিন্দিতাকে ফোন করে কনফার্ম করে নাও। নিয়ে ওঁকে ছেড়ে দাও। ছবি ঠিকই আছে। স্টিল, তোমার যখন মনে হয়েছে, এক বার অনিন্দিতাকে ফোন করে নাও।'

'বাট সার...' খুবই মৃদু গলায় কাস্টমারের কান বাঁচিয়েই বলতে যায় দেবরাজ। ততোধিক নীচু অথচ কঠিন গলায় নিখিল বলেন, 'ড্যুড়! হি ইজ দ্য কাস্টমার। ডোন্ট পুশ ইওর লাক!?

দেবরাজ চুপ করে যায়। আর কথা কাটাকাটি করে লাভ নেই। সে ডেস্কের সামনে থেকে একটু সরে যায়। যেতে যেতে শোনে নিখিল রাজকুমারবাবুকে বলছেন, "সরি টু কিপ ইউ ওয়েটিং স্যর! এক্ষুনি সর্ট আউট করে নিচ্ছি আমরা ব্যাপারটা।

অনিন্দিতার ফোনে দুটো রিং হতে-না-হতেই ওদিক থেকে ফোন তোলে সে। কোনো ভূমিকা না করেই দেবরাজ জিজ্ঞেস করে, "অনিন— ভোর বেলা এক ভদ্রলোক চেক ইন করেছেন। সেভেন্থ ফ্লোর— স্ট্যান্ডার্ড ডাবল বেড রাজকুমার দেব। তোর মনে আছে?'

'রাজকুমার...' অনিন্দিতার স্বগতোক্তির ফাঁকেই দেবরাজ গলাটা নামিয়ে জুড়ে দেয়, "ফিজিক্যালি চ্যালেঞ্জড— হুইলচেয়ার...'

'ও, হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়েছে। চেক ইন করার কিছুক্ষণ পরেই তো উনি চাবি রেখে বাইরে গেলেন। বললেন কীসব আর্জেন্ট কেনাকাটার আছে, টুকিটাকি। ফানি চেয়ার দো— জানিস? নেকরেস্টটাই ডিট্যাচেবল ক্র্যাচ। ঢুকতে গিয়ে মেটাল ডিটেকশনে আওয়াজ শুরু হয়ে গেসল। সেই নিয়ে গেটে একটা কনফিউশন...' দেবরাজের অধৈর্য গলাখাঁকারিতে সংবিৎ ফেরে তার, 'কেন, কী হল? ঝামেলা হয়েছে নাকি?" 'পরে বলব। এখন ব্যস্ত। রাখছি।'

টুক করে ফোনটা কেটে আবার ডেস্কে হাজির হল দেবরাজ। হাসিমুখে। নিখিল আবার নিজের কেবিনে চলে গেছেন। তারপর গেস্টকে বলল, 'আমি অত্যন্ত দুঃখিত স্যর। আমি কনফার্ম করে নিয়েছি।' রুম নম্বরের খোপকাটা একটা ক্যাবিনেট থেকে নির্দিষ্ট রুমের চাবিটা বের করে ভদ্রলোকের হাতে দেয়। সেইসঙ্গে বলে, 'আপনার সঙ্গে কোনো লাগেজ আছে স্যর? আমি কি বেলবয়কে ডাকব? পৌঁছে দিয়ে আসার জন্য?'

'নাহ, থাক, দরকার নেই।'

চাবিটা নিয়ে ভদ্রলোক বেশ জোরেই ঘুরলেন নিজের অটোম্যাটিক হুইলচেয়ারের বোতামে চাপ দিয়ে। অপসৃয়মাণ চেয়ারটির দিকে তাকিয়ে দেবরাজ খেয়াল না করে পারল না, যে অনিন্দিতার কথামতো কোনো নেকরেস্ট নেই চেয়ারের পেছনে। ভদ্রলোকের ক্রাচ জোড়া তাহলে কোথায়? নাকি অনিন্দিতা ভুল দেখেছে?

চতুর্বিংশ অধ্যায়
।। রুক ইন দ্য সেভেন্থ র‍্যাঙ্ক।।

২০১৮, বিকেল বেলা / করাচী, পাকিস্তান

২৯ জুলাই, ঘরের ভেতরটা শুধু ঠান্ডাই নয়, ছায়াময়ও। বাইরের ঝাঁ ঝাঁ রোদ্দুরের থেকে হঠাৎ এই ঘরে ঢুকে প্রথমেই মুখ দিয়ে যে আওয়াজটা প্রতিবর্ত ক্রিয়ায় বেরিয়ে আসে, তা আরামের, প্রশান্তির। কিন্তু ঝড়ের বেগে ঢুকে পড়া ইফতিকারের মুখ দিয়ে প্রথমে যে আধো শিস-আধো চমকের আওয়াজ বেরিয়ে এল সেটা নিখাদ বিস্ময়ের। সেই বিস্ময়ের ধাক্কা এতটাই যে কারেন্টের শকের মতোই তা ছিটকে দিয়েছে একেবারে।

রাজকীয় সোফায় এলিয়ে বসে আছেন দিলদার সিদ্দিকি। হাতের গ্লাসে স্কচ। আর তার পাশে, সোফার হাতলে মদালসা ভঙ্গিতে এলিয়ে, প্রায় স্বামীর বুকের ওপর আধশোয়া হয়ে বসে আছে নাজনিন!! এই পড়ন্ত বিকেলেই তার হাতেও গ্লাস।

তাকে ঘরে ঢুকতে দেখেও সিদ্দিকি দম্পতি চমকাল না দেখেই স্পষ্ট বোঝা গেল যে তারা জানত সে আসছে। প্রশ্ন হল কতক্ষণ আগে থেকে? আর জানালইবা কে? যেন তার মনের কথা আন্দাজ করেই কোনো সম্ভাষণ না করে দিলদার সরাসরি বলে উঠলেন, ‘আরে ভাই, এই করাচিতে আমার প্রায় পঞ্চাশ কোটি টাকার কারবার চলে। কয়েকটা লোকজন না থাকলে, খবর উড়িয়ে আনার লোক না থাকলে, কারবার চলবে কী করে?’

নিয়ন্ত্রণ খুব জরুরি জিনিস। যে কোনো পরিস্থিতিতে নিয়ন্ত্রণ নিজের হাতে রাখাটা খুব জরুরি। ইফতিকার জানে। তাই লাগামটা নিজের হাতে তুলে নেওয়ার চেষ্টায় সে ধীর পায়ে, একটু বেশি ফুটে ওঠা আত্মবিশ্বাস নিয়ে একপাশের একটি সিঙ্গল সোফায় গিয়ে বসে। হাবভাব এমনই যে, এমনটা যে হবে তা তার জানাই ছিল। তারপর খুব গম্ভীর মাপা গলায় বলল, “দিলদারভাই, ঠিক কী কারণে আপনাকে একটা মার্ডার ফ্রেম করতে হল আর একটা সত্যি মার্ডার করতে হল -সেটা বলার জন্য আপনার কাছে ঠিক দশ মিনিট সময় আছে।'

দিলদার একটু কৌতুকের দৃষ্টিতেই তার দিকে তাকালেন, ‘মাত্র! এর চেয়ে অনেক বেশিক্ষণ তো তুমি নাজনিনের সঙ্গে বিছানায় কাটাতে দোস্ত! সেইটুকু কনসিডারেশন তো আমার প্রাপ্য, নাকি হে?’

কী নিরুত্তাপ! কী নিয়ন্ত্রিত! ইফতিকার অবাক হয়ে যায়। নাজনিনের বসে থাকা দেখেই অনেকটা আন্দাজ করা যাচ্ছিল যে দিলদার হয়তো ওদের ব্যাপারটা জানেন। কিন্তু তার বহিঃপ্রকাশ যে এতটা শীতল হবে তা তো ভাবতেই পারা যায় না। সে একটু দিশাহারা হয়ে পড়ে। এই মাপা প্রত্যাঘাতের জবাবে তার অভিব্যক্তি ঠিক কীরকম হতে পারে সেটা সে চট করে ভেবে পেল না। সেই সুযোগে দিলদার আবার বললেন, ‘শোনো বেরাদর— তুমি কীভাবে আন্দাজ করেছ আমি সঠিক জানি না। তবে প্রমাণ খুব একটা পাবে না বাপু। এই দেশে টাকা থাকলে অনেক বড় বড় কাজও অসম্ভব নয়। আর এখানে তো মাথা ঘামানোর জিনিসই কম। একটা ভিখিরির ডেডবডি চুরি করা আর আরেকটা নেশাখোর গুন্ডাকে খুন করা। ও জিনিস মিডিয়াও বিশেষ কভার করতে চাইবে না। কিন্তু ভাবো— সরকারি কর্মচারীর বিশেষত পুলিশের সঙ্গে সুন্দরী পরস্ত্রীর ফস্টিনস্টি কতটা রসালো? আর এক বার সেই অ্যাঙ্গেলটা সামনে এলে...'

‘আপনি নিজের স্ত্রীর সম্বন্ধে কুৎসা রটতে দেবেন?’

‘কুৎসা কীসের হে? এ তো ব্ল্যাকমেল। তুমি ক্ষমতাবান। সরকারি ক্ষমতায় থেকে আমাকে ফাঁসিয়ে দেবার ভয় দেখিয়ে আমাকে অর্থনৈতিকভাবে এবং আমার স্ত্রীকে শারীরিকভাবে শোষণ করছিলে এতদিন।'

ইফতিকার বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে থাকে। এক বার শুকনো ঠোঁটে জিভ বোলাতে

বোলাতে নাজনিনের দিকে তাকায়। সে এখনও একটাও কথা বলেনি। তবে তার দিকেই চেয়ে আছে একদৃষ্টে। ঠোঁটের কোনায় একটা রহস্যময় হাসি। তারপর খুব কষ্টে ভেঙে ভেঙে বলে, 'সব তাসই যখন আপনার হাতে, তাহলে আমার জন্য অপেক্ষা কেন? আপনার তো নিজেরই নিউজ চ্যানেল আছে।'

'আহা, সে তো আর পালিয়ে যাচ্ছে না। কিন্তু দেখো, আদতে আমি এক জন ব্যবসায়ী। ভাবলাম তোমার সঙ্গে যদি একটু সওদা করে নেওয়া যায়...' 'কীরকম?'

এবারে নিজের এলানো ভঙ্গিমা ছেড়ে ওর দিকে একটু ঝুঁকে আসেন দিলদার, 'শোনো ইফতিকার, আমার বউয়ের সঙ্গে শোয়া আর আমার সঙ্গে হাত মেলানো কিন্তু এক ব্যাপার নয়। মনে রেখো, এখানে এক বার ঢুকে পড়া মানে বেরোনোর রাস্তা নেই।'

'ওকে, বলুন। এমনিতেও আপনি আমার জন্য বিশেষ রাস্তা খোলা রাখেননি।'

একটু আত্মপ্রসাদের হাসি ভেসে ওঠে দিলদারের মুখে। সে এক বার অপাঙ্গে নাজনিনের দিকে চেয়ে, গলা ঝেড়ে শুরু করে, 'সাদিক ইসমাইল সাহেবকে তুমি কতটা চেনো?'

'পাকিস্তান আর্মি, আইএসআই, নিশান-এ-ইমতিয়াজ, বিএলএফ-কে কবজায় আনা লোক। এককথায় ইন্সপিরেশন টু এ জেনারেশন!'

'আর সুনীত কৃষ্ণণ?'

অসতর্কভাবেই প্রশ্নটা এসে পড়ায় প্রাথমিক চমকটা কাটিয়ে উঠতে পারে না ইফতিকার। সেইটুকুই যথেষ্ট। নিজের চাল ফাঁস করে ফেলতে, ওই চমকে যাওয়াটুকুই লাগে। দিলদার স্বভাবসিদ্ধ হাসিটি মুখে ধরে রেখে নিজেই বললেন, 'তাকেও নিশ্চয়ই ইন্সপায়ারিং লাগে, তাই না? হাজার হোক, তার পরামর্শেই তো পারিবারিক ব্যবসা ছেড়ে সরকারি চাকরিতে আসা। সেই তো তোমাকে আন্তর্জাতিক ভাইচারার কথা শুনিয়েছে তাই না?'

ইফতিকার সামান্য নড়ে বসে অস্বস্তি কাটাতে। তারপর বলে, 'আপনি কী করে জানলেন এত কিছু?'

'ওই যে বললাম, খবর রাখাটাই আমার পেশা!' মুচকি হেসে জবাব দিলেন দিলদার। তারপর মুখ থেকে হাসি মুছে ফেলে বললেন, 'আর আমাদের প্রধানমন্ত্রীকে কেমন লাগে? খোলাখুলি বলো। এসব কোথাও রেকর্ড করছি না।' 'মজবুত লোক। অন্তত এখন তো মনে হচ্ছে ইন্ডিয়ার সঙ্গে যে একটা ফর নাথিং ছায়াযুদ্ধ এতদিন চালিয়ে আসছি আমরা, যাতে আমাদের ক্ষতির পরিমাণ অনেক অনেক বেশি— সেটা অন্তত একটু বদলাবে।'

রাজনীতি ইফতিকারের প্রিয় বিষয়। তাই কথা বলার সুযোগ পেয়েই সে ভুলেই যায় যে এক জন খুনি-ধড়িবাজ ব্যবসাদার আর তার স্বৈরিণী স্ত্রীর সঙ্গে এক অতি অদ্ভুত পরিস্থিতির মধ্যে মুখোমুখি বসে আছে সে। তার কথার স্রোতে লাগাম দিতে দিলদার নিজেই বলে ওঠেন, 'এবারে আমি যদি বলি তোমার আইডল জনাব সাদিক ইসমাইল আসলে এক জন গদ্দার! আসলে সে তলায় তলায় নিজের দেশের প্রাইম মিনিস্টারকে খুন করাতে চাইছে!'

ইফতিকারের দু' চোখ বিস্ফারিত হয়ে ওঠে অবিশ্বাসে। দিলদার থামেন না। বলে চলেন, 'এখানেই শেষ নয়। এবার যদি তোমায় বলি, সুনীত কৃষ্ণণ আসলে র-এর রিক্রুটার। আজ পর্যন্ত তুমি যা খবর তাকে দিয়েছ, তোমাদের 'BOUND'-এর কাজে লাগবে ভেবে— তার সবটাই আসলে র-এর কোনো এক অজানা অ্যানালিস্টের হাতে গিয়ে পৌঁছেছে।'

'আপনি কি পাগল? না আমাকে পাগল ঠাউরেছেন?' ইফতিকার প্রায় ছিটকে উঠেই পড়ে সোফা থেকে। দিলদার নিজের সিট থেকে নড়েন না পর্যন্ত। তারপর বলেন, 'তুমি জানো, অ্যাজ উই স্পিক, আমাদের প্রধানমন্ত্রী ইন্ডিয়ার প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে একসঙ্গে ইন্ডিয়ার বিভিন্ন শহরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। এই সময় ভাইজান বলে একটি প্রবাদপ্রতিম কিলারের আইডি দিয়ে একটি বেওয়ারিশ লাশকে রেল ইয়ার্ডে ফেলে আসা হবে কেন?'

'কেন? আপনিই বলুন।' জেদি বাচ্চার মতো শোনায় ইফতিকারের গলা।

'কারণ, এই এলাকার পুলিশের মাধ্যমে অফিসিয়াল খবর ছাপানোর দরকার পড়েছিল যে ভাইজান মারা গেছে। যাতে, প্ল্যান-মাফিক ভাইজান যখন ইন্ডিয়ার মাটিতে এই দেশের প্রধানমন্ত্রীকে মারবে, তখন কোনো প্রমাণ না থাকে যে এর পেছনে এই দেশের কিছু লোকের হাত আছে। ফলে বিনা বাধায় দুটো দেশকে যুদ্ধের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেওয়া যাবে। এই প্ল্যান্ট করার দায়িত্ব ছিল আমার। তাড়াহুড়োয় কিছু ভুল হয়েই যায়। সেগুলো এমনিতে পুলিশের নজরে পড়ার কথা নয়। কিন্তু তুমি মাঝখানে চলে আসায় সমস্যা হয়ে গেল।'

'অর্থাৎ আমার চোখে অ্যানোমালিজগুলো ধরা পড়ে যাচ্ছিল।'

'রাইট ইউ আর!'

'আর আমি এই কথায় বিশ্বাস করব কেন? আপনি কাল অবধি ইসমাইলস্যারের হয়ে কাজ করেছেন। আজকে তার এগেনস্টে হয়ে আমাকে চুকলি করছেন, আপনার ফিতরতও তো সুবিধের নয় বলেই মনে হয়।'

'দেখো ইফতিকার, আমি ধোয়া তুলসিপাতা নই। আর যদি ইসমাইল আমাকে ফাঁসানোর চেষ্টা না করত তাহলে আমিও এসব কথা তোমাকে বলতাম না।"

'কীরকম ফাঁসানো?'

'তোমার কি মনে হয় আমি এত বড় চুতিয়া যে আমি যাকে পয়সা দিয়ে হায়ার করব, তার পকেটে আমার সঙ্গে তার লিংকের প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও তাকে আমি খুন করব? আমি বিজনেসম্যান, ধান্দা বুঝি। কতল করে আমার কী লাভ? তায় আবার এমন কিলিং যার সঙ্গে আমার লিংক খুঁজে পেতে তোমার কনস্টেবলেরও দু' মিনিট লাগেনি।'

'তাও, আপনাকে ফাঁসাচ্ছেন এটা বিশ্বাস করা গেলেও পিএম-কে মারতে চাইছেন, এটার কী প্রুফ আছে?'

বিষণ্ণ হাসি হেসে আবার এলিয়ে বসেন দিলদার। নাজনিন সোফা ছেড়ে উঠে যায় একদিকে রাখা টেবিলের কাছে জল খেতে। দিলদার ধীরে ধীরে বলেন, 'ইউ ওয়ান্ট মি টু প্রুভ সামথিং হুইচ দ্য আইএসআই, দ্য ওয়ান অ্যান্ড অনলি মিঃ ইসমাইল ডান্ট ওয়ান্ট টু বি প্রুভেন! সরি, কান্ট প্রুভ এনিথিং মাই বয়! ওয়েট ফর ফিউ ডেজ। পিএম-এর সফর শেষ হওয়ার আগেই তুমি তোমার প্রমাণ পেয়ে যাবে। যদিও ততদিনে তুমি তোমার দেশকে যুদ্ধের মুখে আর নাজনিনকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছ।'

নাজনিনের কথাটা এত হঠাৎ করেই তুলল দিলদার, যে এক ঝলক রক্ত উঠে এসে ইফতিকারের মুখ লাল করে দিল। ঠিক সেই সময়েই নাজনিন হাতে এক গ্লাস জল নিয়ে এসে সামনেতে দাঁড়াল। হচ্ছেটা কী? এরকম আবার হয় নাকি? নাজনিন তার সঙ্গে শোয়, এটা তার বর জানে। বর যে সেটা জানে, সেটা নাজনিন জানে। তা নিয়ে এদের দুজনের বিন্দুমাত্র জড়তা নেই। এমনকী যার সঙ্গে সে শোয়, তার সামনেও নেই? উলটে আবার তার নাম তুলেই ওকে সেন্টিমেন্টাল করার চেষ্টা করছে দিলদার?

কারা এরা? ইফতিকারদের ট্রেনিং-এ ক্রিমিনাল ক্যারেক্টার প্রোফাইলিংএর একটা পেপার ছিল। কিন্তু এ জিনিস কোনোদিন ট্রেনিং-এ শেখা যায় না। ইফতিকার দিশাহারা হয়ে পড়ে। হাত বাড়িয়ে নাজনিনের থেকে জলের গ্লাসটা নিয়ে এক ঢোকে পুরোটা শেষ করে সশব্দে সামনের নীচু কাচের টেবিলে নামিয়ে রাখে। তার চোখের চাউনি পড়েই যেন দিলদার আবার বলে ওঠেন, 'লজ্জা পাওয়ার কিছু নেই ব্রাদার! নাজনিন আমাকে খুবই ভালোবাসে। কিন্তু আমি ওকে শরীর দিতে পারি না। আর সেই তাকত নেই। তাই সেই আনন্দ যদি ও তোমার থেকে পায়, তাতে তো আমি আপত্তির কিছু দেখি না। ও তো আমার প্রতি কর্তব্যে কোনো অবহেলা করেনি।'

ইফতিকার আর নিতে পারছে না। তার কান-মাথা গরম হয়ে উঠছে। তাকে এক্ষুনি এই জায়গা ছেড়ে বেরোতে হবে। একটু নিরালায় বসে ভাবতে হবে। সে এক ঝটকায় উঠে

দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলে, “ওসব কথা থাক। আপনি এখন বাড়ি ছেড়ে কোথাও যাবেন না। আমি একটু ভেবে দেখি এই ব্যাপারটা...’

বেরোনোর জন্য পা বাড়াতে গিয়েই একটু টলে ওঠে ইফতিকার। আশ্চর্য হয়ে এক বার নাজনিনের দিকে তাকায়। সেও যেন টলছে মনে হচ্ছে। এক বার চোখটা রগড়ে নিল ইফতিকার। ব্যাপারটা কী? মাথার মধ্যের ধোঁয়াশা কাটার আগেই সে সপাটে আছড়ে পড়ল কার্পেট মোড়া মেঝেতে।

চোখ দুটো বুজে যাওয়ায় দেখতে পেল না, কিছুটা দূরে নাজনিনও গড়িয়ে পড়ছে একইসঙ্গে।

কয়েকটা চুপচাপ মুহূর্ত কেটে যাওয়ার পরে দিলদার শান্তভাবে একটা ফোন বার করলেন সোফার গদির নীচে থেকে। অদ্ভুতদর্শন ফোন। মোটা, বেঢপ সাইজের। একটা কোডেড নম্বর ডায়াল করে অপেক্ষা করলেন। উলটো দিকের লোকটি ফোন তোলামাত্র বললেন, ‘ ইট ইজ ক্লিন! নিড দ্য জ্যানিটর, নাও!’

৩ আগস্ট, ২০১৮, ভোর বেলা / নিউটাউন, কলকাতা, ভারত

জানলা দিয়ে সামনে বেশ খানিকটা দূরে ইকো পার্ক। তার ওপারের আকাশটা সবে লাল হতে শুরু করেছে। এই সময় সব কিছু বড় পবিত্র মনে হয়। বড় ভালো লাগে এই গ্রহটিকে। মনে হয় আজ, এখন, এই মুহূর্তেই নতুন করে জন্ম হল এই নীল গোলকের। সব কিছু নতুন করে শুরু করাই যায় আবার।

মনে হয় কালকের রাত অবধি যে বৃদ্ধা, কুটিলা পৃথিবীতে বাস করতাম, আজ সকালে, এই ভোরে সে যেন নেই। কোনো অমলতাসের মতো রঙিন ও শিউলির মতো নরম বালিকা এসেছে তার জায়গায়।

সাখাওয়াতের যদিও এসব মনে হচ্ছিল না। এক বার কয়েক মুহূর্তের জন্য তার মনে হয়েছিল বটে, যে এখান থেকে খুব বেশি দূরে নয়, কাছাকাছিই তার বছর দুয়েক আগের আস্তানা। কিন্তু তিনি ভালোই বোঝেন সেই জীবনের থেকে তাঁর দূরত্ব এখন কয়েক আলোকবর্ষ। চাইলেও সে জীবনে ফিরে যাওয়া আর সম্ভব নয়। তা ছাড়া, তিনি বরাবরই বাস্তববাদী লোক। জব অ্যাট হ্যান্ড— এটাই তার কাছে সবসময় বেশি গুরুত্ব পেয়ে এসেছে।

আর এখন তো যা কাজের পরিমাণ— দশটা হাত থাকলেও অপ্রতুল মনে হবে। কাজের কথা মাথায় আসতেই একটু জোর করেই তিনি ঘোর লেগে যাওয়া চোখ দুটো খোলা জানলা থেকে ঘরের ভেতরে ফেরালেন। মোক্ষম সময়জ্ঞান। ঠিক সেই সময়ই আর্য দু’ মগ ধোঁয়া ওঠা কফি নিয়ে এসে দাঁড়াল পাশে।

তার হাত থেকে একটা মগ নিয়ে, কালো কফিতে আরামের চুমুক মেরে সাখাওয়াত বললেন, ‘আঃ! থ্যাংকস আর্য! ওয়ান্স দিস ইজ ওভার, আই ও ইউ এ ডিনার ট্রিট!’

‘শিওর স্যর! আই উইল লুক ফরওয়ার্ড!’

‘বাট বিফোর দ্যাট, দিস নিডস টু বি ওভার! ইওর সাইড অফ দ্য স্টোরি প্লিজ!'

‘বিশেষ কিছুই না স্যর। যা খবর পেয়েছি লোকটা এই সাবকন্টিনেন্টের। এই দেশের হওয়াই স্বাভাবিক। তবে শিওর নই। সঙ্গে কেউ ছিল না। কী করে ভাতিজার খবর পেল সেটাই আশ্চর্য। যাক গে। আমি ভাতিজার ছেলে-ছোকরাদের কাছেও খবর নিয়েছি। লোকটা কলকাতায় আসার ট্রেন ধরেছিল।'

‘হুম। তুমি সেই জন্যেই মনে করছ যে ও কলকাতাতেই এসেছে?’

‘স্যর, জামালপুর থেকে কলকাতার মধ্যে এমন কোনো জায়গা নেই যেখানে কোনো হাই প্রোফাইল ভিজিট আছে।'

‘হাই প্রোফাইল টার্গেট কি থাকতেই হবে? এমনও তো হতেই পারে যে এটা নিছকই কোনো সুপারি কিলিং, রান অফ দ্য মিল?

‘স্যর, আ ট্যাক-৫০ কস্টস অ্যারাউন্ড টেন ল্যাকস ইন আন্ডারগ্রাউন্ড মার্কেট!

লাপুয়া-ম্যাগনাম বুলেট পার পিস অন্তত হাজার তিনেক টাকা দাম। এত টাকার ইনভেস্টমেন্ট কেউ এমনিই একটা সাধারণ খুন করার জন্যে করবে? আরও একটা কথা স্যর— নর্মালি গ্যাং কিলিং স্নাইপার দিয়ে হয় না। স্নাইপার ব্যবহার করা হয় দুটো ক্ষেত্রে। সরকারি সোলজার আর প্রফেশনাল অ্যাসাসিন। সরকারি সোলজার কখনোই ব্ল্যাক মার্কেটে কিনবে না। সো...'

'হুম...' অসমাপ্ত কথাটা অসমাপ্তই থাকে। তাতে বুঝতে অসুবিধে হয় না কিছুই, কারোরই। সাখাওয়াত গম্ভীরভাবে কিছুক্ষণ চুপ থেকে, হঠাৎ একটু অপ্রত্যাশিতভাবেই বেশ তরল গলায় বলেন, "আচ্ছা, এই ফ্ল্যাটটা জোটালে কোথায়?'

'আইএম রিসোর্স। আমার জেলতুতো ভাই-ই বন্দোবস্ত করে দিয়েছিল। আমি ওই সময় খুব ডিটেলসে খোঁজ করতে পারিনি। বাট, ইট ক্যান বি ফাউন্ড আউট নাও, ইফ ইউ ওয়ান্ট!'

হাত নেড়ে আর্যকে নিরস্ত করলেন সাখাওয়াত। বললেন, 'আরে, ছাড়ো! আমি এমনিই জিজ্ঞেস করলাম। উই হ্যাভ আদার থিংস টু ডু নাও! তুমি বলেছিলে তোমার কিছু ব্রিফ করার আছে।'

'হ্যাঁ স্যর। এক মিনিট!' বলেই আর্য চট করে জানলার গোবরাটে কফির মগটা নামিয়ে ঘরের মাঝখানে চলে যায়। সেখানে একটা ডিমের আকৃতির মাঝারি টেবিল। এক ঝলক খালি চোখে সেটাকে মেপে নিয়ে, তার ওপরের জিনিসগুলো সব দু' হাতে সাপটে জড়ো করে আর্য ডিভানে নামিয়ে রাখে।

এবারে ঘরের কোনায় আর একটা কাগজপত্তর ডাঁই হয়ে থাকা টেবিলের দিকে ওর নজর গেল। আবার সব নামিয়ে সেই টেবিলটা খালি করে টেনে নিয়ে এল ঘরের মাঝখানে আগের টেবিলটার ঠিক পাশে। তারপর দরজার পেছনে ঝোলানো একটা স্লিং ব্যাগ থেকে বার করল একটা ম্যাপ।

ভাঁজ খুলে সেই ম্যাপটা যখন সে বিছিয়ে দিল, পুরো দুটো টেবিল ঢাকা পড়ে গেল তাতে।

কলকাতার ম্যাপ! অত্যন্ত বিস্তারিত!

সাখাওয়াত গুটি গুটি এগিয়ে এলেন সামনে। খেয়াল করলেন ম্যাপের তিন জায়গায় লাল মার্কার দিয়ে তারা চিহ্ন দেওয়া। তার মধ্যে দুটো আবার সার্কল করে রাখা। মুখে কিছু না বলে তিনি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালেন আর্যর দিকে।

ছেলেটা ম্যাপের দিকে জ্বলজ্বলে চোখে তাকিয়ে আছে। কিছুক্ষণ সেদিকে আত্মস্থ অবস্থায় তাকিয়ে থেকে আর্য বলতে শুরু করল, 'স্যর, আমি একটু হেড স্টার্ট পেয়েছিলাম। তাই...'

'লেটস স্টার্ট, আর্য!'

'ই...... ইয়েস স্যর...' চট করে নিজেকে গুছিয়ে নিয়ে আর্য বলতে শুরু করে, 'আমি পিএম এবং পাকিস্তানের পিএম-এর এই টুরের ইটিনিরারি খুঁটিয়ে দেখেছি যতটা পেরেছি। বেশিরভাগ সময়ই ইন্ডোর মিটিংস এবং ডেলিগেশন মিটস! ওপেন এয়ার অ্যাপিয়ারেন্স, পাবলিক অ্যাপিয়ারেন্স ছাড়া — স্নাইপারের পক্ষে তার প্ল্যান এক্সিকিউট করা ইম্পসিবল।

'কিন্তু আমি যা খোঁজ নিয়েছি, এই বুলেটগুলো বা তোমার এই রাইফেলটি— এগুলো তো অ্যান্টি-ম্যাটার। মানে কংক্রিট বা কাচের ওপারে থাকা টার্গেটও নালিফাই করতে পারে।'

'তা পারে, কিন্তু তার জন্যও স্নাইপারকে টার্গেটের একদম সঠিক পজিশন জানতে হবে। কংক্রিটের ওপারে হলে হিট-সেন্সর, থার্মাল ইমেজিং ইত্যাদি, আর নাহলে গ্লাস উইন্ডোর কাছাকাছি টার্গেটকে থাকতে হবে। থার্মাল ইমেজিং-এর ক্ষেত্রে প্রধান সমস্যা এখানকার ওয়েদার। হট অ্যান্ড হিউমিড এই পরিবেশে খুব অ্যাকিউরেসি পাওয়া যাবে না। আর আমরা সাধারণত এই ধরনের কাজের জন্য একজন নেভিগেটর সঙ্গে রাখি। হেল্পস

আস রিডিউসিং দ্য এরর কোশেন্ট! এখানে যতদূর জানা গেছে, আমাদের শুটার একাই কাজ করছে।'

'ওকে। কন্টিনিউ……'

'এনিওয়েজ— আমি যা দেখেছি তাতে এই দেড় দিনের টুরে ওঁদের তিনটে এক্সপোজ্‌ড অ্যাপিয়ারেন্স আছে। দ্বিতীয় হুগলি ব্রিজ, এলগিন রোডে নেতাজির বাসভবন এবং তৃতীয়টা এই কাছেই, মাতৃভাষা ভবন, বিশ্ব বাংলা গেট। এখন এলগিন রোডে নেতাজি বাসভবনে পাবলিক এক্সপোজার হলেও, ভেন্যুর এলিভেশন খুব নীচে। দূর থেকে ক্লিয়ার লাইন অফ সাইট পাওয়া অসম্ভব। প্রচুর অবস্ট্যাকলস। দ্বিতীয় হুগলি ব্রিজ সব দিক দিয়েই সুইটেবল। ক্লিয়ার লাইন অফ সাইট। এমনকী গঙ্গার অন্য পাড়ের কোনো ভ্যান্টেজ পয়েন্ট থেকে শুট করেও দিব্যি বেরিয়ে যাওয়া যাবে। যেহেতু কলকাতার এন্ট্রি পয়েন্ট এবং উলটো দিকে কেওটিক হাওড়া— এসকেপ রুট হিসেবেও খুবই ভালো। সো ইজ দিস বিশ্ব বাংলা গেট। প্রোলংড এক্সপোজার, ক্লিয়ার লাইন অফ সাইট, এস্কেপ রুটস— এখানেও অ্যাভেলেবল।'

'তার মানে দুটোই সমান ডেঞ্জারাস বলছ?'

'বলতে পারেন স্যর। তবে ইফ আই হ্যাভ দ্য অ্যাসাইনমেন্ট, তাহলে আমি সেকেন্ড হুগলি ব্রিজ বেছে নেব না।'

'কেন?'

'উইন্ড!'

'সরি!?'

'স্যর, গঙ্গার ওপরে বলেই এখানে হাওয়া প্রচুর। নাও, যত দূরপাল্লার শট হবে, স্নাইপারকে এই উইন্ড স্পিডের ব্যাপারে তত সতর্ক হতে হয়। হাওয়ার স্পিড ফ্লাকচুয়েট করলে শুট করার সময় অ্যাডজাস্ট করাও মুশকিল হয়। তাই খুব দূরপাল্লার শটের স্পট বাছার ক্ষেত্রে কোনো শুটার অপশন পেলে কম উইন্ডি লোকেশনই বেছে নেবে একশোর মধ্যে একশো বার।'

'তাহলে ব্যাপারটা কী দাঁড়াল?'

'ইফ আই অ্যাম দ্য শুটার, আই উইল চুজ বিশ্ব বাংলা গেট অ্যাজ মাই স্ট্রাইক পয়েন্ট!'

প্রথম সূর্যের আলো পুব দিকের জানলাটা দিয়ে এসে পড়েছে ঘরের মেঝেতে। হালকা, নরম রোদ্দুরের ফালি। কিন্তু তাতেও হেসে উঠল না ঘরটা। থমথমে মুখ করে নিশ্চুপ ঘর অপেক্ষা করতে থাকল। এক বুদ্ধিদীপ্ত তরুণ আর এক পোড়-খাওয়া প্রৌঢ় তাকিয়ে রইল একই ম্যাপের দিকে, গম্ভীর মুখে।

প্রৌঢ়ই প্রথম নীরবতা ভাঙলেন, 'অ্যান্ড হোয়েন ইজ দিস গোয়িং টু হ্যাপেন?'

'টুমরো, ইলেভেন এএম!'

'স্নাইপার এখন কোথায় থাকতে পারে?'

'হার্ড টু টেল স্যর। দু' কিলোমিটার রেডিয়াসের মধ্যে যে কোনো সাফিশিয়েন্টলি এলিভেটেড জায়গায়। মে বি অলরেডি ইন হিজ নেস্ট। মে বি স্টিল ওয়েটিং... হু নোজ!'

চট করে ম্যাপের ওপর দুজনেই ঝুঁকে পড়েন। সাখাওয়াত ম্যাপে বিশ্ব বাংলা গেটকে কেন্দ্র করে একটা সার্কল টানেন। জিজ্ঞাসু চোখ তুলে বলেন, 'লাইক দিস?'

'হ্যাঁ স্যর, মোর অর লেস...'

'ওকে। দেন উই হ্যাভ আওয়ার ওয়ার্ক কাট আউট মাই বয়! লেটস ডিভাইড দ্য এরিয়া অ্যান্ড স্ক্যান।'

আর্য একটু চমকে যায়।

'আমরা দুজনে, স্যর? বাট... বাট ইটজ আ হিউজ এরিয়া। দুজনের লেগ ওয়ার্কের জন্য যথেষ্ট সময় নেই। এটা তো স্যর রিয়েল থ্রেট। তাহলে আমরা প্রপার অথরিটিকে

জানিয়ে এবারে সেইমতো অ্যাকশন নিচ্ছি না কেন?'

'বিকজ...' প্রথম সূর্যের রশ্মি সাখাওয়াতের চোখের মণিকে ঝিকিয়ে দেয়, 'আওয়ার প্ল্যান ইজ স্টিল অ্যাক্টিভ, আর্য! উই স্টিল ওয়ান্ট দ্য অ্যাটেম্পু টু বি মেড অ্যান্ড ফেইলড!!'

'হোয়াট?' আর্য নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারে না। এই বৃদ্ধ কি উন্মাদ হয়ে গেছেন? একসঙ্গে দুই যুযুধান দেশের প্রধানমন্ত্রীর জীবনের ওপর ঝুঁকি নিতে চান, খেলার মেজাজে? সে না চাইতেও প্রতিবর্ত ক্রিয়ায় তার গলা দিয়ে আর্তনাদের মতো জিজ্ঞাসা বেরিয়ে আসে ছিটকে। সাখাওয়াত এখনও নিষ্কম্প। ততক্ষণে তিনি তাঁর সাইড ব্যাগটি কাঁধে তুলে নিয়েছেন। দু' পা এগিয়ে আর্যর কাছে এসে তার চোখে চোখ রেখে খুব ঠান্ডা গলায় শুধোলেন, 'এনি ডাউট, মাই বয়?'

এই চোখের কালো মণিতে এখন কোথাও কোনো কৌতুকের আলো লুকিয়ে নেই। ছিপছিপে চেহারার এই প্রায় বৃদ্ধকে শারীরিকভাবে কবজা করতে আর্যর দশ সেকেন্ডও লাগার কথা নয়। কিন্তু ওই চোখের দিকে তাকালে যেন মনে হয় এর বিরুদ্ধে যাওয়া সহজ কাজ নয়। আর্য সারভাইভার। সমস্তরকম প্রতিকূলতার মুখে অবিচলিত থাকাটাই তার বেঁচে থাকার জিয়নকাঠি। সে বোঝে কখন এক পা পেছোতে হয় আর কখন এগিয়ে যেতে হয় দু' পা। এখন পেছোনোর সময়। সে মাথা নীচু করে বলে, 'নো স্যর। অলরাইট। আই উইল স্ক্যান দ্য এরিয়া।

'গুড! লেটস মিট অ্যাট দ্য বিশ্ব বাংলা হোটেল ফর ডিনার, অ্যাট এইট, শ্যাল উই?'

'শিওর স্যর।'

আয়নার সামনে মিনিট পাঁচেক মাত্র!

ঘরে ঢুকেছিল জেল সেট করা ব্যাকব্রাশ চুল, পয়েন্টেড হাই হিল শু, সাদা স্টার্চড শার্ট আর কালো প্যান্টের একজন প্রায় মডেল, যার বাঁ-হাতের পুরোবাহুতে গোটানো শার্টের হাতার ফাঁক দিয়ে উঁকি মারছিল ট্যাটু।

আয়নার সামনে থেকে সরে যে ছেলেটি কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে বেরিয়ে গেল তার ফুরফুরে এলোমেলো হালকা কোঁকড়ানো চুল। পরনে ফ্লোরাল কটন শার্ট! সবুজ চিনোজ! পায়ে স্নিকার্স! কার সাধ্য একই লোক বলে চেনে!

সপ্রশংস দৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে থাকেন সাখাওয়াত। আর্য বেরিয়ে গেলে সাখাওয়াত একটি নম্বর ডায়াল করেন, 'এটা কি রওশন প্লাম্বিং?' 'আপনি কে?'

'আমার একটা নতুন বোরওয়েলের কাজ আছে।'

'এক মিনিট।' কিছুক্ষণ লাইন নিস্তব্ধ থাকার পরে ওদিকে একটা সতর্ক গলার আওয়াজ শোনা যায়, 'জ্যানিটর স্পিকিং!'

'স্ট্যাটাস প্লিজ!'

'আই গেস দে আর অনটু বেদ ভিওয়ানি, বাই নাও!'

২ আগস্ট, ২০১৮, সন্ধেরাত / কলকাতা, ভারতবর্ষ

'ইফ আই মে আস্ক পরীক্ষিৎ, হোয়াট দ্য ফাক ইজ গোয়িং অ্যারাউন্ড হিয়ার?'

বন্ধ ঘরের ভিতরে কথাটা যেন গর্জনের মতো শোনাল! আধুনিক এই কনফারেন্স রুমগুলি তৈরি করানো হয়েছিল নতুন সরকার নির্বাচিত হয়ে আসার পরে পরেই। সব দপ্তরেই তখন কাজ দেখানোর একটা হিড়িক পড়েছিল, যেমন হয় প্রথম প্রথম। কলকাতা পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চও তার ব্যতিক্রম নয়। কোনো একটা ফান্ড অব্যবহৃত হয়ে পড়েছিল। কমিশনারের আগ্রহাতিশয্যে সেটার কিছুটা ব্যবহার করা হয়েছিল মান্ধাতা আমলের কনফারেন্স রুমটাকে কর্পোরেট সেক্টরের আদলে ঢেলে আধুনিক করে সাজাতে।

পুরোটা কাচ দিয়ে ঘেরা। বাইরে থেকে ভেতরটা একটুও দেখতে পাওয়া যায় না। যদিও ভেতর থেকে বাইরেটা পুরোটাই দেখতে পাওয়া যায়। পরীক্ষিৎ তাই আগে থেকেই

ত্রিদিবেশ গোস্বামীকে দেখতে পেয়েছিলেন। ঝড়ের বেগে অফিস করিডোর দিয়ে হেঁটে তিনি এগিয়ে আসছিলেন কনফারেন্স রুমের দিকে। তাঁর রাগে থমথমে মুখের প্রতিটা রেখাও যেন স্পষ্ট পড়তে পারা যাচ্ছিল। তারও আগে, যখন কমিশনার সাহেব তাঁর গাড়ি থেকে পোর্টিকোয় নামলেন, তখনও গাড়ি থামার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর সশব্দে দরজা খুলে বেরিয়ে আসাও দেখা যাচ্ছিল এই কনফারেন্স রুমের মনিটরিং স্ক্রিনে চোখ রাখলে। তাই পরীক্ষিৎ প্রস্তুত হয়ে নিচ্ছিলেন মনে মনে, ঝড়ের জন্য। যদিও ঘরে উপস্থিত বাকিদের সেটা বলার সময় পাননি।

মাত্র দশ-বারো সেকেন্ড! তার মধ্যেই ঝড় আছড়ে পড়েছিল কনফারেন্স রুমের দরজায়। সপাটে দরজা খুলে ঢুকে, কলকাতা পুলিশ কমিশনার, শ্রী ত্রিদিবেশ গোস্বামী নিজের স্বভাবসিদ্ধ বৈষ্ণবোচিত বিনয় ছেড়ে ফেটে পড়েছিলেন প্রচণ্ড ক্রোধে, 'ইফ আই মে আস্ক পরীক্ষিৎ, হোয়াট দ্য ফাক ইজ গোয়িং অ্যারাউন্ড হিয়ার?'

ঘরের বাকিরা স্তম্ভিত হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে পড়েছিল তটস্থ হয়ে। এক জন বাদে। সেই ভদ্রলোক শুধু কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলেন এক বার। অরুণ সচদেভ! এক বার অরুণ আর এক বার ত্রিদিবেশের দিকে তাকিয়ে পরীক্ষিৎ কথোপকথনের ব্যাটনটা নিজের হাতেই তুলে নিলেন, 'স্যর, এক মিনিট। আমি সব এক্সপ্লেন করছি। আগে আপনার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই এঁদের...' তার কথা কেটে মাঝপথেই কমিশনার আবার বলে উঠলেন, 'কী এক্সপ্লেন করবে তুমি, অ্যাঁ? আমার শহরে পিএম আসছেন, তাঁর সিকিউরিটির ওপর এত বড় একটা থ্রেট আর সেটা আমায় জানতে হচ্ছে পিএমও থেকে? শুধু আমিই নয়, ইট সিমস অ্যাডিশনাল কমিশনার, ডেপুটি কমিশনার, অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার— আই মিন, নোবড়ি, নোবডি নোজ এ থিং অ্যাবাউট ইট। হু গেভ ইউ দ্য অথরিটি পরীক্ষি? হু দ্য ফাক গেভ ইউ দ্য অথরিটি টু আন্ডারমাইন দ্য চেন অফ কম্যান্ড?'

'আই ডিড!'

ত্রিদিবেশের উত্তপ্ত গলার বিপ্রতীপে ঘরেরই এক কোণ থেকে ভেসে আসা ঠান্ডা গলাটা আলাদা করে কানে ঢুকল সবার। একটু থমকে গেলেন ত্রিদিবেশও। এই গলা শুধু নিরুত্তাপ নয়, একটা নিশ্চিত্ত কর্তৃত্বের প্রত্যয়ও আছে এই স্বরে। যেন এতক্ষণ দাবার বোর্ডে দাপিয়ে বেড়াচ্ছিল একা কালো ঘোড়া এবং এই সবে নড়েচড়ে বসল সাদা মন্ত্রী। এক বার ঘরের চারিদিকে দ্রুত চোখ বুলিয়ে বক্তাকে খুঁজতেই সহজেই তাকে দেখতে পেলেন ত্রিদিবেশ। মধ্যবয়স্ক, মাঝারি দেখতে এক জন মানুষ। লম্বা টেবিলের এক মাথায় তখনও বসেই আছেন অরুণ সচদেভ। তার দিক থেকে চোখ না সরিয়ে ত্রিদিবেশ বললেন, 'অ্যান্ড হু আর ইউ?'

'ইট উড সাফাইস টু সে, আই অ্যাম দ্য ওয়ান হু উইল রান দ্য শো হিয়ার!' অরুণের কথা শেষ হতে-না-হতেই পরীক্ষিৎ নিঃশব্দে একটি চিঠি বাড়িয়ে ধরেন কমিশনারের দিকে। পিএমও-র করেসপন্ডেন্স! হাই প্রায়োরিটি! অরুণ বলে চলেন, 'অধস্তনদের ওপর হম্বিতম্বি করার বদলে যদি আপনি আপনার টেবিলে পড়ে থাকা পুরোনো না খোলা চিঠিপত্রগুলোর দিকে চোখ বোলাতেন, তাহলে আজকে আপনিও গোড়া থেকেই এই ঘরে থাকতেন আর এত উত্তেজিতও হতে হত না।'

এক ঝলক চিঠিটার দিকে চোখ বোলাতেই ত্রিদিবেশের মনে পড়ে গেছে। এই চিঠিটা বেশ কয়েক দিন আগেই উনি পেয়েছিলেন। পড়েওছিলেন। কিন্তু ছিটগ্রস্ত মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে তাল মেলাতে গিয়ে আর খেয়াল থাকছিল না।

ক্ষণে ক্ষণে সেই পাগলা রাজার মত বদলায়। তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে বাকি পারিষদদেরও নিজেদের কাজের ধরন বদলাতে হয়। এই কিছুদিন আগে তিনি বলছিলেন তাঁর ছেলে তাঁকে মারার ষড়যন্ত্র করেছে। অতএব তাকে খোঁজো খোঁজো করে সারা পুলিশ ডিপার্টমেন্টকে উত্যক্ত করে দিলেন। আবার দু-এক দিন ছেলে নিখোঁজ অবস্থায় থাকতেই, তার ড্রাইভারকে মৃত অবস্থায় পাওয়া যেতেই নতুন বাতিক জুড়লেন— কেউ তাঁর ছেলেকে

গুমখুন করেছে এবং এবার তাঁকে গুমখুন করতে চায়। ছেলেকে খুঁজে পাওয়ার পরে লেটেস্ট বাতিক— এসব কেন্দ্রের ষড়যন্ত্র। এই সময় প্রধানমন্ত্রীর সফর রেখে মিডিয়ার সামনে তাঁকে অপদস্থ করার চক্রান্ত চলছে।

এহেন লোকের গুডবুকে থাকতে, নিজের পোস্টিং ও পদমর্যাদা টিকিয়ে রাখতে গেলে অনেক জরুরি আর প্রয়োজনীয় কাজই শেষমেশ করা হয়ে ওঠে না। চিঠিটা পড়তে পড়তেই ত্রিদিবেশের মেজাজের পারা ধাপে ধাপে নেমেছে। ক্রোধের জায়গা নিয়েছে কৌতূহল ও উদ্বেগ।

কাল বাদ পরশু শহরে আসছেন দুই প্রতিবেশি চিরশত্রু দেশের প্রধানমন্ত্রী। শুধু জাতীয় নয়, আন্তর্জাতিক স্তরে এই সফরের গুরুত্ব অপরিসীম। ইতিমধ্যে দেশ-বিদেশের সংবাদপত্র ও বৈদ্যুতিন মিডিয়ার প্রতিনিধিরা দলে দলে ভিড় জমাতে শুরু করেছে। সফরে দুই প্রধানমন্ত্রী যেসব গুরুত্বপূর্ণ জায়গা ছুঁয়ে যাবেন, ইতিমধ্যেই তার দখল নিয়ে নিয়েছে এসপিজি গ্রুপ ও মিলিটারি ইন্টেলিজেন্সের সাদা পোশাকের লোকজন। রাজ্য পুলিশের ওপরেও প্রাণান্তকর চাপ। ঠিক এই মুহূর্তে এসে যখন তিনি জানতে পারছেন যে 'ভাইজান' নামের এক অজ্ঞাতপরিচয় প্রফেশনাল কিলার এই মুহূর্তে স্বাধীন এবং আনমার্কড অবস্থায় ঘুরে বেড়াচ্ছে, তখন আর সময় কোথায় হাতে? দিশাহারা বোধ করেন ত্রিদিবেশ। সেই ঘোর লাগা উদ্‌ভ্রান্ত চোখেই তিনি এক বার পরীক্ষিৎ আর এক বার অজানা লোকটির দিকে তাকিয়ে অল্প স্খলিত স্বরে বলে উঠলেন, 'সো, ইউ মিন, এই ভাইজান কে, কোথায় আছে, এই মুহূর্তে কী করছে— এ বিষয়ে আমরা এখনও কিছুই জানি না?' ভদ্রলোক ভেতর থেকে নড়ে গেছেন, অরুণ সচদেভের বুঝতে দেরি হয় না। তাই মুহূর্তে নিজের সুর পালটে তিনি উষ্ণ সমব্যথী স্বরে বলে ওঠেন, 'আপনি বসুন, মিঃ গোস্বামী। ইউ উইল নিড সাম ক্যাচিং আপ!'

সামনে রাখা একটি চেয়ারে বসে পড়লেন ত্রিদিবেশ গোস্বামী। তাঁর মন তখন ঝড়ে বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের মতো অশান্ত। পরীক্ষিৎ আবার বলেন, 'সবার সঙ্গে একটু পরিচয় করিয়ে দিই স্যর। উনি মিঃ অরুণ সচদেভ। চিঠিতে পড়েইছেন। এই সফরে পিএম-এর ইমিডিয়েট প্রোটেকশন যেমন এসপিজি গ্রুপের হাতে থাকে, তেমনটিই থাকবে। তবে তার বাইরে, স্টেট পুলিশের মেশিনারি এবং আইবি-র সমস্ত কার্যকলাপ এঁর আন্ডারেই হবে, এমনটাই নির্দেশ এসেছে পিএমও-র কাছ থেকে। অর্ডারের কপি অলরেডি আপনার টেবিলে আছে স্যর। ওঁর পাশে যিনি বসে আছেন তাঁর নাম মোনালিসা। উনি 'দৈনিক সত্যবার্তা' কাগজের একজন রিপোর্টার...' রিপোর্টার শব্দটা শোনামাত্রই আবার ত্রিদিবেশের ভুরু কুঁচকে যায়। পরীক্ষিৎ সেটা লক্ষ করেই তাড়াহুড়ো করে তাকে আশ্বস্ত করতে বলে ওঠেন, 'শি ইজ অ্যান ইম্পর্ট্যান্ট উইটনেস টু আওয়ার ইনভেস্টিগেশন অ্যান্ড শি ব্রট আ ক্রুশিয়াল লিড টু। শি হ্যাজ অলসো সাইনড দ্য এনডিএ অলরেডি।'

'ওকে।"

'আমার পাশে যে দুজন এঁরা এসেছেন বারুইপুর থানা থেকে। দে অলসো হ্যাভ ইম্পর্ট্যান্ট লিডস টু শেয়ার। ইনি ওখানকার থানার অফিসার ইন চার্জ, ইনস্পেকটর, প্রদীপবাবু আর ইনি রাজেশ, সাব-ইনস্পেকটর, বারুইপুর থানা। আর এরা আমার টিমের। প্রতিম, নির্মাণ আর জয়দীপ! দে আর এক্সট্রিমলি কেপেবল অ্যান্ড রিসোর্সফুল!

'বেশ।"

'আমি স্যর ছোট করে আপনাকে জানাব আমাদের এতক্ষণের ফাইন্ডিংস! আপনার জানা দরকার। টাইম ইজ প্রাইম, কিন্তু আপনাকে না জানিয়ে কোনো কাজ করতে আমি বা অরুণবাবু কেউই রাজি নই। তবে শুরুতেই একটা কথা বলে নিতে চাই স্যর। আনলাইক হোয়াট ওয়াজ আওয়ার প্রিলিমিনারি অ্যাজাম্পশন, নাও উই হ্যাভ রিজনস টু বিলিভ যে কিলারের টার্গেট আমাদের পিএম নন।'

'দেন?'

অরুণের স্বভাবসিদ্ধ অনুত্তেজিত গলাতেও সংবাদটি বিদ্যুতের মতো আছড়ে পড়ে

কনফারেন্স রুমের ভেতরে, 'ইটস দ্য পাকিস্তানি পিএম, হুম হি ওয়ান্টস ডেড!'

পঞ্চবিংশ অধ্যায়
।।দ্য কিং মুভস।।

২ আগস্ট, ২০১৮, গভীর রাত / নিউ দিল্লী, ভারত

'হ্যালো অখিলেশ!'

'আরে, দাদা! আপনি? একটা মেসেজ ছেড়ে রাখলে আমিই ফোন করতাম। তা এত রাত্রে? এনি প্রবলেম?'

'না না, আমি ভাবলাম দিনের বেলায় তুমি ব্যস্ত থাকবে, ছবি আঁকতে বা কবিতা লিখতে। এখন হয়তো ফাঁকা পাব। তুমি তো পড়ে গিয়ে চোট পেয়েছিলে...

এখন কেমন আছ?'

'ওসব কিছু না, দাদা!

'কিছু না? শুনলাম ক্রাইম ব্রাঞ্চ ইনভেস্টিগেট করছে!'

'হে হে, বোঝেনই তো। শো বিজনেসে আমাদের থাকতে হয়। আপনার চেয়ে ভালো করে কে বুঝবে এসব, বলুন দাদা!'

'আর ছেলে কেমন আছে?'

'কোমায় আছে। ডাক্তার বলছে ডেঞ্জার পিরিয়ড কেটে গেছে। তবে... ছেলেটাকে কেউ চক্রান্ত করে মারল দাদা। কাজটা ঠিক হল না।'

'আঃ! তুমি এই চক্রান্তর কাঁদুনি গাওয়াটা একটু বন্ধ করো তো। ডেঞ্জার তো নেই। তাহলে আর কী? সিম্প্যাথি ভোট বরং বেশি পাবে। সামনে মিউনিসিপ্যালিটি ইলেকশন না?'

'হ্যাঁ দাদা!'

'আর কী? আমাদের ওখান থেকে সন্দীপকে সরানো দরকার। সুবিধের লোক না। তুমি এক কাজ করো, ওকে তুলে নাও...?

'সন্দীপ ঘোষ? কী বলছেন দাদা? আপনাদের রাজ্য সভাপতি!!'

'যা বলছি করো। তোমারও লাভ, আমারও। ওকে দল থেকে বের করার কোনো কারণ তো একটা চাই!'

'কিন্তু কীভাবে দাদা?

'কী মুশকিল! তোমার হাতে পুলিশ, গোয়েন্দা বিভাগ; সন্দীপের তোমার ওপর রাজনৈতিক রাগ আছে— এর পরেও আমি বলে দেব?'

'ইউ... ইউ আর আ জিনিয়াস দাদা! রিয়েলি!'

'হুম। যাক গে, শোনো, তোমাকে যেটা বলার। আমার একটি লোক ওখানে গেছে স্পেশালি অ্যাপয়েন্টেড। নাম অরুণ সচদেভ! অফিসিয়াল অর্ডার অলরেডি বেরিয়ে গেছে। বাট আই পার্সোনালি ওয়ান্টেড টু টেল ইউ, হি মাস্ট হ্যাভ অল দ্য কো-অপারেশন অ্যান্ড সাপোর্ট ফ্রম ইওর স্টেট পুলিশ! এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা সফর, সেটা আশা করি তোমায় নতুন করে বোঝাতে হবে না!'

'তা তো বটেই দাদা। দেশের পক্ষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ!'

'তোমার এবং আমার পক্ষেও বটে। সামনে ইলেকশন! আই নিড দিস টু বি ভেরি স্পেশাল। আর তুমিও ভালোমতোই জানো, তোমার দরজা আর সিবিআইএর মধ্যে ছিটকিনি একটাই... আমি!'

'সে তো বটেই দাদা।' ম্রিয়মাণ শোনায় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী অখিলেশ রায়ের গলা।

'সুতরাং কোনো অন্যথা যেন না হয়। ফর নেক্সট টু ডেজ, ইভেন ইউ শুড ওবে হিম!'

'শিওর দাদা!'

'আর একটা কথা, এটা আন-অফিসিয়াল!' গলাটা একটু নামিয়ে নেন পিএম। যদিও কোনো কারণ নেই। ঘরে একমাত্র শেখরণ। আর তার নির্দেশে এই কলটার কোনো রেকর্ড অফিসিয়ালি লগ করা হচ্ছে না। তবু, ওল্ড হ্যাবিট, ডাই হার্ড! 'আমারই অন্য এক জন ঘনিষ্ঠ

ব্যক্তি, তিনি এই সফরের নিরাপত্তাজনিত কিছু দিক খতিয়ে দেখছেন। অ্যাজ মোর লাইক অ্যান ইন্ডিভিজুয়াল এক্সপার্ট!'

'ওকে।' একটু হলেও আশ্চর্য শোনায় অখিলেশ রায়ের গলা।

'তার এমন একটা কনট্যাক্ট নম্বর রকার, যার থেকে সে সিকিউরিটি রিলেটেড সমস্ত ইনফর্মেশন যখনই দরকার তখনই পাবে। ইট হ্যাজ টু বি সামওয়ান ফ্রম দ্য টপ!'

'ত্রিদিবের নম্বর নিয়ে নিন দাদা। আমি ওকে বলে দিচ্ছি। যা-ই হোক, কমিশনারকে এড়িয়ে তো আর কিছু হবে না।'

'ওকে! দাও।'

'লোকটা কে দাদা? আপনার সেই পেয়ারের সাখাওয়াত, নাকি?' 'ইউ নো অখিলেশ, অ্যাকচুয়ালি ইউ নিড নট নো!'

পাথরের মতো থমথমে মুখে ফোনটা নামিয়ে রাখলেন পিএম। অখিলেশ নামটা জানল কী করে?

তাঁর অভিব্যক্তি দেখে শেখরণ একটু উদ্‌বেগের সুরেই জিজ্ঞাসা করলেন, 'হোয়াট হ্যাপেনড স্যর? এনিথিং রং?'

'হাউ ডিড হি নো অ্যাবাউট রাকেশ? হাউ?' প্রশ্নটা শেখরণের সঙ্গে সঙ্গে নিজেকেও যেন করলেন পিএম।

পিএম-এর শোবার ঘরের লাগোয়া এই ঘরে আলো বেশ মৃদু। শেখরণের চোখের পাতা কি খুব হালকা কাঁপল? বোঝা গেল না, ঠিক।

২ আগস্ট, ২০১৮, সন্ধেরাত / কলকাতা, ভারত

'অ্যান্ড টু টাই দ্য লুজ এন্ড, স্যর— এই দু-তিন ঘণ্টা আগে, মোনালিসা একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পান, তাঁর নিখোঁজ সহকর্মী দেবদীপ্তর ফোন থেকে। তাতে লেখা আছে, 'দ্য বডিগার্ড...'! মেসেজটা কমপ্লিট কিনা বোঝা যায় না। তবে ইট এগেন পয়েন্টস টু দ্য সেম পার্সন, বেদ ভিওয়ানি, দ্য লস্ট অ্যান্ড ফাউন্ড বডিগার্ড অফ অভিজাত রায়!

একটানা প্রায় পনেরো মিনিট কথা বলার পর, পরীক্ষিৎ থামলেন। গোটা ঘরে তখন পিন পড়লেও শোনা যাবে এরকম নিস্তব্ধতা। কমিশনার ত্রিদিবেশ গোস্বামী এবং অরুণ সচদেভ— দুজনেই টেবিলের ওপর কনুইয়ে ভর দিয়ে দু' হাতে নিজের মুখ ঢেকে বসেছিলেন। পরীক্ষিৎ সামনে রাখা জলের গ্লাসের ঢাকা সরিয়ে ঢক ঢক করে পুরো জলটা খেয়ে গ্লাস খালি করে ফেললেন।

ততক্ষণে দু' হাতে ডুবে থাকা মুখ তুলেছেন ত্রিদিবেশ। গম্ভীর স্বরে তিনি বললেন, 'তাহলে আমাদের ওয়ার্কিং হাইপোথেসিসটা কী?'

'আপাতত এটা ধরেই এগোচ্ছি যে, কোনো ইন্টারেস্টেড গ্রুপ থেকে প্ল্যান করে অভিজাতকে কিডন্যাপ করা হয়। দ্য এইম ওয়াজ টু সুইচ দ্য অ্যাকচুয়াল বডিগার্ড বাই এ লুক অ্যালাইক। সিএম-এর ছেলের পার্সোনাল সিকিউরিটি ডিটেলে থাকার সুবাদে বেদ উড হ্যাভ হ্যাড হাইয়েস্ট পসিবল ক্লিয়ারেন্স অ্যান্ড ভেরি ক্লোজ প্রক্সিমিটি উইথ বোথ দ্য পিএমস। সে লিটারালি যা খুশি করতে পারে।'

অরুণ উত্তর দেন বটে, তবে গোটা সময়টাই তাঁর গলায় এক অদ্ভুত অন্যমনস্কতা।

'হুমম। দেন, আসল বডিগার্ডের লাশ কোথায়?'

'স্যর, আমরা দেবদীপ্তর মোবাইল লোকেশন ট্র্যাক করেছি। ধাড়সা বলে একটি জায়গা আছে, হাওড়া জেলায়। এই জায়গাতেই অভিজাতর ড্রাইভার তড়িৎ শীটের ডেডবডি ডিসকভার করেন মোনালিসা। এখানেই দেবদীপ্তর লাস্ট নোন লোকেশন ছিল। লোকাল থানা সেখানে গেছে খুঁজে দেখতে। আই সিনসিয়ারলি অ্যাজিউম...'

'ওকে। কিপ মি আপডেটেড অ্যাবাউট দ্যাট। বাই দ্য ওয়ে— তাহলে এই আইএম

অ্যাঙ্গেলটার কী হচ্ছে? এই যে শামসুদ্দিন না কী বললে, সে যে জামালপুর এক্সপ্রেসে চড়ল, তারই-বা কী হল?'

'এ ব্যাপারে, ডাইরেক্ট ইনভেস্টিগেটিং অফিসারের থেকেই ওঁর বক্তব্য শুনে নিই আমরা, স্যর?'

রাজেশ এতক্ষণ একটা রাবার ব্যান্ড দু' আঙুলে টান টান আটকে একটা কাগজের পাকানো গুলিকে তাতে আটকে গুলতির মতো ছোড়ার চেষ্টা করছিল। খেয়াল করলে দেখা যাবে তার অনতিদূরে রাখা কফিমগের চারপাশে এরকম অসংখ্য কাগজের গুলি। আন্দাজ করা কঠিন নয় যে সে অনেকক্ষণ ধরেই গুলতি প্র্যাকটিস করে যাচ্ছে। আসলে সে ভাবেওনি যে এই মিটিং-এ তার দিকে কোনো প্রশ্নবাণ ধেয়ে আসতে পারে। যেখানে তার বসই একটা-দুটো হ্যাঁ-হুঁ ছাড়া পুরো চুপচাপ— সেখানে সে কোন চুনোপুঁটি!

এখন হঠাৎ তার খেয়াল পড়ল রুমের সব ক'টা চোখ তার দিকেই তাকিয়ে। সে অপ্রস্তুত হয়ে তড়িঘড়িতে রাবার ব্যান্ডটা আঙুল থেকে খুলতে যেতেই সেটা ছিটকে গিয়ে লাগল ঠিক উলটো দিকে বসা কমিশনারের নাকে।

শিট! তাড়াতাড়ি সিট ছেড়ে উঠে সে বলল, 'সরি স্যর, সরি!' সে দিব্যি অনুভব করতে পারছিল প্রদীপবাবুর এক জোড়া গনগনে রক্তচক্ষু তার পিঠের ওপর বর্ষিত হচ্ছে। যদিও আড়চোখে সে দেখে নিয়েছে পরীক্ষিতের ঠোঁটের কোণে একটা খুব খুব হালকা হাসির রেখা। পরীক্ষিৎই তাকে বললেন, 'রাজেশ, তুমি তোমার হাইপোথেসিস বলো।'

'ওকে স্যর!' উৎসাহিত হয়ে রাজেশ মুহূর্তের মধ্যে ভুলে গেল যে সে এইমাত্র কমিশনারের নাকে রাবার ব্যান্ড ছুড়ে মেরেছে। সে বলতে শুরু করল, 'স্যর, আমার মনে হয় শামসুদ্দিন আর বেদ ভিওয়ানি, মানে এই যে ইমপ্ল্যান্ট— এরা কানেক্টেড! তবে এদের সঙ্গে তৃতীয় এক জন কেউ থাকবে, যাকে আমরা এখনও দেখতে পাচ্ছি না। প্রদীপস্যরের কথামতো আমরা মুঙ্গের থানায় এনকোয়ারি করেছিলাম। সেখানে সবচেয়ে বড় যে আর্মস ডিলার– তাকে তার বাড়িতে পাওয়া গেছে, উইথ ফোর ডেডবডিজ!'

'ডেডবডিজ!' নড়েচড়ে বসেন ত্রিদিবেশ। 'কার? কাদের?'

'ওই ডিলারের পোষ্য গুন্ডা! ডিলারকে ইনজিওর্ড অবস্থায় কাস্টডিতে নেওয়া হয়েছে। খুব বেশি কিছু সে বলতে পারেনি এখনও। তবে এইটুকু বলেছে যে দুজন এসেছিল। এক জন শামসুদ্দিন বলে কনফার্ম করেছে, ছবি দেখে। অন্য জনের ব্যাপারে প্রায় কিছুই বলতে পারেনি। চেষ্টা চলছে ডেসক্রিপশন থেকে একটা ছবি আঁকানোর! আমার সন্দেহ, এই যে অজ্ঞাতপরিচয় লোকটি— এর সঙ্গে আমাদের এই রহস্যময় দেহরক্ষীর কোনো সংযোগ নির্ঘাত আছে। জানি না, কীরকম, বাট— আই ফিল আনকমফোর্টেবল নট নোয়িং মোর অ্যাবাউট দিস আননোন ম্যান!' -

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পরীক্ষিৎ যোগ করেন, 'আর স্যর, বাই নাও, আমাদের কাছে কনক্লুসিভ প্রুফ আছে যে, অভিজাতর সঙ্গে ফিরে আসা বেদ ভিওয়ানি এবং অরিজিনাল বেদ ভিওয়ানি আলাদা লোক।'

তার ইশারায় একপাশে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকা প্রতিম এবারে দুটো ফাইল এগিয়ে দেয় ত্রিদিবেশের দিকে। ফাইল দুটো হাতে নিয়ে, বুকপকেট থেকে চশমা বের করে পরতে পরতে ত্রিদিবেশ জিজ্ঞাসা করেন, 'এটা কী?'

'স্যর, একটা বেদ ভিওয়ানির অরিজিনাল বায়োমেট্রিক রেকর্ডস অ্যাজ স্টোরড ইন গভর্নমেন্ট ডেটাবেস আর অন্যটা আমাদের ইমপস্টারের বায়োমেট্রিক রেকর্ড, যা কালেক্ট করা হয়েছে সে সেন্সলেস থাকাকালীন।'

'অ্যান্ড?'

'অ্যান্ড দে আর কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট!'বেশ সন্তুষ্ট ভঙ্গিতে জানান পরীক্ষিৎ। কখনো ছকভাঙা জিনিস পছন্দ করে না। তাদের কাজের অভিজ্ঞতাও বলে, ঘটে যাওয়া বেশিরভাগ ক্রাইমই নির্দিষ্ট প্যাটার্ন মেনেই ঘটে থাকে। ফলে দুয়ে দুয়ে চার হওয়ার সমস্ত পরিস্থিতিই

তাদের খুশি করে।

কমিশনার কিছুক্ষণ মাথা নীচু করে বসে রইলেন। সেই প্রথমে এক বার মুখ খোলার পর অরুণ সচদেভ এখনও অবধি মুখ খোলেননি। তার দিকে তাকিয়ে কমিশনার বললেন, 'তাহলে আপনি কী সাজেস্ট করছেন মিঃ সচদেভ? আমাদের কীভাবে এগোনো উচিত?'

'এ গণপত, চল দারু লা, এ গণপত, চল দারু লা, আইস চালা সোডা কম, থোড়া পানি মিলা...' মিকা সিংয়ের গলা সরগরম করে তোলে আপাতগম্ভীর মিটিং রুমের পরিবেশ। বিব্রত মোনালিসা তাড়াহুড়ো করে কলটা কেটে দেয়।

এক বার অপাঙ্গে তার দিকে তাকিয়ে গলাখাঁকারি দিয়ে অরুণ নড়েচড়ে বসলেন। তারপর পরীক্ষিতের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এনি নিউজ ফ্রম ধাড়সা?' পরীক্ষিৎ তাঁর টিমের দিকে তাকাতেই, নির্মাণ ইশারায় ঘাড় নেড়ে জানায়, না। অরুণ আবার বলেন, 'আর আমরা কি বডিগার্ডটিকে নজরে রেখেছি?'

'একদম, স্যর। প্লেন ড্রেসে একটা ফুল টিম ট্র্যাক করছে তাকে। এখনও সে হসপিটালেই। নিজের বেডে। কোনো মুভমেন্ট হলেই জয়দীপ খবর পাবে। ইন ফ্যাক্ট, শর্টলি হি হিমসেল্ফ ইজ গোয়িং টু জয়েন দেম!'

'গুড। নাও, আ কোয়েশ্চেন টু ইউ ইয়ং ম্যান।' বলে আচমকা অরুণ ঘুরে তাকান রাজেশের দিকে।

আর সঙ্গে সঙ্গে আবার সেই, 'এ গণপত, চল দারু লা, এ গণপত, চল দারু লা...'

মোনালিসা উঠে খুব সংকুচিত গলায় বলে, 'সরি, আই গেস, আমাকে কলটা নিতে হবে। মে আই গো আউট?'

রাজেশের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতেই অরুণ অসম্ভব ধৈর্যের সঙ্গে বলেন, 'ইয়েস প্লিজ!'

মোনালিসা ফোনটা কানে চেপে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। রাজেশের দিক থেকে চোখ না সরিয়ে অরুণবাবু অবশেষে নিজের প্রশ্নটি ছোড়েন, 'মুঙ্গেরের এই যে ডিলারটি, ভাতিজা — এর থেকে শামসুদ্দিন কী ধরনের বন্দুক কিনতে গেছিল, জানতে পারা গেছে?'

রাজেশ অপ্রস্তুতে পড়ে যায়। এই রে। ব্যাপারটা জিজ্ঞেস করার কথা তো একেবারেই মাথায় আসেনি। সে লজ্জিত হয়ে না-সূচক ঘাড় নাড়ে। অরুণ উত্তেজিত না হয়েই বলেন, 'আই থিংক, মিঃ কমিশনার, উই নিড টু ফাইন্ড দ্যাট!''

'আমি একটা কথা বলি, অরুণবাবু?' ত্রিদিবেশের গলা সিনসিয়ার শোনায়। 'বলুন!'

'স্পষ্টতই আপনি এই ব্যাপারটি অনেক বেশিদিন ধরে ফলো করছেন। আর বোঝাই যাচ্ছে পিএমও-র ইচ্ছা এতে আপনাকে ফ্রি-হ্যান্ড দেওয়া হোক। তাই, আমি প্রস্তাব দিচ্ছি, এই অপারেশনটা আপনিই লিড করুন। পরীক্ষিৎ আর ওর টিম আপনাকে হেল্প করবে। হি ইজ দ্য বেস্ট উই হ্যাভ!'

মনে মনে হাসলেন অরুণ। এখন যা সিচুয়েশন— যে দায়িত্বে থাকবে তার অবস্থা টাইব্রেকারে শট মারতে যাওয়া প্লেয়ারের মতো। গোল করতে পারলে, কোনো কৃতিত্ব নেই, কারণ ইউ আর স্যাপোজড্ টু ডু দ্যাট! আর গোল মিস করলে... হয়েই গেল। তাই কায়দা করে ধুরন্ধর কমিশনার নিজের ঘাড় থেকে বন্দুকটি নামাতে চাইছেন। নো প্রবলেম। অরুণ এই কাজটিই করতে এসেছেন। আর সত্যি কথা বলতে কী, পুলিশের জুরিসডিকশনাল লড়াইতে ফেঁসে ইনভেস্টিগেশনকে এক সেকেন্ডও দেরি করাতে চান না তিনি।

ঘাড় নেড়ে সায় দিয়ে তিনি সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'বেশ, তাই হোক। থ্যাংকস! রাজেশ, প্রদীপবাবু— আপনারা আমাকে এই ইনফর্মেশনটা যত শিগগিরই সম্ভব এনে দিন, সেদিন শামসুদ্দিন ও তার সঙ্গী কী কিনতে গেছিল?'

'ওকে স্যর।' এতক্ষণে প্রথম কথা বললেন প্রদীপবাবু। তারপর রাজেশকে সঙ্গে নিয়ে ধীর পায়ে বেরিয়ে যেতে যেতে শুনলেন, অরুণ বলছেন, 'দিস উইল বি মাই অফিস, আনটিল ফারদার নোটিস! আপনারা এখানেই যোগাযোগ করবেন এসে।'

ঘাড় নেড়ে সম্মতি দিয়ে বেরিয়ে গেলেন বারুইপুর থানার সর্বময় কর্তা। তাঁর অত বড় বেআইনি অস্ত্র তৈরির চক্র ধরার সাফল্যের কথা আজ পেছনের সারিতে। তবে তাতে তাঁর কোনো দুঃখ নেই। কেমন একটা উত্তেজনা অনুভব করছেন আবার, চাকরিজীবনের প্রথম দিককার মতো।

অরুণ ঘুরলেন পরীক্ষিতের দিকে। 'পরীক্ষিৎ, আই নিড সেভেরাল থিংস টু বি ডান, একইসঙ্গে।'

চট করে ঘাড় ঘুরিয়ে নিজের টিমের দিকে তাকিয়ে পরীক্ষিৎ বললেন, 'নো প্রবলেম স্যর। আই হ্যাভ পিপল! আপনি বলুন।'

'ফার্স্ট— পরশুর ফুল ইটিনিরারি থেকে পাবলিক অ্যাপিয়ারেন্সের লিস্টগুলো বার করুন। তার আশেপাশে দেড়-দু' কিলোমিটার দূরত্বের মধ্যে একটু লেগওয়ার্ক করতে হবে। এনিথিং আনইউজুয়াল, এনিথিং আউট অফ অর্ডিনারি— শুড বি রিপোর্টেড টু ইউ অ্যান্ড টু মি। যত জন খুশি লোক ডিপ্লয় করুন। ট্রাই অ্যান্ড কভার অ্যাজ মাচ গ্রাউন্ড অ্যাজ পসিবল!'

'শিওর স্যর। প্রতিম, নির্মাণ...' 'উই আর অন ইট স্যর!'

পরীক্ষিতের মুখের কথা খসামাত্র তার দুই তরুণ তুর্কি বেরিয়ে গেল কনফারেন্স রুমের দরজা ঠেলে। সেই সময়েই ফোন বেজে উঠল কমিশনারসাহেবেরও। তিনিও 'এক্সকিউজ মি' বলে রুমের বাইরে পা রাখলেন। সেদিকে এক মুহূর্তমাত্র তাকিয়ে থেকে অরুণ আবার বললেন, 'একজন কেউ চাই, যে শুধু বেদ ভিওয়ানি নয়, সিএম ও তার ছেলের বাকি সমস্ত বডিগার্ডদের চেক করবে। আমি নিশ্চিত করে জানতে চাই, যে বেদ-ই একমাত্র ইম্পার্সোনেটর কিনা।"

'জয়দীপ!'

'ওকে স্যর!' ধুস! একদম ভাল্লাগে না জয়দীপের, এই সমস্ত কাগজপত্র ঘাঁটার কাজ। পরীক্ষিৎস্যর ভালোমতোই জানেন যে জয়দীপ ওই প্রতিম বা নির্মাণের চেয়ে রাস্তার কাজ, লেগ-ওয়ার্ক অনেক ভালো করতে পারবে। কিন্তু শালা, শোধ নিচ্ছে মাইরি। ওই একটা একটুখানি ক্যাচাল করে ফেলল সে উকিলের ব্যাটাকে পেঁদিয়ে— তারই শোধ তুলছে। মরুক গে যাক। মুখ বেজার করে জয়দীপও বেরিয়ে যায় কনফারেন্স রুম থেকে।

ইতিমধ্যে ঘরে ফিরে এসেছেন কমিশনার-সাহেব। অরুণ এবারে পরীক্ষিতের দিকে তাকিয়ে বলেন, 'নাও— অর্ডার ইওর মেন টু উইথড্র ফ্রম ট্র্যাকিং দ্য বডিগার্ড! মাই টিম ইজ অলরেডি দেয়ার!'

'হো... হো... হোয়াট, স্যর?'

হঠাৎ এইরকম আশ্চর্য ইন্সট্রাকশন পেয়ে রীতিমতো চমকে যান পরীক্ষিৎ। তিনি বলেন, 'কিন্তু স্যর...'

'কোনো কিন্তু নয় পরীক্ষিৎ। আপনার লোকজন এই ব্যাপারে খুব একটা প্রফেশনাল নন। ইজিলি স্পট করা যায়। আমার সন্দেহ আমাদের বডিগার্ডও তা করতে পেরেছেন। তাই এখনও পর্যন্ত তার কোনো মুভমেন্ট নেই।'

'ওকে স্যার।'

ফোন কানে দিয়ে ঘরেরই একটি কোণে সরে গেলেন পরীক্ষিৎ। অরুণ কমিশনারের দিকে ফিরে কিছু বলার আগেই দেখা গেল রাজেশ দৌড়ে আসছে করিডোর দিয়ে। কৌতূহলী চোখে সেদিকে তাকিয়ে রইলেন অরুণ। দু-তিন সেকেন্ডের মধ্যে কনফারেন্স রুমের দরজা সজোরে খুলে ভেতরে ঢুকে পড়ল রাজেশ। বেশ ভালোরকম হাঁপাচ্ছে সে। এইটুকু দৌড়ে তো এত হাঁপানোর কথা নয়। কোনোমতে দম নিয়ে যখন সে কথা বলল, তখন বোঝা গেল, তার হাঁপানির কারণ দৌড়ের ক্লান্তি নয়, খবরের অভিঘাত। 'স্যর, দ্য ডিলার— মুঙ্গের পুলিশ কনফার্ম করল, দ্য ডিলার সোল্ড দেম আ ম্যাকমিলান ট্যাক-৫০!!'

'ফাক!' একযোগে বলে উঠলেন কমিশনার এবং পরীক্ষিৎ।

অরুণ সম্মোহিতের মতো সামনের দিকে চেয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। খুব মৃদু গলায়

বললেন, 'আই সাসপেক্টেড অ্যাজ মাচ!'

২ আগস্ট, ২০১৮, গভীর রাত / কলকাতা, ভারত

ওয়ার্ডে একটাই আলো জ্বলছে। কম শক্তির সাদা আলো। যদিও হাঁটা-চলা করার জন্য তা যথেষ্ট। বিছানায় শুয়ে থাকা বডিগার্ড নিঃশব্দে চোখ খুলল। মাথার বালিশের পাশেই নিজের হাতঘড়িটা রাখা আছে। চোখ বুলিয়ে দেখা গেল পৌনে তিনটে বাজে।

এটাই সঠিক সময়। এই ভোররাত্রে মানুষের ঘুম সবচেয়ে গাঢ় হয়ে আসে। সারারাত সতর্ক জেগে সেবা করছে যে মানুষগুলি— তারাও যে যেখানে পারে শরীর মেলে এখন একটু আরাম শুষে নিচ্ছে। কেউ নিজের চেয়ারে। কেউবা ফাঁকা স্ট্রেচারে। চূড়ান্ত সজাগ, তীক্ষ্ণ মানুষটিও এখন একটু আলগা, একটু অসতর্ক!

বডিগার্ড নিঃশব্দে উঠে বসে নিজের বেডে। হালকা ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ উঠল। কিছুক্ষণ সে অপেক্ষা করল। ঘরের মধ্যেকার দুজন নার্স ঝিমোচ্ছে টেবিলের ওপারে নিজেদের চেয়ারে বসে বসেই। তারা একটুও নড়ল না। একটু দূরে একটা ছোট্ট কাচঘেরা কেবিনে আলো জ্বলছে। সেখানেও অন ডিউটি ডাক্তারবাবু চেয়ারে হেলান দিয়ে হাঁ করে ঘুমোচ্ছেন।

বিছানা থেকে নেমে সে খুব স্বাভাবিক ভঙ্গিতে বাথরুমের দিকে এগিয়ে গেল। এই সময় কমবয়েসি নার্সটি একটু সচকিত হয়ে উঠল। এদের কোনো একটা সেন্স থাকে। চট করে চোখ খুলে সে রোগীকে বাথরুমের দিকে যেতে দেখেই উঠে দাঁড়াতে গেল। বডিগার্ডটি তাকে হাত তুলে নিরস্ত করল। হাতের ইশারাতেই বোঝাল যে সে একাই যেতে পারবে। বাথরুমের দরজার সামনে গিয়ে সে সুইচবোর্ডে হাত দিল আলো জ্বলবে বলে।

রোগী সত্যিই এমনিতে সুস্থ। নেহাত মুখ্যমন্ত্রীর ছেলের বডিগার্ড, তাই। নাহলে এই কন্ডিশনের রোগীকে ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিটে রাখা হয় না। তাই নার্স আবার নিশ্চিন্ত হয়ে চেয়ারে এলিয়ে বসলেন। চোখ বুজে ফেলার আগে অভিজাতর মনিটরের দিকে এক বার চোখ বোলালেন। ভাইটালস সব ঠিকই আছে। যদিও রোগী এখনও কোমায়! দীর্ঘশ্বাস ফেলে নার্স চেয়ারের পিঠে মাথাটা হেলিয়ে দিলেন।

ঠিক সেই সময় সাৎ করে পেশেন্টদের নির্দিষ্ট বাথরুমের সামনে থেকে সরে বডিগার্ডটি ঢুকে গেল তার পাশেই স্টাফ বাথরুমে। তিরিশ সেকেন্ড কী বড়জোর এক মিনিট। তার পরে ঠিক তেমনি নিঃশব্দে দরজা খুলে যে বেরিয়ে এল তার পরনে সাধারণ প্যান্ট-শার্ট। প্যান্টটা দেখলে বোঝা যায় একটু ছোট। যাক গে! এখন এখান থেকে বেরোনোটাই প্রথম কাজ।

এদিক-ওদিক দেখল এক বার বডিগার্ড। চোখে পড়ল বাথরুমের দরজার সামনেই একটা ছোট্ট আয়না। সেখানে কিছু ক্লিপ আর একটা হেয়ারব্যান্ড। কোনো নার্সেরই হবে। আরও কুড়ি সেকেন্ড। হাঁটতে হাঁটতেই ক্লিপ আর হেয়ারব্যান্ড দিয়ে এলোমেলো চুল হয়ে গেল যেন জেল-চর্চিত ব্যাকব্রাশ। বেরোনোর মুখে অভিজাতর বেডের পাশেই একটা টুলের ওপর রাখা একটা ট্রে। তারপর কিছুটা তুলোর বাণ্ডিল, একটা কাঁচি, দু-একটা টুকিটাকি ওষুধের ভায়াল। সেটা হাতে নিয়ে ধীর-অচঞ্চল পায়ে বেরিয়ে এল সে। দরজা দিয়ে দেখা যাচ্ছে সামনে বসে থাকা দুজন গার্ডও ঝিমোচ্ছে।

মনে মনে সে নিজেকে বলল— দৌড়োনো চলবে না। তাকে ট্রেনিংএর সময় পইপই করে শেখানো হয়েছে— যে কোনো জায়গায়, যে কোনো পরিস্থিতিতে দৌড়োতে থাকা মানুষ সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আর এই মুহূর্তে তার প্রথম উদ্দেশ্যই হল লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ না করা। বেরিয়ে সে করিডোর ধরে যেতে থাকল ভেতর দিকে। ওই দিকে একটা নিরালা বারান্দা আছে, সে জানে। হসপিটালের কিছু বাতিল জিনিসপত্র জড়ো করে রাখা হয়

সেখানে। ওখানটায় কোনো ক্যামেরা নেই। ওইখানেই একটা গ্রিল আলগা করে রাখা আছে তার জন্য!

একজন গার্ডের চোখ খুলে গেল। হাতে ওষুধপত্রের ট্রে নিয়ে একটা গ্রুপ ডি স্টাফ কোথায় একটা যাচ্ছে। নাথিং অ্যালার্মিং! নাথিং ইন্টারেস্টিং!!

মাত্র মিনিট পাঁচ-সাত। এস. এস. কে. এম.-এর মেন গেট দিয়ে চুল পাট পাট করে আঁচড়ানো একটা লক্কা-পায়রা টাইপের ছেলে শিস দিতে দিতে বেরিয়ে মিশে গেল সামনের রাস্তায়।

সে খেয়াল করেনি। মেন গেটের একটু ভেতরেই একপাশে পার্ক করে দাঁড়িয়ে আছে একটা ট্যাক্সি। ওই সাদা, মোবাইল অ্যাপে বুক করা ট্যাক্সি। খেয়াল করার মতো জিনিসও নয়। বডিগার্ড চোখের আড়ালে যেতেই সেই ট্যাক্সির ভেতরে পেছনের সিটে শুয়ে থাকা একটি ছেলে তার মুখের কাছে ঝুলতে থাকা হ্যান্ডসফ্রিতে কাউকে জানাল, 'টার্গেট ইজ অন দ্য মুভ! রবীন্দ্রসদনের দিকে হাঁটছে। টিম টু, ইউ আর আপ।'

হসপিটাল থেকে বেশ অনেকটা দূরে একটি বিল্ডিং-এর ভেতরে কনফারেন্স রুমে তখনও ঝকঝকে আলো৷ টেবিল ঘিরে বসে আছেন অন্তত তিন-চার জন। সামনে রাখা স্পিকারে তারাও শুনতে পেল এই কথোপকথন।

মৃদু ঘাড় নাড়লেন অরুণ! তারপর বললেন, 'কিপ মি পোস্টেড, গাইজ!'

ষড়বিংশ অধ্যায়
।। দ্য ট্র্যাপ ক্লোজেস ইন।।

৩ আগস্ট, ২০১৮, দুপুর / নিউটাউন, কলকাতা, ভারত

‘ডাক্তার এর’ম বলে দিল? এরা মানুষ না পিচাশ গো?’

‘তাহলে আর বলচি কী? ওই রাত্তে আমি কোথায় রক্ত পাই বলো তো, ভাই?'

‘তা পব্লেমটা কী বলছিল?'

‘আমি কি ছাই পষ্ট বুঝি? কীসব বলছিল রক্ত-পেলেট কমে গ্যাচে! ‘ইশ! তা, শেষমেশ রক্ত পাওয়া গেল তো? ভালোয় ভালোয় অপারসন মিটল তো?’

‘হ্যাঁ, তা মিটল! নারনার বাবা পঞ্চানন্দর কাছে মানত করেছিলুম! বাবা ভীষণ জাগ্গত!’

‘হ্যাঁ, এটা একদম ঠিক বলেছ নিতাইদা! আমিও তো সেই বাবার কাছেই মানত করে এসেছিলুম, যে একটা চাকরি জুট্যে দাও, না হলে লাইনে মাথা দেব। তা দেখ, ঠিক পেয়ে গেলুম। একটাই পব্লেম—কোথাও একটা থাকার জায়গা চাই কাছাকাছির মদ্যে! তা, তুমি তো বলচ এখানে জায়গা নেই... নাকি? কী বলচ বলো...’

‘না গো! থাকার জায়গা হবে না! বললুম না! এখানে সব ফুল। তা ছাড়াও, এখানে ভাড়া পাওয়া কি অত সোজা নাকি? আঁধার কাট, ভোটার কাট— কত কিছু জমা দিতে হবে। সইসাবুদ করতে হবে। সব বড় বড় লোকের ফেলাট! যে কাউকে কি দেবে নাকি এরা? এ কি আমাদের ভগবতীপুরের রতন স্যাকরার বাড়ি পেয়েছ নাকি, হেঁ... হেঁ...ফচু ব্যাটা গেল বউদির রুপোর ট্যাক-ঝাপটা করাতে, আর রতনের মেয়েকে বিয়ে করে চলে এল... হে... হে... হে... খোঁজখবর, তত্ত্বতালাশের কোনো ব্যাপারই নেই... হেঁ... হেঁ.........’

ছেলেটা অনেকক্ষণ থেকেই উশখুশ করছিল। অল্পবয়সের ছেলে তো। বিড়ি-ফিড়ি খাবে হয়তো। ফাঁক খুঁজছে। কিন্তু নিতাই এই নির্বান্ধব পুরীতে দুটো কথা বলার লোক পায় না সহজে। এক বার পেলে তাই ছাড়তে চায় না। বউও বলে, ও একটু বেশিই কথাত্তে আছে। নিতাইয়ের দমকে দমকে হাসির ফাঁকে ছোকরা সুযোগ পেয়ে বলে উঠল, ‘আচ্ছা, তাহলে আমি একটু এদিক-ওদিক দেখি দাদা! বুঝলে? আসচি আবার কিছুক্ষণের মদ্যে!’

‘হ্যাঁ, হ্যাঁ— এসো, এসো।'

ছেলেটা বাড়িটা থেকে বেরিয়ে এল। উফ, কী বকবক করতে পারে রে বাবা লোকটা। সেই কখন খবর বেরিয়ে গেছে— এই বিল্ডিং-এ কোনো নতুন লোক নেই। সব রিটায়ার্ড সরকারি চাকুরে বা বয়স্ক আইটি প্রফেশনাল। এখানে সব ভিজিটরদের রেকর্ড রাখা হয়। গেটে একটা টাইমে অন্তত চার জন গার্ড। কোনো ফাঁক দিয়েই একটা অচেনা লোকের এই বাড়িতে ঢুকে পড়া চাপ। তারপরও প্রায় পাঁচ-দশ মিনিট নষ্ট করতে হল। যত্তসব ভাট বকুনির আড়ত!

এখানে যে কিছু পাওয়া যাবে না এটা ওর আন্দাজ ছিল। এই সব বাড়িতে কোনো অচেনা মানুষের ঢোকা খুব চাপ। শামসুদ্দিনের যে কনট্যাক্ট, সে নিশ্চয়ই অনেক খোঁজখবর করেই ওই অ্যাপার্টমেন্টটা জোগাড় করেছিল। যে এলাকাটা ওর ভাগে পড়েছে, সেখানে এইরকম অ্যাপার্টমেন্টের সংখ্যাই বেশি।

যখন সে রাস্তায় নেমেছিল, প্রথমেই চারপাশটা দেখে মনে মনে একটু দমে গেছিল। শয়ে শয়ে বাড়ি, হোটেল, মল, হাসপাতাল চারপাশে। হাতে সময় মাত্র কয়েকটা ঘণ্টা। এর মধ্যে কোথায় খুঁজবে আর কীই-বা খুঁজবে ও? কী ধরনের অ্যানোমালি খুঁজছে, সেটাই তো স্পষ্ট নয়। সাখাওয়াতস্যরও একদম নিশ্চিতভাবে জানেন না, যে ওরা কীসের খোঁজ করে চলেছে। এই সব ক্ষেত্রে প্রায় পুরোটাই ইনটুইশনের ওপর নির্ভর করতে হবে। কিন্তু এতগুলো জায়গায়! এ অন্তত এক সপ্তাহের কাজ বলে মনে হচ্ছিল।

মনে পড়ল ট্রেনিং-এর সময় ওদের ট্রেনার ভি. কে. চৌহানের বলা কথা। আসল

ডিটেকশন, গোয়েন্দাগিরি— মোটেই গল্পে যেরকম পড়া যায় তত রোমাঞ্চকর, উত্তেজনাময় নয়। তার বেশিরভাগটা জুড়ে থাকে ক্লান্তিকর, একঘেয়ে খোঁজার কাজ। অভিজ্ঞতা আর ঠান্ডা মাথা সেই কাজকে বিন্দুমাত্র সহজ করে না। শুধু কাজকে অ্যাপ্রোচ করার ধরনটা গুছিয়ে দেয়।

হলও ঠিক তেমনটাই। প্রাথমিক ধাক্কা সামলে, রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতেই ওর হিসেবি মন এলিমিনেশন প্রসেস শুরু করল। বিশ্ব বাংলা গেট পঞ্চান্ন মিটার উঁচু। একটা বহুতল বিল্ডিং-এর এক-একটা তলার উচ্চতা গড়ে তিন থেকে চার মিটার হয়। সেই হিসেবে মোটামুটি বারো থেকে আঠেরো তলার বহুতল বাড়িগুলোই একজন স্নাইপারের টার্গেট হবে। সুতরাং তার চেয়ে কম উচ্চতার বিল্ডিংগুলো বাদ।

দুই প্রধানমন্ত্রীর নিজস্ব সিকিউরিটি আছে। স্ট্যান্ডার্ড সিকিউরিটি প্রোটোকল মেনেই অন্তত দেড় কিলোমিটার রেডিয়াসের মধ্যে সমস্ত এই ধরনের বহুতলের ছাদে এসপিজি-র নিজস্ব স্নাইপার অলরেডি পোস্টেড থাকবে। সুতরাং সেগুলোও বাদ দেওয়াই যায়। টু ভালনারেবল! যে লোককে তারা খুঁজছে, সে অত কাঁচা, ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করবে বলে মনে হচ্ছে না।

চলতে চলতেই হাতের ফোনে ম্যাপটা খুলে নিজের এলাকাটা আরেক বার দেখে নিয়েছিল সে। এক কিলোমিটার রেডিয়াসের বাইরের এলাকাটা স্ক্যান করতে হবে। সেখান থেকে শুরু করে দু' কিলোমিটার রেডিয়াস পর্যন্ত অন্তত! যদিও ট্যাক ৫০-র রেঞ্জ প্রায় আড়াই থেকে পৌনে তিন কিলোমিটার— কিন্তু কিল কনফার্ম করার জন্য স্নাইপার তার দূরত্ব যতটা সম্ভব কম রাখতে চাইবে। পরে প্রয়োজনে না হয় খোঁজার পরিধি বাড়ানো যাবে। আপাতত সে লক্ষ্যস্থির করেছিল এক থেকে দুই কিলোমিটারের মধ্যে থাকা এমন বহুতল যার উচ্চতা বারো থেকে আঠেরো তলার মধ্যে।

তা, তার সংখ্যাও কম নয়। গত চার ঘণ্টায় সে অন্তত পনেরোটা এরকম বিল্ডিং-এ তত্ত্বতল্লাশ চালিয়েছে। কমার্শিয়াল বিল্ডিং অর্থাৎ হোটেল, মল, অফিস— এই সব জায়গায় সিকিউরিটি থাকলেও তা লঙ্ঘন করা সহজ। কারণ সব জায়গাতেই প্রচুর বাইরের লোকের যাতায়াত। আবার রেসিডেন্সিয়াল বিল্ডিংগুলোতে সিকিউরিটি খুব টাইট না হলেও সব চেনা লোকের বসবাস। একে-অপরের মুখ চেনে, তাই অচেনা লোকের, নতুন লোকের নজরে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা ষোলো আনা। তবু কোনো জায়গাই বাদ দেওয়া যায় না। যদি শামসুদ্দিন তার জন্য একটা আস্তানা জোগাড় করে দিতে পারে, তাহলে এটা ভাবার কোনো কারণ নেই যে, যে বা যারা এই আক্রমণের পরিকল্পনা করেছে, তারাও সেরকম পারবে না।

তাই, গাফিলতির কোনো জায়গা নেই। এক এক করে সমস্ত বিল্ডিং-এ বিভিন্নরকম কায়দায় সে ওপরের তিনটি তলায় উঠে উঠে দেখেছে। উদ্দেশ্য— ক্লিয়ার লাইন অফ সাইট পাওয়া যায় কিনা বিশ্ব বাংলা গেটের, সেটা দেখা। যে কোনো দূরপাল্লার শুটিং-এর যেটা আবশ্যিক শর্ত। যেখান থেকে তা পাওয়া যাচ্ছে না, সেই সব স্পটগুলো স্বাভাবিকভাবেই বাদ। সময়সাপেক্ষ কাজ। ক্লান্তিকরও বটে।

যদিও তার কাছে এসব শারীরিকভাবে ক্লান্তিকর নয়। বালুচিস্তানের পঞ্চাশ ডিগ্রি টেম্পারেচারে বালির ঝড়ের মধ্যে মাইলের পর মাইল হেঁটে যাওয়া, প্রতি মুহূর্তে পাকিস্তানি আর্মি বা আইএসআই-এর হাতে ধরা পড়ার ঝুঁকি নিয়ে সেই প্রতিকূলতম পরিস্থিতিতে নকল পরিচয়ে দিনের পর দিন বাস করা— সেসবের কাছে এ তো বাগানে প্রাতঃভ্রমণের মতোই সহজ।

কিন্তু হাতে সময় বড় কম। চার ঘণ্টাতেও একটাও এমন জায়গা পায়নি, যা স্নাইপার হিসেবে তার পছন্দ হত। আর যত সময় গড়িয়ে যাচ্ছে, এই খোঁজাখুঁজিকে যত বিফল, ভুল রাস্তা মনে হচ্ছে, ততই ক্লান্তি চেপে বসছে যেন তার শরীরে। খিদেও পেয়েছে বেশ। এই নিতাইদা লোকটির সঙ্গে বকবক করে যেন চেপে রাখা খিদেটা চাগাড় দিয়ে উঠেছে।

হাঁটতে হাঁটতে সে একটা হোটেল পেরিয়ে এল। অভ্যাসবশত এক বার মাথা তুলে

দেখল হোটেলটা। হুম। ক্যান্ডিডেট ভেন্যু! আন্দাজ পনেরো-যোলো তলা উঁচু। কিন্তু এখন এখানে ঢোকা যাবে না। মাথা কাজ করছে না। ট্রেনার-স্যর বলেছিলেন— একজন এজেন্টের সবচেয়ে বড় শত্রু হচ্ছে খিদে আর ক্লান্তি। সো, টেক এনাফ রেস্ট এন্ড টেক প্লেন্টি অফ গুড ফুড! অতএব আগে খাওয়া যাক।

পাঁচ তারা হোটেলটার গা ঘেঁষে একটু এগোলেই একই ফুটপাথে সারি সারি ঝুপড়ি হোটেল। সবরকমের খাবার-দাবারই পাওয়া যায়। তারই মধ্যে একটাতে ঢুকে সে একটা ফাঁকা টেবিল দেখে বসে পড়ল। মোটামুটি লাঞ্চের টাইম। টেবিলগুলোর সব ক'টাতেই ভিড় আছে মোটামুটি। এই টেবিলটা সদ্য ফাঁকা হয়েছে। পড়ে থাকা এঁটো থালাগুলো দেখেই বোঝা যাচ্ছে। একটা বাচ্চা ছেলে থালাগুলো সরিয়ে নিতে এসে জিজ্ঞেস করল, 'কী লেবেন, স্যার!'

'কী পাওয়া যাচ্ছে?'

'ভাত, ডাল, বাঁধাকপি, সয়াবিন, মাছ, চিকেন, মটন সব পাওয়া যাবে।'

'থালি পাওয়া যায় না?'

'যাবে স্যার!' হাতের কাজ মেটাতে মেটাতেই জবাব দিল ছেলেটা। 'তাহলে একটা ভেজ থালি দাও। আর একটা টক দই।'

'ওকে স্যার!'

এঁটোকাঁটা পরিষ্কার করে, টেবিলটা একটা তেলচিটে ন্যাকড়া দিয়ে মুছে দিয়ে ছেলেটা চলে যায়। টেবিলে রাখা জলের জগ থেকে গেলাসে জল ঢেলে একটু একটু করে চুমুক দিতে দিতে সে শুনতে পায়, পাশের টেবিলে বসে থাকা ছেলে-মেয়ে দুটির কথোপকথন। কেন যে সেদিকে কান গেল সে ঠিক বুঝতে পারে না। হয়তো হাতে কোনো কাজ ছিল না, তাই.......

'আমি তোকে বাজি ফেলে বলছি সব হুইলচেয়ারেই থাকে। থাকতে বাধ্য। আমাদের দেশে কি সব জায়গা হুইলচেয়ার অ্যাক্সেসিবল নাকি?'

'আর, আমিও বাজি ফেলতে পারি, এই লোকটার ছিল না!' 'তাতে কী? রুমে রেখে গেসল হয়তো!' 'তার মানে যেখানে গেছিল সেখানে ক্রাচ লাগে না বলছিস?' 'নিউটাউনের সব মলেই র‍্যাম্প আছে। না লাগতেই পারে।' 'কিন্তু এ গেছিল সামনের স্টোরটায়। কোনো মলে নয়। অন্তত এর তাই বক্তব্য! সেখানে তো র‍্যাম্প নেই।'

'ওফ, তুই পারিসও বটে!' মাছের কাঁটা বাছতে বাছতে মেয়েটা বলল, 'এসব নিয়ে অকারণ ভাটাচ্ছিস তুই! এত বাল কি খাল নিকালনোর মতো কোনো ব্যাপারই নয় বস, এটা! তুই কী বলছিস, ক্লিয়ার করে বল তো!'

'আমার শুধু এটুকুই বলার, যে এই লোকটার ব্যাপারে জানানোর জন্য আমাদের ওই পুলিশ নোটিসটায় রেসপন্ড করা উচিত!'

'দেবু, নিখিলদার পয়েন্টটা তুই বোঝার চেষ্টা কর। পুলিশ রুটিন এনকোয়ারি করেছে। এখন এই সব আমরা পুলিশকে জানালে তারা এসে ফালতু হ্যারাস করবে এই ভদ্রলোককে। উই উইল গেট নেগেটিভ পাবলিসিটি, ফর অল রং রিজনস!'

'সো হোয়াট? তার জন্য সিকিউরিটি কম্প্রোমাইজ করতে হবে নাকি?'

'ধুর বাল! একটা খোঁড়া লোক কী সিকিউরিটি থ্রেট দেবে তোকে?' স্পষ্টতই বিরক্ত মেয়েটা ততক্ষণে চেয়ারটা পেছনে ঠেলে উঠে পড়ে। খাওয়া হয়ে গেছে তার। ছেলেটাও সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়তে পড়তে বলে, 'ইউ নেভার নো!'

আমার ঝাঁট জ্বালাস না মাইরি, দেবু...' কথা বলতে বলতেই দুজনে বেরিয়ে যায় ঝুপড়ি থেকে। পাশের টেবিলে বাচ্চা ছেলেটা ফিরে আসে ততক্ষণে ভাতের থালা নিয়ে। স্টিলের থালার ওপরে কাগজের প্লেট পেতে ধোঁয়া-ওঠা ভাত। সঙ্গে ছোট ছোট বাটিতে ট্যালটেলে ডাল আর লালচে ধরনের তরকারি— কীসের ঠিক বোঝা যায় না একনজরে। ঠক করে সেসব নামিয়ে বাচ্চাটা বলে, 'মাছ-ফাছ লাগবে নাকি স্যার?'

'যা পারিস কর গে যা,
'নাহ!'
'দইটা দিয়ে যাচ্ছি, এক্ষুনি। আপনি খেতে থাকুন!'
'হুম।'
এইমাত্র খিদে ছাড়া মাথায় কিছু ঢুকছিল না তার। কিন্তু এখন সামনে গরম খাবার নিয়েও কেন কে জানে ভীষণ অন্যমনস্ক সে। প্ল্যান চাই। কোনোভাবে ওই হোটেলে তাকে এক বার ঢুকতেই হবে।

২ আগস্ট, ২০১৮, গভীর রাত / কলকাতা, ভারত

টার্গেট, অর্থাৎ যাকে অনুসরণ করা হচ্ছে, তাকে একটা কাল্পনিক চতুর্ভুজের কেন্দ্র ধরে নিলে তার চার কোণে থাকে চার জন। ভিন্ন ভিন্ন পোশাক, সমাজের ভিন্ন ভিন্ন স্তরের মানুষের সাজ। কার সাধ্য তাদের মধ্যে কোনো প্যাটার্ন, কোনো সামঞ্জস্য খুঁজে বার করে। এই চার জনের সঙ্গে কনট্যাক্ট রেখে চলে একটি অত্যন্ত সাধারণ দেখতে গাড়ি। যে জায়গায় এই অপারেশন চলে, সেখানকার রাস্তায় মানানসই গাড়ি। ঠিক যেন একটি কাল্পনিক বাক্সের মধ্যে বন্দি করে ফেলা হয় বেচারা টার্গেটকে, তাকে বুঝতে না দিয়েই।
টেলিভিশন বা সিনেমায় দেখা যায়, যাকে ফলো করা হচ্ছে, সে বার বার পেছন ফিরে তাকায়। আর যখনই সে পেছন ফেরে, অনুসরণকারী শখের গোয়েন্দা কোনো গলির ভেতর, কোনো পোড়োবাড়ির দেওয়ালে গা ঘেঁষে সেঁটে যাচ্ছে। আর কী তাদের ছদ্মবেশের বহর। এমন দাড়ি-গোঁফের বাহার, এমন কালো চশমা, যে রাস্তাভরতি লোকের মধ্যেও তার দিকেই আগে চোখ যাবে।
বাস্তবে একটু আলাদারকম হয়। হতেই হবে। অনুসরণের নামে ওইরকম বালখিল্যপনা এমনকী পাপুয়া নিউগিনির সিক্রেট এজেন্সিও বরদাস্ত করবে না।
বডিগার্ড লোকটি উঁচু দরের প্রফেশনাল। সে অনেক ভেবে-চিন্তেই এই ভোররাতের সময়টা বেছেছে। শুধুমাত্র সিকিউরিটি ঢিলে থাকে না এই সময়। রাস্তাঘাটও থাকে ফাঁকা, নির্জন। লোকের ভিড়ে মিশে কারও পক্ষে তাকে অনুসরণ করা শুধু কঠিন নয়, অসম্ভব।
কিন্তু র-এর যে ট্র্যাকিং টিমটার ওপর দায়িত্ব পড়েছে তাকে অনুসরণ করার, তারা শুধু পেশাদার নয়, সর্বোচ্চ পর্যায়ের পেশাদার।
নিজাম প্যালেসের সামনে যে দুধের ট্যাঙ্কি বওয়া ভ্যানওয়ালা সজোরে গান গাইতে গাইতে তাকে ক্রস করে গেল, এবং একটু এগিয়ে যে বেচারার ভ্যানের চেন পড়ে যাওয়ায় প্রায় পাঁচ মিনিট তাকে ভ্যান মেরামত করতে হল— সেই শক্তপোক্ত চেহারার বছর পঁচিশের ছেলেটার সঙ্গে, তেঘরিয়া জামা মসজিদের সামনে চোখে পিচুটি, গায়ে চাপ চাপ ময়লা, একমুখ কুটকুটে দাড়ি-গোঁফের জঙ্গল— আধপাগল পীরের কোনো মিলই নেই।
এন. আর. এস.-এর সামনে যে মেয়েটি তাকে কুৎসিত ভঙ্গিমায় ডাকছিল সে যে একটা সস্তার কলগার্ল, তাতে বডিগার্ডটির কোনো সন্দেহই নেই। এমনিতে তার এসব ব্যাপারে ছুঁৎমার্গ না থাকলেও এখন সময় নেই বলেই এড়িয়ে গেছে।
অবশেষে সে বি. আর. সিং হসপিটালের সামনে এসে থমকে দাঁড়াল একটু। একটু দাঁড়াতেই কিছুক্ষণের মধ্যে হসপিটালের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল একটা অ্যাম্বুলেন্স। হুটার বাজছে না। ভেতরে রোগী নেই, বোঝাই যায়। গেট থেকে বেরিয়ে, বাঁ-দিকে ঘুরে, একটু আস্তে হল সেটা। বডিগার্ডটি বিদ্যুবেগে ড্রাইভারের পাশের সিটের লাগোয়া দরজাটি এক হ্যাঁচকায় খুলে লাফিয়ে উঠে পড়ল। আর সঙ্গে সঙ্গে গতি বাড়িয়ে তীব্র বেগে ছুটে গেল অ্যাম্বুলেন্সটি। যে পথে বডিগার্ডটি এতক্ষণ হেঁটে এসেছে, আবার ফিরে সেই পথেই।
রাস্তার উলটো দিকে একটা সুলভ শৌচালয়। একটা লুঙি পরা দেহাতি লোক তার সামনে দাঁড়িয়ে বিড়ি খাচ্ছিল। রাত বাকি থাকতেই প্রাতঃকৃত্য সেরে নিতে চায় সে। কিছুক্ষণ

অ্যাম্বুলেন্সটার দিকে তাকিয়ে সে শার্টের বুকপকেট থেকে একটা ফোন বার করে।

ফোন বার করে এন. আর. এস.-এর সামনে দাঁড়িয়ে থাকা সেই কলগার্লটিও। কোনো কাস্টমার কল করেছে বোধহয়। মেয়েটা একটা ছেনালির হাসি মুখে ফুটিয়ে খুব নীচু স্বরে কী একটু কথা বলে। তারপর ফোনটা ব্লাউজে গুঁজে হ্যান্ডব্যাগ থেকে একটা সিগারেট বার করে ধরিয়ে নেয়।

ঠিক সেই সময়ই অ্যাম্বুলেন্সটা দ্রুতগতিতে তাকে পেরিয়ে চলে যায়।

প্রফেশনাল!! খুব ভালো সতর্কতা! যদি কেউ পায়ে পায়ে পিছু নিয়েও থাকে, এই অতর্কিত এবং দ্রুত দিক পরিবর্তন ও গতিবৃদ্ধির সঙ্গে তাল মেলাতে গেলেই তার ধরা পড়ে যাওয়ার চান্স একশো পার্সেন্ট।

কিন্তু যেমন বলা হয়েছিল। র-এর ট্র্যাকিং টিম, দুনিয়ার অন্যতম সেরা। মেয়েটির মুখে ধীরে ধীরে একটু মৃদু হাসি ফুটে উঠল। সে তার সস্তার গোলাপি ব্লাউজের ফাঁক থেকে একটা কমদামি মোবাইল বার করল। স্পিড ডায়ালে একটা নম্বর ডায়াল করে বলল, 'টার্গেট অন ইওর ওয়ে, কেরিয়ার!' 'গুড নিউজ! ডিড হি স্পট এনি অফ ইউ?'

'মনে হয় না। বাট হি ইজ প্রো অ্যান্ড হি ইজ কেয়ারফুল!'

'ভেরি গুড! বাই দ্য ওয়ে— ইউ লুক লাইক, ইউ ক্যান গেট সাম বিজনেস টুডে!'

'শাট আপ, ইউ ফাকার!'

ছদ্ম কোপে কথাটা বলেই ফোনটা কেটে দেয় মেয়েটি। তারপর হাঁটা লাগায় বি. আর. সিং হসপিটালের দিকে। পোশাকটা পালটাতেই হবে।

এস. এস. কে. এম.-এর সামনে থেকে ইউ টার্ন মেরে অ্যাম্বুলেন্সটা যখন ফাঁকা রাস্তা দিয়ে হু-হু করে ছুটে চলেছে পার্ক সার্কাস সেভেন পয়েন্ট ক্রসিংএর দিকে, তখন রাস্তায় অল্প অল্প গাড়ি চলা শুরু হয়ে গেছে। তাই বেশ কিছুটা পেছনে অলস কিন্তু নির্দিষ্ট গতিতে আসতে থাকা সাদা উবেরটা অ্যাম্বুলেন্সের আরোহী বা ড্রাইভারের মনে কোনো সন্দেহের উদ্রেক করল না।

'এখন এক বার বলব ওঁকে?' ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞেস করে মোনালিসা। 'পাগল হয়েছেন নাকি? দেখছেন না, কীরকম থমথমে মুখে বসে আছে সব?' আরও ফিসফিস করে তার কানে কানে বলে রাজেশ।

'কিন্তু একটা ছেলে জলজ্যান্ত হাওয়া হয়ে গেল, আর তার ফ্ল্যাটে অজানা লোকে এসে আড্ডা গেড়েছে—— এটা সন্দেহজনক নয়?' বলতে বলতে উত্তেজনায় মোনালিসার গলা চড়ে যায়।

অরুণ এতক্ষণ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দুই পিএম-এর ইটিনিরারি দেখছিলেন আর নীচু স্বরে কিছু আলোচনা করছিলেন পরীক্ষিতের সঙ্গে। মোনালিসার গলা কানে যেতেই চোখ তুলে তাকালেন তার দিকে। এমনিতেই একজন সাংবাদিকের সমানে বসে থাকাটা তাঁর পছন্দ নয়। সেটা তিনি পরীক্ষিৎকে বলেওছেন। বাট, এক্ষেত্রে এই মেয়েটির আনা লিডই তাদের একমাত্র পজিটিভ কনফার্মেশন। এ ছাড়াও অ্যাপারেন্টলি ওয়ান অফ দ্য অফিসার্স ল্যান্ডেড ইন সাম কাইন্ড অফ আ স্যুপ অ্যান্ড দ্যাট লেড দেম টু মেক সাম কম্প্রোমাইজ! হি ডাজন্ট লাইক ইট, বাট কান্ট স্টপ ইট ফ্রম হ্যাপেনিং ইদার!

এই যেমন এখনও মেয়েটা সাইড-টক করে যাচ্ছে। অরুণ ইচ্ছে করলে ইগনোর করতে পারতেন এটা। কিন্তু মনে হল মেয়েটাকে একটা শিক্ষা দেওয়া দরকার। সে, নিছকই ভাগ্যক্রমে যে সুযোগ পেয়েছে অনেক সিনিয়র জার্নালিস্ট তা পাওয়ার জন্য নিজের কিডনি দিয়ে দিতে রাজি থাকবে। পড়ে পাওয়া সুযোগের সম্মান করতে শেখা দরকার এই 'টু মিনিট নুডলস' প্রজন্মের।

একটু গলাখাঁকারি দিয়ে তিনি বললেন, 'কী ব্যাপার মিস? এনিথিং রং?' 'নাথিং স্যর, নাথিং।' আগ বাড়িয়ে রাজেশ উত্তর দেয়। তার দিকে তির্যক দৃষ্টিতে তাকিয়ে অরুণ বললেন, 'আহ, সো আপনি ওঁর স্পোকসপার্সন?

‘না, ইয়ে... মানে... মানে...’ রাজেশ অপ্রস্তুত হয়ে আমতা আমতা করতে থাকে। তার দিকে আর এক বারও না তাকিয়ে অরুণ পূর্ণ দৃষ্টিতে আবার তাকালেন মোনালিসার দিকে।

মোনালিসা একটু টলে গেল। ঠিক এই মুহূর্তে এক সম্ভাব্য আততায়ীর সঙ্গে বুদ্ধির লড়াইতে আলো-ছায়ায় লুকোচুরি খেলছে কয়েক জন মানুষ। ঠিক এই মুহূর্তে সারা কলকাতায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে কয়েকশো পুলিশ খুঁজে চলেছে কিছু অনির্দিষ্ট ক্লু, কোনো অজানা আততায়ীর অদৃশ্য পদচিহ্ন। ঠিক এই মুহূর্তে এই উপমহাদেশের দুই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মানুষের মাথার ওপর ঝুলছে অনিবার্য মৃত্যুর পরোয়ানা!

আর সে কিনা মাথা ঘামিয়ে চলেছে একটি ছেলে, নিতান্তই সাধারণ একটি ছেলেকে খুঁজে পাওয়া নিয়ে। কে সেই ছেলে? খুব শিগ্‌গিরই এক্স হতে চলা তার কৈশোরের বয়ফ্রেন্ড! এটা কি এঁদের বলাটা ঠিক হবে? বের করে দেবে না তো তাকে? বিজনদা কি তাকে আর চাকরিতে রাখবে এরকম ফেলিওরের পরে? ভাবতে ভাবতে সে বোধহয় একটু বেশিই সময় নিয়ে ফেলেছিল। অরুণের অধৈর্য গলাখাঁকারি তার সংবিৎ ফেরাল। সে মরিয়া হয়ে বলল, ‘স্যর, আপনি... আপনি হয়তো আমাকে প্যারানয়েড ভাববেন, কিন্তু...’

‘আমি কী ভাবব, সেটা নিয়ে স্পেকুলেশনটা এখন না হয় তোলাই থাক। আপনি বলুন, কী বলছিলেন?'

‘স্যর, আমার এক বন্ধু, নিউটাউনে একটা ফ্ল্যাটে থাকে... মানে থাকত... তাকে লাস্ট চার-পাঁচ দিন হল দেখা যাচ্ছে না। লাস্ট সানডে ওর নেবার ওকে লাস্ট দেখে— ভোর বেলা অফিস যেতে...'

‘সানডে, অফিস?’

‘ইয়েস, এক্সাক্টলি। দ্যাট ইজ ওয়ান অফ মাই পয়েন্টস! আরও আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে সে চলে যাওয়ার দিন দুই-তিন পর থেকেই কিছু অজানা-অচেনা লোকের যাতায়াত দেখা যাচ্ছে ওই ফ্ল্যাটে। কখনো ভোর বেলা, কখনো গভীর রাত্রে। এদিকে আমার বন্ধুর কোনো পাত্তাই নেই। অফিসের কেউ জানে না সে কোথায়...’

‘হোল্ড অন মিস! আমার দুটো প্রশ্ন আছে।’ তড়বড় করে মোনালিসা বলে যাওয়ার ফাঁকেই জোর করে তাকে থামিয়ে অরুণ নিজের প্রশ্নটা গুঁজে দেন।

‘শি... শিওর স্যর!’ প্রচণ্ড বেগে ছুটে চলা গাড়ি যেমন ঝাঁকুনি দিয়ে ব্রেক কষে, সেরকমই হোঁচট খেয়ে থেমে গেল মোনালিসা।

‘আপনার এই বন্ধুটি কীরকমের বন্ধু?’

মোনালিসাদের প্রজন্ম অরুণদের প্রজন্মের মতো এই ধরনের বিষয় নিয়ে কথা বলতে অকারণ জড়তায় ভোগে না। তবু মোনালিসা এক-দু’ মুহূর্ত থমকাল। সে নির্দ্বিধায় অরুণের চোখে চোখ রেখেই বলে, ‘আমার বয়ফ্রেন্ড স্যর... ওয়েল, আই মিন, মাই সুন টু বি এক্স বয়ফ্রেন্ড!’

‘ইন্টারেস্টিং!’ অরুণের গলায় একটু মজার সুর যেন, ‘ডাজ হি নো দ্যাট? ‘হোয়াই ডু ইউ আস্ক স্যর?’

‘এমনটা কি হতে পারে না, ইমপেনডিং ব্রেক-আপের খবর পেয়ে তার সঙ্গে ডিল না করতে পেরেই আপনার বন্ধু...’

‘আই ডোন্ট থিংক সো, স্যর।' এবারে মোনালিসা অরুণের কথার মাঝপথে বাধা দিয়ে ওঠে। ‘এক তো, সে এখনও জানত না। কোনোভাবেই তার পক্ষে জানা সম্ভব নয় কারণ আমি এই ঘরে আপনাদের বলার আগে এটা কাউকেই বলিনি। দ্বিতীয়ত, হাউ অ্যাবাউট দ্য ফোকস? ওই যেসব উটকো লোকজন, ওরা কারা?’

‘বিফোর আই ইভেন থিংক অ্যাবাউট আনসারিং দ্য কোয়েশ্চেন, মোনালিসা, আমি আমার দ্বিতীয় প্রশ্নটা করতে চাইব!’

‘অবশ্যই স্যর!’

মোনালিসা ধীরে ধীরে নিজের আত্মবিশ্বাস ফিরে পাচ্ছে। সে আড়চোখে খেয়াল করল পরীক্ষিৎ মিটিমিটি হাসছেন। পরীক্ষিতের একটু একটু পছন্দ হতে শুরু করেছে মেয়েটাকে। বুদ্ধিমতী, সাহসী, আত্মবিশ্বাসী। আর একেবারেই হেঁ-হেঁ করা হাত কচলানো পাবলিক নয়।

অরুণ সেই আত্মবিশ্বাসী মেয়েটিকে নিজের স্বভাবসিদ্ধ ঠান্ডা গলায় বললেন, 'হোয়াই শুড উই কেয়ার অ্যাবাউট দিস স্টোরি অফ...' কথা শেষ হবার আগেই এতক্ষণ নিশ্চুপ থাকা স্পিকার সশব্দ হয়ে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে ঘরের সবাই এক লহমায় সচকিত হয়ে ওঠে। স্পিকারে একটি চেনা গলা পাওয়া যায়, 'টার্গেট বোর্ডেড অফ অ্যাট পার্ক সার্কাস সেভেন পয়েন্ট ক্রসিং। হি হ্যাজ এ স্লিং ব্যাগ উইদ হিম, দিস টাইম!'

'আর ইউ অন ফুট?' অরুণ নড়েচড়ে টেবিলের দিকে এগিয়ে আসেন। দুটো কনুইয়ের ভর টেবিলের ওপর দিয়ে দাঁড়িয়েই পড়েন শেষমেশ!

'ইয়েস, মর্নিং ওয়াক স্যর! আই অ্যাম জগিং!'

'হাউ ক্লোজ আর ইউ?'

'অ্যাবাউট থার্টি মিটারস!'

'হাউ অ্যাবাউট দ্য অ্যাম্বুলেন্স?'

'কেরিয়ার ইজ স্টিল অন ইট... ও ফাক! আই গেস হি স্পটেড মি... ওভার অ্যান্ড আউট'

পিঁইই... করে একটা একঘেয়ে আওয়াজ হচ্ছিল নিস্তব্ধ ঘরে। পাঁচ-ছ' সেকেন্ডের নীরবতা কাটিয়ে পরীক্ষিৎই প্রথম কথা বলে ওঠেন, 'স্যর!'

'ইয়েস, ইয়েস!' চটকা ভেঙে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন অরুণ। পরীক্ষিতের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'নিয়ারেস্ট কোথায় ফোর্স আছে?'

'লোয়ার সার্কুলার রোড সেমেটারির কাছে। অ্যাট দিস আওয়ার... ফাইভ মিনিটস!'

'আস্ক দেম টু রাশ! অ্যারেস্ট দিস ম্যান! লেটস মুভ!'

কমিশনারসমেত সবাই ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে উদ্যত হলেন। পরীক্ষিৎ এক বার পেছন ফিরে মোনালিসার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ইউ স্টে ব্যাক!'

'আই অ্যাম স্যর! আই নিড টু রাইট দ্য অ্যারেস্ট রিপোর্ট!' মোনালিসা সপ্রতিভ জবাব দেয়। পরীক্ষিৎ বেরিয়ে যেতে গিয়েও কী মনে করে ফিরে আসেন এক বার। ঘরে তখনও ত্রিদিবেশ। পরীক্ষিৎ মোনালিসাকে জিজ্ঞেস করেন, 'তোমার বয়ফ্রেন্ডের উধাও হওয়ার গল্পটা কেন বললে?'

'নট শিওর ইফ ইট স্টিল ম্যাটার্স স্যর!'

'লেট মি বি দ্য জাজ!'

'ওয়েল, এই অ্যাপার্টমেন্টটা থেকে বিশ্ব বাংলা গেট একদম কাছ থেকে দেখা যায়। ক্লিয়ার লাইন অফ সাইট। আমি অনেক বার গিয়ে দেখেছি। আর...'

করিডোরের শেষ প্রান্ত থেকে অধৈর্য অরুণের গলা শোনা যায়। পরীক্ষিৎ এক বার তাঁর দিকে তাকিয়ে হাত তুলে মোনালিসাকে বলেন, 'আর...'

'আমি জানি ওইখানেই মাতৃভাষা সদনে পিএম-দের পাবলিক অ্যাপিয়ারেন্স আছে। সো, ওয়াজ জাস্ট ওয়ান্ডারিং!'

'ওহ, দ্যাট! গুড, বাট ডোন্ট ওরি! নাও উই হ্যাভ দ্য ম্যান!!'

করিডোর বরাবর প্রায় দৌড়তে থাকেন পরীক্ষিৎ। বাকিরা ততক্ষণে অনেকটা এগিয়ে গেছে। দৌড়োতে দৌড়োতেই তিনি ভাবতে থাকেন। ভাবনাটা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারেন না।

স্নাইপার রাইফেল কে কিনতে গিয়েছিল? কেনই-বা গিয়েছিল?

সপ্তবিংশ অধ্যায়
।।আ ন্যাস্টি চেক।।

৩ আগস্ট, ২০১৮, ভোর / কলকাতা, ভারত

শাড়ি পরে দৌড়োনো খুব মুশকিল। সীমা এই জন্যই শাড়ি একদম পরতে চায় না। আজও ও একেবারেই রাজি ছিল না এই কলগার্লের মেক-আপ নিতে। কিন্তু একলা মেয়ের পক্ষে অন্য কোনো গেট-আপে ভোররাত্তিরে একা একা রাস্তায় ঘোরাটা জাস্টিফাই করা খুব মুশকিল। অগত্যা রাজি হতে হয়েছিল।

এখন সমস্যা হচ্ছে।

অবশ্য ভুলটা ওরই, ওদেরই। ভোররাত্তির থেকে প্রায় দু-তিন ঘণ্টা ধরে তারা এই লোকটার পিছু নিয়েছে। লোকটা নিঃসন্দেহে প্রফেশনাল। কিন্তু বাঁধাগতের প্রফেশনাল। কেউ পিছু নিয়েছে এটা সন্দেহ করেছে, কিন্তু লোক বদলে বদলে যাওয়ায় চিনতে পারেনি... নিশ্চিত হতে পারেনি। ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করেছে, সে চেষ্টাও ভীষণ কপিবুক। কোনো সারপ্রাইজ, কোনো চমকই ছিল না। তাই হয়তো ধীরে ধীরে অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস গ্রাস করেছিল তাকে।

না হলে কোনোদিনই ফুট-ফলোয়ার হিসেবে ওর কন্ট্রোলে কল করার কথা নয়।

কোনো আড়াল না পেয়ে কংক্রিটের রাস্তাতেই বাঁ-দিকে ঝাঁপ দিয়ে উপুড় হয়ে পড়ল সীমা। পড়েই অভ্যস্তভাবে গড়িয়ে গেল কিছুটা। পড়ার মুহূর্তেই টের পেয়েছে প্রায় ঘাড়ের চামড়া ছুঁয়ে একটা জ্বলন্ত সীসা বেরিয়ে গেল।

সময় নেই একদম। দ্রুত একটা বেজির মতো চার-হাত পায়ে ছুট লাগাল সে। প্রায় কুড়ি গজ দূরে ফ্লাইওভারের পিলার। ওর আড়ালে যেতেই হবে। শিট! কোনোভাবেই সম্ভব নয়!!

সে একদম ফাঁকা একটা রাস্তার মাঝামাঝি, একলা। পায়ের কাছে স্ট্র্যাপ্ড পিস্তলটা বার করারও সময় নেই। চোখের কোনা দিয়ে সে দেখতে পেয়েছে, ক্লিয়ার লাইন অফ সাইট পেয়ে লোকটা পিস্তল তুলেছে তার দিকে। যে কোনো মুহূর্তে বুলেট এসে বিঁধবে তার শরীরে।

খট করে একটা মৃদু আওয়াজ এল তার সোজাসুজি ওপরের দিকের কোণ থেকে। লোকটার বাঁ-পাশ থেকে। স্পষ্ট বোঝা গেল না। তবে দেখা গেল লোকটা গুলিটা এড়ানোর জন্য আড়ালে সরে গেল।

টাইম!!!

দ্য মোস্ট ভ্যালুয়েবল কারেন্সি ইন আ কমব্যাট! সিও-স্যর বলতেন।

সময় পাওয়া গেছে। গুলতি থেকে ছিটকে বেরোনো ঢিলের মতো তীব্র গতিতে ছুটল সীমা। তিন-চার সেকেন্ড। আবার একটা ডাইভ খেয়ে সে থামটার আড়ালে চলে গেল।

বডিগার্ড লোকটাকে ওরা খুব ভুল ভেবেছিল। বেশ ভালোরকম প্রফেশনাল লোকটা। এমন একটা জায়গা বেছেছে, যেটা ভ্যান্টেজ পয়েন্ট বলা যেতে পারে। একটা ইলেকট্রনিক ডিসপ্লে সাইনবোর্ড আছে কলকাতা ট্র্যাফিক পুলিশের। সেই সাইনবোর্ডের পেছনে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে সে। তার দিক থেকে আলো আসার ফলেই তাকে লোকেট করা অসম্ভব হত। কী ভাগ্যিস অল্প অল্প দিনের আলো ফুটতে শুরু করেছে।

সীমা এক বার চট করে উঁকি মেরে দেখল। একই সময়ে বডিগার্ডটাও মুখ বাড়িয়েছে। সীমাকে দেখতে পাওয়া মাত্র একটা ফায়ার করল সে। পিস্তলের নলটা নড়ে ওঠামাত্র সীমা কভার নিয়েছে আবার। থামের গায়ের কংক্রিটের ছোট্ট টুকরো ভেঙে ছিটকে এসে লাগল তার চোখে-মুখে। হাত দিয়ে ঝেড়ে চোখটা পরিষ্কার করে নিল সে।

যা দেখার সে দেখে নিয়েছে। লোকটার হাতে একটা স্ট্যান্ডার্ড গ্লক ২৬। দশটা বুলেট

থাকে। এ ছাড়াও দুটো ফ্যাক্টরি এক্সটেনশন। মানে বারোটা বুলেট একটা ম্যাগাজিনে। চারটে ফায়ার করেছে লোকটা। সীমা এক বার নিজের ডান দিকে তাকাল। গুলিটা ওই দিক থেকেই ফায়ার করা হয়েছিল।

কে করল?

প্রায় ফুট পঞ্চাশেক দূরত্বে একটা ছায়ামূর্তি। মাটি থেকে বেশ উঁচুতে। মনে হয় প্যাকিং বাক্স টাইপের কিছুর ওপরে দাঁড়িয়ে আছে। ছায়ামূর্তি তার দিকে তাকিয়ে বাঁ-হাতের চারটে আঙুল তুলে ইশারা করল।

চার, মানে ডি— মানে ডেল্টা! অর্থাৎ সিদ্ধার্থ। সীমা দু' আঙুল তুলে দেখিয়ে দিল। তার কোড ব্রাভো।

সিদ্ধার্থ ওকে ইশারা করল কভার ফায়ার দিতে। এক লহমায় থামের আড়াল থেকে বেরিয়ে পর পর তিনটে ফায়ার করল সীমা। তিনটেই ডিসপ্লে বোর্ডের বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে লাগল। লোকটা এখন দু' সেকেন্ড সময় নেবে। সেই সুযোগে সিদ্ধার্থ নিজের পজিশন ছেড়ে দ্রুত দৌড়ে কিছুটা কাছে গিয়ে একটা রোড ব্লকের আড়ালে পজিশন নিল।

এখনও রাস্তায় গাড়ি বা মানুষ চলাচল সেভাবে শুরু হয়নি। লাস্ট কুড়িপঁচিশ সেকেন্ড কোনো গাড়ি যায়নি। মানুষজন যদি কেউ আশেপাশে থেকেও থাকে, তারা ভয়েই গা-ঢাকা দিয়েছে নির্ঘাত। সীমা খালি মনে মনে চাইছে ভিড় বাড়ার আগেই যেন লোকটাকে ধরা যায়। ভিড় রাস্তায় বেপরোয়া বন্দুকধারী মোটেও ভালো ব্যাপার নয়।

বডিগার্ড নেক্সট রাউন্ড ফায়ারের জন্য মাথা তুলতেই সিদ্ধার্থর বেরেটা এম নাইন থেকে দু' রাউন্ড শর্ট-বার্স্ট ফায়ার হল, অন টার্গেট!! উলটো দিক থেকেও দু' রাউন্ড পালটা জবাব এল। পাঁচ-ছয়! উলটোপালটা, অফ-টার্গেট!

একটা চাপা আর্তনাদ শুনতে পাওয়া গেল স্পষ্ট। ওয়াজ ইট এ হিট? মনে মনে দশ গুনল সিদ্ধার্থ। সীমাও। ততক্ষণে কোনাকুনি এগিয়ে সীমাও পজিশন নিয়েছে একটা কংক্রিটের বড় সিন্ডার ব্লকের আড়ালে। সে সিদ্ধার্থর দিকে তাকাল। সিদ্ধার্থ ইশারায় বলল— হি ইজ গোয়িং ইন। নট গুড! সীমা এখনও বিশ্বাস করতে পারছে না। দ্যাট গাই ইজ স্মার্ট!

হাতের ইশারায় সীমা আপত্তি জানাল। সিদ্ধার্থ আবার রিপিট করল তার সিদ্ধান্ত। অগত্যা। প্রোটোকল। কিছু করার নেই। সিদ্ধার্থ চতুর্বেদী ওর সিনিয়র। ফিল্ডে তার ডিসিশানই ওকে মেনে নিতে হবে। কভার ফায়ার করার জন্য রেডি হল আবার সে। তার বেরেটা এম নাইন থ্রি-তে সতেরোটা বুলেট ধরে একটা ম্যাগাজিনে। এখন চোদ্দটা আছে। অ্যাটাচড থ্রি-স্লট পিক্যাটিনি রেলে সাঁটা লেজার পয়েন্টকে স্থির করে সে ফায়ার শুরু করল।

এক দুই তিন চার— চারটেই ডিসপ্লে বোর্ডে। জ্বলতে থাকা বেশিরভাগ আলো নিভে গেছে। সিদ্ধার্থ এই ফাঁকে দৌড়ে পৌঁছে গেছে বোর্ডের একপাশে। নিজেকে আড়াল থেকে টেনে বার করে ফাইনাল অ্যাসল্ট শুরু করতে যেতেই সীমার নজরে পড়ল একটা নড়াচড়া! সে চীৎকার করে সাবধান করতে গেল... টু লেট!!!

থাড!! সাত নম্বর! একদম পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক থেকে সিদ্ধার্থর রগে গুলিটা চালিয়েছে লোকটা। গোড়ায় কুঠার মেরে কেটে ফেলা একটা গাছের মতো বিনা আর্তনাদে লুটিয়ে পড়ল সিদ্ধার্থর প্রাণহীন শরীরটা! লোকটা এক বার সিদ্ধার্থর গলায় হাত দিয়ে ওর মৃত্যু সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়ে নিল।

তার মানে একটু আগে শোনা অস্ফুট আর্তনাদটা ফেক ছিল। এর তো কোনো আঘাতই লাগেনি।

দশ গজ দূরে কংক্রিটের চাঙড়ের আড়াল থেকে সীমা বিস্ফারিত চোখে সেদিকে তাকিয়ে রইল পাক্কা দশ সেকেন্ড মতো। সে নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না। সিড, সিদ্ধার্থ— এইমাত্র, আধ ঘণ্টা আগে যে ছেলেটা ওর সঙ্গে খুনসুটি করছিল সে আর নেই!!

শিট! ফাক!!

নিজের বাঁ-হাতের নখ দিয়ে ডান হাতের তালুর উলটো পিঠে জোরে চাপ দিয়ে কোনোমতে নিজের সংবিৎ ফিরিয়ে আনল সীমা। রি-ইনফোর্সমেন্ট আসতে কত দেরি তা সে জানে না। বাট শি নিডস টু গেট দ্যাট বাস্টার্ড! শি মাস্ট!

পুরোটা গুছিয়ে নিতে হয়তো আর একটু সময় নিলে ভালো করত সীমা। সেটা বুঝতে একটু দেরি হয়ে গেল!

তাড়াহুড়ো করে উঠতে যেতেই আবার তিনটে ফায়ার ওর দিকে। আট-নয়-দশ!!

এবারে ক্লোজ প্রক্সিমিটি। একটা আগুনের শিক যেন বাঁ-কাঁধ ফুঁড়ে বেরিয়ে গেল! শি হ্যাজ বিন হিট!

টলতে টলতে আড়ালে সরে যাওয়ার আগে সীমা দেখতে পেল লোকটা এবারে সিদ্ধার্থর আগের পজিশনে চলে এসেছে। অর্থাৎ সীমার আরও কাছে। নাও হি ইজ অন দ্য অ্যাটাক!!

দাঁতে দাঁত চেপে নিজের প্রাথমিক যন্ত্রণার ঢেউটা সামলে সীমা চট করে ডান দিক দিয়ে বেরিয়ে একটা ফায়ার করল। পালটা সঙ্গে সঙ্গে একটা— এগারো!!

ওহ! হি ইজ ড্যাম গুড! রেডি ফর অল দ্য মুভস... ওয়েল... অলমোস্ট! ...বাট নট কোয়াইট! আগে থেকেই ভাবা ছিল সীমার। ডান দিক থেকে উলটো ঘুরে পিছিয়ে এসে, একই গতিতে সে বাঁ-দিকে ঘুরে লোকটার দিকে ফায়ার করল— দু' রাউন্ড!! এই বার কাঙ্ক্ষিত চিৎকারটা শুনতে পাওয়া গেল। হাঁটুতে লেগেছে লোকটার।

শুকনো ঠোঁটে জিভ বুলিয়ে নিল সীমা। আড়চোখে এক বার দেখল। তাদের দুজনের যা পজিশন, ঠিক তার সঙ্গে সমবাহু ত্রিভুজের শীর্ষবিন্দুর অবস্থানে রয়েছে আর একটা ব্লক। লাস্ট গ্যাম্বল— এক বার ওখানে যেতেই হবে। প্রায় কুড়ি ফুট আনকভার্ড জায়গা— কিন্তু যেতে পারলে...

লোকটা আহত এখন। এই সুযোগে দৌড় শুরু করল সে। ঝুঁকে, জলপোকার মতো দ্রুতগতিতে। খট করে একটা আওয়াজ পেল। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকানোর মতো সেকেন্ডের ভগ্নাংশও নেই। গুলি খাওয়া বাঁ-কাঁধের ওপর ভর দিয়েই সে আছড়ে পড়ল দ্বিতীয় ব্লকটার আড়ালের নিরাপদ আশ্রয়ে। সারা শরীরে এক অবর্ণনীয় যন্ত্রণার ঢেউ খেলে গেল। কে যেন সজ্ঞানে তার হাড়ের ওপর দিয়ে করাত চালাচ্ছে।

সেই তীব্র যন্ত্রণাতেও একটা চাপা হাসি খেলে গেল সীমার মুখে। বারো! নাও!!

ক্লাচ... একটা আওয়াজ করে শেষ হয়ে যাওয়া ম্যাগাজিনটা রিলিজ করে নতুন ম্যাগাজিনটা ভরতে যাচ্ছিল বডিগার্ড। মূর্তিমান বিভীষিকার মতো, ঘূর্ণিঝড়ের মতো ছুটে এল সীমা। হাতে উদ্যত বেরেটা এম নাইন থ্রি!!

থাড, থাড, থাড, থাড... নির্বিচারে একের পর এক ফায়ার করতে থাকল সীমা। প্রথম দুটোই যথেষ্ট ছিল। চেস্ট অ্যান্ড হেড শট। কিন্তু... ম্যাগাজিনের সব ক'টা গুলি ততক্ষণে নিষ্প্রাণ হয়ে যাওয়া শরীরটার ওপর খালি করে দিয়ে তার পাশেই টলতে টলতে বসে পড়ল সীমা।

ঘড়ি দেখল।

লাস্ট কন্ট্রোল রুমে কল করার পর মাত্র দু' মিনিট সাতচল্লিশ সেকেন্ড কেটেছে। মনে হচ্ছে আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে রি-ইনফোর্সমেন্টের জন্য। কংক্রিটের ব্লকটার গায়ে শরীর ছেড়ে দেয় সীমা।

মৃত বডিগার্ডটার দিকে ঘৃণাভরে তাকিয়ে এক বার বলে, 'ইউ ফরগট টু কাউন্ট, ফাকার!'

একটু আগে জ্বলজ্বল করে ইলেকট্রনিক ডিসপ্লে বোর্ডে জ্বলছিল, 'রাইডিং উইদাউট হেলমেট ইজ ডেঞ্জারাস!'

সব নিভে গেছে। শুধু 'ডেঞ্জারাস' শব্দটা তখনও জ্বলজ্বল করছে বোর্ডে!! সেদিকে

এক বার তাকিয়ে সীমা ইয়ারপিসটা ডান হাতের আঙুল দিয়ে একটু চেপে ক্লান্ত গলায় বলল, 'ব্রাভো টু কন্ট্রোল — দ্য টার্গেট ইজ ডাউন! আই রিপিট, দ্য টার্গেট ইজ ডাউন!'

রাস্তাটার নাম নয়াপট্টি মেন রোড। এই রাস্তা দিয়ে, অধুনা সুদৃশ্য করে সাজিয়ে তোলা এই লেক বা খালের পাড় ধরে যেসব সুবেশ ও সুবেশা তরুণ-তরুণী ভোরের নরম রোদ্দুর মেখে হেঁটে বেড়াচ্ছে, সাখাওয়াত হলফ করে বলতে পারেন এরা কেউই এই রাস্তার নাম জানে না।

সাখাওয়াত জানেন। এই শহরের শরীরের গোপনতম প্রদেশে ছড়িয়ে থাকা প্রতিটা শিরা-উপশিরার কথা তিনি জানেন। কিন্তু তাতেই-বা লাভ কী? নির্দিষ্ট করে কী খুঁজছেন তা তিনি নিজেও জানেন না।

শুধু জানেন কোনো এক অজ্ঞাতপরিচয় আততায়ী আর কয়েক ঘণ্টার মধ্যে মারণ হানা হানতে চলেছে প্রতিবেশি রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রীর ওপর। ঠিক সাখাওয়াতের প্ল্যান-মাফিক!!

আজ থেকে তিন মাস আগে তাকে যে অসম্ভব দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল, তা পূরণ করতে দরকার ছিল একটা অবিশ্বাস্য দুঃসাহসিক পরিকল্পনা— যা সাধারণ মানুষের কল্পনাতেও আসবে না।

কী সে পরিকল্পনা? প্রতিবেশি রাষ্ট্রনায়কের ওপর ভুয়ো আক্রমণ প্ল্যান্ট করা। এমন ভুয়ো, যে কারও সাধ্য হবে না তা বোঝার। নিরপেক্ষ তদন্তের প্রতিটি পদক্ষেপেও ইন্ডিয়ান মুজাহিদিনের পায়ের ছাপ পাওয়া যাবে এবং খুব কৌশলে নিজেরই নিয়ন্ত্রণে তদন্ত চালু রেখে যাবেন তিনি, নেপথ্যে থেকে, সমান্তরালভাবে।

তার জন্যই নিয়োগ করা হল আর্যকে। তার জন্যই জেলে বন্দী থাকা আবদুল রিহান কুরেশিকে দিয়ে নিউজপেপারে কোডেড মেসেজ পাঠিয়ে অ্যাক্টিভেট করা হল আইএম-এর ওয়েস্ট বেঙ্গল সেলকে।

অরুণ সচদেভের পাকিস্তানি অ্যাসেটকে দিয়ে প্ল্যান্ট করানো হল একটা ফলস ডেডবডি— যা নিউজ চ্যানেল ও প্রিন্ট মিডিয়াকে জাস্ট এনাফ হিন্ট দেবে, যে এই সেই ভারতীয় খবরি যে পাকিস্তানের পিএম-এর ওপর হামলার প্ল্যানের খবর পাঠিয়েছিল।

আর এই অরুণ সচদেভ! মাই গড়! হাউ গালিবল ইউ ক্যান বি? একজন নোবডি হয়ে কী সিম্পলি, কত সহজে বিশ্বাস করে গেল যে জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা তাকে আলাদা করে ডেকে এত গুরুত্বপূর্ণ কাজের ভার দিচ্ছে! ভাবলেও মাঝে মাঝে নিজের মনেই হাসি পেত সাখাওয়াতের।

দ্য হোল প্ল্যান ওয়াজ সো ইম্পসিবল! ইট ওয়াজ সো কমপ্লিকেটেড ইয়েট, সো সিম্পল অ্যান্ড বিউটিফুল। অ্যান্ড হাউ গুড ওয়াজ ইট কামিং অফ!

সাখাওয়াত ভেবেছিলেন— দিস, দিস উড বি হিজ রিডেম্পশন! হি উইল বি ব্যাক!

প্ল্যানিং-এর সময় থেকে তা শেখরণের কাছে ব্রিফ করা অবধি তিনি গোটা পরিকল্পনাকে অজস্র বার কাটাছেঁড়া করেছেন। মগজের কম্পিউটারে সিমুলেশন চালিয়েছেন একের পর এক। প্রত্যেকটাতেই রেখেছেন সারপ্রাইজ এলিমেন্ট, কিছু অদৃষ্টপূর্ব বিপত্তি— যার সাপেক্ষে নিজের পরিকল্পনার ফাঁকফোকরগুলো ঝালিয়ে নিতে পেরেছেন।

কিন্তু যেটা তিনি দুঃস্বপ্নেও ভাবেননি, তা হল, ঠিক তাঁরই পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করতে কোনো অজানা শক্তি, কোনো সম্পূর্ণ অচেনা আততায়ী নিজের সর্বশক্তি নিয়োগ করবে। ভাবেননি তাঁর ভুয়ো হত্যা ষড়যন্ত্র অন্য কারও মাথায় একই সময়ে সত্যিকার ষড়যন্ত্র হয়ে দেখা দিতে পারে। ভাবেননি, তাঁকে, অপারেশন শতরঞ্জের মাস্টারমাইন্ডকে, শেষমেশ সময়ের স্রোতের বিপরীতে সাঁতার কেটে আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে সেই পরিকল্পনাকেই ব্যর্থ করার।

এখন ভাবতে ভাবতে নিজের মাথার চুল অজান্তেই খামচে ধরলেন তিনি। উফ!

এবারে তিনি ব্যর্থ হতে পারেন না। এক বার তাঁর গোটা কেরিয়ারের, গোটা গুপ্তচর

জীবনে দাঁড়ি টেনে দিয়েছিল এক চন্দন সামল। এক গ্র্যান্ডমাস্টার দাবাড়ুর নিজের জীবন বাজি রাখার মোক্ষম চাল তাঁকে হারিয়ে দিয়ে গেছিল। শুধু হার নয়, লজ্জা, কলঙ্ক! এক শহর-ভরতি, এক স্টেডিয়াম-ভরতি লোকের সামনে তাঁর সেই অসহায় আত্মসমর্পণ, বুকে বুলেট নিয়ে শুয়ে থাকা, চন্দন সামল নিশ্চয়ই প্রবল আত্মতৃপ্তি নিয়েই উপভোগ করেছিল।

আর নয়! এবারে তাঁর জেতার পালা। এবারে তাঁকে জিততেই হবে। এবারে তাঁকে তাঁর এই দীর্ঘ আঠেরো মাসের দুঃস্বপ্নের ইতি টানতেই হবে। এখন তিনি বুঝতে পারেন, কেন আগের বার চন্দন তাঁকে হারিয়ে দিতে পেরেছিল। কারণ, হি ওয়াজ নট ডেসপারেট এনাফ! দিস টাইম, হি ইজ!

অ্যান্ড ডেসপারেট টাইম নিডস ডেসপারেট মেজার্স!

ফুটপাথের ধারে মাঝে মাঝেই কিছু বেঞ্চি পাতা। তারই একটাতে বসে তিনি ফোনে একটা নম্বর ডায়াল করলেন।

'হ্যালো!'

'হাই রাকেশ! হাউ ইজ ইট গোয়িং?'

'শেখরণ, আর ইউ বিজি?'

'তা একটু, বই কী!'

'আই নিড হিজ নাম্বার!'

'হিজ...' একটু থমকে গেলেন শেখরণ। তারপর চট করে সামলে নিয়ে বললেন '...ইউ মিন...'

তাকে কথা শেষ না করতে দিয়েই রাকেশ বললেন, 'ইয়েস, আই মিন দ্য কমিশনার। ইউ সেড হি উইল বি রেডি ফর মাই কল, ডিডন্ট ইউ?'

'বাট... বাট... ইউ উইল বি এক্সপোজ়ড! ডু ইউ ওয়ান্ট দ্যাট?'

'আই ডোন্ট কেয়ার!'

৩ আগস্ট, ২০১৮, বিকেল বেলা / নিউটাউন, কলকাতা, ভারত

'আপনাদের তো রেজিস্টার হয় না, নিশ্চয়ই। অনলাইন এন্ট্রি করেন তো? এক বার দেখান তো সিস্টেমে, রেকর্ডটা।'

ফোনটা করেছিল হয়তো মিনিট পাঁচেক আগে। বড়জোর দশ মিনিট। কলকাতা পুলিশ যে এত তৎপর তা দেবরাজের জানা ছিল না। এই দেশে পুলিশ বললে যে কয়েকটা টিপিক্যাল চেহারা চোখের সামনে ভেসে ওঠে, এই লোকটা যদিও একদমই সেরকম নয়।

সাদা ফর্মাল শার্ট, কালো প্যান্ট। স্মার্ট ঝকঝকে চেহারা। চশমার নীচে বুদ্ধির ঝিলিক দেওয়া এক জোড়া চোখ। দাড়ি-গোঁফ নিখুঁত কামানো। কথাবার্তাতেই বোঝা যায়, তুখোড় স্মার্ট। গলায় আইকার্ড ঝোলালেই এমনকী 'দ্য স্টাডস'-এর উঁচু পদের স্টাফ বলেও চালিয়ে দেওয়া যাবে।

দেবরাজের শিফট শেষ হওয়ার মুখে। ঠিক তখনই ও ফোনটা করেছিল। মনে মনে প্ল্যান ছিল, ও বেরিয়ে যাওয়ার পরে পুলিশ এলে কেউ জানতে পারবে না, কে ফোনটা করেছিল। কিন্তু তা আর হল কই?

টিভিতে সকাল থেকেই ফ্ল্যাশ হচ্ছে কেউ কিছু সন্দেহজনক দেখলেই যেন অমুক নম্বরে ফোন করে। সে ফোন করে নিজের সন্দেহের কথা জানিয়েছিল সেই নম্বরেই। তারপর দ্রুত হাতে কাজ গুছিয়ে নিচ্ছিল। বেরোনোর আগে, পরের শিফটের ছেলেটির জন্য চেক আউট রেকর্ডস, গেস্ট রিকোয়েস্টস— সব অর্গানাইজ করে রাখছিল। এক মনে ঘাড় নীচু করে কাজ করছিল সে। সঙ্গী ছেলেটি গেছে লাঞ্চ করতে। অনিন্দিতা আজকে ব্যাঙ্কোয়েট ডিউটিতে। হঠাৎই একটা সুগম্ভীর গলার ডাকে তার চমক ভাঙে!

'আপনিই কি দেবরাজ?

'ইয়েস স্যর, হোয়াট ক্যান আই ডু ফর ইউ?' কাস্টমার ভেবেই সহজাত পেশাদারিত্বে

নিজেকে মুড়ে ফেলতে অসুবিধে হয়নি দেবরাজের।

'আপনিই ফোন করেছিলেন পুলিশে? কিছু একটা সাসপিশাস অ্যাক্টিভিটি নোটিস করেছেন আপনি?'

'হ্যাঁ, মানে, ইয়ে... মানে, আপনি?' হঠাৎ চমকের ধাক্কায় দেবরাজের পেশাদার স্মার্টনেস মুহূর্তের মধ্যে খসে পড়ে।

'আমি ক্রাইম ব্রাঞ্চ থেকে আসছি।' বলতে বলতেই অভ্যস্ত হাতে লোকটি নিজের বুকপকেট থেকে আইকার্ড বের করে দেখায়। 'কী ব্যাপার একটু খুলে বলবেন?'

একটু এদিক-ওদিক চেয়ে ইতস্তত করে দেবরাজ। নিখিলদাকে ওর চেম্বারে দেখা যাচ্ছে না। মালটা নির্ঘাত ফুঁকতে বেরিয়েছে। সে বলে, 'শিওর স্যর...'

পাঁচ মিনিটও লাগে না তার পুরো ব্যাপারটা গুছিয়ে বলতে। লোকটা বিশেষ মন দিয়ে শুনছে বলে মনে হয় না। তবে তার কথা শেষ হওয়ামাত্র তার ভুল ভাঙে। লোকটা বলে, 'আপনাদের তো রেজিস্টার হয় না, নিশ্চয়ই। অনলাইন এন্ট্রি করেন তো? এক বার দেখান তো সিস্টেমে, রেকর্ডটা।'

রেকর্ডটা খুলে কম্পিউটার স্ক্রিনটা ও লোকটার দিকে ঘুরিয়ে ধরে। পকেট থেকে একটা নোটবই বার করে কীসব লিখতে লিখতে লোকটা বলে, 'রুমটা ক'তলায়?'

'ফোর্টিন্থ ফ্লোর!'

'হুম। ভদ্রলোক কি এখনও রুমে আছেন?'

এক বার কি-কার্ড হোল্ডারের দিকে তাকিয়ে দেবরাজ বলে, 'অ্যাটলিস্ট রিসেপশনে তো চাবি রেখে যাননি দেখছি।'

'গুড! চলুন তাহলে, এক বার দেখা করে আসা যাক।'

দেবরাজ আঁতকে ওঠে, 'সরি স্যর, এক্সট্রিমলি সরি, যদি আমার বস জানতে পারেন যে আমি পুলিশকে ইনফর্ম করেছি, তাহলে...'

'আরে কী করে জানতে পারবে আপনার বস?'

'গেস্ট নিজেই কমপ্লেন করতে পারেন স্যর!'

'গেস্টকে আমার পরিচয় না দিলেই হল। এমনি একটা ছুতো বানিয়ে এক বার মুখোমুখি দেখে নেওয়া। আপনি

একদম ঘাবড়াবেন না, চলুন তো! লোকটা হাত বাড়িয়ে ওর পিঠ চাপড়ে উৎসাহ দেয়। কেন কে জানে, দেবরাজ এখন আর বিশেষ উৎসাহ পায় না। সে মিনমিন করে বলে, 'বাট স্যর...' কথাটা শেষ করার আগেই পিঠে রাখা হাতটা একটু ভারী হয়ে ওঠে। ওকে টেনে কাছাকাছি এনে লোকটা গম্ভীর হয়ে বলে, 'ন্যাশানাল ইমার্জেন্সির সময় পুলিশকে তার কাজে সাহায্য না করার কনসিকোয়েন্স জানেন, দেবরাজবাবু?'

কথা না বাড়িয়ে দেবরাজ চুপচাপ নিজের কাজের জায়গার ঘেরাটোপটুকু পেরিয়ে চলে আসে। প্রশস্ত লবি পেরিয়ে একপ্রান্তে লিফট। ফাঁকা। দুজনে লিফটে ওঠা অবধি আর কোনো কথা বলে না। লিফটের দরজা বন্ধ হতেই দেবরাজ লোকটাকে বলে, 'কিন্তু কী বলব গেস্টকে?'

'লিভ ইট আপটু মি!'

নির্দিষ্ট কামরার সামনে দাঁড়িয়ে দেবরাজ দরজায় নক করে। ভেতর থেকে আওয়াজ আসে, 'কে?'

'দেবরাজ, ফ্রম রিসেপশন স্যর।'

'ও, ওকে। আ মিনিট প্লিজ!'

এক মিনিট নয়। তিরিশ-চল্লিশ সেকেন্ডের মাথায় খুলে যায় দরজা। ওপারে দাঁড়িয়ে আছেন রাজকুমার। দু' বগলে ক্রাচ। সকালে হুইলচেয়ারে বসে থাকা অবস্থায় দেখেছিল দেবরাজ। তখন বুঝতে পারেনি। এখন বোঝা যাচ্ছে, লোকটা বেশ লম্বা। ছ' ফুটের ওপর তো বটেই। এই পুলিশের লোকটার মাথায় মাথায়। রাজকুমার তার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে

চেয়ে বেশ ভদ্রভাবেই বললেন, 'ইয়েস, দেবরাজ, হোয়াটস দ্য ম্যাটার?'

'হাই স্যর, দিস ইজ আর্য! আই অ্যাম দ্য কনসিয়েরজ অফ দিস হোটেল!' পুলিশটা বলে ওঠে। বুদ্ধি আছে লোকটার। ওর পোশাক দেখে কেউ চট করে সন্দেহ করবে না যে ও এই হোটেলের কেউ না। রাজকুমারও করেন না। স্বাভাবিকভাবেই বলেন, 'বলুন, কী ব্যাপার?'

'আমি এইমাত্র দেবরাজের মুখে শুনলাম সকালে কী ঘটেছে স্যর! ইটজ আ টেরিবল মিসকমিউনিকেশন ফ্রম যাওয়ার এন্ড। আমি তাই আপনার কাছে পার্সোনালি ক্ষমা চাইতে এলাম।'

'ওহ! নো প্রবলেম! ওসব সকালেই মিটে গেছে। আপনি আবার কষ্ট করে এলেন কেন?'

'না না, কষ্ট কীসের স্যর? আপনারা আমাদের ভ্যালুড গেস্ট! আসলে দেবরাজও একটু গিলটি ফিল করছিল। সো উই থট...'

অসম্পূর্ণ কথাটা বাতাসে ভাসিয়ে দেবরাজের দিকে ইঙ্গিতপূর্ণভাবে চায় লোকটা। দেবরাজ বুঝতে পারে। সে খেই ধরে বলতে শুরু করে, 'আই হোপ আপনি খুব খারাপ ভাবেননি স্যর...'

দেবরাজের দিকে লোকটা চোখ ঘোরায়। সেই কয়েক সেকেন্ডের সুযোগে দরজার সামনে থেকেই যতটা পারে ঘরের মধ্যে চোখ বুলিয়ে নেয় লোকটা। বিশেষ কিছুই চোখে পড়ে না।

টেবিলের ওপর টুকিটাকি, ঘড়ি, মানিব্যাগ ইত্যাদি। একটা আধ-খাওয়া জলের গ্লাস। টিভিটা চলছে। দরজার দিকে একটু কোণ করে আয়না। তাতে উলটো দিকের দেওয়ালের কাবার্ডটা দেখা যাচ্ছে। কাবার্ডের দরজাটা একটু ফাঁক হয়ে আছে। সেখান দিয়ে একটা আকাশি রঙের জামা-ই সম্ভবত, তার কিছুটা দৃশ্যমান। কাঁধের কাছে অদ্ভুত কালো রঙের গ্যালিজ দেওয়া। কিছু একটা ইউনিফর্মের মতো দেখতে। কীসের, তা আর্য বুঝতে পারে না। তার কানে আসে রাজকুমার বলছেন, 'ওয়েল আর্য, দেবরাজ— ইট ওয়াজ আ নাইস জেশ্চার অন ইওর পার্ট! থ্যাংক ইউ!'

চট করে নিজের চোখ সরিয়ে নিয়ে আর্য একগাল হেসে হাত বাড়ায় করমর্দনের জন্য, 'দ্য প্লেজার ইজ অল মাইন, স্যর!'

লোকটাও হাত বাড়িয়ে দেয়। প্রথমে একটু টলে গেলেও সামলে নেয় সঙ্গে সঙ্গেই।

হাত মেলানো শেষ করে দেবরাজের পাশাপাশি লিফটের দিকে হাঁটতে হাঁটতেই ফোনটা বেজে ওঠে আর্যর। পকেট থেকে বের করে দেখে—রাকেশস্যর! দ্রুত ফোনটা কানে নিয়ে সে হাতের ইশারায় দেবরাজকে এগোতে বলে। আর মুখে বলে, 'হ্যালো স্যর!

'আর্য! আই রিয়েলি হ্যাভ আ গুড নিউজ! ইন আ রিয়েলি লং লং টাইম আ রিয়েল গুড নিউজ!'

রাকেশ সাখাওয়াতের গলায় স্পষ্টতই খুশি। আজকে সকালের সঙ্গে এই গলাকে মেলানো যায় না। কী এমন হল এই কয়েক ঘণ্টায়? আর্য একজন রুম সার্ভিসের লোকের পাশ কাটিয়ে যেতে যেতে চাপা গলায় বলে, 'কী হয়েছে স্যর?'

'দ্য কিলার, আওয়ার কিলার— ইজ ডেড!'

'হোয়াট?''

অনিচ্ছাসত্ত্বেও আর্য এমন চেঁচিয়ে ফেলে যে বেশ কয়েক পা এগিয়ে যাওয়া দেবরাজও শুনতে পেয়ে পেছন ফিরে তাকায়। উলটো দিকে সাখাওয়াত তখন বলছেন, 'ইট ওয়াজ ওয়ান অফ দ্য বডিগার্ডস অফ দ্য সিএম— আজ ভোর বেলা পার্ক সার্কাসের কাছে একটা অ্যাকশনে মারা গেছে সে... ইউ কাম হিয়ার ফাস্ট, উই নিড টু টাই ফিউ লুজ এন্ডস বিফোর গোয়িং ব্যাক টু দিল্লি!'

'শিওর স্যর!'

খুব ভালো খবর। ফোনটা নামিয়ে লিফটে করে নামতে নামতে আর্য ভাবে। খুবই ভালো খবর। দুই দেশের প্রধানমন্ত্রীর জীবন নিয়ে এই ঝুঁকিপূর্ণ বাজি রাখা তার না-পসন্দ ছিল। কিন্তু সে খুশি হতে পারছে না কেন?

দীর্ঘ সময় শত্রুপক্ষের ডেরায় তাদের বুকের ওপর বসবাস করতে করতে আর্যর ভেতরে একটা অদ্ভুত অনুভূতির জন্ম হয়েছে। তার মন যেন বিপদের আশঙ্কা পেলে একটু আগে থেকেই সিগন্যাল দেয়।

কেন কে জানে, ওর মন পুরোপুরি আনন্দিত হতে পারছে না।

আল আহসান আমিনের গলায় সর্দি বসেছে। এই বয়সে আর শরীরের দোষ দেওয়া যায় না। উপস্থিত সবার মধ্যে ইনিই সবচেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ! গলাখাঁকারি দিয়ে কফটাকে ভেতরে চালান করে তিনি সামনে রাখা স্পিকার ফোনে বললেন, ‘শায়র সাহাব! উধার সে খুশখবরি তো নেহি আ রহি হ্যায়! ইস বারে মে কেয়া বাতানা হ্যায় আপকো?’

‘কী যে বলেন জনাব! আপনার কি আমার ওপর ভরসা নেই?’

‘তা আছে। কিন্তু আমি ছাড়াও এখানে অনেকে আছেন...’ তাঁর কথা কেটে আইএসআই-এর রহমত চৌধরি একটু ঝুঁকে বলে ওঠেন, 'সাদিক, আশা করি তুমি জানো, উই কান্ট অ্যাফোর্ড দ্য স্লাইটেস্ট মিসটেক হিয়ার!’

‘দেয়ার ওন্ট বি স্যর!

‘তাহলে, এই যে লোকটি মারা গেল, এর শাহাদত বৃথা যাবে না তো?’ আজিজ খান বলে ওঠেন।

সাদিক ইসমাইলের হাসির আওয়াজ স্পষ্ট পাওয়া যায় স্পিকারে। সে অল্প হেসে বলে ওঠে, ‘শাহাদাতের কথা আমি বুঝি না মিয়াঁ! ওসব যারা দেশপ্রেম দেশপ্রেম খেলেন, তারা জানেন। আমি খেলোয়াড়। শতরঞ্জ খেলি। সেখানে ইমোশন নয়, ক্যালকুলেশন, হিসেবই শেষ কথা বলে।

‘তা, আপনার ক্যালকুলেশন কী বলছে?’

‘দ্য মিশন ইজ স্টিল ভেরি মাচ অন, গাইজ! ইন ফ্যাক্ট, ইট ইজ রাইট অন ট্র্যাক!!

অষ্টাবিংশ অধ্যায়
।।দ্য কর্নার্ড কিং।।

দৈনিক সত্যবার্তা

দিগ্বিজয়ী পরীক্ষিৎ: কলকাতা পুলিশের রোমহর্ষক সাফল্য প্রধানমন্ত্রীকে খুন করার বিদেশি ষড়যন্ত্র ব্যর্থ, আততায়ী মৃত
- মোনালিসা দাস

আজ ভোররাত্রে পার্ক সার্কাস সেভেন পয়েন্ট ক্রসিং-এ কলকাতা পুলিশের সশস্ত্র বাহিনীর সঙ্গে গুলির লড়াইতে মৃত্যু হল এক বিদেশি আততায়ীর। সংঘর্ষে শহীদ হয়েছেন এক পুলিশকর্মীও। নিহত পুলিশকর্মীর নাম বা অন্যান্য বিশদ বিবরণ এখনও জানা যায়নি।

পুলিশের সূত্রে খবরে প্রকাশ, কয়েক সপ্তাহ আগেই তাঁরা গোয়েন্দা দপ্তর সূত্রে খবর পান আগামীকাল কলকাতায় হতে চলা ভারত ও পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর যৌথ সফরে একটি বড়সড় ধরনের নাশকতামূলক হামলার সম্ভাবনা রয়েছে। গোয়েন্দা প্রধান শ্রী পরীক্ষিৎ দাশগুপ্তর কথা থেকে জানতে পারা যায় যে বিগত কয়েক সপ্তাহ ধরেই এই নিয়ে কলকাতা পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চ তদন্ত করছিল।

মাঝে কিছুদিনের জন্য নিখোঁজ হওয়া মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী অখিলেশ রায়ের পুত্র শ্রী অভিজাত রায়ের দেহরক্ষী বেদ ভিওয়ানির ওপর তাঁদের প্রাথমিক সন্দেহ পড়ে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে অভিজাত রায়ের সঙ্গেই বেদ ভিওয়ানিও নিখোঁজ হয়েছিলেন। মাত্র দু' দিন আগে তাঁদের দুজনকেই মারাত্মক আহত অবস্থায় এস. এস. কে. এম. হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছিল।

সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের তালিকায় থাকার কারণেই আহত অবস্থাতেও বেদ ভিওয়ানির ওপর থেকে নজরদারি সরায়নি পুলিশ। তাদের এই অতন্দ্র কর্তব্যনিষ্ঠারই ফল তাঁরা পেলেন আজ। বেদ ভিওয়ানি পাহারাদারের চোখে ধুলো দিয়ে পালাতে গিয়ে অসমর্থ হন। ফলস্বরূপ তিনি গুলি চালিয়ে বাঁচার চেষ্টা করেন। তার সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন দুই কম্যা ।

তাঁদের একজন ঘটনাস্থলে দুষ্কৃতীর হাতে মারা গেলেও শেষমেশ অন্য কম্যান্ডোর গুলিতে বেদ ভিওয়ানিরও ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়।

বেদ ছাড়াও এই ঘটনার সঙ্গে কে বা কারা জড়িত তা এখনও জানতে পারা যায়নি। পুলিশ সূত্রে খবর তদন্ত চালু থাকবে, তবে এখনও পর্যন্ত যা তথ্য পাওয়া গেছে তাতে এটি বেদ ভিওয়ানির একক ষড়যন্ত্র হওয়াও সম্ভব।

নিরাপত্তা বিষয়ক এই উদ্বেগজনক খবরের সূত্র ধরে দৈনিক সত্যবার্তার পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা শ্রী রঘু শেখরণ জানান, 'এই সফরের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে গুরুত্ব অসীম! আমাদের গোয়েন্দা, পুলিশ ও নিরাপত্তারক্ষীদের ওপর আমাদের পূর্ণ আস্থা আছে। এই ঘটনা আবারও প্রমাণ করে সেই আস্থা অমূলক নয়।

কালকের কলকাতা সফরের ব্যাপারে দুই প্রধানমন্ত্রীই সহমত। যে কোনো মূল্যে এই মৈত্রী সফর হচ্ছেই।'

এই উপমহাদেশের এবং সম্ভবত আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেরও এই সময়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সফরের প্রাক্কালে কলকাতা পুলিশের এরকম সাফল্য কি আমাদের এই সফরের নিরাপত্তার বিষয়ে আরও বিশ্বাসী করে তুলবে নাকি এই আক্রমণ অন্য কোনো বৃহত্তর নাশক পরিকল্পনারই ইঙ্গিত?

উত্তর লুকিয়ে আছে সময়ের গর্ভে।

এমনিতে বাংলা বলতে আর্য রীতিমতো স্বচ্ছন্দ। পড়তেও পারে। কিন্তু একটু হোঁচট খেয়ে খেয়ে। তাই এইটুকু লেখা পড়তেও বেশ খানিকটা সময় লাগল। এখন যদিও তার কোনো ব্যস্ততা নেই। সেই সকালের ফ্ল্যাটেই সে ফিরে এসেছে সাখাওয়াতের ফোন পেয়ে। সেরকমই কথা হয়েছিল।

মন খচখচ করছিল যদিও। কিন্তু ট্রেনিং-এর রগড়ানিতে ক্ষুরধার ইনস্টিংক্ট জানে, তার কাছে সব তথ্য নেই। আর সব তথ্য না থাকা অবস্থায় ইনস্টিংক্ট ফলো করা সর্বনেশে হতে পারে। তাই সে ফিরে গিয়ে অপেক্ষা করাই স্থির করেছিল।

যদিও এতক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে তা সে ভাবেনি। এই ফ্ল্যাটে সে ফিরেছে প্রায় ঘণ্টা খানেক হতে চলল। পরিকল্পনামাফিক ফ্ল্যাটের প্রতিটা কোণ থেকে নিজেদের অস্তিত্বের চিহ্ন মুছে দিয়েছে। সম্ভাব্য যে সমস্ত জায়গায় ফিঙ্গারপ্রিন্ট থাকতে পারত, সেগুলো সব পরিষ্কার করে মোছা, নিজেদের ব্যবহার করা কাগজপত্র নিঃশেষে পুড়িয়ে ফেলা— এই সব করতে কিছুটা টাইম গেছে।

এরপর কিছু কাজ বাকি থেকে যায়। প্রমাণ প্ল্যান্ট করার। খুব সম্ভবত সাখাওয়াতস্যর এখনও, এত কিছুর পরেও চাইবেন অরিজিনাল প্ল্যান-মাফিক এগোতে। সেটা তিনি এলে তবেই বোঝা যাবে।

ততক্ষণে সে বাথরুমে গিয়ে প্রাণ ভরে স্নান করে ফ্রেশ হয়েছে। ফিল্ডে শেখা। যখন যে সুবিধেটুকু পাচ্ছ, নিয়ে নাও। এর পরে কবে, কোথায়, কী পাবে, কোনো গ্যারান্টি নেই। স্নান সেরে, নিজের ব্যাগ গুছিয়ে, একটা ফ্রেশ জিন্স-টিশার্ট গায়ে চাপিয়ে সে ফ্রিজ খুলেছিল। পাওয়া গেছিল একটা বিয়ারের বোতল। সেটা নিয়ে সে বসেছিল জানলার ধারের চেয়ারটায়।

একমাত্র এই কাগজটাই খবরটা করেছে সন্ধে বেলা। ফুটপাথে কাগজ বিছিয়ে বসে থাকা হকারের সামনে রাখা কাগজের হেডলাইন চোখে পড়তেই সে আকৃষ্ট হয়ে কিনেছিল। পুরো একটা বোতল শেষ হয়ে গেল সোয়া পাতার রিপোর্টটা পড়তে পড়তে। কিন্তু সাখাওয়াতের তবু দেখা নেই। একটু আশ্চর্যই লাগে আর্যর।

তার আজকে রাত্রেই বেরিয়ে যাওয়ার কথা। দু' দিন ছুটি। তার পরেই ইউনিটে রিপোর্ট করবে। সেরকমই কথা বলা আছে। সাখাওয়াত কবে, কোথায়, কখন যাবেন আর্য জানে না।

সত্যি কথা বলতে কী, সাখাওয়াতের সম্বন্ধে সে বিশেষ কিছুই জানে না। শুধু এই কয়েক সপ্তাহ একসঙ্গে কাজ করতে গিয়ে যেটা দেখেছে— ভদ্রলোক অসম্ভব থরো! কোনো খুঁটিনাটিই প্রায় নজর এড়ায় না। মাথা ঠান্ডা, প্রচণ্ড হিসেবি এবং একইসঙ্গে পরিশ্রমী। শর্টকাট বোঝেন না। একটা শীতল নিষ্ঠুরতা বাসা বেঁধে আছে এই লোকটার আপাত উষ্ণ ছা-পোষা ব্যবহারের মধ্যে। নিজের লক্ষ্যপূরণের প্রয়োজনে প্রিয়তমের গলায় ছুরি বসতেও দ্বিধা করে না যে নিষ্ঠুরতা, সেই আদিম স্বভাব ছাপ রেখে গেছে ভদ্রলোকের চোখে-মুখে।

এই ধরনের লোকের মহড়া নেওয়া খুব শক্ত। কেউই এর বিরুদ্ধে যেতে চাইবে না চট করে।

কিন্তু আর্যকে শেখানো হয়েছে এই পৃথিবীতে কেউ অজেয় নয়। প্রত্যেকের কিছু-না-কিছু দুর্বলতা থাকে। সেই জায়গাটা খুঁজে বের করতে হয়। আর্যর বিশ্বাস, ও এই লোকটির সেই দুর্বল জায়গাটা খুঁজে পেয়েছে। অসম্ভব ক্ষমতালোভী এই মানুষটি। ক্ষমতার কাছাকাছি থাকার জন্য নিজের মেধা, পরিশ্রম, দক্ষতা— সব কিছু বাজি ধরতে পারেন। সবরকমের সমঝোতা করতে প্রস্তুত থাকেন। এখন এই তথ্যটা কোনো কাজে লাগবে না। তবে ভবিষ্যতে কখনো...

ভাবতে ভাবতে টেবিলে রাখা মোবাইলটা তুলে সবে ফোন করতে যাবে সে, হঠাৎ দরজায় খুটখাট আওয়াজ ভেসে আসে। মুহূর্তের মধ্যে বিদ্যুবেগে উঠে দাঁড়ায় সে। চোখের পলক ফেলার আগে প্রতিবর্ত ক্রিয়ায় সাইড হোলস্টার থেকে বেরিয়ে এসেছে সিগ সয়ার পি থ্রি টুয়েন্টি!

দরজা খুলে ঘরে ঢোকেন সাখাওয়াত। ঢোকামাত্র আর্যকে দেখে তাঁর ভুরু কুঁচকে যায়। আর্য লজ্জা পেয়ে পিস্তলটা হোলস্টারে ভরতে ভরতে বলে, 'এক্সট্রিমলি সরি স্যর! আমি ভুলে গেছিলাম যে একটা চাবি আপনার কাছেও আছে।'

'প্লিজ, ডোন্ট বি।' মুচকি হাসেন সাখাওয়াত, 'দোষটা তো আমারই। ঘরে সশস্ত্র কম্যান্ডো থাকাকালীন আন-অ্যানাউন্সড ঢোকাটা কোনো কাজের কথা নয়।' এবারে আর্যও হেসে ফেলে। তারপর বলে, 'আই হ্যাভ ক্লিনড এভরিথিং স্যর। তো, টাচ করবার সময়, প্লিজ বি কেয়ারফুল। আপনি বাথরুমে ফ্রেশ হয়ে নিতে পারেন। বাট আফটার দ্যাট, আই ওয়ান্ট টু টেল ইউ সামথিং, ইফ ইট ইজ ওকে...'

সাখাওয়াত ততক্ষণে ফ্রিজ খুলে আরও একটা বিয়ারের বোতল বার করে ফেলেছেন। একটা চেয়ার টেনে এনে আর্যর সামনে বসতে বসতে তিনি একটু মজা পাওয়া গলাতেই বললেন, 'আমি ঠিক এই ভয়টাই পাচ্ছিলাম। তুমি বাপু যা প্রশ্ন আছে করেই ফেলো।'

আর্য খেয়াল না করে পারে না, সাখাওয়াত একটু বেশিই খুশি হয়ে আছেন। এই অবস্থায় সন্দেহের খচখচে কাঁটাটা দিয়ে না খোঁচাতে পারলেই ভালো হত। কিন্তু সেও নিজের কর্তব্যের কাছে বাঁধা। সন্দেহ যখন হয়েছে তখন তাকে বলতেই হবে সে কথা।

আর্য সবিস্তারে তার সকাল থেকে অনুসন্ধানের গল্প শোনায়। কীভাবে সে টার্গেট বিল্ডিং ন্যারো ডাউন করেছে। কোন কোন কারণে বিল্ডিংগুলো বাতিল করেছে। কথার ফাঁকে ফাঁকে সাখাওয়াত হুঁ-হাঁ করে মাথা নেড়ে চলেন। সবটাই প্রশংসাসূচক সম্মতি।

শেষে সে বলতে থাকে 'দ্য স্টাডস'-এর এপিসোড। কীভাবে সে সেখানকার দুই এমপ্লয়ির কথোপকথন ওভারহিয়ার করে। তারপর কীভাবে পুলিশ সেজে গিয়ে লোকটার সঙ্গে দেখা করে আসে। প্রায় পনেরো মিনিট সে নাগাড়ে কথা বলে যায়। পুরো সময়টা জুড়ে মাঝে মধ্যে হুঁ-হাঁ করা ছাড়া সাখাওয়াত কোনো কথা বলেননি। মিটিমিটি হেসেছেন আর টুকটুক করে চুমুক দিয়েছেন বিয়ারের বোতলে। নিজের কথা শেষ করে আর্য চোখে-মুখে প্রত্যাশা মেখে তাকায় বর্ষীয়ান গোয়েন্দার দিকে।

সাখাওয়াতও তার দিকেই তাকিয়ে আছেন। মুখে হাসি মেখেই তিনি বলেন, 'তাহলে ব্যাপারটা কী দাঁড়াল? প্রশ্নগুলো কোথায়? একটা রিক্যাপ হোক, নাকি?'

'সেটা কীরকম, স্যর?'

'এমন কিছু না। আমি তোমার সন্দেহের জায়গাগুলো নিয়ে প্রশ্ন করব। তুমি উত্তর দেবে। দেখা যাক সেগুলো স্যাটিসফ্যাক্টরি মনে হয়, নাকি হিসেবে গরমিল থেকে যায় কোথাও। ওকে?'

'ওকে!'

'বেশ, লোকটা খোঁড়া হওয়া সত্ত্বেও ক্রাচ না নিয়ে বেরোল কেন?'

'হয়তো নিয়েই বেরিয়েছেন। ছেলেটা দেখতে ভুল করেছে।'

'হুম। পসিবল। সবচে' বড় কথা আমাদের মধ্যে ইনহেরেন্ট একটা স্বভাব থাকে—

আমাদের গুরুত্ব পেতে ভালো লাগে। এই ভিভিআইপি ভিজিটর আসার আগে সাজো সাজো পরিবেশে, হয়তো ছেলেটা একটু ইম্পর্ট্যান্স পেতে চেয়েছে। কিন্তু যদি সে ভুল না দেখে থাকে?'

'হয়তো রাজকুমারবাবু ভুলে গেছিলেন নিয়ে যেতে? সেটাও তো সম্ভব। মানে ধরুন, ঘরে ঢুকে উনি বাথরুমে গেলেন ক্রাচ নিয়ে। বাথরুম থেকে ফিরে এসেই মনে পড়ল কিছু একটা কেনা হয়নি। ক্রাচ বিছানায় পড়ে রইল। উনি চলে গেলেন জিনিসটা কিনে আনতে।'

বলতে বলতে আর্য টের পাচ্ছিল, এরকম পয়েন্টেড প্রশ্ন-উত্তরের খেলায় তার মনের অগোছালো চিন্তাগুলোও গুছিয়ে আসছে।

'বেশ। কী কিনলেন, কীভাবে পে করলেন?'

'পে, মানে, টাকাপয়সা, ডেবিট কার্ড...' প্রশ্নটা বুঝতে না পেরে একটু ইতস্তত করে আর্য। সাখাওয়াত বলেন, 'তা, সেগুলো কোথায় রাখা থাকে? পকেটে না ওয়ালেটে?'

'ওয়ালেটে।' আর্যর মুখ থেকে কথাটা খসে পড়ামাত্র যেন ঝাঁপিয়ে পড়ে পরের প্রশ্নটা করেন সাখাওয়াত, 'তা, আমরা সবাই তো ওয়ালেটে কোনো-নাকোনো ফটো আইডি রাখি। যখন নেক্সট টাইম ফেরত এলেন হোটেলে, তখন কি ওঁর ওয়ালেটেও কোনো আইডি ছিল না? থাকলে, দেখিয়ে দিলেই তো মিটে যেত।'

'হয়তো....... হয়তো.....' আর্য আমতা আমতা করে।

সাখাওয়াত তার দিকে তাকিয়েই থাকেন একদৃষ্টে। আর্য মরিয়া হয়ে বলে, 'হয়তো ছিল। উনি দেখাতে চাননি। ইগো। ওরকম উঁচু দরের হোটেলে উঠেছেন যখন তখন নিশ্চয়ই অবস্থাপন্ন মানুষ। এরা অনেকসময়ই নিয়মকানুন মানতে চায় না। মনে করে সেসব তাদের জন্য নয়।'

সাখাওয়াতের মুখের হাসিটা আরও একটু স্পষ্ট হয়।

'গুড! ইয়েস, ভেরি মাচ পসিবল! তা, তুমি যখন ওঁকে দেখলে, কথা বললে— সেরকম মানুষ বলে মনে হল কি?'

'আই হার্ডলি স্পোক টু হিম ফর ফিউ সেকেন্ডস! তার মধ্যে সেরকম কিছু হিন্ট পাওয়া শক্ত। তাও— আর আমি তো গেছি তার কাছে ক্ষমা চাইতে!'

'ট্রু! তাহলে তো মিটেই গেল। তুমি নিজেই যথেষ্ট স্বাভাবিক কারণ দেখাতে পারছ ভদ্রলোকের আচরণের। দেয়ার ক্যুড বি মিলিয়ন আদার রিজনস বিহাইন্ড হোয়াই হি ডিড হোয়াট হি ডিড। আর সেগুলোর একটাও ক্রিমিনাল অফেন্স না-ই হতে পারে। দেন, দেয়ার ইজ নাথিং টু ওরি অ্যাবাউট!'

'রাইট স্যর!'

আর্য চুপ করে যায়। সত্যিই, যুক্তি দিয়ে দেখলে এখানে অস্বাভাবিক কিছুই চোখে পড়ছে না। তবু... তবু...

খচখচানিটা মনেই চেপে রেখে সে চেয়ার ছেড়ে ওঠে। ক্যাজুয়ালি সাখাওয়াতের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে, 'কিছু খাবেন স্যর?'

তার প্রশ্নকে অগ্রাহ্য করেই সাখাওয়াত পালটা প্রশ্ন করেন, 'ঠিক কী কারণে তুমি এই বিষয়টা তুললে বলো তো আর্য... আমার মনে হয় না এতক্ষণ যা সব আলোচনা হল সেগুলো তোমার অজানা ছিল। কিছু একটা আছে, যেটা তুমি আমায় বলছ না।'

আর্য কিচেন কাউন্টারের কাছে গিয়ে রান্নার জোগাড় দেখছিল। চকিতে ঘুরে সাখাওয়াতের দিকে তাকায়। ঘাঘু গোয়েন্দার নজর এড়ায়নি কিছুই। সে একটু লজ্জিত হাসি হেসে বলে, 'আসলে এমন দুটো ব্যাপারে খটকা স্যর, যেগুলো নিয়ে আমি নিজেই জোর দিয়ে কিছু বলতে পারব না।'

'শোনা যাক।'

'বেশ।' ঘুরে কাউন্টারে হেলান দিয়ে আর্য বলে, 'দুটো জিনিস আমার নজর কেড়েছে বিশেষভাবে। এক, লোকটার সঙ্গে যখন হ্যান্ডশেক করার জন্য হাত বাড়িয়েছিলাম, লোকটা

ক্রাচ ছেড়ে আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দেওয়ার সময় মনে হল একটু যেন টলে গেল। দেখে মনে হল, ক্রাচ নিয়ে চলতে যেন অভ্যস্ত নয়। আমার এক রিলেটিভ ক্রাচ ব্যবহার করেন। ক্লোজ রিলেটিভ। তার মুভমেন্টসগুলো আমার মগজে ছোট থেকে দেখে দেখে কোথাও রেজিস্টার করে গেছে। আজ এঁর মুভমেন্ট আলাদা করে নজরে পড়েছে বলেই বুঝতে পারছি দেয়ার ইজ সামথিং ডিফারেন্ট অ্যাবাউট ইট। নাথিং কংক্রিট! জাস্ট ইনটুইশন!'

'ইউ মাস্ট অলরেডি নো ইয়ং ম্যান, আশ্চর্যজনকভাবে এই জগতে ইনটুইশন, ইনস্টিংক্টের কদর সলিড ইনফর্মেশনের চেয়েও কখনো কখনো বেশি।' 'সেই জন্যই আপনার সঙ্গে শেয়ার করলাম স্যর!'

'গুড! হাউ অ্যাবাউট দ্য আদার থিং?'

'ইয়েস, কামিং টু ইট। ভদ্রলোকের ঘরে দুটো জিনিস আমার নজর কেড়েছে। দেওয়ালে লাগানো আয়নায় দেখতে পাচ্ছিলাম আলমারির ভেতরে রাখা একটা পোশাক— দেখে মনে হয় কিছু একটা ইউনিফর্ম গোত্রের। কোথাও একটা দেখেছি, কাউকে একটা দেখেছি এরকম ইউনিফর্ম পরে থাকতে। কিন্তু কিছুতেই মনে পড়ছে না। বাট, তার চেয়েও একটা ইম্পর্ট্যান্ট জিনিস দেখতে পেয়েছি স্যর। ওঁর ঘরের জানলা দিয়ে স্পষ্ট দেখা যায় মাতৃভাষা সদনের গেট। ঠিক পাশ দিয়ে লম্বালম্বি ওই মেট্রো রেলের এলিভেটেড ট্র্যাক চলে যাওয়ার ফলে লাইন অফ সাইট মেন্টেন করাও খুব সহজ। এয়ার ফ্রিকশনও কম হবে কেউ ফায়ার করলে!!'

'ইন্টারেস্টিং!' সাখাওয়াত চেয়ার ছেড়ে উঠে সিংকের কাছে বিয়ারের বোতলটা রেখে দিতে দিতে বলেন, 'কিন্তু অনেস্টলি স্পিকিং— পুলিশ সলিড কাজ করেছে। আমার এই বিষয়ে ডিটেলসে কথা হয়েছে কমিশনারের সঙ্গে। সেখানে, বেদ ভিওয়ানি বা তার ইমপস্টার, যে-ই বলো, মারা যাওয়ার পরে, আমাদের আর এই নিয়ে মাথা ঘামানোর দরকার থাকছে কি? দ্য থ্রেট সিমস টু বি ওভার! ইজন্ট ইট?'

'ইজ ইট স্যর?' দু' পা এগিয়ে আসে আর্য, 'হোয়াট ইফ ইট ইজ এ গ্যামবিট? হোয়াট ইফ দ্যাট গাই ইজ জাস্ট এ ডিকয়!'

ছায়া ছায়া ঘরের জানলার ওপর থেকে একটানে একটা ভারী পর্দা কেউ সরিয়ে দিল যেন। চোখ ধাঁধানো রোদ্দুরে যেন ভরে গেল চারিদিক। অন্ধকারে সয়ে যাওয়া চোখ যেন কুঁচকে গেল তীব্র আলোর উপস্থিতিতে। আর্যর মুখে 'গ্যামবিট' শব্দটা শোনামাত্র সাখাওয়াতের মাথায় আছড়ে পড়ল দু' বছর আগে এই শহরে এক ধুরন্ধর প্রতিপক্ষের সঙ্গে তাঁর পাঞ্জা লড়ার গল্প।

তাই তো। সকালেও তো এই কথা ভাবছিলেন। তখন তো মাথায় আসেনি যে এবারেও সেরকম কিছু হতে পারে। ঠিকই তো, হতেই পারে এটাও ঠিক সেরকমই ঠকানো চাল। উড়িয়ে দেওয়া যায় না সেই সম্ভাবনাকে।

এই পরিকল্পনার পেছনে আইএসআই-এর হাত থাকা অসম্ভব নয় মোটেই। আর যদি তারাই থাকে, তাহলে এর মধ্যে নিশ্চিত হওয়ার কোনো বিলাসিতা তো সত্যিই সাজে না। আফটার অল দ্য স্টেকস আর টু হাই!!

হাতঘড়ির দিকে এক বার তাকালেন সাখাওয়াত। রাত আটটা পনেরো। আর্যর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ইউ ব্রট এ ফিউ মোর ওয়ার্কিং আওয়ার্স ফর ইউ, ল্যাড! চলো, 'দ্য স্টাডস'-এ ডিনার করা যাক।

৩ আগস্ট, ২০১৮, রাত্রি বেলা / লালবাজার, কলকাতা, ভারত

কনফারেন্স রুম শুধু নয়, ঢেলে সাজানোর সময় প্রেস কনফারেন্সের জন্য বরাদ্দ ঘরটিকেও ঢেলে সাজানো হয়েছিল। এতটাই, যে অনেকদিন সেখানে না আসা কোনো লোক

হঠাৎ করে ঢুকলে মনে করবে কোনো পাঁচ তারা হোটেলের সুসজ্জিত লবিতে এসে ঢুকেছে।
,

সুবিশাল ঘরটি দামি সুদৃশ্য মার্বেলে মোড়া। আরামপ্রদ গদি-আঁটা চেয়ার। অন্তত দেড়শো-দুশো সাংবাদিকের একসঙ্গে বসার ব্যবস্থা। এ ছাড়াও প্রচুর ফাঁকা ফ্লোর স্পেস— আলোকচিত্রীদের জন্য। দেওয়ালে বেশ কিছু দামি পেন্টিং। মনেই হয় না কলকাতা পুলিশের সদর দপ্তর এটা।

আজ এত বড় ঘরেও তিলধারণের স্থান নেই। সাংবাদিক, আলোকচিত্রী, ইলেকট্রনিক মিডিয়ার প্রতিনিধি— ফেটে পড়ছে গোটা হল।

অরুণ যদিও সেখানে নেই। তিনি এই প্রেস রুম থেকে বেশ খানিকটা দূরে সেই কনফারেন্স রুমেই বসে আছেন। তাঁর এমনিতেই ভিড়ে ভয়। তায় স্বাভাবিক কারণেই তাঁর ওই মঞ্চে থাকার কোনো উপায় নেই। তিনি ছায়াজগতের মানুষ। পাদপ্রদীপের আলো তাঁর জন্য নয়।

তবে তাতে তাঁর কোনো আফশোস নেই। দিস ইজ আ জব ওয়েল ডান! যে দায়িত্ব তাঁকে দেওয়া হয়েছিল, তিনি খুশি সেই দায়িত্ব তিনি পালন করতে পেরেছেন। আর আধ ঘণ্টার মধ্যে কলকাতা এয়ারপোর্টে ল্যান্ড করবে এয়ার ইন্ডিয়া ওয়ান। দুই যুযুধান দেশের প্রধানমন্ত্রী মৈত্রী সফরে পা রাখবেন এই সিটি অফ জয়-এর বুকে। তার অনেক আগেই, তাঁদের জীবনের ওপর অজানা মৃত্যুর যে সর্বনাশা ছায়া পড়েছিল, তা দূর করে দেওয়া গেছে।

স্বয়ং শেখরণ তাকে পার্সোনালি ফোন করে অভিনন্দন জানিয়েছেন। গোটা তদন্তকারী টিমের মধ্যেই একটা খুশির আবহাওয়া। একটাই খারাপ খবর— সিদ্ধান্ত চতুর্বেদীর মৃত্যু। সাতাশ বছরের প্রাণবন্ত এক জন যুবকের মৃত্যু সবসময় তীব্র দুঃখজনক। তার কোনো সান্ত্বনাও হয় না। তবে শেখরণ তাকে কথা দিয়েছেন সিদ্ধান্ত এবং সীমা— দুজনের জন্যই বড়সড় রাষ্ট্রীয় সম্মান অপেক্ষা করে আছে।

কনফারেন্স রুমের টিভির পর্দায় তখন ত্রিদিবেশের নায়কোচিত হাবভাব। যা করেননি, যার পেছনে তাঁর বিন্দুমাত্র অবদান নেই, সেই কাজেরও কৃতিত্ব এত নির্লজ্জভাবে কুড়িয়ে নিতে বিশেষ কাউকে দেখেননি অরুণ। সেসব সহ্য করতে না পেরেই হয়তো পরীক্ষিৎ উঠে চলে গেলেন প্রেসরুম ছেড়ে, ফোন আসার অজুহাতে।

নিজের মনেই মুচকি হেসে ওঠেন অরুণ।

হঠাৎই সশব্দে কনফারেন্স রুমের দরজা খুলে ঢোকেন পরীক্ষিৎ। তাঁর চোখ-মুখ সাদা, বিবর্ণ! অরুণ চমকে তাকান তার দিকে। একটু আশ্চর্য হয়েই বলেন, ‘কী হয়েছে পরীক্ষিৎ? আর ইউ ফিলিং আনওয়েল?’

‘স্যর, উই ফাক্ড আপ!

‘সরি?!’

‘স্যর, আপনার মনে আছে আপনাকে বলেছিলাম ধাড়সার আশ্রমের সেই মেয়েটির কথা— যে প্রথম আমাকে লিড দেয়!’

‘ইয়েস, বন্যা!’ পরীক্ষিৎ চমৎকৃত হয়। এরকম অকিঞ্চিৎকর এক জনের নামও মনে রেখেছে লোকটা। এলেম আছে! অরুণ না থেমেই জিজ্ঞাসা করেন, ‘কী হয়েছে তার?

‘না, তার কিছু হয়নি স্যর! কিন্তু সে এইমাত্র ফোন করেছিল, নিজে থেকে। আমি ওকে আমার মোবাইল নম্বর দিয়ে রেখেছিলাম। খবরে যে বেদ ভিওয়ানিকে দেখানো হয়েছে, বন্যা বলছে ও যাকে সেদিন রাত্রে দেখেছে, এ সে নয়।'

‘হাউ ইজ শি সো শিওর?’

‘লোকটার মুখটা নাকি ও স্পষ্ট দেখেছে ফোনের আলোয়। সেটা সম্পূর্ণ আলাদা মুখ।'

এক মিনিট গুম হয়ে বসে রইলেন অরুণ সচদেভ। এই আকস্মিক অপ্রত্যাশিত

খবরটা আত্মস্থ করতে একটু সময় লাগল।

ফিল্ড অপারেশন তিনি কখনো করেননি। সেখানকার ব্যাকরণ আলাদা। অন্যরকমের ফ্লেক্সিবিলিটি, দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা, ইনটুইশন, ইনস্টিংক্ট— এসব কিছুই তার নেই। দিশাহারা লাগছে তার একটু।

চুপ করে বসে তিনি নিজের চিন্তাটা গোছানোর চেষ্টা করলেন। নিজেকেই নিজে বলতে শুরু করলেন, তুমি একজন অ্যানালিস্ট। দুনিয়ার সমস্ত কোণ থেকে পাওয়া ডেটা, ইনফর্মেশনের ভিড় থেকে, সেই আপাত অগোছালো, বৈশিষ্ট্যহীন তথ্য থেকে প্যাটার্ন খুঁজে বের করা এবং তার ওপর নির্ভর করে ভবিষ্যতের কর্মপন্থার দিক্‌নির্দেশ করাই তোমার কাজ। ইউ আর ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ইন দিস কান্ট্রি, হোয়াইল ডুইং সো!

তো, সেটাই করো, যেটা তুমি ভালো পারো।

যখন মুখ তুলে তাকালেন অরুণ, পরীক্ষিৎ দেখে অবাক হয়ে গেলেন, একটু আগের সেই বিভ্রান্তি, সেই ভয়ার্ত চাউনি উধাও। ততক্ষণে পরীক্ষিৎতের দুই লেফটেন্যান্ট প্রতিম আর নির্মাণও তাদের প্রিয় স্যারের পাশে এসে হাজির। এক জোড়া স্থিতপ্রজ্ঞ চোখ তাদের দিকে মেলে অরুণ শান্ত স্বরে বললেন, 'সেই মেয়েটি কি আছে প্রেস কনফারেন্সে? ওই জার্নালিস্ট মেয়েটি?'

'কে স্যর? মোনালিসা?' নির্মাণ তড়বড়িয়ে বলে, 'আছে, আছে, আমি দেখেছি।'

পরীক্ষিৎ একটু আশ্চর্য হয়ে তার দিকে তাকাতেই নির্মাণ লজ্জায় একটু কুঁকড়ে যায়। বলে, 'না, মানে, সামনের দিকেই বসে আছেন, আমি দেখেছি।'

'ওকে। পরীক্ষিৎ, কাউকে অ্যালার্ম না করে, ওকে আগে ডেকে আনার বন্দোবস্ত করুন। সেইসঙ্গে কমিশনার সাহেবকে মেসেজ পাঠান, এবারে তাঁর নির্বাচনী প্রচার বন্ধ করে এখানে আসতে। আই নিড হিম।'

পরীক্ষিৎ ঘুরে তাকানোর আগেই নির্মাণ দৌড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়, আজ্ঞা পালন করতে। সে ছুটতে ছুটতেও অনুভব করে তার বস তার দিকে তখন আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে আছে।

'আরও দুজন ছিল না? জয়দীপ আর কী যেন নাম ওই ছেলেটি, বারুইপুর থানা থেকে এসেছে...'

'জয়দীপকে পেয়ে যাবেন স্যর। এখুনি ডেকে পাঠাচ্ছি। প্রদীপবাবু আর রাজেশের তো এতক্ষণে বেরিয়ে যাওয়ার কথা... দেখছি আমি...'

'বেরিয়ে যাবেন কেন? আই গেভ দেম আ টাস্ক টু কমপ্লিট!'

'শিওর স্যর, দেখছি।' একটু অপ্রস্তুত হয়ে যান পরীক্ষিৎ। আসলে তিনিই ওদের বলেছিলেন চলে যেতে। সকালের ঘটনার পরে ভাবেননি আর ওদের দরকার লাগতে পারে। ততক্ষণে প্রতিম কল করেছে জয়দীপকে। জয়দীপ আশেপাশেই কোথাও ছিল। সঙ্গে সঙ্গে হন্তদন্ত হয়ে এসে ঢুকতেই পরীক্ষিৎ তার ওপর ফেটে পড়ে হঠাৎ, 'কোথায় থাকো দরকারের সময়? বেদ ছাড়া বাকি বডিগার্ডদের ডেটা চেক করেছিলে?'

'হ্যাঁ স্যর। সেটাই করছিলাম। কম তো নয়। এসপিজি গ্রুপ আর সিএমএর নিজস্ব সিকিউরিটি ডিটেল নিয়ে প্রায় তিনশো জন। ধরে ধরে সব চেক করতে হচ্ছে। মোটামুটি শেষ। এখনও অবধি কোনো অ্যানোমালি নেই।'

'মোটামুটি বলে কোনো কথা হয় না। বাকিগুলো শেষ করতে কত টাইম লাগবে আর?'

জয়দীপ কিছু উত্তর দেওয়ার আগেই অরুণ বলে ওঠেন, 'জয়দীপ, আপনি কি সিএম-এর সিকিউরিটি ডিটেলে থাকা লোকগুলোর রেকর্ড আগে চেক করেছেন?'

'হ্যাঁ স্যর। আমার ধারণা এসপিজি গ্রুপে ইনফিল্ট্রেট করা শক্ত। দে আর অলওয়েজ আন্ডার রেডার, আফটার এইট্টি ফোর!'

সপ্রশংস দৃষ্টিতে তার দিকে এক বার তাকান অরুণ। টিমটা সত্যিই ভালো। স্বাভাবিক বুদ্ধি আছে এদের। একটু ভেবে নিয়ে তিনি বলেন, 'তাহলে এক্ষুনি বাকিগুলো চেক না করলেও চলবে।'

জয়দীপ কিছু একটা বলতে যায়। ততক্ষণে দৌড়োতে দৌড়োতে ঘরে ঢুকেছে রাজেশ। ঢুকেই হাঁপাতে হাঁপাতে সে বলে, 'বলুন স্যর! আমি প্রায় বেরিয়েই যাচ্ছিলাম। এই ম্যাডামের সঙ্গে গল্প করছিলাম বলে ক্যাম্পাসেই পেয়ে গেলেন আমাকে।'

ম্যাডামটি কে? আন্দাজ করতে কষ্ট হয় না। পেছনে পেছনেই নির্মাণের সঙ্গে ঢুকছে মোনালিসা। অরুণ তিলমাত্র সময় নষ্ট না করে মোনালিসাকে বলেন, 'আপনার এক্স-বয়ফ্রেন্ড, যিনি নিখোঁজ, তাঁর ফ্ল্যাটের ঠিকানাটা দরকার। নির্মাণ, আপনি ওটা নোট করে নিয়ে ম্যাডামকে ছেড়ে দিয়ে আসুন। আর ম্যাডাম, একটা কথা... স্কুপ যা পাওয়ার আপনি পেয়ে গেছেন। আমাদের এই মিটিং-এর ব্যাপারে কোনো কথা কালকের সকালের কাগজে যেন না বেরোয়।

মোনালিসা ব্যাগ থেকে পেন বার করছিল। সে অরুণের গলার স্বরেই টের পেয়েছে এখন আর সময় নষ্ট করার মতো সময় নেই। সে ঠিকানাটা দ্রুত একটা কাগজের টুকরোতে লিখে দিতে দিতে বলে, 'খবরটা আমি প্রথমে পাব তো, স্যর?' 'উই উইল সি!'

এখানকার পুলিশদের মতো বোকামি করে তিনি এই সব জার্নালিস্টদের এনকারেজ করতে রাজি নন। বিন্দুমাত্র সময় নষ্ট না করে তিনি রাজেশের দিকে ফেরেন, 'ডিড ইউ গেট দ্য পিকচার?'

'নট পিকচার স্যর, পিকচার্স! একটু বেশি টাইম পেয়েছিলাম তো...'

তাকে মাঝপথে থামিয়ে পরীক্ষিৎ অধৈর্য গলায় বলে ওঠেন, 'পিকচার্স?

'হ্যাঁ স্যর। মুঙ্গের পুলিশের সঙ্গে আমার ডিটেলস কথা হয়েছে। ওরা যাকে হেফাজতে নিয়েছে তার এই আন্ডারওয়ার্ল্ড সার্কিটে বিশাল নামডাক। সবাই ভাতিজা বলে চেনে তাকে। সে বলেছে তার কাছে অল্প কয়েক দিনের ব্যবধানে এক জন নয়, দু-দু' জন এসেছিল স্নাইপার রাইফেল কিনতে। প্রথম জন কিনে নিয়ে চলে যায়। পরে যে দুজন আসে, তারাও একই জিনিস কিনতে চাওয়ায় তার সন্দেহ হয়। সে লোক লাগাতে, তারা সেসব লোকদের খুন করে, ওকে মেরেধরে, বন্দুক না নিয়েই চলে যায়। ভাতিজার ডেসক্রিপশন অনুযায়ী ওদের আর্টিস্ট তিনটে ছবি দিয়েছে। ওরা সেগুলো ফ্যাক্স করে দিয়েছিল দুপুর বেলাতেই।'

রাজেশ নিজের হাতের একটা ফাইল থেকে তিনটে পেন্সিল স্কেচ বের করে টেবিলে সাজিয়ে দেয়। পরীক্ষিৎ তার ওপর ঝুঁকে পড়েন। অরুণও। একদৃষ্টে ছবিগুলো দেখতে দেখতে তিনি রাজেশকে একটু কড়া গলায় বলেন, 'ছবিগুলো আগে দেননি কেন?'

'স্যর, ওই ব্যাপারটার পরে আমি ভাবলাম, মানে, আই থট দিস ইজ ওভার!'

মুখ না তুলেই চিবিয়ে চিবিয়ে র-এর অ্যানালিস্ট বলেন, 'ইটস নট ইওর জব টু থিংক, স্যর! ইট ইজ মাইন...'

রাজেশ ঘাবড়ায় না। সে একটা স্কেচের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলে, 'এই লোকটাই শামসুদ্দিন আলম স্যর। আইএম-এর অ্যাসেট। ভাতিজা বলেছে ওর সঙ্গের লোকটার নাম নাকি জব্বার... এই, এই লোকটা। ও-ও আইএম!'

পরীক্ষিৎ খেয়াল করেন, অরুণের কানে বোধহয় রাজেশের বলা কোনো কথাই যাচ্ছে না। তিনি মন্ত্রমুগ্ধের মতো চেয়ে আছেন তৃতীয় ছবিটার দিকে। একটা বয়স্ক মুখের স্কেচ। চৌকো চোয়াল, সোজা ভুরু। পরীক্ষিৎ আঙুলের ইশারায় রাজেশকে চুপ করতে বলেন।

গোটা ঘর নিস্তব্ধ হয়ে যায়। আর ঠিক সেই সময়েই জয়দীপ বলে ওঠে, 'স্যর, একটা কথা বলব বলব করে সময় পাচ্ছি না। বলব?'

বিরক্ত হয়ে পরীক্ষিৎ একটা দাবড়ানি দিতে যাবেন, ঠিক সেই সময়েই মুখ তুলে অরুণ বলেন, 'বলুন জয়দীপ, কী বলবেন?'

'স্যর, আমাদের হটলাইনে একটা কল এসেছিল। আমরা তো সব জায়গায় লোককে সাবধান করছিলাম। সন্দেহজনক কিছু দেখলে জানাতে বলেছিলাম। কল বেশি আসেনি। আমাদের এদিকের লোকজনকে তো চেনেন, কেউই পুলিশের আমিই লাফড়ায় পড়তে চায় না। কিন্তু একটা কল এসেছিল। কেউ না থাকায়, ধরেছিলাম। নিউটাউনের ওদিকে একটা হোটেল আছে, 'দ্য স্টাডস'! বড় হোটেল। ওখানকার রিসেপশন থেকে ফোন এসেছিল। একজন বোর্ডারের হাবভাব নাকি ছেলেটার ঠিকঠাক মনে হয়নি। কেন, ঠিক পরিষ্কার করে বলতে পারেনি। কীসব বলছিল ক্রাচ-ফাচ নিয়ে...'

ক্রাচ— শব্দটা কানে যেতেই যেন ধ্যান ভেঙে ওঠেন অরুণ।

'ক্রাচ, ইউ সেড?'

'হ্যাঁ, মানে লোকটা খোঁড়া, এরকমই তো বলল মনে হল...'

তার কথা শেষ না করতে দিয়েই অরুণ পরীক্ষিৎকে বলেন, 'আমাদের অন্তত কুড়ি জনের টিম দরকার। আর্মড। প্লেন ড্রেস। পাওয়া যাবে?'

'ইয়েস স্যর!' আড়চোখে পরীক্ষিৎ এক বার দেখেন। টিভির পর্দায় দেখা যাচ্ছে কমিশনার প্রেস কনফারেন্স শেষ করেছেন। এবারে এখানে চলে আসবেন। অরুণ থামেন না। বলে চলেন, 'একটা টিম নিয়ে আপনি যান মোনালিসার বলা ঠিকানায়। এই স্কেচগুলোর কপি যেন টিমের সবার হাতে থাকে। তবে খোঁজার সময়, প্রাইমারিলি আপনারা প্রথম দুজন অর্থাৎ শামসুদ্দিন আর জব্বারকে খোঁজার দিকে নজর দিন।'

'হোয়াট অ্যাবাউট দ্য আদার ওয়ান স্যর?'

'দেখুন, শামসুদ্দিন এই জায়গার লোক। কোনো ফ্ল্যাট খালি করিয়ে সেখানে ঢুকতে যে লোকাল লিংক লাগবে সেটা তারই থাকা বেশি স্বাভাবিক। তৃতীয় জনের সম্ভাবনা আমি একেবারে উড়িয়ে দিচ্ছি না। তবে চান্স কম।'

'গট ইট, স্যর! কিন্তু ওই তৃতীয় জন কে স্যর? মনে হল আপনি চেনেন...' সাহস করে জিজ্ঞাসা করে ফেলেন পরীক্ষিৎ। ছবিটা হাতে তুলে নিয়ে সেদিকে তাকিয়ে অরুণ বলেন, 'ইফ হি ইজ হু আই থিংক হি ইজ, দেন হি ইজ এ ঘোস্ট!' মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে না পেরে ঘরের সবাই তাঁর দিকেই তাকিয়ে থাকে। অরুণ উঠে দাঁড়িয়ে বলেন, 'গাইজ, ইফ দিস ম্যান হ্যাজ রিয়েলি কাম হিয়ার টু কিল সামওয়ান— তাহলে সেই লোকটির ভাগ্য অসম্ভব ভালো হওয়া দরকার এর হাত থেকে বাঁচার জন্য। সম্ভবত সবচেয়ে সৌভাগ্যবান হওয়া দরকার। এই লোকটি সারা পৃথিবীর সমস্ত প্রফেশনাল অ্যাসাসিনদের মধ্যে সবচেয়ে বড় রহস্য! শেষ পাঁচ-ছ' বছর, পিপল ডিডন্ট ইভন নো, হি ওয়াজ অ্যালাইভ! যদি এ সত্যিই বেঁচে থাকে, তাহলে কালকে দিন শেষ হওয়ার আগেই দুই প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে একজনের বেঁচে না থাকার চান্স নাইন্টি পার্সেন্ট।'

'হু ইজ হি?' এই প্রশ্নটা ভেসে আসে কমিশনারের কাছ থেকে। তিনি কখন ঘরে ঢুকেছেন, কেউ খেয়ালই করেনি।

অরুণ তাঁর দিকে তাকিয়ে বলেন, 'শাহজাদা!! হি হ্যাজ কাম টু কিল!' ফিল্ডিং টিমের ক্যাপ্টেন যেমন নিজের টিমকে খারাপ অবস্থা থেকে টেনে তোলার জন্য হাততালি দেয়, সেরকম ঢঙেই তালি বাজিয়ে পরীক্ষিৎ বলে ওঠেন, 'লেটস গো গাইজ! আমরা জানি, হোয়াট উই আর আপটু! লেটস কিল দ্য বাস্টার্ড অ্যান্ড সেভ দ্য ডে!'

সবাই একটু চনমনে হয়ে ওঠে। এতক্ষণ অরুণ একটু ভয় পাইয়েই দিচ্ছিলেন। ফিল্ডে অনভিজ্ঞতার কারণেই তিনি বুঝতে পারেননি— টিমের মরাল ডাউন থাকলে অনেক সহজ কাজও বানচাল হয়ে যায়। পরীক্ষিৎ অভিজ্ঞ পুলিশ অফিসার। ঠিক সময়ে পেপ-টক দিয়েছেন ওদের চাঙ্গা করার জন্য।

অরুণ নিজের অভিভূত ভাবটা সামলে নিয়ে বললেন, 'অ্যাজ আই ওয়াজ সেয়িং, আমি জয়দীপ আর রাজেশ— সঙ্গে আরও কয়েক জন— আমরা যাব দ্য স্টাডস! আপনারা অন্যটায়! ম্যাপ অনুযায়ী এই দু' জায়গা থেকেই বিশ্ব বাংলা গেট বা ভাষা সদন উইদিন রেঞ্জ।

সো, বি ভেরি কশাস! তিন জনের কাউকে দেখতে পেলে, সম্ভব হলে গ্রেফতার করুন, না হলে গুলি।'

'রেঞ্জ বলতে কীসের রেঞ্জ বলছেন?' ত্রিদিবেশ আবার একটু ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করেন।

'ম্যাকমিলান ট্যাক-৫০-র কমিশনার সাহেব!'

যে সময় গোয়েন্দা দপ্তরের সদর থেকে চারটে সাধারণ স্করপিও বোঝাই হয়ে প্রায় জনা পঁচিশেক প্লেন ড্রেসের সশস্ত্র এজেন্ট যাত্রা শুরু করছে, সেই সময় 'দ্য স্টাডস'-এর এই করিডোরে ঘন অন্ধকার। পনেরো তলার লবিতে হালকা নীলচে আলো যে মায়াময় পরিবেশের সৃষ্টি করেছে, তাতে আলোর চেয়ে আঁধার বেশি। রাত বেশি না। সাড়ে বারোটা। বাইরে শহর তখনও মোটামুটি জেগে। কিন্তু বিত্তশালীদের এই হোটেলের এই উঁচু তলায় সুষুপ্তি বিরাজ করছে। করিডোরের একপ্রান্তে হঠাৎই একফালি আলো ফুটে উঠল। কোনো একটি ঘরের দরজা খুলল।

অন্ধকারের সঙ্গে মানানসই ঘন রঙের পোশাকের দুজন মানুষ বেরিয়ে এলেন সেই ঘর থেকে। গোটা করিডর ফাঁকা। এদিক-ওদিক দ্রুত চোখ বুলিয়ে তারা বিড়ালের মতো নিঃশব্দ পায়ে এগিয়ে এল একটি নির্দিষ্ট ঘরের সামনে। দুজনের মধ্যে যে লম্বা, সে বন্ধ দরজার ওপর ঝুঁকে কান পেতে কিছুক্ষণ কী যেন শুনল। সেই অবস্থাতেই সে হাতের ইশারায় অন্য জনকে বলল দূরে সরে যেতে।

দূরে সরে গিয়ে দ্বিতীয় জন পকেট থেকে কিছু একটা বার করে পজিশন নিয়ে দাঁড়াল। মুহূর্তের জন্য নীল আলোয় ঝিকিয়ে উঠল সেমি-অটোম্যাটিক পিস্তলের পলিমারাইজ্ড নল!

প্রথম জন ততক্ষণে সন্তর্পণে খুলে ফেলেছে দরজার লক। খুব কাছে দাঁড়িয়েও অন্য জন কোনো আওয়াজ পায়নি। ভেতরে থাকা লোকটি যদি এই আওয়াজের প্রত্যাশায় কান পেতে বসে না থাকে, তাহলে কোনোভাবেই শুনতে পাওয়া সম্ভব নয়।

সারপ্রাইজ ইজ আ ওয়েপন! তাদের সেটাই ব্যবহার করতে হবে। অভ্যস্ত হাতের ইশারায় পেছনের জনকে কিছু একটা ইশারা করেই সামনের জন চোখে পরে নিল নাইট ভিশন গগলস! দেখাদেখি পেছনের জনও।

তারপর হঠাৎই শিকার দেখতে পেয়ে ঝাঁপিয়ে পড়া বাজের ক্ষিপ্রতায় এক ধাক্কায় দরজা খুলে দু' হাতে পিস্তল ধরে ঘরে ঢুকে রোল করে গেল প্রথম জন। থামা যাবে না। শত্রু যদি তৈরি বসে থাকে ফায়ারিং পজিশনে— তাকে কোনো স্থির টার্গেট দেওয়া চলবে না। রোল করতে করতেই সে দেখে নিয়েছে— ঘরের ওপেন স্পেসে কেউ নেই। একদিকের দেওয়ালের কাছে পৌঁছোতেই যেন স্প্রিং দেওয়া যন্ত্রের মতো লাফিয়ে সে হাঁটু গেড়ে বসে। হাতের উদ্যত পিস্তল তখন ঘরের কোণে কোণে খুঁজে বেড়াচ্ছে লুকিয়ে থাকা আততায়ীর চিহ্ন।

নাহ, কেউ নেই!

বাথরুম!! শিকারির পায়ে সে এগিয়ে যায় বাথরুমের দরজার দিকে। ভেতরে অন্ধকার। ততক্ষণে দ্বিতীয় জন এসে হাজির হয়েছে রুমের দরজার কাছে। সেদিকে না তাকিয়েই প্রথম জনের কানে ধরা পড়েছে চেনা পায়ের শব্দ। সে হাত তুলে সেখানেই অপেক্ষা করতে বলে তাকে। বাথরুমের দরজার কাছে গিয়ে সন্তর্পণে পরীক্ষা করে।

নাহ, দরজা বাইরে থেকে লকড! হতাশ হয়ে সে ইশারায় সে কথা জানায় দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটিকে। লোকটি সাবধানে ঘরের ভেতরে ঢুকে, দরজা বন্ধ করে দেয়। আলো জ্বালিয়ে নেয় ঘরের। দুজনেই চশমা খুলে ফেলে।

প্রথম কথা বলেন সাখাওয়াত, 'আবার কি বাইরে গেল?'

'না। আমি সারাক্ষণ নজর রেখেছিলাম স্যার, লবি থেকে।' বলতে বলতেই তার নজর

পড়ে ঘরের এককোণে। হুইলচেয়ার সেখানে যেমনটি, তেমনই পড়ে আছে। ক্রাচ জোড়া কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

দুজনেই মুখ চাওয়াচাওয়ি করে। তারপর সাখাওয়াত বলেন, 'লেটস লুক অ্যারাউন্ড। সময় নষ্ট করে লাভ নেই।'

বিনা বাক্যব্যয়ে দুজনে তন্নতন্ন করে ঘর সার্চ করতে আরম্ভ করে। প্রায় পনেরো মিনিটের মেথডিক্যাল এবং থরো খোঁজাখুঁজির পরেও বিশেষ কিছুই পাওয়া যায় না। কোনো ডকুমেন্টস, আইডি, জামাকাপড়, কিস্সু নেই। বিছানার চাদরে সামান্য ভাঁজ পর্যন্ত নেই। এমন মনে হচ্ছে যেন এই ঘরে কেউ চেক ইন করেইনি।

বেরিয়ে যাওয়াই মনস্থ করে দুজনে। এ ঘরে থেকে আর কোনো লাভ নেই। বেরোনোর মুহূর্তে আর্যর নজরে পড়ে ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটটা। কী মনে হতে সে ঝুঁকে সেখান থেকে একটা দুমড়ে ফেলে দেওয়া কাগজ তুলে নেয়। একটা হালকা সবুজ রঙের সস্তা কাগজের বিল। কোনো টেলারিং-এর দোকানের। বিলটা পড়তে পড়তে সে স্বগতোক্তির ঢঙে বলে, 'আশ্চর্য!'

'কী ওটা?' কৌতূহলী সাখাওয়াত এগিয়ে আসেন। সাখাওয়াতের হাতে বিলটা তুলে দিতে দিতে আর্য বলে, 'বিল ইস্যু হয়েছে রাজকুমারবাবুর নামে, তিন দিন আগে। শ্যামবাজারের টেলারিং-এর দোকান থেকে। অথচ রাজকুমারবাবু হোটেলে চেক ইন করেছেন গতকাল ভোরে। তাহলে মাঝের দিনগুলোয় উনি ছিলেন কোথায়?'

সাখাওয়াত বলেন, 'এখন আমাদের রুমে চলো। বাকি কথা ওখানে বসেই হবে।'

আলো নিভিয়ে বেরিয়ে নিঃশব্দে দুজনেই যখন করিডোরের অন্য প্রান্তে জনৈক রোহন ফালোরের নামে বুক করা কামরায় ঢুকছে, তখন তারা জানেও না, রাজকুমার দেব দূরে নিউ গড়িয়ার মেট্রো কারশেডের এক অন্ধকার পরিত্যক্ত কোণে চুপচাপ বসে আছে।

শিকার না শিকারি— কার অপেক্ষায় সে বসে আছে কে জানে।

নববিংশ অধ্যায়
।। দ্য চেক অ্যান্ড দ্য মেট।।

৪ আগস্ট, ২০১৮ / নিউটাউন, কলকাতা, ভারত

উৎসব শুরু হয়েছে শহরের এই প্রান্তে। উজ্জ্বল কমলা রঙের হাজার হাজার পতাকার রঙের ছটায় তীব্র রোদ্দুরকেও ম্লান বলে মনে হচ্ছে।

সকাল থেকে গোটা শহর নিউটাউনমুখী। শহরের এই অংশে মূলত তথ্যপ্রযুক্তি কোম্পানিগুলোর অফিস। সোম থেকে শুক্র অবধি তাদের অফিস খোলা থাকে। আজ শনিবার এবং আগামীকাল— দু' দিন ছুটি।

ছুটির মেজাজে থাকা এই উচ্চবিত্ত শহুরে মানুষদের মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর আবেদন অত্যন্ত তীব্র। দীর্ঘদিন একটা দুর্নীতিগ্রস্ত প্রশাসনকে মেনে নিতে নিতে মানুষ যখন হতাশ ও কোণঠাসা হয়ে পড়েছিল তখন স্বপ্নের সওদাগরের মতো এঁর উত্থান। উন্নত জীবনযাত্রার মান, প্রচুর বিনিয়োগ, স্বচ্ছ ও দক্ষ প্রশাসন— এই সবের প্রতিশ্রুতি দিয়েই ধূমকেতুর মতো জাতীয় স্তরের রাজনীতিতে এঁর উঠে আসা।

বিতর্ক কম নেই মানুষটিকে ঘিরে। ভেতরে ভেতরে ইনি সাম্প্রদায়িক এবং কট্টর প্রাচীনপন্থী বলেই বেশ কিছু লোকের বিশ্বাস। আরও একটি ব্যাপারে এঁর ভক্ত ও বিরোধী— উভয়েই একমত। ইনি বিরোধিতা সহ্য করেন না। ছলেবলে-কৌশলে নিজের রাজনৈতিক জীবন বিরোধীশূন্য করে ফেলাই এঁর চরমতম উচ্চাশা।

আর দিন কয়েকের মধ্যে নির্বাচনের দামামা বেজে যাবে পাঁচ রাজ্যে। শুরু হয়ে যাবে প্রচারের ঢক্কানিনাদ। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের আগে এই পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচন খুব খুব গুরুত্বপূর্ণ। বিরোধীদের কাছে চ্যালেঞ্জ, নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার। জাতীয় রাজনীতিতে নিজেদের প্রাসঙ্গিক করে রাখার। আর প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর দলের কাছে চ্যালেঞ্জ, তাদের মুছে ফেলার।

সকাল থেকে বিশ্ব বাংলা গেটের চারপাশে যে ভিড় ধীরে ধীরে জমে উঠছে, লরি, বাস, ট্রাক-ভরতি লোকের যে ঢেউ বেলঘরিয়া এক্সপ্রেসওয়ে-এয়ারপোর্টচিনার পার্ক কিংবা বাইপাস-চিংড়িহাটা-সেক্টর ফাইভ হয়ে আছড়ে পড়ছে নারকেলবাগান মোড়ে— তা দেখে যদিও বোঝা যায় প্রধানমন্ত্রীর বিরোধীদের কাজটা সিসিফাসের চেয়েও শক্ত। বড় বড় ওবি ভ্যান নিয়ে সর্বভারতীয় মিডিয়া হাউসগুলো আগের দিন রাত থেকেই ঘাঁটি গেড়ে আছে পারমিট জোনে। প্রায় পঞ্চাশ মিটার দূর দিয়ে বাঁশের ব্যারিকেড করে ঘিরে দেওয়া হয়েছে বিশ্ব বাংলা গেট। তার ভেতরে ঢুকতে গেলে পেরোতে হবে স্নিফার্স ডগ, মেটাল ডিটেক্টর, ইউনিফর্মধারী কম্যান্ডো, পুলিশ এবং সাদা পোশাকের গোয়েন্দাদের। বিশেষভাবে ইস্যু করা পারমিট ছাড়া নতুন কোনো লোক— তা সে যতই চেনা হোক, ওই এলাকায় ঢোকা আজ অসম্ভব। সমস্ত ট্র্যাফিক ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে সিটি সেন্টার টু-এর সামনে থেকে।

বিশ্ব বাংলা গেটের তিন দিকেই যে তিনটি প্রধান রাস্তা বেরিয়ে যাচ্ছে একাধিক জায়েন্ট-স্ক্রিন বসানো হয়েছে অন্তত এক-দেড় কিলোমিটার দূরত্ব অবধি। যাতে দূরদূরান্তে দাঁড়িয়ে থাকা লোকও তাদের নেতার প্রতিটি নড়াচড়া, প্রতিটি মুখভঙ্গি, হাত নাড়া, আস্ফালন দেখতে পান, তালি বাজাতে পারেন।

যখন নবনির্মিত মাতৃভাষা সদনের চারপাশে আয়োজন ধীরে ধীরে পূর্ণতার দিকে যাচ্ছে, ঠিক সেই মুহূর্তে সেখান থেকে কুড়ি কিলোমিটার দূরে, প্রিন্স অফ ওয়েলস সুইটের রাজকীয় হলুদ ড্রয়িং রুমে বসে দুই পুরোনো দিনের বন্ধুর মতো চা খাচ্ছিলেন দুই প্রধানমন্ত্রী। সামনের নীচু টেবিলে কেক-পেস্ট্রির স্তূপ।

অতিথি মানুষটি নিজে আমিষভোজী হলেও তিনি জানেন তাঁর আপ্যায়নকারী নিরামিষভোজী! তাই অন্তত সকালের চায়ের সঙ্গে কোনো আমিষ পদ না রাখার অনুরোধ

করেছেন তিনি। মিডিয়ার চোখের আড়ালে কিছুক্ষণ কথা বলা দরকার। সেই কথা প্রথাগত অফিসিয়াল বিষয়ে নাও হতে পারে। বস্তুত সেটা হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। কিন্তু সাধারণ আলাপচারিতার মধ্যে দিয়ে একটি মানুষের যে চারিত্রিক ছবিটি ফুটে ওঠে, ভবিষ্যতের কূটনৈতিক কৌশল নির্ধারণে তা খুবই কাজ দেয়।

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ফিরোজ আহমেদ নিজের পূর্বজীবনে বিখ্যাত ক্রিকেট খেলোয়াড় ছিলেন। তাঁর শরীর এখনও খেলোয়াড়োচিত। নির্মেদঝকঝকে শরীর, অভিজাত হাঁটা-চলা, গম্ভীর সুললিত গলার জন্য রমণীমোহন হিসেবে তাঁর খ্যাতি খেলোয়াড় হিসেবে খ্যাতির চেয়ে নেহাত কম নয়। কিন্তু তিনি জানেন এসব কিছুই চিরকালীন নয়। যে দেশকে তিনি একসময় বিশ্বকাপ এনে দিয়েছেন, সেই দেশের মানুষের দ্বারাও তার পরে বহু বার ব্যঙ্গে, উপহাসে, কটুক্তিতে ক্ষতবিক্ষত হয়েছেন। তখনও জানতেন এসব কিছুই নয়। দিস টু শ্যাল পাস!

একমাত্র তাঁর আম্মির ছিল তাঁর ওপর এক পৃথিবী বিশ্বাস। ছুটির দুপুরে মাথায় হেনা লাগিয়ে দিতে দিতে তিনি বলতেন, 'লাল্লা, যো ঠান লেনা উও করনা! কিসিকো ইয়ে বাতানে মত দেনা কে ইয়ে তুঝসে না হো পায়েগা! তু সব কর সকতা হ্যায়...'

উচ্চাশা তাঁর গগনচুম্বী। ছোট্টবেলায়, যখন খেলতে শুরু করেছেন লাহোরে তাঁদের অভিজাত পাড়ার গলিতে, তখন থেকে তিনি তাঁর দোস্তদের গল্প শোনাতেন কীভাবে তিনি একদিন তাঁর দেশের হয়ে খেলবেন। বাচ্চা ছেলে বলে লোকজন তাঁকে নিরাশ করেনি। কিন্তু তাঁর কথা যে সত্যি হবে এমনটাও কেউ ভাবেনি।

ভুল ছিল তারা। তিনি কিন্তু শেষ করেছেন দেশের হয়ে বিশ্বকাপ জিতেই।

যখন রাজনীতিতে ঢুকেছেন তখন থেকে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে তিনি দেশের প্রধানমন্ত্রী হতে পারবেন। পর পর দু' বার নির্বাচনে শোচনীয়ভাবে হার হয় তার দলের। নিকটতম বন্ধুরাও তখন আড়ালে হাসাহাসি করছেন। মশকরা করছেন। প্রথমা স্ত্রীর সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদের ফলে ব্যক্তিগত জীবনও তখন টালমাটাল। এই অবস্থাতেও আম্মির ওই বিশ্বাস ফিরোজের মনের সাহসকে নিভতে দেয়নি।

তৃতীয় নির্বাচনে প্রধান বিরোধী দল। পাকিস্তানি পিপলস পার্টিকে টপকে এবং চতুর্থ নির্বাচনেই জয়লাভ। জোট সরকার বটে। কিন্তু বিদেশে লেখাপড়া করা, চোস্ত ইংরেজি বলা, স্মার্ট-সুদর্শন ফিরোজ আহমেদের পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়া তাতে আটকায়নি।

যেদিন প্রধানমন্ত্রী হয়ে তিনি শপথগ্রহণ করেছিলেন সেদিন থেকে তাঁর লক্ষ্য স্থির। কাশ্মীর সমস্যার স্থায়ী সমাধান। অর্থাৎ কাশ্মীরকে পৃথক রাষ্ট্রের মর্যাদা দেওয়ানো। তিনি জানেন কাজটা সোজা নয়। কাজটা আরোই কঠিন হয়ে পড়েছে ভারতে কট্টর দক্ষিণপন্থী শক্তিগুলির ক্রমাগত উত্থানের ফলে। এরা ঐতিহাসিকভাবেই পাকিস্তান-বিরোধী। এদের সঙ্গে কোনোরকম সমঝোতায় আসতে গেলে পাকিস্তানকে নিজের আত্মসম্মানের অনেকটাই খোয়াতে হতে পারে। তিনিও জানেন, তাঁর নিজের দেশেরও অনেকগুলি মৌচাকে তিনি অনাবৃত হাত ঢুকিয়ে দিচ্ছেন। হুল তারা ফোটাবেই। বিষের জ্বালাও তাঁকে ভোগ করতেই হবে।

কিন্তু তিনি মরিয়া। পাকিস্তানের অর্থনৈতিক অবস্থা ভঙ্গুর। একটা গ্রিস হওয়া সময়ের অপেক্ষামাত্র। আর অস্ত্রপ্রিয়, যুদ্ধপ্রিয় একটা দেশ যদি ফেইলড স্টেটে পরিণত হয়, তা গোটা পৃথিবীর পক্ষে বিপজ্জনক।

সবচেয়ে বড় কথা, তাঁর ইতিহাসে থেকে যাওয়ার লোভ। এটিই তাঁর উদগ্র উচ্চাকাঙ্ক্ষা। এতদিনে তিনি বুঝে গেছেন, বিশ্বকাপ জেতানো বা প্রধানমন্ত্রী হওয়া— কোনোটাই তাঁকে ইতিহাসে চিরস্থায়ী করতে পারবে না। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী স্বয়ং জিন্নাহ্... ওয়ান অ্যান্ড অনলি, কায়েদ-এ-আজম! তাই তাঁকে এমন কিছু করতে হত যা এর আগে কেউ ভেবেও দেখেনি।

তাই এই সফরেও তিনি মাত্রাতিরিক্ত সাবধানী। উলটো দিকের মানুষটি ধুরন্ধর রাজনীতিবিদ। তিনিও এই শান্তি-প্রয়াসের মধ্যে অন্তত সাময়িক লাভ দেখতে পাচ্ছেন বটে। তবে তাঁর পা অনেক শক্ত জমিতে। ব্যালান্সড! চাইলেই কখনো সামনের পায়ে ওজন ট্রান্সফার করে পাকিস্তানকে যুদ্ধের হুমকি দিতে পারেন, আবার চাইলেই তিনি পেছনে এসে কাশ্মীরের দীর্ঘস্থায়ী সমস্যার সমাধানের উদ্দেশ্যে হাত বাড়িয়ে দিতে পারেন।

এই মানুষটিকে বোঝা খুব খুব দরকার।

টেবিল থেকে একটা অ্যাপল পাই-এর টুকরো হাতে তুলে নিয়ে ফিরোজ সামনে ঝুঁকে পিএম-কে বললেন, 'জনাব, হাউ ইজ ইওর মম?'

'ওহ! শি ইজ ফাইন, ফিরোজ, থ্যাংক ইউ!'

দুই রাষ্ট্রপ্রধান নিজেদের মধ্যে মৃদু স্বরে আলাপে নিমগ্ন। বেশ কিছুক্ষণ পরে শেখরণ ঘরে ঢুকে এগিয়ে এলেন লঘু পায়ে। তাকে দেখে দুজনেই চুপ করে গেলেন। শেখরণ অল্প ঝুঁকে পিএম-এর কানে কানে কিছু একটা বললেন। পিএম মৃদু হেসে সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়তে শেখরণ এবার ফিরোজের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এভরিথিং ইজ রেডি স্যর। মাতৃভাষা সদনের সামনে আজ আপনাকে দেখতে প্রায় এক লক্ষ লোক এসেছে। শ্যাল উই মুভ?'

'শিওর!' হাসিমুখে উঠে দাঁড়ালেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী।

শেখরণ এগিয়ে যাওয়ার জন্য ফিরেও, এক বার ঘুরে হাসিমুখে বললেন, 'বাই দ্য ওয়ে স্যর, বিগ ফ্যান! বিগ ফ্যান অফ ইয়োর্স!'

'ইউ মিন পলিটিক্স অর ক্রিকেট?'

'বোথ স্যর, আই মিন বোথ।' একটু অপ্রস্তুত হাসি ফুটে ওঠে শেখরণের মুখে। সেটা দেখে হো-হো করে হেসে ওঠেন দুই প্রধানমন্ত্রীই।

বেরোনোর পথে ফিরোজ বলেন, 'জনাব, উড ইউ মাইন্ড, ইফ আই গো লাস্ট? মানে আমার বক্তব্যটা যদি আপনার পরে হয়?'

'সাধারণত হোস্ট কান্ট্রির হেড শেষে বলেন, তাই না?' হেসেই উত্তর দেন পিএম। কিন্তু ফিরোজ নাছোড়বান্দা, 'সে তো ঠিকই। বাট, এবারেরটা আমরা আলাদা আলাদা করতে পারি না? মানে একদম শেষে, আমার মুখ দিয়ে যখন কাশ্মীর নিয়ে আমাদের দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের পরিকল্পনার কথা বেরোবে, দ্যাট উইল হ্যাভ এ গ্রেট ইম্প্যাক্ট! ডোন্ট ইউ থিংক?'

তার দিকে তাকিয়ে দশ সেকেন্ড চুপ করে থাকেন পিএম। চশমার পেছনে ওই ভাবলেশহীন এক জোড়া চোখের চাউনি বাঘা বাঘা লোকের শিরদাঁড়া নরম করে দেয়। ফিরোজ আহমেদও একটু অস্বস্তি বোধ করেন। বেশি বাড়াবাড়ি হয়ে গেল নাকি? তাঁর ক্ষণিকের আশঙ্কা ভুল প্রমাণ করে মৃদু হেসে পিএম বলেন, 'হোয়াই নট? আমাদের সংস্কৃতে বলে অতিথি দেব ভবঃ! আপনি আমাদের গেস্ট। আপনার ইচ্ছাই আমাদের জন্য আদেশ।

'কী যে বলেন জনাব!'

রাজভবনের সামনের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে ছবি তোলার ফাঁকে মৃদু গলায় এই সব কথাবার্তা চলছে, ঠিক তখনই শেখরণ আরও এক বার দ্রুত পায়ে এলেন কোথাও থেকে। পিএম তার কথা একমুহূর্ত শুনেই ফিরোজের দিকে তাকিয়ে বলেন, 'আমাকে প্লিজ দু' মিনিটের জন্য এক্সকিউজ করবেন।'

'শিওর!' ফিরোজ হাসিমুখে এগিয়ে যান এক চেনা বঙ্গললনার দিকে। একসময় যখন কলকাতায় খেলতে আসতেন তখন এই ললনার... থাক সে পুরোনো কথা।

শেখরণ উত্তেজিত চাপা স্বরে বললেন, 'স্যর, টিল নাও নো লাক!' 'হোয়াট আর দে ডুয়িং?

'দে আর অন দ্য গ্রাউন্ড! এখন সবাই জানে হু দে আর লুকিং ফর। ওই স্কেচগুলো এখন সবার কাছে। ওরা এখনও আশা করছে খুব তাড়াতাড়ি ওরা ধরতে পারবে লোকটাকে। আর দেয়ার এনি চান্স, উই ক্যান কল দিস অফ স্যর?'

প্রশ্নটা শেখরণের মুখ থেকে বেরোনোমাত্র জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকান পিএম। সেই চাউনির সামনে হিমস্রোত বয়ে যায় শেখরণের শরীরে। তিনি সামলে নিয়ে বলেন, 'আই... আই আন্ডারস্ট্যান্ড স্যর।' তারপর এক বার আড়চোখে গল্পে মশগুল ফিরোজের দিকে তাকিয়ে বলেন, 'ডাজ হি... ডাজ হি নো?'

'হোয়াই শুড হি?' পালটা এই কাটা কাটা উত্তরের বা প্রতিপ্রশ্নের কোনো জবাব হয় না। শেখরণ শেষ বারের মতো এক বার বলেন, 'ইফ হি... ইউ নো...'

'ইউ প্রে ইট ডাজন্ট কাম টু দ্যাট, রঘু, ইউ প্রে হার্ড...' চাউনিতে তাকে প্রস্তরীভূত করে দিয়ে গটগট করে হেঁটে পিএম এগিয়ে গেলেন তাঁর সম্মানীয় অতিথির দিকে।

কাছেই দাঁড়িয়ে থাকা সদাসতর্ক প্রহরীটি হাঁটতে হাঁটতে নিজের গোপন কমিউনিকেশন পিসে বলে উঠল, "ফিনিক্স ইজ অন দ্য মুভ! পেঙ্গুইন টু! থার্ড কার ফ্রম দ্য এন্ড!!

ঘড়িতে ন'টা সাত। সেক্টর ফাইভ স্টেশন থেকে নতুন ঝকঝকে মেট্রো রেকটা একটা পিচ্ছিল সরীসৃপের মতো বেরিয়ে যাচ্ছে। ঘড়ি দেখে একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন স্বপনবাবু। সময়েই চলছেন তিনি। যদিও চিংড়িহাটায় ঢোকার মুখে একটা গণ্ডগোল হল। তাতে কিছুটা সময় গেছে।

কলকাতা মেট্রো রেল জিএসএমআর টেকনোলজি ব্যবহার করে ক্যাব মোটরম্যান আর ট্র্যাকশন লোকো কন্ট্রোলের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করার জন্য; যাতে টানেলের মধ্যে দিয়ে বা সারফেসে চলাকালীন যে কোনো সময় মোটরম্যান কন্ট্রোলের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারে বা কন্ট্রোল চাইলে যাতে যে কোনো সময় কোনো মেসেজ কোনো একজন মোটরম্যান বা রুটে চালু থাকা সমস্ত মোটরম্যানের কাছে ব্রডকাস্ট করতে পারে।

এমনিতে এই টেকনোলজি বেশ আধুনিক এবং খুব একটা সমস্যা করে না। কিন্তু আজকে চিংড়িহাটা স্টেশনে ঢোকার মুখে প্রথমে একটু ইন্টারফিয়ারেন্স শোনা যায়। অল্প স্ট্যাটিক নয়েজ। তারপর সব কমিউনিকেশন বন্ধ। প্রায় তিরিশ সেকেন্ড মতো ব্যাপারটা স্থায়ী হয়। তারপর আবার সব ঠিকঠাক। অন-বোর্ড ইঞ্জিনিয়ার বিশেষ কিছু বুঝতে পারেননি তৎক্ষণাৎ। লগবুকে এন্ট্রি করে নিয়ে বললেন ব্যাপারটা পরে দেখবেন। তার জন্যই একটু দেরি হল। প্রায় মিনিট পাঁচেক এক্সট্রা দাঁড়াতে হল।

কিন্তু এখন বোঝা যাচ্ছে, ভেবে-চিন্তে বেশি টাইমই রাখা আছে। নিউ টাউন স্টেশনে পৌঁছোনোর টাইম ধরা আছে ন'টা পনেরো। আর তো তিনটে স্টেশন। ছ-সাত মিনিট লাগবে বড়জোর। নিউ টাউন স্টেশনের নাম রাখা হয়েছে বিধাননগর। ওখান থেকে ট্রেন ছাড়বার টাইম ঠিক দশটা। ন'টা পনেরো থেকে দশটা অবধি ট্রেন মুভ করবে না। পারমিশন নেই। কারণ ওই সময় চলবে দুই প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতা!

কিছু সাধারণ মানুষ এমনিই ভলান্টিয়ার করেছেন আজ। তাদের বেশিরভাগই যদিও ওই লোকোশেডে কাজ করা লেবার। বিনা পয়সায় নতুন ট্রেনে চেপে শহরের মাথার ওপর দিয়ে ঘুরে বেড়ানোর কথায় সবাই এককথায় রাজি হয়ে গেছিল। তাদের কোনো তাড়া নেই। একটু পরেই এই ট্রেন নিউ টাউন স্টেশন থেকে ফিরতি জার্নি দেবে নিউ গড়িয়ার দিকে। ওরাও তখনি ফিরবে। মাঝে সায়েন্স সিটির কাছে দুজন পুলিশ উঠল। একটা কামরাতেই প্যাসেঞ্জার ছিল। পুলিশ দুজন উঠে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সবাইকে দেখল। অকারণেই দু-এক জনের ওপর হম্বিতম্বি করল। একজনকে লাঠির খোঁচা মারল।

নিরীহ লোকগুলো এমনিতেই পুলিশকে ভয় পায়। জড়িয়ে-মড়িয়ে কীসব বলল, আর পুলিশগুলোই-বা কে কী বুঝল কে জানে।

কাঁটায় কাঁটায় ন'টা তেরোতে স্বপনবাবু রুট ৬-এর নতুনতম মডেলের ট্রেন নিয়ে এসে দাঁড়ালেন অত্যাধুনিক স্টেশন বিধাননগরে। নীচে থিকথিক করছে ভিড়। এখান থেকে সভামঞ্চ প্রায় দেড় কিলোমিটার দূরে। সরাসরি খালি চোখে দেখার কোনো সম্ভাবনাই নেই। জায়ান্ট স্ক্রিনে নিজেদের প্রিয় নেতাকে দেখতে পেয়েই এখানকার লোকজন সন্তুষ্ট।

প্রধানমন্ত্রী এখনও স্টেজে ওঠেননি। অখিলেশ রায় বক্তৃতা দিচ্ছেন। এখান থেকে শোনা যাচ্ছে মাইকে বয়ে আসা তাঁর কাংস্যবিনিন্দিত কণ্ঠস্বর, 'আপনাদের আমি বলেছিলাম আমাদের পুলিশ স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের চেয়ে কিছু কম নয়। এই তো, ত্রিদিব, ত্রিদিব আছে এখানে। জিজ্ঞেস করুন ওকে। অ্যাই ত্রিদিব, তোমাকে বলেছিলাম না? আমি জানি আমাদের রাজ্য বিশ্বের ধরণিতে সেরা রাজ্য হয়ে উঠতে পারে...'

স্বপনবাবু ধীরে-সুস্থে নিজের কোচ থেকে নামেন। ট্রেন ততক্ষণে খালি। টুকটুক করে হেঁটে গিয়ে তিনি অফিসঘরে ঢুকলেন। চেনা মুখ কেউই নয়। তবে কিছু এন্ট্রি ইত্যাদি করতে হবে সেকশন ইনচার্জের কাছে গিয়ে। তার কেবিনটা ঘরের এককোণে। সেদিকে এক বার তাকিয়ে স্বপনবাবু নিজের মনে মনেই বললেন, 'ধুর, থাক গে! এখনও সময় আছে তো অনেকটা। আমি বরং একটু চা-ফা খেয়ে আসি!'

মনে মনে ভাবতে ভাবতেই দেখলেন একটা পিওন টাইপের ছোকরা পাশ দিয়ে যাচ্ছে। হাতে কিছু ফাইলপত্তরের তাড়া। স্বপনবাবু তাকে ডেকে বললেন, 'এই, ভাই— তোমার নামটা কী?'

'কেন বলুন তো?'

'না, মানে আমি ওই নতুন ট্রেনটা ট্রায়াল রান দিয়ে নিয়ে এলাম...'

কথা শেষ না করতে দিয়েই ছেলেটা যন্ত্রের মতো গলায় বলে ওঠে, 'ডিউটিশিট আর টাইম শিট নিয়ে ওই চেম্বারের সামনে গিয়ে বসুন। স্যার সময় হলেই ডেকে নেবেন।'

'এই, ইয়ে, হ্যাঁ— সে কথাই বলছি— আমার না একটু মানে ওই চা-ফা খেয়ে আসছি আর কী। তোমার স্যার খুঁজলে ব'লো স্বপনদা চা খেতে গেছে। উনি আমায় ভালোমতোই চেনেন।'

'অ, ঠিক আছে।'

ছোকরা আর দাঁড়ায় না। ভারি ব্যস্ত সে। দুজন প্রধানমন্ত্রীর চেয়েও, মনে হয়!!

স্বপনবাবু বাইরেটায় এসে আড়মোড়া ভাঙলেন। প্ল্যাটফর্মেও ছড়িয়েছিটিয়ে আছে বেশ কিছু পুলিশ ও উর্দি পরা কম্যান্ডো। বাব্বা— সিকিউরিটি বেশ কড়া! মনে মনে ভাবলেন স্বপনবাবু।

মুখটা ফস ফস করছে। চা তো সামনের স্টলে পাওয়া যাবে। একটু বেশি দাম নেবে। সে নিক গে! কিন্তু সিগারেট খাবেন কী করে? এই পুরো চত্বর তো নো স্মোকিং! অভ্যাসে এক বার পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেটটা বের করে দেখে রেখে দিতে যাবেন, হঠাৎ একদম পাশ থেকে কে বলে ওঠে, 'বিড়ি খাবা নাকি স্যার?'

স্বপনবাবু দেখেন তাকিয়ে। লম্বা ছেলে একটা। মুখটা কেমন চেনা চেনা লাগছে। তাকে চুপ দেখেই ছেলেটা তড়বড় করে বলে ওঠে, 'আমি তো আপনার ট্রেনেই আলাম, স্যার!'

'তোর মুখটা কেমন চেনা চেনা লাগছে।'

একগাল হেসে ফেলে ছেলেটা।

'তা তো লাগবেই। সিদিন তো আপনার পকাট থেন ওই আইকাট পড়ে গেসল। আমিই তো দিয়ে এলুম...'

'ও, হ্যাঁ হ্যাঁ— মনে পড়েছে। বাহ, তোর সঙ্গে আবার দেখা হয়ে গেল রে!' 'তা বলচি কী, বিড়ি খাবা?'

চারপাশটা এক বার দেখে নিয়ে স্বপনবাবু বলেন, 'এখানে কোথায় খাব রে? সব বারণ তো।'

'আমরা বাত্তুমে খেয়ে আলাম! ওখেনে ক্যামেরা নেই!'

'কোনদিকে রে?'

'চলো, দেকাচ্ছি!'

স্বপনবাবু একটু পেছনে হেলে ছেলেটাকে আপাদমস্তক জরিপ করেন। দাঁত বের

করেই আছে। মালটা সিগারেট ঝেড়ে খাবে। তাই পিছু নিচ্ছে। কী আর করা যাবে। স্বপনবাবু ওই সব ছ্যাঁচড়া বড়লোকগুলোর মতো এদের অপমান করে তাড়িয়ে দিতে পারবেন না। না হয় খেলোই একটা সিগারেট— কী এসে যাবে তাতে! একবার কাঁধ ঝাঁকানি দিয়ে তিনি বললেন, 'চ!'

ঘড়িতে তখন সাড়ে ন'টা!

নেপথ্যে তখন খুব পরিচিত আওয়াজ ভেসে আসতে শুরু করেছে। হালকা নাকিসুরে টেনে টেনে ভারতের প্রধানমন্ত্রী আহ্বান জানাচ্ছেন উপস্থিত জনতাকে, 'বন্ধুগণ...'

মেঘের গর্জনের মতো আওয়াজ উঠছে নীচে থেকে, 'ভারত মাতা কি... জয়!'

শ্যামবাজার, কলকাতা, ভারত

'কাস্টমারের মুখ কী করে মনে থাকবে বলুন দিকি মশাই? সাতসকালে এসে এরকম দিকদারি করলে ধান্দা চলবে কী করে? আপনারা এবার আসুন তো!'

ছেলেটা স্পষ্টতই বেশ বিরক্ত। দোকানটা খুব একটা বড় কিছু না। আবার ছোটও বলা চলে না। পেছন দিকের দেওয়ালের গায়ে খোলা কাবার্ডে হ্যাঙারে ঝোলানো সারি সারি প্যান্টের আর জামার সংখ্যা বলে দেয়, দোকানটার বিক্রিবাটা মন্দ না। আজকের রেডিমেড প্যান্ট-জামার রমরমার আমলে মোহনলাল স্ট্রিটের ওপরে একটা মাঝারি টেলারিং শপের যে এরকম বিক্রি থাকতে পারে, সাখাওয়াত নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করতেন না।

যদিও এই শনিবার সকাল ন'টার সময়, দোকানে মোটেও ভিড় নেই। সবে দোকান খুলেছে লোকটা। আইবি-র অভিজ্ঞতা থেকে সাখাওয়াত জানেন জেরা করার চেয়ে বেশি সুফল পাওয়া যায় গল্পগাছায়। প্রশ্নের মুখে পড়লে সাধারণ মানুষ অনেক নিরীহ উত্তরও দিতে চায় না। তবে গল্প করতে করতে নিজের অজান্তেই অনেক গোপন ও গুরুত্বপূর্ণ কথা নিতান্ত অচেনা মানুষজনের কাছেও বলে ফেলে।

কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে সাখাওয়াতের আজকে সময়ের বড় অভাব। শহরের উলটো প্রান্তে এতক্ষণে জমায়েত শুরু হয়ে গেছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই মঞ্চে উঠবেন এই উপমহাদেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দুই মানুষ। আর সেইসঙ্গে তাঁদের নাগালের মধ্যে পেয়ে যাবে সেই রহস্যময় আততায়ী, যাকে তিনি রাজকুমার দেব নাম চেনেন। কাল রাত্রে এই লোকটির ঘরে সার্চ করার পরেও তারা নিশ্চিত হতে পারছিলেন না যে তাঁদের সন্দেহ সম্পূর্ণ অমূলক কিনা। হাজার হোক পুরোটাই ওয়াইল্ড গেসের ওপর দাঁড়িয়ে ছিল।

সেই সময় শেখরণের সোর্স কাজে লেগে গেল। পুলিশ কমিশনার ত্রিদিবেশের সঙ্গে তার আগেই কনট্যাক্ট এস্টাব্লিশ করে ফেলেছিলেন সাখাওয়াত। এক্সপোজড হওয়ার, জানাজানি হয়ে যাওয়ার ঝুঁকি নিয়েই। সেই ঝুঁকিই শেষমেশ তাদের পোক্ত প্রমাণ ধরিয়ে দিল হাতে। ত্রিদিবেশ তাঁর ফোনে পাঠিয়েছিলেন তিনটে ছবি। সম্ভাব্য সন্দেহভাজন হিসেবে যাদের চিহ্নিত করেছে কলকাতা পুলিশ।

ভাতিজার বর্ণনা শুনে পুলিশের আর্টিস্টের আঁকা সেই স্কেচগুলোর মধ্যে দুটো নিয়ে সাখাওয়াতের কোনো আগ্রহ ছিল না। তৃতীয় ছবিটি আর্য দেখেই শনাক্ত করে। এই সেই রাজকুমার দেব। হ্যাঁ, চেহারায় কিছু পার্থক্য আছে। স্কেচটা একটা অল্পবয়েসি লোকের আর রাজকুমার দেব একজন মধ্যবয়স্ক মানুষ। কিন্তু সেটুকু বদল যে খুবই সম্ভব তা আর্যর চেয়ে ভালো আর কে জানবে?

লোকটার আসল পরিচয় জানার পরে তাদের বাকি কাজ ছিল সোজাসাপটা। জিজ্ঞাসাবাদ করে করে তাকে খুঁজে বার করা। কিন্তু ততটা সোজা হল না। প্রথমত, কলকাতা পুলিশের একটা বড় টিম নিয়ে অচিরেই হোটেলে হাজির হয়েছিলেন স্বয়ং অরুণ সচদেভ। তাঁর এবং তাঁদের নজর এড়িয়ে বেরোনো জরুরি, কারণ তাদের হাতে রয়েছে আর্যর স্কেচ এবং দরকারে শুট অ্যাট সাইটের অর্ডার।

পুলিশের নজর এড়িয়ে যতটুকু যা খোঁজখবর আশেপাশের এলাকায় করা গেল, তাতে দেখা গেল কেউই সেই লোকটাকে দেখেনি। কোনো রেস্তরাঁ, কোনো দোকান, কোনো চায়ের ঠেক— কোথাওই না।

সারারাতের ব্যর্থ অনুসন্ধানের পর, তাদের একমাত্র ভরসার জায়গা হয়ে দাঁড়িয়েছে এখন এই দোকানটা। সাখাওয়াত কোনো ভণিতায় না গিয়ে সরাসরি জিজ্ঞেস করেছিলেন লোকটাকে, 'এই বিলটা আপনি কাকে ইস্যু করেছিলেন, বলতে পারবেন?'

'কেন? এই তো লেখা রয়েছে, রাজকুমার দেব।' লোকটা একঝলক বিলটা দেখেই চোখ সরিয়ে নিয়েছিল। তার মন তখন কুলুঙ্গিতে রাখা গণেশ ও লক্ষ্মীর প্রতিমায় ধূপ দেখানোয়।

'আপনি চেনেন রাজকুমারবাবুকে?'

'নাহ!' নিরাসক্ত গলায় কাজ করতে করতেই উত্তর।

'তাও, জামাকাপড় বানালেন, আপনার থেকে ডেলিভারি নিলেন, এই তো লেখা আছে —দু' দিন আগে নিয়েছেন। মুখটা তো অন্তত মনে থাকবে, তাই না?' সাখাওয়াত একটু প্রত্যাশা নিয়ে লোকটার দিকে তাকান। লোকটা বাসি মালাগুলো ঠাকুরের আসন থেকে তুলে জড়ো করে একটা পুরোনো লোহার বালতিতে ফেলতে ফেলতে একইরকম গলায় উত্তর দেয়, 'নাহ! মনে পড়ছে না।'

'একটু চেষ্টা করুন না— দেখুন না, এই লোকটা কি?'

সাখাওয়াত রাজকুমারের স্কেচটা মোবাইলে খুলে দেখাতে গেলেন। লোকটা রীতিমতো খেঁকিয়ে জবাব দিল, 'কাস্টমারের মুখ কী করে মনে থাকবে বলুন দিকি মশাই? সাতসকালে এসে এরকম দিকদারি করলে ধান্দা চলবে কী করে? আপনারা এবার আসুন তো!'

সাখাওয়াত একটু অসহায়ের মতো তাকান আর্যর দিকে। সে তখন একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে শোকেসে সাজানো সারি সারি জামাকাপড়গুলোর দিকে। হঠাৎ চোখ ফিরিয়ে সে লোকটাকে বলে, 'আচ্ছা দাদা— ওই ড্রেসটা কীসের?'

'কোনটা?'

'ওই যে, নীচের থাকে বাঁ-দিক থেকে দু' নম্বরটা।'

'ও, ওটা! ওটা তো মেট্রো রেলের ইউনিফর্ম! মেট্রো রেলের একজন চাকুরে থাকে তো এই পাড়ায়। ওরই... ও, আপনাদের এই রাজকুমারবাবুও তো ওই ইউনিফর্ম বানাতেই এসেছিলেন...'

সাখাওয়াত আর আর্য একে অপরের দিকে তাকিয়ে একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'হোলি ফাক!'

কাউন্টারের ওপরেই লোকটার বাইকের চাবিটা রাখা ছিল। বিনা দ্বিধায় সেটা তুলে নিয়ে আর্য এক লাফে দোকানের বাইরে। পেছনে পেছনে সাখাওয়াতও। ব্যাপারটা কী হচ্ছে, লোকটা সেটা বুঝতে পেরে চোর চোর বলে চিৎকার করার আগেই, সগর্জনে বাইকটা বেরিয়ে গেল মোহনলাল স্ট্রিট ধরে বাঁ-দিকে, রাজা দীনেন্দ্র রায় স্ট্রিটের দিকে।

ছুটির দিনের সকালে রাস্তায় তখনও যান চলাচল শুরু হয়নি। বাইকে বেপরোয়া স্পিড তুলতে তুলতে বাইকের আওয়াজ ছাপিয়ে চেঁচিয়ে আর্য বলল, 'স্যর, ওই লাইনটা তো যদ্দূর জানি, অপারেশনাল নয়, তাহলে?'

'ইউ ডোন্ট স্লো ডাউন! লেট মি চেক!'

কুইন্স গ্যামবিট! এগেন!

ডিকয়, এগেন!

নট এগেন! নট দিস টাইম! নট এনিমোর!

চোয়াল শক্ত হল সাখাওয়াতের। ডেসপারেট টাইম নিডস ডেসপারেট মেজার্স! মোবাইলের বোতাম টিপে কানে দিলেন সাখাওয়াত। এক বার রিং হতেই ওদিক থেকে ফোন

তুললেন পুলিশ কমিশনার। কোনো সম্ভাষণ নয়, কোনো কুশল বিনিময় নয়। প্রশ্নই ওঠে না। সাখাওয়াত সরাসরি জিগেস করলেন, “বিশ্ব বাংলা গেটের কাছে যে মেট্রো রুট, সেটা কি অপারেশনাল?’

‘কেন বলুন তো? না, মানে, নয় বলেই তো.........’

‘কিন্তু আপনি শিওর নন, তাই তো?’ অধৈর্য সাখাওয়াত কথা কেটে পালটা প্রশ্ন করেন।

‘হ্যাঁ, মানে পরীক্ষিৎ জানতে...’

‘গিভ হিম দ্য ফোন! নাও!’

এত জোরে সাখাওয়াত চিৎকার করে ওঠেন যে বাইক চালাতে চালাতে আর্যও চমকে ওঠে। পরীক্ষিৎ কমিশনারের বাড়ানো ফোনটা ধরে একটু আশ্চর্য গলাতেই বলেন, 'হ্যালো! হু ইজ দিস?’

‘কুশল সংবাদের সময় নেই পরীক্ষিৎ। মেট্রো রেলের যে লাইনটা বিশ্ব বাংলা গেটের একটু দূর অবধি এসেছে, সেটা কি অপারেশনাল?’

‘হ্যাঁ, মানে আজকে ওদের পাইলট রান আছে, ট্রায়াল, নিউ টাউন স্টেশন অবধি।

‘শিট! অপারেশনাল...’ ফোনটা ধরেই শেষ অংশটুকু আর্যর কানে পৌঁছে দিলেন সাখাওয়াত। স্পিড বাড়ল বাইকের। সাখাওয়াত শুনতে পেলেন পরীক্ষিৎত বলছে, ‘একটা ট্রেন ন’টা পনেরোয় ঢুকেছে। এখন সিকিউরিটির কারণে সেটা ছাড়বে না। ছাড়বে ফের দশটায়।

সাখাওয়াত ঘড়ি দেখলেন। ঘড়িতে তখন সাড়ে ন'টা। ফোনের মধ্যে দিয়ে সাখাওয়াত বিপুল হাততালির আওয়াজ পাচ্ছেন। পিএম স্টেজে উঠছেন। তিনি ফোনে ফের জিজ্ঞেস করলেন, ‘সেটা কত দূরে, গেট থেকে?’

আওয়াজ ছাপিয়ে পরীক্ষিৎ চেঁচিয়ে বললেন, ‘তা প্রায় দেড় কিলোমিটার কী তার চেয়ে একটু বেশিই হবে!’

‘উইদিন রেঞ্জ।’ ফোনটা হাতে ধরেই আবার আর্যকে জানালেন তিনি। তারপর ফোনে বললেন, ‘গেট টু দ্যাট স্টেশন কুইকলি। আওয়ার ম্যান ইজ দেয়ার!’

ফোনটা কেটে দিলেন সাখাওয়াত। একটা গভীর নিঃশ্বাস নিলেন। বাইক ততক্ষণে উল্কার গতিতে উলটোডাঙা মেন রোড ধরে এসে পড়েছে বাগমারি রোডে। একটু ঝুঁকে তিনি আর্যকে বললেন, ‘আর ইউ রেডি ফর ইট, সন?’ ‘ডু ইউ ব্রিদ স্যর?’

বাইকের ওপর ঝুঁকে পড়ল আর্যর শরীর। স্পিডোমিটারের কাঁটা তখন একশো ছুঁচ্ছে।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে এক বার গোটা প্ল্যাটফর্মের এদিক-ওদিক দেখে নিল শাহ্জাদা। আগের মতোই কিছু পুলিশ এবং কম্যান্ডো গোটা প্ল্যাটফর্মে। লেবারগুলোকে এক জায়গায় জড়ো করে খানাতল্লাশি চলছে।

দূরে শোনা যাচ্ছে শয়তানের বাচ্চার গলার আওয়াজ, ‘এ আমার পরম সৌভাগ্য যে আমাদের দুই দেশের মানুষ আমাদের দুজনের সামনে এই সুযোগ এনে দিয়েছে যাতে আমরা আদর্শ প্রতিবেশির সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারি। যাতে আমরা এমন হিন্দুস্তানের স্বপ্ন দেখি যেখানে কেউ পাকিস্তানকে তাদের দুশমন ভাবে না। যাতে আমরা এমন পাকিস্তান গড়ে তুলতে পারি যেখানে ট্যাঙ্ক, মিসাইল বা বোমা নয়, স্কুল, হাসপাতাল আর কলকারখানার কথা হবে বেশি করে...’

ইউনিফর্মের একটা বিশাল মাহাত্ম্য আছে। ইউনিফর্ম পরে থাকলে লোকে এমনিতেই ভেবে নেয় তুমি তাদেরই লোক। দু’ বার তাকায় না। রেল কর্মচারীর

ইউনিফর্ম পরা লোকটা যখন হেঁটে হেঁটে ধীরে ধীরে ডিএমসি-র দিকে যেতে থাকল তখনও কেউ তার দিকে দু’ বার তাকাল না। না তার দিকে, না তার পিঠের ব্যাগটার দিকে। ব্যাগটা অবিশ্যি দেখার মতো নয়। বহু ব্যবহারে জীর্ণ একটা ব্যাকপ্যাক। যে ধরনের ব্যাগ নিয়ে শহরতলির চাকুরেরা নিত্য শহরে যাতায়াত করে, যার মধ্যে তাদের জলের বোতল,

টিফিনবাক্স থাকে— সেরকমই একটা ব্যাগ।

কেউ ভালো করে খুঁটিয়ে দেখলে বুঝতে পারত ব্যাগটা বেশ ভারী। আর তাতে এমন অনেকগুলো যন্ত্রাংশ আছে, যা ঠিক নিত্যযাত্রীদের ব্যাগে পাওয়া জিনিসগুলোর মতো নয়।

পায়ে পায়ে মোটরম্যানদের নির্দিষ্ট কোচের সামনে গিয়ে সে কার্ড সোয়াইপ করাল। ঘড়িতে তখন ন'টা পঞ্চান্ন। দরজা খুলে গেল। ভেতরে ঢুকে সে ব্যাগটা রেখে দরজা লক করতে যাবে, এমন সময় একটা পুলিশ কনস্টেবল এগিয়ে এল। শাজাদার মুঠো শক্ত হল। পিঠের পেশি আঘাত করার এবং আঘাত সহ্য করার জন্য রেডি হল। কনস্টেবলটা এসে বলল, 'আইকার্ড দেখি আপনার।

বিনা বাক্যব্যয়ে আইকার্ড বের করে দিল শাহজাদা। তাতে চোখ বুলিয়ে কনস্টেবল বলল, 'স্বপনবাবু, আপনার ট্রেন এখন ছাড়বে না। একটু ওয়েট করতে হবে।'

'সে ঠিক আছে স্যার। কিছু প্রবলেম হয়েছে, নাকি?'

বেজে ওঠা ওয়াকিটকিতে সাড়া দিতে দিতে পুলিশটা ওকে হাত নেড়ে সরে গেল সামনে থেকে, 'অল ওকে হিয়ার স্যর!'

মাত্র তিরিশ সেকেন্ড। প্যানেলের একটা জায়গার ডালা খুলে একটা ছোট্ট কালো বাক্স মতন যন্ত্র ফিট করে দিল তাতে। তারপর বাইরের দরজাটা ভেতর থেকে লক করে শাহ্জাদা ভেস্টিবিউল ধরে হাঁটা লাগাল পেছনের ডিএমসি-র দিকে।

ওটাই তার ঈগলস নেস্ট!

লিফট এখনও ফাংশনাল নয়। ভিড়ের মধ্যে বাইক চালাতে না পেরে শেষ পাঁচশো মিটার দৌড়েছে আর্য। সাখাওয়াত চেষ্টা করেছেন তাল মেলানোর। কিছুক্ষণের মধ্যেই বুঝেছেন, সম্ভব নয়। আর্য এখনও ক্লান্ত নয়।

দুটো-তিনটে করে সিঁড়ি টপকে সে যখন ঝাঁ-চকচকে প্ল্যাটফর্মে পা রাখল তখন ঘড়িতে ন'টা সাতান্ন। ফিরোজ আহমেদের স্পিচ চলছে পুরোদমে। ঘন ঘন তালির ঝড় বয়ে যাচ্ছে।

গোটা প্ল্যাটফর্ম থিক থিক করছে পুলিশে। আর্য জানে, এদের অনেকের কাছেই তার ছবি আছে। সে নিজের মাথার বেসবল ক্যাপটা আর একটু টেনে নেয়। ছোটা যাবে না। ছুটলেই সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হবে।

দ্রুত পায়ে হাঁটতে হাঁটতে সে চোখ চালাতে থাকে চারিদিকে। সে যদি স্নাইপার হত, কোথা থেকে গুলি করত? ধরে নেওয়া যায়, লোকটা হায়ার্ড! অর্থাৎ তার শহিদ হওয়ার কোনো দায় নেই। সুতরাং সে কাজ শেষ করে বেরিয়ে যেতে চাইবে। কিন্তু কীভাবে? এই চক্রব্যূহ থেকে সে বেরোবে কীভাবে?

অফিসঘরের পাশ দিয়ে পায়ে পায়ে হাঁটছিল সে। হঠাৎ কানে এল একটা চড়া গলার তর্কবিতর্ক। উঁকি মেরে দেখল কেউ কাউকে ফোনে ধমকাচ্ছে, 'আরে যত সিনিয়র ড্রাইভারই হোক, ডিউটি-শিট ফিল-আপ না করে কোথায় চলে গেল? ট্রেন ছাড়ার সময় হয়ে এল এদিকে...'

ট্রেন ছাড়ার সময়!! ড্রাইভার!! ওহ!

চমকে ট্রেনটার দিকে তাকাল আর্য। ড্রাইভারের কম্পার্টমেন্টটা স্পষ্ট দেখা যায় না এখান থেকে। একটা ঢাউস ব্যাগ, স্বচ্ছ কাচের অংশটুকু আড়াল করে রাখা আছে।

একটা লেলিহান বিদ্যুতের শিখা আর্যর মগজের অন্ধকারকে আলোয় ভাসিয়ে দিয়ে গেল। এ ছাড়া কিছু হতেই পারে না। গুলি চলবে। ট্রেন ছাড়বে। ট্রেনের মোটরম্যান যেতে থাকবে ঘটনাস্থলের উলটো দিকে। কারও মনে কোনো সন্দেহের উদ্রেক না করেই।

আর সাবধানতা চলবে না। দৌড় শুরু করে সে। প্যাসেঞ্জার কম্পার্টমেন্টের একটা গেট খোলা আছে। কোনোভাবে ভেতরে ঢুকতেই হবে তাকে।

ঘড়িতে ন'টা উনষাট! ফিরোজ আহমেদ তখন উদাত্ত গলায় বলছেন, 'কেয়া আপ আপকে জিন্দেগিমে আমন দেখনা চাহতে হো...'

জনতার প্রবল গর্জনে গুলির আওয়াজ চাপা পড়ে গেল। কম্পার্টমেন্টের দরজা তখনও ফুট বিশেক দূরে। কিন্তু বাতাস কেটে গুলিটা সশব্দে ট্রেনের বড়িতে লাগতেই আর্য বুঝতে পারল ছুটন্ত তার দিকেই গুলি ছোঁড়া হচ্ছে। সেই সময়ই তার কানে এল একটা চেনা গলা, 'হল্ট! স্টপ ফায়ারিং, নাও!'

ততক্ষণে দ্বিতীয় বুলেটটা ছুটে এসেছে। কম্পার্টমেন্টের দরজাও বন্ধ হতে শুরু করেছে। আর্য ডাইভ দিয়ে কামরার ভেতরে ঢুকতে ঢুকতেই বুঝতে পারল তার কাঁধের চামড়া ফুঁড়ে একটা লোহার জ্বলন্ত শিক যেন এপার-ওপার হয়ে গেল।

ডাইভ দিয়ে কামরার মেঝেতে পড়েই সে খানিকটা গড়িয়ে গেল। হাঁটুতে ভর দিয়ে উঠতেই বুঝতে পারল ট্রেন খুব ধীরে চলতে শুরু করেছে। সময় নেই একদম!!

দ্রুত শরীরটা গড়িয়ে এগিয়ে যেতেই মাঝের দরজাটা খুলে গেল। সামনের কম্পার্টমেন্টের ওপারেই ডিএমসি। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে ফায়ারিং-রেডি ম্যাকমিলান ট্যাক-৫০, দুনিয়ার ভয়ংকরতম স্নাইপার রাইফেল, আর তার ট্রিগারে হাত রেখে ওর দিকে পেছন ফিরে গুলি করতে রেডি কিংবদন্তী খুনি...

..শাহজাদা!

স্নাইপার রাইফেলের সঙ্গে তার সম্পর্ক মাশুকার মত। যখন এর শরীরে সে হাত রাখে তখন অন্য কোনো দিকে সে তাকায় না।

দুটো গুলির আওয়াজ সে পেয়েছে। সে জানতে পেরেছে গাড়িতে কেউ উঠেছে। কিন্তু তার আর পাঁচ সেকেন্ড লাগবে। নিশানা স্থির। হাত তুলে খোলা ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে থাকা ফিরোজ আহমেদের হাসিমুখটা দেখে একটা গভীর নিঃশ্বাস নিল শাহজাদা।

স্মুদ ফায়ারিং-এর মূল শর্ত হল স্মুদ ব্রিদিং! শ্বাস নেওয়ার সময় শরীরে যেন কোনো কম্পন না হয়। সামান্যতম কাঁপুনি এক-দু' কিলোমিটার দূর থেকে বুলেটের যাত্রাপথে প্রায় চার-পাঁচ সেন্টিমিটার এদিক-ওদিক করিয়ে দিতে পারে। দ্য ডিফারেন্স বিটুইন আ ফ্যাটাল শট অ্যান্ড এ ফ্লেশ উন্ড!

নিঃশ্বাস ছাড়তে ছাড়তে ট্রিগারে চাপ দিতে যাবে, ঠিক সেই মুহূর্তে ঝন ঝন করে ভেঙে পড়ল কাচ। হাত কেঁপে গেল। লক্ষ্যভ্রষ্ট বুলেট চলন্ত ট্রেন থেকে বেরিয়ে গিয়ে ধাক্কা খেল ব্রিজের গায়ের রেলিং-এ।

দাঁতে দাঁত চেপে পেছন ফিরল শাহ্জাদা। মুহূর্তের মধ্যে তার হাতে উঠে এসেছে গ্লক ২৬। সেকেন্ডের ভগ্নাংশের মধ্যে চোখের কোণ দিয়ে দেখতে পেয়ে ছায়াটাকে লক্ষ করে গুলি চালাল সে। পর পর দু' বার!

শ্রেষ্ঠতম শিকারির হাত থেকে শেষ মুহূর্তে ছিটকে বেরিয়ে গেছে শিকার। রাজসিক ক্রোধে সে ঝাঁপিয়ে পড়ে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলতে চায় এই অর্বাচীন কাফেরকে।

গুলিটা ছুড়েই তার ফল কী হল দেখার জন্য স্থির দাঁড়ায়নি আর্য। সে জানে সে মুখোমুখি হয়েছে এক জীবন্ত কিংবদন্তির। সামান্য হিসেবে ভুলচুক মানেই সর্বনাশ!

পুরো শরীরটা নিয়ে সে ঝাঁপিয়ে বাঁ-দিকে ফায়ার এক্সটিঙ্গুইশারের আড়ালে সরে গেছিল। তার হাতে স্ট্যান্ডার্ড ইস্যু, বেরেটা এম নাইন থ্রি! সে গুলি করার জন্যই রেডি হয়ে আড়াল থেকে বেরোতে যেতেই প্রবল ধাক্কা। কী উল্কার গতিতে ছুটে এসেছে লোকটা! অবিশ্বাস্য!

হাতের পিস্তল ছিটকে গেল এককোণে। চলন্ত ট্রেনের দুলুনি সেটাকে পুরোপুরি নাগালের বাইরে নিয়ে চলে গেল। আর্য ছিটকে পড়তে পড়তে অসম্ভব দ্রুততায় গড়িয়ে সরে গেছে একপাশে।

নিড সাম টাইম! কিন্তু সময় কোথায়?

কালান্তক যমের মতো শাহ্জাদা তার গ্লক নিয়ে এসে দাঁড়াল আধশোয়া হয়ে পড়ে থাকা আর্যর সামনে।

কলকাতা মেট্রোর এই নতুন রুটে অনেকরকম নতুন টেকনোলজি আমদানি করা হয়েছে। তারই একটা হল আরএফআইডি সেন্সর, প্রত্যেক স্টেশনে। কোনো যান্ত্রিক গোলযোগ বা মোটরম্যানের শরীর খারাপ বা গাফিলতির জন্য যদি ট্রেন স্টেশনের কাছাকাছি এসে গতি নাও কমায়, এই সেন্সর তা সেন্স করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ট্রেনের গতি কমিয়ে দেবে।

হায়! দুনিয়ার শ্রেষ্ঠতম অ্যাসাসিন সেটা জানত না।

হঠাৎ একটা ঝাঁকুনি। টেকনোপোলিস স্টেশনে ঢোকার মুখে ট্রেন আস্তে হচ্ছে। সেকেন্ডের ভগ্নাংশের জন্য কেঁপে গেল শাহ্‌জাদার শরীর, পিস্তলের নল!

যথেষ্ট! স্পেশাল ফ্রন্টিয়ার ফোর্সের সবথেকে সেরা কম্যান্ডো আর্য তনভীরের জন্য ওইটুকুই যথেষ্ট। কেউটের ফণার মতো তার ডান পা বাতাস কেটে নেমে এল শাকজাদার কবজিতে। হাতুড়ির মতো প্রবল আঘাতে পিস্তল ছিটকে পড়ল এককোণে।

ওই একই মুভমেন্টে উঠে দাঁড়িয়েছে আর্য। সে তার হঠাৎ কুড়িয়ে পাওয়া অ্যাডভান্টেজ খোয়াতে রাজি নয় কোনোভাবেই। বাঁ-পা দিয়ে শাহ্‌জাদার ডান পায়ের পাতা চেপে ধরে ডান হাতের কনুই দিয়ে সে মারল একটা আন্ডারকাট, চোয়ালে।

নট সো ইজি। অনায়াসে সেটা দু' হাতে ব্লক করে তাকে আবার ঠেলে দিল শাহজাদা। দু-তিন পা পিছিয়েই নিজেকে ভারসাম্যে ফিরিয়ে আনল আর্য। ততক্ষণে শাহজাদা এগিয়ে এসেছে।

পেশাদার বক্সারের মতো নাচতে নাচতে লঘু পায়ের ছন্দে এগিয়ে এসে সে একটা কম্বিনেশন পাঞ্চ চালাল। লেফট-জ্যাব, রাইট-জ্যাব, আন্ডারকাট— আর্যর সোলার প্লেক্সাস লক্ষ করে। তিনটেই ব্লক করতে সমর্থ হল বটে আর্য; কিন্তু অচিরেই বুঝতে পারল তার প্রতিপক্ষের আসল মুভ এটা নয়। তৃতীয় ডান হাতি জ্যাবটা আটকানোর সময় তার শরীরটা ওপেন হয়ে গেছিল।

একইসঙ্গে বাঁ-হাঁটু আর বাঁ-কনুইয়ের প্রবল আঘাতটা এসে লাগল তার মধ্যচ্ছদায় এবং তার ডান কানের নীচে। ভাইটাল ব্লো। দম আটকে গেছে আর্যর। কানের নীচের আঘাতটা তাকে বেশ কিছুটা দিশেহারাও করে দিয়েছে। চোখের সামনে অস্পষ্ট দেখছে সে শাহজাদার অবয়বটাকে।

কিছুটা সময় দরকার তার। আর এই দুনিয়ায় বাস্তবের কোনো হাতাহাতিতে প্রতিপক্ষ কখনো সময় দেয় না রিকভার করার। সেটাই নিয়ম। টলতে টলতে সে যখন ভারসাম্য খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করছে, তখনই একদম শরীরের কাছে ঘেঁষে এল শাহ্‌জাদা, বিদ্যুবেগে! নিজের কপালের সামনেটা দিয়ে ফুটবলে হেড করার মতো সজোরে আঘাত করল আর্যর নাক আর ওপরের ঠোঁটের ঠিক মাঝের অংশে। তারপরই ডান পায়ের কিক আছড়ে পড়ল আর্যর সম্পূর্ণ অরক্ষিত পাঁজরে। ছিটকে পড়ল আর্য। কিন্তু পড়তে পড়তেও সে আশ্চর্য হল। এই দুটো প্রবল আঘাতের সময় সে সম্পূর্ণ ভালনারেবল ছিল। সে নিজে এই চান্স পেলে, এখানেই শেষ করে দিত প্রতিপক্ষকে। কিন্তু শাজাদার করা আঘাত মারাত্মক ড্যামেজিং হলেও ফ্যাটাল নয়।

তবে কী... রক্তাক্ত মুখ থেকে থুতু ফেলে উঠে দাঁড়িয়ে সে দেখল তার দিকে সামান্য পাশ ফিরে এই সুযোগে শাহজাদা হাতছাড়া হওয়া পিস্তলটা খুঁজছে। কী বোকা!!

স্টার্টিং ব্লক থেকে ছিটকে বেরোনো উসেইন বোল্টের মতো লাফিয়ে উঠে আর্য বাঁ-পায়ের কিক মারল একখানা। ঠিকঠাক ল্যান্ড করেছে এটা। পাঁজর চেপে ধরে একটু পিছিয়ে গেল শাহজাদা।

অল্প অল্প হাঁপাচ্ছে সে। আর্য রিয়েলাইজ করল তার লড়াই যার সঙ্গে তার একমাত্র দুর্বলতা স্ট্যামিনা। বয়সের কারণেই সে আর্যর থেকে একটু হলেও দ্রুত ক্লান্ত হবে। সুযোগটা আর্য কাজে লাগাতে চায়।

একটা পোল ধরে ডান্সারদের মতোই শূন্যে পুরো শরীরটা ভাসিয়ে একটা কিক মারতে চায় শাহ্‌তর্জাদার বাঁ-পাঁজরে। শাজাদা সামনে ঝুঁকে ব্লক করে... ভুল... ভুল...

ভাসতে ভাসতেই, মাঝপথে একটা সিটে পা আটকে শরীরটাকে থামিয়ে আর্য সপাট লাথিটা মেরেছে একটু সামনে ঝুঁকে থাকা শাহ্‌তাদার গলায়!

মোক্ষম মার! ওঁক করে একটা আওয়াজ করে এবার উলটে পড়ে শাহজাদা! কিন্তু সে ছাড়বার পাত্র না। পড়ে যাওয়া অবস্থাতেই শরীর ঘুরিয়ে সে তীব্র গতিতে পৌঁছে যায় একদিকের সিটের কাছে। পড়তে পড়তেই সে খেয়াল করেছে আর্যর পিস্তলটা রয়েছে এই সিটের তলায়! হাত বাড়াতেই পিস্তলটা হাতে পায় সে।

'মাদারচো...' জখম শ্বাস চেপে ঘেন্না মেশানো খিস্তিটা উগরে দিতে দিতে সে উদ্যত পিস্তল নিয়ে সামনে ফেরে...

খুব খুব দেরি। অন্তত এক সেকেন্ড বেশি দেরি করেছে তার শরীরটা, ঘুরতে। ক্লান্তির কারণেই।

পুরো শরীরের ভরটা নিজের ডান হাঁটুতে দিয়ে চিত হয়ে থাকা শাহ্‌জাদার ট্র্যাকিয়ার ওপর ল্যান্ড করল আর্য। খট খট খট— সুতীব্র হাড় ভাঙার শব্দ!

নিজে বোঝার আগেই শাহ্‌জাদার শরীর নিস্পন্দ হয়ে গেল। ট্রেনটাও ঠিক সেই সময়েই টেকনোপোলিস প্ল্যাটফর্মে থামল। সংজ্ঞাহীন শরীরটার দিকে তাকিয়ে নিজের ক্লান্ত শরীরটাকে টেনে তুলতে তুলতে আর্য বলল, 'হোয়াট? ইউ ওয়্যার সেয়িং সামথিং?

ত্রিংশ অধ্যায়
।। দ্য হ্যান্ডশেকস অ্যান্ড দ্য স্পিলড ব্লাডস।।

৫ আগস্ট, ২০১৮

সন্ধে নামছে গাঢ় নীল রং নিয়ে। শহরের এই প্রান্তের রাস্তাগুলি চওড়া ও সুপরিকল্পিত। ফলে যানবাহনের গতি কমে না বিশেষ। শীতাতপনিয়ন্ত্রিত অ্যাপক্যাবের মধ্যে বসে অপসৃয়মাণ শহরকে দেখতে দেখতে সাখাওয়াতের ঠোঁটে একটু আত্মপ্রসাদের হাসি ফুটে ওঠে।

হি হ্যাজ রিডিমড হিমসেলফ!

শেখরণ বা পিএম যা চাইছিলেন তা হয়তো হয়নি। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীকে চাপে ফেলা যায়নি। শেষ মুহূর্তে সব ফাঁস হয়ে যাওয়ার চাপে পুরো ব্যাপারটাই মিডিয়ার চোখের থেকে লুকিয়ে ফেলতে হয়েছে।

কিন্তু, তাঁর মিশন সাকসেসফুল। আ বুলেট ওয়াজ ফায়ার্ড। নোবডি ওয়াজ কিলড, অ্যান্ড দেয়ার ইজ স্টিল দ্য লিংক টু আইএম। পরিস্থিতির প্রতিকূলতা বিচার করলে, এটা অভাবনীয় সাফল্য।

কিন্তু হায়! এ সাফল্যের উদ্যাপন হবে না। চ্যানেলে চ্যানেলে ইন্টারভিউর ডাক পড়বে না। ভরা সভায় কেউ গলায় পরিয়ে দেবে না সম্মানের স্মারক। নামের আগে বসবে না নতুনতর উপাধি।

এই সাফল্যের মূল দুই হোতা, যজ্ঞের শেষের দগ্ধ সমিধের টুকরোগুলো সংগ্রহ করে নিয়ে মিলিয়ে যাবে সেই ছায়ান্ধকারে, যেখান থেকে শিকারির নিঃশব্দ পদচারণায় বেরিয়ে এসেছিল তারা...

খ্যাঁচ করে ব্রেক কষে দাঁড়াল গাড়িটা। এত জোরে, যে তন্ময় হয়ে ভাবতে থাকা সাখাওয়াতের চিন্তাসূত্র ছিন্ন হয়ে গেল। যদিও রাস্তা জনবিরল, তবু স্বয়ংক্রিয় ট্র্যাফিক সিগনালে হঠাৎই জ্বলে উঠেছে লাল আলো।

পারিপার্শ্বিক ভালো করে বুঝে ওঠার আগেই সাখাওয়াত দেখলেন একটি বাইক এসে থামল, ঠিক তাঁর জানলার পাশে।

এই মুহূর্তগুলি পোড়-খাওয়া যোদ্ধার সূক্ষ্ম সংবেদনশীল স্নায়ুতন্তুতে কম্পন জাগায়। কিন্তু হ্যান্ড-আই কো-অর্ডিনেশন বড় নির্মম। দেহপট সনে...

সতর্ক হয়ে নড়ে ওঠার আগেই সাইলেন্সার লাগানো একটি নল ফণা তুলে দাঁড়াল বৃদ্ধ গোয়েন্দার হতভম্ব চোখের সামনে।

...এই তাহলে মৃত্যুভয়? অসমসাহসী চন্দন সামলের মনের ভেতর তাহলে কি ঠিক এমনটাই হয়েছিল, সেই সন্ধ্যায়, স্টেডিয়ামে, এক ঝাঁক মৃত্যুদূতের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে?

সে কি আদৌ ভয় পেয়েছিল, নাকি নিজের আসন্ন জেতার নিশ্চয়তায় ভয় পেতে ভুলে গিয়েছিল?

রাকেশ সাখাওয়াত কি ভয় পাচ্ছেন? নাকি জীবনের শেষ দাবাখেলাতে জিতেও হেরে যাওয়ার দুঃখে তিনি অসাড়!

উত্তর আর কোনোদিনই নিশ্চিত করে জানা যাবে না...

'এ তোর কী ধরনের ব্রেক-আপ বুঝি না। যার সঙ্গে ব্রেক-আপ করলি, সে-ই জানে না।'

'কী করে জানাব? জানানোর কোনো উপায় কি সে রেখেছে?'

'একটা কাজ করতে পারিস। আমাদের পেপারে একটা হাফ পেজ অ্যাড দিয়ে দে! ঠিক জানতে পেরে যাবে।'

‘ধুস! আমাদের কাগজ তো ওয়েস্ট বেঙ্গলেই সব জায়গায় পৌঁছোয় না। সে এখন কোথায় না কোথায় আছে...'

একটু ভারী হয়ে যায় মোনালিসার গলা। সায়ন বলে, “কিস্‌সুই জানো না সোনামণি! সান্ধ্য এডিশনের ওই একটা রিপোর্টিং-এর জেরে একদিনে সার্কুলেশন ডবল। বিজনদা বলছিল দেড় লাখ কপি বিক্রি হয়েছে কাগজ। তার ওপর প্রেমিকা যে কাগজের আপিসে চাকরি করে, আমি যে চুলোতেই থাকি, তার একখানা কপি নেব না? এমন নরাধম পাষণ্ড প্রেমিক এই দুনিয়ায় আছে নাকি?’

‘বলছিস?’ মুহূর্তে গলা তরল হয়ে যায় মোনালিসার।

‘তা নয়তো কী? আর কালকে যা কপিটা নামিয়েছিস, আজকে তো সাদাবাড়িও পিছিয়ে পড়বে মনে হয়!! এখন আপনিই দৈনিক সত্যবার্তার স্টার, ম্যাম!'

বাইকের পেছনে বসে থাকা অবস্থাতেই খুব ধীরে মোনালিসা সায়নের কোমরটা জড়িয়ে ধরে। সায়ন অল্প পেছন ফিরে দেখে। মুখে তার মুচকি হাসি ফুটে ওঠে। সি. আর. অ্যাভিনিউ থেকে বাঁ-দিকে প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিটে বেঁকে যাওয়ার মুখে এসে হঠাৎ মোনালিসা চেঁচিয়ে ওঠে, ‘অ্যাই, অ্যাই! দাঁড়া তো, দাঁড়া এক বার, প্লিজ!'

চমকে সায়ন তাড়াতাড়ি বাইকটাকে সাইড করে। ভালো করে বাইকটা থামার অপেক্ষা না করেই লাফিয়ে নামে মোনালিসা। রাস্তার মোড়ে একটা পুরোনো বইয়ের দোকান। লোকটা কিছু ম্যাগাজিন এবং সকালের দিকে কিছু নিউজপেপারও রাখে। মোনালিসা দ্রুত পায়ে গিয়ে একটা সত্যবার্তা তুলে নেয়। প্রথম পাতাটা গোগ্রাসে গিলতে গিলতে সে কোনোদিকে না তাকিয়ে আবার বাইকের কাছে এগিয়ে আসে।

সায়ন বেগতিক বুঝে, টুক করে বাইকটা স্ট্যান্ড দিয়ে ছুটে গিয়ে লোকটাকে খুচরো চার টাকা দিয়ে দেয়। ফিরে এসে দেখে মোনালিসা তখনও কাগজের প্রথম পাতাতেই ডুবে। উঁকি মেরে সে দেখে— তার তোলা ছবিটা নেই। ভালো তুলেছিল ছবিটা। ফাঁকা মেট্রো রেলের কম্পার্টমেন্টের একপ্রান্তে একটা দূরপাল্লার রাইফেল - যার নল উলটো দিকে কোনো অনির্দেশে তাক করে রাখা! -

মোনালিসা একটা দুর্দান্ত হেডিং করেছিল। এত ভালো, যে বিজনদা তাতে একটুও কলম ছোঁয়াননি। হেডিং ছিল—

‘লক্ষ্য? ভ্রষ্ট!!’

এখন সায়ন যে ছবি দেখতে পাচ্ছে, তাতে বিশ্ব বাংলা গেটের ওপর মাতৃভাষা সদনকে ঘিরে থাকা গ্যালারি থেকে হাসিমুখে হাত তুলে দাঁড়িয়ে থাকা দুই দেশনায়কের। পিআর ফোটো! হেডিংটাও চেঞ্জড।

খুব অবাক হয় না সায়ন। এই প্রফেশনে তার প্রায় এক দশক হতে চলল। সত্যবার্তা এর আগে এ জিনিস না করলেও অনেক জায়গাতেই এসব হয়। পার্ট অফ দ্য জব!

মোনালিসা চোখ তুলে তাকায় ওর দিকে। উদ্ভ্রান্ত দৃষ্টি দু’ চোখে! আহা, বেচারা! ওর প্রথম আঘাত। মানিয়ে নিতে সময় লাগবে।

‘গেট মি টু বিজনদা সায়ন!’

কান্না চাপতে গিয়ে কর্কশ শোনাচ্ছে মোনালিসার গলা। সায়ন তড়িঘড়ি বাইকে স্টার্ট দেয়।

অফিসে পৌঁছে ঝড়ের বেগে বিজনদার কেবিনে ঢোকে মোনালিসা। তার তখন চোখ জলে ঝাপসা। কান দিয়ে গরম হলকা বেরোচ্ছে অপমানে। দেবদীপ্ত থাকলে বিজনদা এ জিনিস করতে পারত? প্রচণ্ড বিচলিত থাকায় ও বিজনদার মুখোমুখি, দরজার দিকে পেছন ফিরে বসে থাকা ভদ্রলোককে খেয়ালও করেনি। মোনালিসা জিজ্ঞেস করে,

শুরুতেই ঝাঁপিয়ে পড়ে কান্না-বিকৃত গলায় ‘হোয়াট দ্য ফাক ইজ দিস বিজনদা? হোয়াট দ্য ফাক...’

‘ওয়েল, ডোন্ট বি সো হার্শ অন হিম ডিয়ার!’ পেছন ফিরে থাকা লোকটি একটু ঘুরে

স্মিত হেসে ওর দিকে তাকায়, ‘আমার অনুরোধেই বিজনবাবুকে এটা করতে হয়েছে! ইউ নো, আই অ্যাম ভেরি পারসুয়েসিভ!!’

বিস্ফারিত চোখে সেদিকে তাকায় মোনালিসা। এই ক'দিনে তার জীবন অজস্র অবিশ্বাস্য মোড় নিয়েছে। কিন্তু এটা তার ভাবনারও অতীত ছিল। তার সামনে বসে আছেন ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা, রঘু শেখরণ!!

কোচি, ভারত

চারপাশে পাখিদের কিচিরমিচির! এই গভীর শান্ত সকালে, এই সবুজের সমুদ্রের মধ্যে এইটুকুই যা আওয়াজ।

সিমেন্টের বাঁধানো বেদিতে বসে থাকতে থাকতে চোখ বুজে সবটুকুতে প্রকৃতি শুষে নেওয়ার ইচ্ছে নিয়ে গভীর শ্বাস নিল আর্য। আঃ!

পাশে এসে বসল কেউ একটা। গায়ের গন্ধে আর্য টের পেল, বাবা! ‘কফি?’

বাড়ানো কফির মগটা হাতে নিতে নিতে মৃদু হেসে আর্য বলে, ‘থ্যাংকস ড্যাড!’

‘পেপার?’

‘আই উইল পাস!’

‘গুড ফর ইউ ব্রো!’

দুজনেই হালকা হেসে ওঠে। বাবা পেপারটা বেঞ্চে রেখে দেন। ইংরেজি সর্বভারতীয় দৈনিক। না চাইতেও অভ্যাসবশত আর্যর নজর চলে যায় একটা ছবির দিকে। একটি খুব চেনা মুখের ছবি। তার নীচে অল্প কয়েক লাইনের খবর

> ‘মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় নিহত প্রাক্তন আইবি গোয়েন্দা ও বিরূপাক্ষ হত্যাকাণ্ডে দায়ী কুখ্যাত অফিসার রাকেশ সাখাওয়াত! শনিবার রাত্রে দমদম বিমানবন্দর যাওয়ার পথে রাকেশ সাখাওয়াতের গাড়িতে একটি ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ধাক্কা মারে। সাখাওয়াত ঘটনাস্থলেই মারা যান। স্বস্তির বিষয় ট্রাকচালক এক্ষেত্রে পালিয়ে যায়নি। দায়িত্বশীল নাগরিকের মতোই সে পুলিশের হাতে ধরা দেয়। পুলিশ সূত্রে খবর ট্রাকটির কোনো যান্ত্রিক গোলযোগ আছে কিনা পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে। তার ওপর নির্ভর করে ড্রাইভারকে চার্জশিট দেওয়া হবে।
> প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ২০১৭ সালে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর আতঙ্কবাদীদের হাতে হত্যার পর, কর্তব্যে গাফিলতির অভাবে মিঃ সাখাওয়াতের চাকরি যায়। তারপর থেকে বিগত দু' বছর উনি কোথায়-কীভাবে গা-ঢাকা দিয়েছিলেন সে বিষয়ে কিছু জানা যায় না।”

খবরটা পড়ে বিমূঢ়ের মতো মুখ তোলে আর্য। তার অভিব্যক্তির হঠাৎ পরিবর্তন দেখে তার বাবা একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেন, ‘এনিথিং রং?’

‘সামওয়ান গট কিলড! সামওয়ান আই নিউ!’

মুখে আফশোসের একটা চুক চুক করে আওয়াজ করেন আর্যর বাবা। তারপর সংযত গম্ভীর গলায় বলেন, “কিন্তু তোমাদের পেশায় তো এটা বেশ স্বাভাবিক। তোমাকে তো

এইভাবে...'

'সমস্যা সেটা নয় বাবা। আমার আশঙ্কা অন্য জায়গায়...' হঠাৎই বেঞ্চ থেকে উঠে পড়ে আর্য। তার দেখাদেখি তার বাবাও। বাড়ির দিকে বেশ দ্রুত পায়ে এগোতে এগোতে আর্য বলে, 'আমার সন্দেহ একে মারা হয়েছে, কারণ এ এমন কিছু জানত, যা কিছু লোকের সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছিল।'

'হুমম... ইট সিমস দেয়ার ইজ সামথিং মোর টু ইট, যা তুমি বলতে চাইছ...' 'হ্যাঁ! সমস্যা হল, শুধু এই লোকটিই নয়, সেগুলো আমিও জানি!!'

কলকাতা, ভারত

বাইরে পড়ন্ত বিকেলের তীব্র রোদ। যদিও গাড়ির ভেতর শান্ত, সৌম্য, আরামদায়ক বাতানুকূল পরিবেশ। ফাঁকা করে দেওয়া রাস্তা দিয়ে হু-হু করে ছুটে চলেছে গাড়িটা। রাজহাঁসের সাঁতারের মতো মসৃণ, রাজকীয়।

পিএম তাকিয়ে রয়েছেন বাইরের দিকে। ভিআইপি রোডের দু'পাশে একঘেয়ে শহর ছাড়া দেখার মতো কিছু নেই। তবু বাইরের দিকে তাকিয়েই অন্যমনস্কভাবে তিনি কিছু একটা ভেবে যাচ্ছেন।

শেখরণ এক বার গলাখাঁকারি দিয়ে বললেন, 'স্যর...'

'ওঃ! হ্যাঁ।' যেন স্বপ্নোত্থিতের মতো শেখরণের দিকে তাকালেন দেশের সবচেয়ে শক্তিশালী মানুষটি।

'তাহলে আমাদের অফিসিয়াল ভার্সন কী হবে স্যর? উই ক্যান নট হোল্ড অনটু দিস ফর মাচ লং.....'

'লেট দ্য ফার্স্ট স্টোরি বি আওয়ার অনলি স্টোরি! অ্যান্ড রিমেমবার— লোকটি আমায় মারতে চেয়েছিল!!'

'কিন্তু স্যর, অন্যটা? আই মিন অনেক আই উইটনেস, একটা বড় স্নাইপার রাইফেল, দুটো ডেডবডি... হাউ উইল উই প্লে দিস ডাউন?'

ভুরু কুঁচকে শেখরণের দিকে তাকান পিএম। চাউনিতে বিরক্তি স্পষ্ট। 'তুমি কি সত্যিই চাও যে এটাও আমি তোমাকে বলে দেব? ফর গডস সেক রঘু, টেক দ্য মরাল হাই গ্রাউন্ড! সেনসিটিভ ফর ন্যাশনাল ইন্টারেস্টস! পিরিয়ড!'

শেখরণ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকেন। ইফ ওনলি দ্যাট ওয়াজ দ্যাট ইজি! আবার ভেবে দেখতে গেলে তাঁর কোন কাজটাই-বা সহজ? সহজ কাজ করে করে তিনি কার্যত ভারতের দ্বিতীয় শক্তিশালী ব্যক্তি হয়ে ওঠেননি। কিছুক্ষণ চুপ থেকেই তিনি আবার বলে ওঠেন, 'বাট রাকেশ?'

'ডু উই নিড হিম এনিমোর?' ঠান্ডা গলায় যে প্রতিপ্রশ্নটা মানুষটি করেন, সেটাই আসলে উত্তর।

শেখরণ বাইরের দিকে তাকান। যশোর রোড ক্রসিং-এর কাছে এসে গেছেন তাঁরা। এয়ারপোর্ট প্রায় ছুঁই ছুঁই। নেমেই ফিরোজ আহমেদের সঙ্গে ব্যস্ত হয়ে পড়বেন তার বস। হাসি হাসি মুখে ছবি তোলার পোজ দিতে!

একটা কথা, এক্ষুনি না জানলেও চলে। কিন্তু শেখরণের স্বস্তি হচ্ছে না। যে মানুষটির সঙ্গে তার ওঠাবসা— তার চিন্তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলা খুব শক্ত। আগে থেকে তৈরি থাকতে হয়। না হলে রোলারের চাকায় তোমাকে পিষে দিয়ে এগিয়ে যায় নিষ্ঠুর জয়রথ। তিনি এক বার ফাইনালি বাইরের দিকে তাকিয়ে আবার চোখ ফিরিয়ে বলে ওঠেন, 'কিন্তু স্যর, এই প্ল্যানটা কোনো কাজেই লাগল না। দ্যাট ম্যান, ফিরোজ— ওয়াজ টু স্লাই!'

'হ্যাঁ, নোবেল পিস প্রাইজ পেতে চায়, বাস্টার্ডটা! দ্যাট ক্লাউন! শান্তি, কাশ্মীর— মাই ফুট!' এই প্রথম, এই প্রথম ভেতরে চেপে রাখা হতাশা আর ক্রোধের হলকা, চাপা দেওয়া পাথর সরিয়ে ক্ষণিকের জন্য তার লেলিহান জিভ বাড়িয়ে দেখা দেয়।

শেখরণ সতর্ক হয়ে যান। ক্ষমতার মোহ প্রবল। আর এই লোকটির মধ্যে তো তা আরও বেশি। তাই একটু রয়ে-সয়ে জিজ্ঞেস করেন, ‘দেন, হোয়াট ডু উই ডু, স্যর?’

‘যুদ্ধ... একটা যুদ্ধ চাই রঘু! উই নিড আ ব্লাডি ওয়ার!!’

জন্ম: ১৯৮১
শিক্ষা: স্নাতক (ইঞ্জিনিয়ার)
কর্ম: বহুজাতিক সফটওয়্যার কোম্পানি, কলকাতায় পোস্টেড

এইরকম করেই তো শুরু হয় লেখক পরিচিতি, তাই না?

কিন্তু, এ কি নেহাত ব্যক্তি পরিচিতি নয়? জন্ম, শিক্ষা, কর্ম, পরিবারের বাইরে যে লেখকসত্তা— তাকে কতটুকু জানা যায় এইভাবে?

অরিন্দমের বিশ্বাস, লেখকের সেরা পরিচয় তার লেখায়। তিন-চার বছরের আনকোরা লেখক জীবনে তিনি প্রচুর কবিতা লিখেছেন, যা প্রায় কেউই ছাপেনি (কী দুঃখু! কী দুঃখু!!)!! তুলনায় গল্প বা উপন্যাস লিখেছেন বেশ কম। গদ্যের বেশিরভাগই প্রকাশিত 'দেশ', 'নবকল্লোল', 'যুগ' ও 'অন্তরীপ'-এর মতো পত্রিকায়। প্রথম এবং এই বইয়ের আগে একমাত্র প্রকাশিত বই 'একটি মিথ্যে ঘটনা অবলম্বনে'। 'শতরঞ্জ' অরিন্দমের দ্বিতীয় প্রকাশিত বই।

এইসব ছোটগল্প-উপন্যাস-প্রকাশিত বইয়ের মধ্যেই লেখক অরিন্দমের পরিচয় ছড়িয়ে আছে। আশা করব, পাঠক তা খুঁজে পাবেন!

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী আসছেন ভারত সফরে। আসছেন কলকাতায়।

আন্তর্জাতিক ও কূটনৈতিক স্তরে অসম্ভব স্পর্শকাতর ও গুরুত্বপূর্ণ সফরের আগেই ঘটে চলেছে কিছু আপাত সংযোগহীন ঘটনা।

দৈনিক সত্যবার্তার সাংবাদিক মোনালিসাকে গভীর রাতে ফোন করে কী অ্যাসাইনমেন্ট দিলেন সম্পাদক? করাচির 'চানেসার গোঠ' রেলস্টেশনে পাওয়া যায় কার অজ্ঞাতপরিচয় লাশ? র'-এর উচ্চাকাঙ্ক্ষাহীন রিপোর্ট অ্যানালিস্টকে শীতঘুম ভাঙিয়ে কোন কাজে নিয়োগ করা হল? কে-ই বা করলেন? বারুইপুরে চটি কিনতে গিয়ে পুলিশের হাতে কেন গ্রেপ্তার হলেন জনৈক বাংলার শিক্ষক? গণেশনগর মহল্লায় একা একটা ফ্ল্যাটে কাটানো ওই বিপত্নীক ভদ্রলোকই-বা কে? তাঁর কী সম্পর্ক, এই সমস্ত ঘটনার সঙ্গে?

হিংস্র বাস্তুতন্ত্রের মধ্যে শ্বাপদের নিয়ত ছোটাছুটিতে গুলিয়ে যায়, কে শিকার আর কে-ই বা শিকারি!

শতরঞ্জ বড় জটিল! ভার্জিনিয়ার শান্ত শহরতলি থেকে কলকাতার ব্যস্ত রাজপথ, লাহোরের মোচি গেট থেকে বারুইপুরের বাজার, দিল্লির ক্ষমতার অলিন্দ থেকে চানেসার গোঠ-এর আন্ডারওয়ার্ল্ড, দুবাইয়ের বিলাসবহুল হোটেল থেকে ধাড়সা— ষড়যন্ত্র ও পাল্টা ষড়যন্ত্রের সূক্ষ্ম জাল ছড়িয়ে আছে আমাদের চারপাশে!

খেলা হবে নাকি?